কালকূট
কালকূট
রচনা
রচনা
সমগ্র
সমগ্র

কালকূট রচনা সমগ্র

[প্রথম খণ্ড]

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

সূচীপত্র

৩০শে ডিসেম্বর। রবিবার। শীতের সকাল, মেঘমুক্ত নীল আকাশ। বাংলার শীতকালতো, তাতে আবার শীতটাও বেশী পড়েনি। উত্তুরে হাওয়া দক্ষিণের এই জেলাটিতে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বেঁকে উঠছিল। জেলা ২৪ পরগণা, কাছেই সমুদ্র।

কিন্তু সেদিকে বিশেষ কারুর নজর ছিল না। ভোটের তরঙ্গে ভাসছে সারা জেলা। তরঙ্গ না বলে বলা উচিৎ ভোটের জ্বর চড়ছিল, আস্তে আস্তে সাধারণের শিরায় শিরায় ঝিমুনো রক্তের বাড়ছিল গতি।

সকাল থেকে দেখা গেল, শিল্পাঞ্চলের ভোটনায়কদের আজকের টার্গেট হচ্ছে ভাটপাড়া। শ্যামনগর থেকে ভাটপাড়া, দীর্ঘ পাঁচ ছ' মাইল তার বিস্তৃতি। সারা ভারতের লোক থিক্ থিক্ করছে সমস্ত অঞ্চলটিতে। রবিবারের ছুটিতে গা ভাসিয়েছে সারা এলাকা···কিন্তু ভোট প্রার্থীদের কাছে এই একমাত্র দিন সব মানুষগুলোকে পাওয়ার।

বর্ষার জলে যেমন আগাছার ভিড় বাড়ে, ভোটের আগে তেমনি শ্যামা মুখুজ্জে খাড়া করেছেন জনসংঘ। পিদীম জ্বালিয়েছেন, শুনি এ নাকি মুখুজ্জে মশাইয়ের শিবরাত্রির সল্তে। পিদীম জ্বলে চর্বিতে। দুষ্ট লোকে বলে, চর্বির যোগান নাকি হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যাক্ সে কথা।···আইন সচিবের দল থেকে কেটে পড়া শ্রমিকদের এক মাসীমা হয়েছে এ দলের ভাটপাড়ার এসেম্বলীর প্রার্থী।

আজকের সকালে এরা এবং এ অঞ্চলে আচমকা আবির্ভূত কংগ্রেসী নতুন দেবতা দয়ারাম বেরীর দল সবচেয়ে বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দয়ারাম বেরী

তার তিন ফুট শরীরটাকে নিয়ে টুক টুক করে এলাকাতে ঘুর ঘুর করছে, টহল দিচ্ছে তার প্রচার ভ্যান। তাদের কথায় এবং চলায় ফেরায় বেশ একটা ডগলাসি ভাব ফুটে উঠেছে। ঘোড়া হলে তার মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ত, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পেট্রলের গন্ধ আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে জগদ্দল কাঁকিনাড়ার রাস্তা। ফেনা যা গড়াচ্ছে, সেটা মাইক্রোফোনের সামনে ভলান্টিয়ারের মুখ থেকে।

কৃ-ম-প্র'র বিধানসভার প্রার্থীও ঘুরছেন কুঁড়ে মাথায় করে। রাজনৈতিক আকাশে এ শ্রাবণের ঘনঘোরে বর্ষা পিয়াসী ব্যাংএর ডাকাডাকির মত কৃপালনীও কৃপা না করে পারেননি। ভাই লেহাম তো পড়্, তা পরে লাগে তাক, না লাগে তুক্, এই ভেবে এরাও আসর জাঁকিয়ে বসেছে। এদলের এসেম্বলী প্রার্থীটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের ভারী আদুরে পিসীমা।

মাসীমা আর পিসীমা অর্থাৎ কর্তা কংগ্রেসের একজন শালী, অপরটি ভগ্নী। জোড়া বলদ খোদ কর্তা মহেশ্বর, মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ছে আর আপনারা তা শুনতেও পাচ্ছেন নিশ্চয়ই।

এরা সকলেই প্রায় মেতে উঠেছে। মাততে পারেনি বলশেভিক পার্টির বিধান সভার প্রার্থী সীতা শেঠ। কেন না, তার অত পয়সা নেই। তার তো আর মিলওয়ালা, জমিওয়ালা, বিশ্ববিদ্যালয়ওয়ালা সাকরেদ নেই। যেটা আছে, সেটা সদিচ্ছা আর কিছু দরিদ্র কুলিমজুর, যারা দিবারাত্র কলে মিলে খাটে আর পুলিশের ও কলের সাহেবের চোখরাঙানি ও খেউড় শুনে মরে।

আর আমরা ভোটদাতারা, পথে পথে দাঁত বার করে হাসছি, খালি পেটে চা ঢালছি চৌরাস্তার মোড়ে বসে, বাজার থেকে ফিরে আসছি শূন্য থলি নিয়ে, মুখে হাসি বুকে বিষ নিয়ে খিস্তি করছি, শুক্‌নো মুখে ভিড় করছি ডাক্তারের দরজায় আর বোম্বাইওয়ালী সাঁইয়ার বুকে হাজার পাওয়ারের আলো দেখে ছটফট করছি পোকার মত।

রোদ পোয়াচ্ছে আগরওয়ালা, লালা দুবের দল, সরকারি কর্মচারীরা জমকাচ্ছেন বৈঠকখানা। ওদিকে শ্যামনগরে পোষকালীর মেলা। আটপৌরে মেয়ে পুরুষের দল ছুটেছে সেদিকে।

এমন সময় গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে ভেসে এল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। কে আসছেন? দেখা গেল উত্তর মুখো ছুটেছে জনসংঘের সেই দেখে দেখে চোখে পচে যাওয়া মাইক্ লাগানো ঘোর সবুজ গাড়ীখানি, পেছনে আর একখানি

সুদৃশ্য মোটরকার। তার মধ্যে মেসোমশাই শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে আছেন গুটিসুটি বসে। চলেছেন ভাটপাড়ায় কোন্ ক্লাবের মাঠে বক্তৃতা দিতে।

জগদ্দলে বেয়াইর দল বলদের লেজ তুলে গোঁফ মুচড়ে নিল একচোট। ভাবখানি, ওবেলা দেখ্ নেবে।

মাসীমা তো কবেই ভাটপাড়ায় চলে গেছে। দেখে শুনে কৃ-ম-প্র'র পিসীমা ভাটপাড়ায় চলে গেল। দেখে শুনে কৃ-ম-প্র'র পিসীমা ভাবল দাঁড়াও, আমিও ওঁকে (অর্থাৎ পিসেমশাই কৃপালনীকে) এনে দেখিয়ে দিচ্ছি।

ওদিকে ভাটপাড়ার মোড় আগ্‌লে বসে আছে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বাবু, বিধানসভার স্বতন্ত্রপ্রার্থী। সে তার এক কমিশনার ভায়াকে বিমুখ করে নিজেই প্রার্থী হয়ে এখন প্রৌঢ়া বাঈজীর মত হাসছে মিট মিট করে। অর্থাৎ, তার নাচানাচিতে এখন আর কেউ ভুলবে না বুঝেই সে তার 'রেলগাড়ীর' দৌড় কমিয়ে ব্রেক কস্‌বার উদ্যোগ করেছে। উদ্দেশ্য, নেপথ্য থেকেই কারুর গলায় ঝুলবে।

বেলা গড়িয়ে চলল, পথঘাট এল একটু ঝিমিয়ে। তবে ছুটির দিন তো। লোকজন কিছু আছেই। মেলার যাত্রীরা পেটের ভাত হজম না করেই ছুটেছে। কারুর খোঁপা ঝুলছে, বেঁকে গেছে টিপ। আধাভদ্র ও ভদ্রদের কোলে ছেলেপুলে। বাসে কাঁপছে অনেকে। উপোসীরা, ভবঘুরেরা, ভদ্র বেকারেরা এবং অগেরস্ত কুকুরেরা ঘুরছে রোজকার মতই।

পৌষের দুপুর, কিন্তু মনে হচ্ছে বসন্ত এসে গেছে। ডাকছে কোকিল হাওয়া উঠেছে এলোমেলো হয়ে। একেই বলে বোধ হয় অকাল বসন্ত। গায়ে শুটি ওঠাটা যা বাকী আছে।

ষাঁড়ের গর্জন শোনা গেল। অকাল বসন্তে কি ষাঁড় গর্জায়? উঁকি মেরে দেখি, মিছিল আসছে। জোড়া বলদের মিছিল। আর বলদ থাকলেই ডাণ্ডা থাকবে। হাতে ডাণ্ডা, একেবারে মোক্ষম যাকে বলে।

ভক্ করে নাকে একটা গন্ধ যেতেই থমকে গেলাম। কিসের গন্ধ? মিছিলের অগ্রগামীদের দিকে তাকিয়ে দেখি, সবাই রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছে। শিবনেত্র রক্তবর্ণ হয়েছে, গা টলছে আর জড়ানো গলায় খালি শোনা যাচ্ছে 'কং কো দো।' অর্থাৎ কংগ্রেসকো ভোট দো।......এ স্লোগানটি না থাকলে মনে হত বুঝি একদল ডাণ্ডাধারী মাতাল কোথাও মদ বয়কট-ওয়ালাদের ঠ্যাঙাতে চলেছে।

জেহাদী মত্তের চরণভরে ধরণী করিছে টলমল। হাওয়া থেমে গেছে, পথের দুধারে স্তব্ধ বিমূঢ় জনতা। পথ কাঁপছে, আকাশ ফাটাচ্ছে রোষহুঙ্কার। কিন্তু কার বিরুদ্ধে এ জেহাদ!

এদেরও টার্গেট ভাটপাড়া, রিলায়েন্স মিলের ময়দান। সেখানে আসছেন আজ শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ, দেখাবেন তুলনাহীন খেলা।

দেখে শুনে চন্দননগর ফেরতা উট্‌কো মাতালও হেসে উঠল। উট্‌কো মাতালের বউ সোয়ামীর হাত ধরে চেঁচাচ্ছে, 'ওরে, তুই সারা হপ্তার পয়সা দিয়ে মাতোয়ালা বনে এলি, বালবাচ্চারা কি খাবে?'

উটকো মাতাল সে কথার জবাব না দিয়ে থুথু ছেটাতে লাগল আর মিছিলের মাতালদের চীৎকার করে বলতে লাগল, 'থুক শালা, মাতাল বনেছে দুস্‌রা আদমীর পয়সায়।'

আমরা পথচারীরা খালি পেটে খিল ধরিয়ে হাসলাম। উটকো মাতাল সে হাসি শুনে খেপে গিয়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করল।

ভাঙা মিছিল চলে গেল। পথচারীদের হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতেই একটা ঝড় বয়ে গেল কটূক্তির। ভালমানুষ বাবুরা মিহি করে বললেন, 'এ তো গুণ্ডামি।'

একটা রিক্‌সাওয়ালা তার রিক্‌সার পেছন থেকে ফর্‌ ফর্‌ করে ছিঁড়ে ফেলল জোড়া বলদের পোষ্টারটা।

ধুলোয় ধোঁয়ায় ভরা আকাশ। বেলা চলে গেছে। শীত লাগছে একটু।

বাসে চাপলাম নৈহাটী যাওয়ার উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে একবার উঁকি মারব অতুল্যচরণের ভোট-বন্দনা সভায়। জায়গা মিলল পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পাশেই। ড্রাইভারের পাশে আর একটি বাবুভায়াও আছেন। সেজেগুজে চলেছেন বোধ হয় নৈহাটীতে সিনেমাটা আস্‌টা দেখতে, কোন্‌ না একটু চপ্‌ কাটলেটও খাবেন বাসন্তী কেবিনের চেম্বারে বসে।

মোটরবাস চলল গোঁ গোঁ করে। হোই · জগদ্দল্‌, কাঁকনাড়া, ভাটপাড়া, নৈহাটী, গৌরীপুর, হাজিনগ···র! কানপাতা দায়। পথে পথে ক'লো লোকের ভিড়, যেন দলা পাকিয়ে আছে। হাজার হর্ণেও সরতে চায় না, শুনতে পায় না।

আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যা নামছে। গাছে গাছে দিন শেষের কাকপক্ষীর জটলা। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া শেষ মিলটা পেরুতেই দেখি জোড়াবলদ

ও দয়ারামবেরীর পোষ্টার নিয়ে লোকজন ফিরে আসছে। কি ব্যাপার ?…
যারা ফিরে আসছে তারা সকলেই ঘরে বাইরে থেকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং পোষ্টার চাপিয়ে দেওয়া লোক। তাদের মুখে বিরক্তি ও ভীতির ছায়া। বোঝা যাচ্ছে তারা রিলায়েন্সের ময়দান অবধি পৌছয়নি, তার আগেই এ্যাবাউট্ টার্ণ করেছে।

একটু নড়েচড়ে বসলাম। পাশের বাবুভায়া একটি সিগারেট ধরালেন। নাকের ভিতর দিয়ে একটা শব্দ করল পাঞ্জাবী ড্রাইভার।

মিছিল থেকে ফিরে আশা লোকের ভিড় বাড়ছে, পথের দুপাশ ধরে আসছে তারা। একটা লোক দরমা আঁটা পোষ্টার ফেলে দিল ছুঁড়ে নর্দমায়।

এর মধ্যেই একটা নতুন মিছিল দেখা গেল সাধুদের। চারটে ন্যাংটা সাধু রিকসায় বসে, একদল ঢোল করতাল বাজাতে বাজাতে চলেছে।

সামনে তাকিয়ে দেখি কাঁকনাড়ার মোড়ের কাছে অসম্ভব ভিড়। যত এগোই, তত ফিরে আসা মিছিলের লোকগুলোর মুখে দেখি ত্রাস, গতি দ্রুত। অত্যন্ত সাধারণ কলে খাটা লোক এরা। গোলমালের আঁচ পেয়েছে যেন।

পেপার মিলের সাইডিংএর কাছে আসতেই হঠাৎ বাসের গায়ে দুমদাম করে কয়েকটা লাঠি পড়ল। পাঞ্জাবী ড্রাইভার বলে উঠল, ইলোক বহারে ফুর্তি মচাতা।…বাবুভায়া বললেন—যত সব ন্যাষ্টি…

আর খানিকটা এগুতেই একদল ক্ষিপ্ত লাঠিধারী বাসের পথরোধ করে দাঁড়াল।

বাস থেমে পড়তেই ক্ষিপ্তের দল অন্ধের মত লাঠি ঘোরাতে লাগল বাঁই বাঁই করে। হল্লা, খিস্তি আর দাঙ্গা।…

ড্রাইভারের পাশের দরজাটাতে একটা মোটা হাত এগিয়ে এল, দরজাটা খুলে ফেলার জন্য। তাকিয়ে দেখি সেই মিছিলের মাতাব্বরদের একজন। মুখে মদের গন্ধ, মাথায় গান্ধী টুপী, হাতে ডাণ্ডা। সে গর্জাচ্ছে, 'উতরকে আও!'

দরজাটা খুলে যেতেই সে এক হ্যাচ্‌কায় আমাকে টেনে নামিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগল।

তার চোখের দিকে তাকিয়েই আমার মনে পড়ে গেল আমি বাঙ্গালী। বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠে আমার কানে খালি একটা শব্দ বাজতে লাগল

টিপ্ টিপ্ টিপ্। গুণ্ডার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, আমার মাথায় চুল চাঁছা, কোয়ার্টার ইঞ্চি একটি টিকিও আছে। মনে পড়ল আমার মৃত পিতার শ্রাদ্ধ হয়েছে কয়েকদিন।...আততায়ী বুঝতে পারছে না আমি বাঙ্গালী না অবাঙ্গালী।

সেই বাবুভায়াকেও টেনে নামানো হয়েছে। কানে এল বাবুভায়া জিজ্ঞেস করছেন,

'কি হয়েছে ভাই?'

একটা মাত্র আঘাতের শব্দ পেলাম, দেখলাম বাবুভায়া আমারই পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছেন।

আমি প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে চাইলাম, কিন্তু গলার স্বর নেই। কানে একটা আর্তনাদ ভেসে এল, ওরে বাবা রে...মরে গেলাম রে।.. বাসের প্যাসেঞ্জারদের টেনে টেনে নামানো হচ্ছে।

নিজের নাম নিয়ে নিজেকে মনে মনে ডেকে বললাম, ওরে মরবার আগে একটু চেষ্টা কর্। একটা কথা বল্। মাথার উপরে যে তোর ডাণ্ডা!

জিজ্ঞেস করলাম, 'কা হুয়া?'

প্রশ্ন শুনে খুনী সংশয়ান্বিতভাবে আমার হাত ছেড়ে দিল, সরিয়ে দিল ধাক্কা দিয়ে। বলল, 'দেখতা নেই কা হুয়া?'

সে আমাকে অবাঙ্গালী ভেবেই ছেড়ে দিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি পথচারীদের উপর খুনীদের ডাণ্ডা পড়ছে নির্মমভাবে। মৃত্যুভয়ে সব চীৎকার করছে, ছুটছে, তাদের পেছনে ধাওয়া করছে কংগ্রেসী ভলান্টিয়ার মাতালেরা। উত্তর পূব কোণে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে। আগুন লেগেছে সেখানে।

কিন্তু আমার কানে তখন বাজছে, হয় তো বেঁচেছিস্. এবার পালা, পালা তাড়াতাড়ি। কিন্তু কোথায় পালাব? সামনে পেছনে খুনীদের তাণ্ডব। মিউনিসিপ্যালিটির দিকে তাকিয়ে দেখি দরজা জানালা সব বন্ধ। প্রাণভয়ে যারা মিউনিসিপ্যালিটির মাঠের দিকে যাচ্ছে, তাদেরও ওরা তাড়া করে গিয়ে মারছে। কোথায় যাব?

সামনেই ফায়ারব্রিগেডের ষ্টেশন, মাত্র পনের হাত দূরে। যেতে পারলে হয়তো বাঁচব। কিন্তু পা সরছে না। যদি চিনে ফেলে।...ওখানেই যে তাণ্ডবটা সবচেয়ে বেশী হচ্ছে।

তবুও এগুলাম। মিনিটে এক পা করে।

ফায়ারব্রিগেডের গেটের সামনেই তখন একজন সাইকেল আরোহী পথিকের উপর কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে।—মার্, মার্ শালাকে।

সামনের মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে একজন কংগ্রেসী উত্তেজিত বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিয়েছে। আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে খুনীরা। তাদের ছোটার ঝাপটা লাগছে আমার শরীরে। ওরা পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছে। সে খালি বাস্‌টা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল উত্তর দিকে।

একটা খুনীর চীৎকার ভেসে এল, ওই···ওই যাতা হ্যায়।

আমার দিকেই ছুটে আসার শব্দ পেলাম, অনেকগুলি পায়ের শব্দ। আসছে···আমার দিকেই আসছে।···কিন্তু আমার ন্যাড়া মাথা। চিনতে পারবে কি?

পা এঁটে গেছে মাটিতে, সিটিয়ে গেছে শরীরটা। ঘাড়ে পিঠে সমস্ত শিরা উপশিরা এঁকেবেঁকে উঠেছে ডাণ্ডা খাওয়ার আগ্‌মুহূর্তে। একবার, মাত্র একবার চেষ্টা করলাম ছোটবার, একটা ঝাঁকানি দিলাম্ শরীরটাকে।

কিন্তু পারলাম না।

দুটি গ্রাম্য মহিলা আর একটি বৃদ্ধ ফায়ারব্রিগেডের গেটের সামনে অসহায়ের মত আঁকুপাকু করছে। কোথায় যাবে তারা, কোন্‌দিকে? পানপুরে? না কি কেউটেতে? কিন্তু চারদিকে যে দাঙ্গার দাবানল!

আমার পাশ দিয়েই একজন মার খেয়ে গড়িয়ে পড়ল নর্দমাতে।

মা! মাগো!···

কে বলল? ওই আহত, না আমি? আমি···আমিই বলেছি।···ভারতের কোন্ মা এই দাঙ্গাবাজদের জন্ম দিয়েছে? কোথায়, কোন্ নিরালা গাঁয়ে, কোন্ বস্তীর অন্ধকুঠরীতে সেই মা মাটিতে কপাল কুটে আত্মহত্যা করতে চাইছে।···চারদিকে অতুল্য ঘোষ ও দয়ারাম বেরীদের ছায়া ঘুরছে, পরাজয়ের ভয়ে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত।···মা, এই দেশের মাটিতেই কি তুই তোর আঁতুড় ঘর পেতেছিলি, ঢেলেছিলি রক্ত, ছিঁড়েছিলি নাড়ি?

ফায়ারব্রিগেডের সামনে আসতেই এক লাফে ভিতরে ছুটে যেতে চাইলাম। বাধা দিল একজন অফিসার।—আপনারা সব ভেতরে ঢুকলে, ওরাও যে ঢুকবে।

আমার কানে এল আমারই তিক্ত উত্তেজিত গলা, তবে কি মরব?

অফিসারও কেমন ভীত। অন্ধকার মুখে অপ্রতিভ হয়ে বলল, তবে যান,

ভিতরে গিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে বসে থাকুন, যেন দেখতে না পায় আপনাদের। তাহলে আমরাও মরব।

ফায়ারব্রিগেডের ভেতরে ঢুকতেই, যেমন করে চড়ুই দোয়েল পুচ্ছ নাড়ে, তেমনি যেন নড়ে উঠল আমার শিরদাঁড়াটা। বেঁচেছি···বেঁচেছি।···

আমার পেছন পেছন এল সেই গ্রাম্য পরিবারটি।

গঙ্গার দিকে যাওয়ার নিরালা পথটা দিয়ে একটা বারো-তের বছরের ছেলেকে গুণ্ডারা তাড়া করেছে।

ফায়ারব্রিগেডের কর্মীরা জটলা করছে, হাত কচলাচ্ছে, পায়চারী করছে। সামনেই রাস্তার উপর, গলির মধ্যে যে তাদের অসহায় স্ত্রী ও শিশুরা রয়েছে। সাহায্য চাইছে অফিসারের কাছে। অফিসার অস্বস্তিভরে উত্তেজিতভাবে জবাব দিচ্ছে, কি করব আমি বল? থানায় কোন অফিসার নেই, সেপাইরা নাকি সব টালিগঞ্জে না কোথায় গেছে। আমি কি করব?

একজন সাধারণ কর্মী কেঁদে ফেলেছে ভয়ে আর উত্তেজনায়, সরকার··· আমার সরকার!···

একটা মোটর সাইকেল আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আসছে বুঝি তা' হলে পুলিশ।...কিন্তু চীৎকার বেড়ে উঠল দাঙ্গাবাজদের। দ্রাম্ করে শব্দ হয়ে মোটরসাইকেলের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে ফায়ারব্রিগেডের কর্মীরাই এনে তুলল রক্তাক্ত দেহ একটা। নিরীহ মোটরবাইক-আরোহীটির।

কে একজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে, আমার মাইয়ার জামাইডারে ধইরা রাখছে, বুঝি মাইরা ফালাইছে।

কখন অন্ধকার নেমেছে টেরও পাইনি। লক্ষ্য করে দেখলাম, আমার মত আরও কয়েকজন এসে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। মেয়ে পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ। রবিবারের ছুটিতে তারা বেরিয়েছিল।

এখনো লোক আসছে এখানে। আসছে নানান খবর নিয়ে। কোথায় নাকি মেয়েমানুষকে বে-ইজ্জৎ করেছে, মেরেছে।

ওদের ভোটপ্রার্থী কংগ্রেসী নেতা নিজে নাকি আগুন লাগাবার হুকুম দিয়েছে।

তখনো চলেছে ঘোর তাণ্ডব, তখনো শোনা যাচ্ছে অসহায়ের তীব্র আর্তনাদ।

পুলিশ এল। এল শ্মশান আগলাতে, ভাগাড়ের পাহারাদারিতে।

কোলাহল স্তিমিত হয়ে আসছে। গোঁ গোঁ শব্দ উঠছে ট্রাকের। ছুটন্ত বুটের আওয়াজ এদিক ওদিক করছে।

একদিকে কাঁকনাড়া, আর একদিকে ভাটপাড়া। দুইদিকে দুই ভিন্ন প্রদেশের লোকের ভিড়। কিন্তু কি আশ্চর্য! কাঁকনাড়ার মোড়ে একটা বাঙ্গালীর দোকানও লুট হয়নি, দোকানীরা মারও খায়নি।···কেমন করে খাবে? দাঙ্গাবাজরা যে বেশীরভাগই ভাড়াটে গুণ্ডা, কংগ্রেসের নতুন ভলান্টিয়ার আগন্তুক। তারা যে জানে না এদের প্রাদেশিক পরিচয়। জানলে রক্ষা ছিল না।

যেখানে হয়েছে, সেখানেই ছিল স্থানীয় নামকরা শয়তান ও গুণ্ডার দল, যারা প্রতিমুহূর্তে সুযোগের সন্ধানে ফেরে নিশাচর শ্বাপদের মত।

ভাঙা মোটা কাঁপা গলায় গান ভেসে এল,

I was with you the whole night…….

হুড্ খোলা মোটরকারে চেপে চলেছে মত্ত শ্বেত-প্রভুরা, কোলে তাদের অর্ধ উলঙ্গ রঙ্গ-সঙ্গিনী, এই ভীত সন্ত্রস্ত শ্মশানের বুকে আজ এদেরই পুরা আজাদি। ওরা হলো বেড়ালের মত আরামে গোঙাচ্ছে, শিষ দিচ্ছে কাঁপা কাঁপা সুরে।

আর আমরা এদেশবাসীরা শেয়ালকুকুরের মত ছোটাছুটি করছি অন্ধকারে। কার মোটা গলার আঁ আঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় আমার। ফার্স্ট এইডের লোক এসেছে দু'জন পুলিশের সঙ্গে।

কে একজন আর-একজনকে দেয়ালের পাশে ফিস্ ফিস্ করে বলছে, এক দাঙ্গা ছেড়ে আর এক দাঙ্গা···আমরা সব দাঙ্গায় মরব···উঃ। জানোয়ারের দল!···

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ফায়ারব্রিগেডের একটা ব্যারাকপুরগামী গাড়ীতে উঠে পড়লাম।

আনাচে কানাচে অন্ধকারে বেশ্যালয়ের ধারে ঘাপটি মেরে আছে তখনো শয়তানেরা। যারা পারেনি প্রাণধরে বাড়ীর বাইরে থাকতে, যারা চলেছে বাড়ীর উদ্দেশ্যে আমাদের সামনেই তাদের আক্রমণ করে ছিনিয়ে নিচ্ছে পয়সা, জামা চাদর।

ব্রিগেডের গাড়ী হু হু করে ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে।

জগদ্দলের দিকে উত্তেজনা আছে, দু'একটা চোরা ঘটনাও ঘটে গেছে কিন্তু এখনো ঠিক সুবিধে করতে পারেনি।

পরদিন ১লা জানুয়ারী, ইংরেজদের নববর্ষ। জহরলাল নেহরু আসছেন ব্যারাকপুরে পশ্চিমবঙ্গের সামরিক ঘাঁটী-সহরে।

পথে এসে যখন দাঁড়ালাম, দেখলাম স্থানীয় কলকারখানার লরীগুলোতে মানুষবোঝাই, চলেছে ব্যারাকপুরের দিকে। লরীর কন্‌ভয়। চলেছে লাঠি ভাণ্ডাধারীর দল, ছুরি আর ড্যাগার নিয়ে, খাপে ঢাকা তলোয়ার বাগিয়ে ধরে সাদা টুপী মাথায় দিয়ে।

স্থানীয় নামকরা গুণ্ডা, সর্দারের দল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। জোর করে রিক্‌সায় চাপছে একসঙ্গে তিনজন, চারজন। ভীত রিক্‌সাওয়ালারা পেট পিঠ এক করে প্রাণের ভয়ে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে।

পথে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে জনতা; নিশ্চল, অবাক, সন্ত্রস্ত।

কিন্তু একদিন এই জনতা এমনি বিমূঢ় নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে দেখবার জন্য সেদিন এরা মিছিল করে ছুটে গিয়েছিল। সেই পথের মোড় আজ বেঁকে গিয়েছে একেবারে উল্‌টো হয়ে।

আজ চলেছে ভাণ্ডাধারীরা, ছোরা আর তলোয়ার নিয়ে। গতরাত্রের মত্ত রক্তচক্ষুতে কুৎসিত ইন্ধন নিয়ে।

এই মত্তদের রিকসায় চাপা ও কোম্পানীর লরীর কনভয় দেখে কে একজন ফিস ফিস্ করে উঠল, মাইরী, সেই লড়াইয়ের সময় আমরিকানলোগ্ শালা এইভাবে যেত।...

সুযোগ বুঝে একটিভ্ হয়ে উঠেছে মজুরদের মাসীমা পিসীমার দল।

মাঝে মাঝে মনে হয়, মন যেন এক সর্বনেশে যন্ত্রবিশেষ। বর্ষে বর্ষে ঋতু বদলায়, তার সঙ্গে রূপ বদলায় এই পৃথিবীর। কত তার রূপ, কখনো দেখি জলশূন্য রিক্ত মাঠ, সহস্র ফাটল ফেটে চৌচির হয়ে আছে। সেই ফুটি-ফাটা মাঠের উপর দিয়ে পাগল হাওয়া হা হা করে ছুটে যায়। মনে করি, রিক্তা ধরিত্রী নিঃশব্দ কান্নায় গুমরে উঠছে। অগ্নিস্রাবী আকাশ। গাছে পাতা নেই, কলকাকলী নেই বিহঙ্গকুলের। বিশ্বসংসার জ্বলছে নিরন্তর।

আবার দেখি, কোন্ অদৃশ্য লোক থেকে সহস্র ধারে আসছে বন্যা। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি। ভেসে গিয়েছে মাঠ, সবুজ শস্যে ভরে উঠেছে তার বুক। সোহাগী গর্ভবতী হঠাৎ হাওয়ার শিউরিনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে হাসিতে।

মনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে শূন্য। লোকে বলে, মনের মানুষ মেলে না। তাই কি! মনের সঙ্গে কোনদিন বোঝাপড়া করলাম না। শূন্য মন নিয়ে আমরা দিবানিশি ছুটে চলেছি বৈচিত্র্যের সন্ধানে। কী চাই জানি নে, পাওয়ার জন্য পাগল হয়েছি। তাই কেউ বলেছে, 'বৃথা তারে খুঁইজে মরা মাটির এই বৃন্দাবনে।' কেউ বলেছেন, 'একবার—আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনারে চেনা।' মনের এই বিড়ম্বনার কথা আর একজন বলেছেন,

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই নে'

বৈচিত্র্যের সন্ধান, আমাদের মনেরই সন্ধান। মানুষ খোঁজার ছলে আমরা মন খুঁজি। তাই বন্ধু যখন বিদ্রূপ করে বললে, 'কেন যাচ্ছ কুম্ভমেলায়? ধর্ম করতে নাকি?' ধর্মের নামে যে-হিসাবে ধার্মিক বোঝায়, আমি তা নই,

আবার বিধর্মীও নই। আমরা সেই মানিকবাবুর 'লেবেল ক্রসিং'-এর নায়কের মত।

বললাম, 'দেখতে।'

'কী দেখতে? লক্ষ লক্ষ ধর্মান্ধ মানুষকে?'

ধর্মান্ধ! লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্ধ হয়, তবে খুঁজেই দেখি না কেন, লক্ষ মনের কোন্ চোখে পরানো আছে সেই ঠুলি। মনে পড়ছে এক প্রৌঢ়া বিধবার কথা। বাঙালী বিধবা কুম্ভমেলায় গঙ্গার উপরে এক ভাসমান সেতুর কোণে বসেছিলেন আহ্নিক শেষ করে। সন্ধ্যা নামছে। আমিও যাচ্ছিলাম জলের দিকে। মহিলাটির গায়ে পা লেগে গেল। বাঙালীর ছেলে আমি। সসঙ্কোচে ক্ষমা চেয়ে হাত বাড়ালাম ওঁর দিকে। উনি তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে চিবুকে হাত দিয়ে সশব্দে আঙুলটি চুম্বন করলেন। স্বভাবতই অনেক কথা হল। ওঁর একটি কথা এখানে বলব।

কথার পিঠে কথা দিয়ে একবার কয়েক মুহূর্তের জন্ম চুপ করে রইলেন। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন মেলার ভিড়ের দিকে। তারপরে বললেন, 'বাবা, মানুষ মিলে মেলা, মানুষের মেলা। যখন ভাবি, এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মেলায় আমিও একজন, তখন সুখে আনন্দে আমি আর চোখের জল রাখতে পারি নে।'

এখন মনে পড়ছে সে কথা। কিন্তু তখন বন্ধুকে বলেছিলাম, 'ধর্মান্ধ কিনা জানি নে, তবে মানুষ দেখতে যাচ্ছি। আমাদের সব কিছুতে সাধ মিটতে পারে। সাধ মেটে না মানুষ দেখে, মানুষ চেখে! মানুষের চেয়ে বিচিত্র এ সংসারে আর কী আছে?'

বুঝলাম, বন্ধু খুশী হয় নি। বিদ্রূপে বেঁকে ছিল তাঁর ঠোঁট! অনেক তর্ক সে তখন করেছিল। এখন সে তর্কের কথা তুলে লাভ নেই। তর্ক করেও লাভ নেই। আমরা যা দেখি নি, যা পাই নি, তাই দেখবার ও পাবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠি। অজানা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সত্যি, অষ্টপ্রহর মানুষের সঙ্গেই বাস করি। মানুষের কত রূপ দেখি। কিন্তু যেখানে চলেছি, সেখানে আরও কত মানুষ, কত তার রূপ! যে প্রতিবেশীকে বছরের পর বছর দেখেও কোনদিন চোখে পড়ে নি, পরিবেশের গুণে তার বিচিত্র রূপ দেখে আমাদের মন ভুলে যায়। কী কথা! হাজার দিন

দেখেও যে মন ভোলে না, সে একদিন সব ভোলে। মন চিনি না।। তাই তো বারে বারে রূপ দেখি।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

এত রূপের ফেরে ফিরি কেন আমরা। মন খুঁজি। লক্ষ রূপের আরশিতে আমরা নিজের বৈচিত্র্যকে দেখি। এই বৈচিত্র্য হল নিরিখ, যাকে বলে কষ্টিপাথর। দাগ কাটো। সোনা কি লোহা, নিমেষে তা ফুটে উঠবে।

না, আর দেরি নয়। মন চলেছে আগে আগে, এবার পা চালিয়ে দিই। ডুব দেব লক্ষ হৃদি-কুম্ভ-সায়রে।

পিঠে নিয়েছি ঝোলা, হাতে নিয়েছি ঝুলি। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরম দেখে চক্ষুস্থির। তবুও উঠতে পেরেছি, এক সময়ে গাড়িও ছেড়েছে।

এক ফালি ছোট্ট কামরা। জনা আটেকের বসবার জায়গা। কলকাতাবাসী এক উত্তরপ্রদেশের ছজনের পরিবার বসেছেন প্রায় দুটো সীট দখল করে। আমিও পেয়েছি খানিকটা। আরও জনা চারেক উপরে নীচে। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।

ছ'জনের পরিবারের চালক যে যুবকটি, সে গোটা তিনেক ট্রিলট্রাঙ্ক সেঁটে দিল প্ল্যাটফরমমুখো দরজায়। দিয়ে আমার দিকে বীরত্বব্যঞ্জক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল। অর্থ পরিষ্কার। হেসে জবাব দেওয়া ছাড়া উপায় কী।

আমার আজানুলম্বিত কালো ওভার-কোট আর টুপি দেখিয়ে সে ইংরেজী মিশ্রিত হিন্দীতে বলল, 'আপনাকে দেখাচ্ছে যেন মিলিটারি সেপাই। দরজার দিকে 'সিরিফ' কটমট করে তাকিয়ে থাকবেন। তাহলেই আর কেউ সাহস করে—'

শেষটুকু তার চোখের আধবোজা হাসিতেই পরিস্ফুট। অতএব তার নির্দেশে আমি হলাম এ কুঠুরির আর-এক দিকের দ্বাররক্ষী। সন্দেহ ছিল নিজেরই, এ চোখের কটমটানিতে কেউ ঘাবড়াবে কিনা।

এই তো আমরা। কেউ বলতে এলে মন ভারি করি। অথচ সামান্য সুখের জন্য আমরা নিয়ত এমনি অভিনয় করে চলি। নিজের সঙ্গেও করি কি-না কে জানে!

কথায় জানলাম, ছজনের পরিবারের দেশ আজমগড় জেলা। ব্যবসাক্ষেত্র কলকাতা। গন্তব্য এলাহাবাদ, কুম্ভমেলা। আমি? আমিও একই পথের

যাত্রী। হ্যাঁ? শুনে ভারি খুশী। যুবকটি লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ট্রাঙ্কের উপর। নাক ডাকতে আরম্ভ করল কম্বল মুড়ি দিয়ে।

পরিবারের মা, মেয়ে আর বউ সামনে দিব্যি এলিয়ে পড়লেন আমার উপরে। ভগবান জানেন, কী খেয়ে ওঁর গতরখানি অমন ভয়াবহ হয়েছে। আমি বেঁকে রইলাম একটা চ্যাপটানো ব্যাগের মত। ওভারকোটের মহিমায় এত যে ফৌজী কায়দায় কটমট করে তাকালাম, সেদিকে কারুরই হুঁশ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকার ঐকতান শোনা গেল। কিন্তু নথ-নোলক-পরা নাকগুলিও যে এমন মেঘগর্জন করতে পারে, তা কে জানত।

কয়েক হ্যাঁচকাতেই এক্সপ্রেসখানি গজলের দ্রুত রেলার মত বাংলাদেশ পেরিয়ে গেল। মুখ বাড়িয়ে দিলাম বাইরে। অন্ধকারের বুকে অজস্র আলোর সারি, যেন কচি শিশুর হাসফুটে চোখের মত। অন্ধকার মিহিজামের আলো। মন্ত্রনগরী চিত্তরঞ্জন। সীমান্ত বাংলার। কাঁথা-মাদুর-পচা ছেলে আমরা। বাইরে বড় যাতায়াত নেই। এইটুকুতেই মনে হল, দেশ ছেড়ে এলাম। এবার মহাদেশের পথে। মহামেলার পথে, লক্ষজনের মাঝে। সেই লক্ষজনের অকল্পিত বিচিত্র রূপ বিচিত্র নাদে আমার প্রতিটি ধমনীকে ডাক দিয়ে চলেছে। পথে কী আছে কে জানে।

মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি কালো কঙ্কালের দুটি হাত। চমকে উঠলাম। সকলে নিদ্রামগ্ন। আমি প্রহরী।

কঙ্কালসার কম্পিত হাতদুটো অতিকষ্টে একটি কমলালেবু ছাড়াচ্ছে। এতক্ষণ মুখোমুখি দেখেছিলাম, সামনের সীটে একটি কম্বলের পুঁটুলি। এবার সেই পুঁটুলির মধ্যে দেখছি একটি মুখ। লিকলিকে ঘাড়ের উপর বসানো একটি মাথা। গোঁফ-দাড়ি-গজানো শীর্ণ মুখ। কোটরাগত চোখ। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল সেই চোখের চাউনি। গেঁড়িগুগলির মত একরাশ মাদুলি ঝুলছে কণ্ঠার কাছে।

নিঃসন্দেহে মানুষ। চোখাচোখি হতেই নিঃশব্দে হেসে উঠল সে। বালকের মত তার কোটরাগত চোখেও হাসির নির্ঝর। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল হিন্দীতে, 'আমি যাব, হ্যাঁ।'

আমাকেই বলছে। অবাক হয়ে বললাম, 'কোথায়?'

'কুম্ভমেলায়? কেন, আমি যেতে পারিনে?'

এই সামান্য জিজ্ঞাসায় তার চোখের ব্যগ্রতা দেখে আরও অবাক হলাম।

কেন যেতে পারবে না। কিন্তু তার কথা শুনে আমার যেন সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কি অসুখ করেছে ?'

সে-কথায় কোন জবাব দিল না সে। খানিকক্ষণ ধরে চিবুল কমলালেবু। তারপর আপনা থেকেই বলতে আরম্ভ করল। তার একটানা কণ্ঠস্বর একাত্ম হয়ে গেল ট্রেনের শব্দের সঙ্গে। বলল, বাড়ি তার বালিয়া জেলায়। কাজ করত কলকাতার শহরতলীর এক কারখানায়। সেখানে আছে তার বউ, তার ছেলেমেয়ে। বউও কাজ করে। না, তার চেহারা দেখে যেন বয়স ঠিক না করে ফেলি। বয়স তার মাত্র আঠাশ। বউ তার বাইশ বছরের জোয়ানী অওরত। বেচারা তাকে খাওয়া-দাওয়া সবই দিচ্ছিল। সে যে বড় ভালো লড়কী। কিন্তু—

তার রুগ্ন চোখে ফুটে উঠল অসহ্য যন্ত্রণা। 'আর সহ্য হয় না এই ব্যামোর কষ্ট, তাই চলেছি কুম্ভমেলায়।'

বললাম, 'কেন ?'

এবার তার অবাক হওয়ার পালা। তার সেই কোটরগত বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন, তুমি জান না ? তবে তুমি কেন চলেছ ? জান না, অসুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেবতারা তাঁদের অমৃতকুম্ভ প্রয়াগ-সঙ্গমে লুকিয়ে রেখেছিলেন ?'

বললাম, 'শুনেছি।'

তেমনি মিষ্টি হেসে বলল, 'শুধু শোননি, কেন দুনিয়ার মানুষ যায় সেখানে ? কেন মহাপুরুষ সাধুরা আসেন সেখানে স্নান করতে ? তাঁদের চেহারা দেখ নি কী সুন্দর ! কী তার বাঁধুনি ! কুম্ভযোগে সঙ্গমে স্নান করলে মানুষ শত বছর পরমায়ু পায়, রোগমুক্ত হয়। তাই তো আমি যাচ্ছি।'

বলতে বলতে আলোকিত হয়ে উঠল তার কালো কঙ্কাল মুখ। বোধহয় খানিকটা উত্তেজনাও এসেছে তার। কিসের একটা বেগ আসছে তার হৃৎপিণ্ড থেকে। সে তাড়াতাড়ি আবার কম্বল মুড়ি দিল। কম্বলের ভেতর থেকে শুনতে পেলাম একটা ঘড়ঘড় শব্দ, তার সঙ্গে দেহাতী ভাষায় ছন্দিত ঈশ্বরের নাম।

ঘুমন্ত কামরা। বাইরে অন্ধকার। আকাশে অস্পষ্ট নক্ষত্র। গাড়িটা হুড়মুড় করে ছিটকে গেল আরেকটা লাইনে। কত রাত কে জানে !

মিথ্যে বলেনি যুবকটি। ব্যর্থ হয়নি আমার প্রহরা। ফৌজের মতনই

বাধা দিয়েছি জন-বন্যার পাগলা গতি।

কিন্তু এই মানুষটি, ওই কম্বলের পুঁটুলিটি কী অপূর্ব! ভাবতে গেলাম, কিন্তু ভাবা হল না। লোকটির গা থেকে খসে পড়েছে কম্বল। বুকে হাত দিয়ে কাসছে ঘং ঘং করে। কাশির ফাঁকে ফাঁকে বলছে রুদ্ধগলায়:

'উঃ, বড় তখলিফ, বড় তখলিফ। এখন নয়, হে ভগবান! সে যে অনেক দূর, অনেক দূর।'

কী অনেক দূর! ভীত বিস্মিত হয়ে তার অসহ্য যন্ত্রণা দেখতে লাগলাম। বললাম, 'কী বলছ?'

সে বললে, 'খুলে দাও দরজা, জিঞ্জির খুলে দাও। প্রাণ গেল হে ভগবান! এখনো অনেক দূর।'

দরজা খুলে দেব! চাবুকের আঘাতের মত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা বাইরে। দরজা খুলে দেব কি!

সে কাশতে কাশতে চেঁচিয়ে উঠল, 'খুলে দাও বাবু, খুলে দাও।'

কথা শেষ হল না। তার কম্বলের উপর কী যেন চকচক করে উঠল। তরল পদার্থ। রক্ত। রক্ত তার ঠোঁটের কশে। রাজরোগ-যক্ষা।

সে যে অমৃত-কুম্ভ সন্ধানের যাত্রী। সে যে শত বছরের পরমায়ু-সন্ধানী। এ গাড়ী কি পথ ভুল করেছে!

আর আমি! কত কথা বলেছি নিজের মনে। অমৃতকুম্ভকে হৃদিকুম্ভ নাম দিয়ে চলেছি ছুটে। কিন্তু এইমুহূর্তে মনে হল, কোথায় পালাই। চোখের সামনে কিলবিল করছে জীবন্ত মৃত্যুজীবাণু। পালাও পালাও। বিচিত্রের সন্ধানী, অমৃতের সন্ধানী ভুল করে পা দিয়েছি যমের দোরে।

আশ্চর্য! কেউ উঠল না ঘুম থেকে। কাশির শব্দে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে শুল কেউ কেউ। আমি খুলে দিলাম দরজা। বুঝতে পারিনি যে, একটা ষ্টেশনে এসেছে।

ছুটে গেলাম গার্ডের কাছে। গার্ড বললেন, 'কুড়ি মিনিট দেরীতে দৌড়াচ্ছি আর এখনো রাত রয়েছে, কাকে বলতে যাব বলুন। আপনি তার চেয়ে কামরাটা বদলী করে ফেলুন।' সেই ভালো, ওই কামরাটি ছাড়া আর সব কামরাতেই আছে অমৃত-কুম্ভ! মৃতসঞ্জীবনী। এসে দেখি, ভয়ানক ব্যাপার। ফৌজ নেই দরজায়, বিনা বাধায় ঢুকছে সব বেনো জলের মত। প্রায় কুড়ি-খানেক মাথার উপরে মাথা। অন্ধকূপ হত্যার জীবন্ত ছবি।

চেঁচিয়ে মারামারি করে কোনরকমে নেমে এলাম নিজের ঝোলাঝুলি নিয়ে। কিন্তু কেউ দরজা খোলে না। আমি এক দ্বাররক্ষী, পড়েছি অনেক রক্ষীর হাতে। কেউ কথাই বলে না। কিন্তু পড়েও থাকতে পারি না। মন তো আবার বলছে, চলো চলো।

গাড়ি ছেড়ে দেয়। ছুটে গিয়ে উঠলাম একটা আপার ক্লাস কামরায়। তীরের মতো ছুটে এল কয়েক জোড়া আধ-ঘুমন্ত চোখের বিরক্ত সন্দেহান্বিত দৃষ্টি। গুটিকয়েক অবাঙালী মহিলা ও পুরুষ। অস্ত্র ছিল একটি। পরিষ্কার ইংরেজীতে বললাম, 'একটু বিপদে পড়ে উঠে পড়েছি। যাব এলাহাবাদ। সুযোগ পেলেই নেমে যাব, আপনাদের কষ্ট দেব না।'

চেহারা দেখিয়ে সব বোঝানো যায় না। কথা শুনিয়ে অনুমান করাতে হয়। একটু একটু করে বিরক্ত চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল। তারপর একটু বা কৌতূহল। তারও পরে আপার ক্লাস গদির সামান্য একটুখানি জায়গায় প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেতের করুণা।

দাম আছে এই প্রত্যাশিত করুণায়। করুণা কেন। সভ্যতাই বলা যাক না। বুঝলাম, দুটি পরিবার রয়েছে কামরাটিতে। একটি পরিবার অন্ধ্রের, আর একটি মধ্য-প্রদেশের। জায়গা দিলেন অন্ধ্রের এক ভদ্রলোক। এঁরা তীর্থযাত্রী। কলকাতার কালীঘাট দর্শন করে চলেছেন প্রয়াগসঙ্গমের কুম্ভ-মেলায়। ঘুরেছেন আরও অন্যান্য জায়গায়। প্রয়াগ হয়ে চলে যাবেন দেশে। অনেক কথা হল। বললেন, 'আফসোস রয়ে গেল, কল্যাণী, কংগ্রেস দেখা হল না।'

সে আফসোস ছিল আমারও। কিন্তু একটা দেখতে গেলে আর-একটা ছাড়তে হবে, উপায় কী? তারপর ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'আপনি কেন চলেছেন প্রয়াগে?'

ভদ্রলোকেরা তিন ভাই। তিনজনেই অদ্ভুত কালো। যাকে বলে নিকষ কালো। মাথার চুলও তিনজনেরই ঘন কুঞ্চিত। সঙ্গে বড় ভাইয়ের বউ। আজানুলম্বিত বেণী ঝুলে পড়েছে সীটের নীচে। দুটি কানে গুটি আটেক সোনার মাকড়ি, নাকের দুদিকে দুটি নাকছাবি। ঘোমটা নেই। কিন্তু ইংরেজী জানে বলে মনে হল। তাঁরা তিন ভাই ও এক ভাজ, চারজনেই আমার জবাব শোনার জন্য মুখের দিকে তাকালেন।

লজ্জা পেলাম। বললাম, 'কেন, যেতে নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ইয়ংম্যানেরা তো এ সব বড় একটা—'

বললাম, 'পছন্দ করে না বলছেন তো? ঠিকই। আমিও মাথা মুড়োতে যাচ্ছি না। দেখুন, আমাদের জীবন বড় সীমাবদ্ধ। গণ্ডীবদ্ধ জীবনদর্শনের কচকচি নিয়ে আমরা দিনগত পাপক্ষয় করি। কিন্তু নিজের দেশের কতটুকু জানি। দেখেছি কতটুকু। আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ যা নিয়ে মরে বাঁচে (তা ভালো কি মন্দ জানি নে), সে তার জাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে যেখানে মিলিত হয়, যেখানে আমাদের সমস্ত জাতি হাসে কাঁদে, গান গায়, তাকে ইয়ংম্যান হয়ে আমি অবহেলা করব কী করে। যদি আমার হাসি পায়, তবে আমি হাসব কাঁদব। যদি নুয়ে আসে মাথা তাকে আমি মিথ্যে অহঙ্কার দিয়ে জোর করে তুলে ধরব না। আর যদি থাকতে পারি নিরাসক্ত তা-ই থাকব। এত বড় দেশ, এত মানুষ, কত তার বৈচিত্র্য! আপনাদের দেখব বলেই তো এসেছি। না এসে পারলাম না।'

আবার বিচিত্রের কথা। ধক করে উঠল বুকের মধ্যে। এই একই গাড়ির কয়েকটা বগীর পেছনে রয়েছে সেই মানুষটি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তার সেই যন্ত্রণাকাতর মুখ। এতক্ষণ কী করছে সে। কেমন আছে।

এঁরা আমার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন কি-না জানি না, বিস্মিত হয়েছেন বুঝলাম। কিন্তু আমার আর কথা বলতে ইচ্ছা করল না। এঁদের কৌতূহল ছিল অনেক, মেটাতে পারলাম না আর।

কাঁচের সাশির বাইরে দেখছি আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। গাড়ি এসে দাঁড়াল মোকামাঘাটে। নেমে গেলাম প্ল্যাটফরমে। নীচু প্ল্যাটফরম। উত্তরে হাওয়া দুরন্ত ঝাপটা মারছে। গায়ের মোটা ওভারকোটটা পর্যন্ত পাতলা কাপড়ের মত উড়তে লাগল।

বিহারের চেহারা এখন শ্যামল। দিগন্তবিস্তারী মাঠে ছোলা আর মটর অড়হরের কিশোরী ডগা দোলাচ্ছে মাথা। মাথা তার হলুদ ফুলে গিয়েছে ছেয়ে।

গাড়ির পেছন দিকে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। আর একবার চমকে উঠল বুকের মধ্যে। লাল কাঁকরের উপর শোয়ানো রয়েছে সেই মানুষটি। অমৃতসন্ধানী। মুখটি খোলা। শরীর ঢাকা কম্বলে। সে যেন চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে!

মনে পড়েছে সেই বালকের মত আবদারের সুর, 'আমিও যাব!' কেন? না, বাঁচবার জন্য।

আমার যাত্রাপথের প্রথমেই বিচিত্র এই মৃত্যুদৃশ্য। কে জানত, অমৃত-

সন্ন্যানীর পেছনে পেছনে মৃত্যু এসে এই কামরাটায় ওত পেতে ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। তাই সে বার বার বলেছিল, 'হে ভগবান, সে যে এখনো অনেক দূরে।'

গাড়ির দরজায় দরজায় কুম্ভযাত্রীর মারামারি, চিৎকার, হল্লা। সবাই যাওয়ার জন্ম পাগলের মত ছটফট করছে। তুমি পড়ে রইলে। সে যে এতদূর, তা আমিও জানতাম না। তোমার হয়ে আমি হাজারটা ডুবও যদি সঙ্গমে দিই তাহলেও তোমার আশা আর কোনদিন মিটবে না। তুমি পড়ে থাক, আমাদের পরমায়ু নিয়ে আমরা ছুটে চলি। এটাই নিয়ম।

সত্যি এ নিয়ম বড় বিচিত্র।

কত সুখ দুখ আসে নিশিদিন।
কত ভুলি কত হয়ে আসে ক্ষীণ।

নইলে বাঁচতাম কী করে। মনে পড়ে, একটা আধপাগলের মুখ থেকে একবার শুনেছিলাম, 'শুনি, পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। জল আমাদের দুঃখ, স্থলটুকু আমাদের সুখ।'

সেই অপার দুঃখকে ভুলে থাকা ছাড়া উপায় কী? সামান্য সুখের মুখ দেখলেই দুঃখ ভুলে যাব।

তাড়াতাড়ি সেই আপার ক্লাসে এসে তুলে নিলাম নিজের ঝোলা-ঝুলি। অন্ধ্রের বড়ভাই বললেন, 'কোথায় চললেন?'

বললাম, 'আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, এবার নেমে যাই।'

'কেন বসুন না। শুধু শুধু আর কামরা বদলি করে কী হবে। একেবারেই এলাহাবাদে গিয়ে নামবেন।'

ভাবলাম, উনি হয়তো জানেন না যে আমার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট। বললাম, 'উপায় নেই, থার্ড ক্লাসের টিকিট।'

কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই নামতে দিলেন না। মনে হল তাঁদের সমস্ত পরিবারটিই নামতে দিতে চান না। চোখমুখ কুঁচকে ভদ্রলোক এমন একটি ভাব করলেন যেন সামান্য টিকিটের জন্ম আবার এত ভাবনা কিসের। কিন্তু আমি তো জানি কালো-কোটধারী একজন সামান্য রেল কর্মচারী সময় বিশেষে কী দারুণ বিভীষিকা। অপমানের ভয়টাই বড়। তাছাড়া আর কী।

তবু বসতে হল ভদ্রলোকের আগ্রহে। বুঝলাম, ওদিকের মধ্যপ্রদেশের পরিবারটি রুষ্ট হয়েছেন। রুষ্টতার সঙ্গে কিছুটা বিদ্রূপ।

সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রদেশের মানুষগুলো বোধহয় একটু বেশী সেন্টিমেন্টাল। নাকি ইংরাজীতে যাকে বলে 'টাচি', বোধহয় তাই। অর্থাৎ আবেগপ্রবণ। সেই আবেগপ্রবণতা মধ্যপ্রদেশের লোকের কাছে ন্যাকামো মনে হতে পারে। আমার উঠে যাওয়াতেই বা কী এমন ভদ্রতা প্রকাশ পেত।

কিন্তু এক-একটা সময় আসে, যখন মনকে দিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারি নে; অন্ধ্রের ভদ্রলোক আলোচনা পেড়ে বসলেন ধর্মতত্ত্বের। অথচ মন পড়ে রইল মোকামাঘাটে। মোকামাঘাটের বিছানো লাল কাঁকরের বুকে, যেখানে শুয়ে রয়েছে আমাদের অনেকের সহযাত্রী। তাছাড়া ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আমার অধিকারই-বা ছিল কতটুকু।

পায়ের কাছেই দেখছি ছেঁড়া কম্বলে ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে একটি মানুষ। বেরিয়ে আছে শুধু মুখটি। ঘুমন্ত মুখ। বয়স ঠাওর করা মুসকিল। মুখের উপর ছড়িয়ে আছে একরাশ রুক্ষ চুল। ভাবলাম, এদেরই কারুর চাকর-বাকর হবে।

গাড়িটা হঠাৎ লোকালের মতো থামতে থামতে চলেছে। শত হলেও পশ্চিমদেশ। ভোরের আলোয় যাকে দেখেছিলাম শ্যামাঙ্গিনী রৌদ্রালোকে দেখলাম শ্যামাঙ্গিনী কিঞ্চিৎ রুক্ষ। যত দূরে চোখ যায়, শুধু জনহীন মাঠ আর মাঠ। অড়হর, কলাই, মুগ আর মুশুরির মাঠ ঠেকেছে গিয়ে আকাশের গায়ে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে উঠছে গ্রাম। এ গ্রাম কালকাসুন্দের বনঝোপ আর আম-জাম-সুপুরি-নারকেলের ছায়া-শীতল গ্রাম নয়। আমবাগান আছে বটে, থোকো থোকো কাঞ্চন-বরণী বোলে ভরে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। আর আছে তালবন। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাটির দেয়াল আর খোলার ছাউনি-দেওয়া বস্তি।

অন্ধ্রের ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'আপনি বোধহয় আমার কথা ঠিক ধরতে পারছেন না। না, না, আমি আপনাকে খুব বড় কথা কিছু বলছিলাম না। আমি শুধু আপনাকে—' বলতে বলতে থেমে গেলেন। নিতান্ত হুঁ-হাঁ দিয়ে কাজ সারছিলাম। লজ্জা পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি, তিনি আপন মনে মাথা নাড়ছেন। মাথা নামিয়ে বসে আছেন দুই ভাই। আর তাঁর স্ত্রী তাকিয়ে রয়েছেন বাইরের দিকে। কিন্তু কিছু দেখছেন না। মন-চোখ তাঁর এদিকেই ? চোখ দুটি ছলছল করছে। লজ্জিত করুণ মুখে সামান্য হাসির আভাস জোর করে ফুটিয়ে রেখেছেন তিনি।

তাঁরা চারজনেই যেন বড় বিমর্ষ হয়ে উঠেছেন। মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত

হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন উপনিষদে যে সমস্ত প্রাকৃত—'

'না, না, অতবড় কথা আমি বলতেই পারব না। আমি বলেছিলাম,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন তিনি, 'জানেন, আমাদের এই চারজনের পরিবারটি একেবারে অভিশপ্ত। আমি নিজে একজন সরকারী কর্মচারী, আমার ভাই দুজনও তাই। আমাদের অর্থের অভাব নেই। শুধু একটি অভাবে আমরা সর্বহারা হয়েছি, আমরা পাগলের মত ঘুরে মরছি সারা দেশ। এই আমাদের কুলগুরুর নির্দেশ।'

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন তিনি। উত্তেজনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হু-হু রক্ত ছুটে আসছে তাঁর স্ত্রীর মুখে। স্বামীর দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। বোধহয় নিরস্ত করতে চাইছিলেন স্বামীকে। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছিলেন না।

আমার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আশ্চর্য। মনে হল তাঁর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। তাঁর দক্ষিণী সমুদ্রের অতল ডাগর চোখে ঝিক-মিকিয়ে উঠল অশ্রুর মুক্তাবিন্দু। সপ্তরশ্মি খেলে গেল তাঁর গ্রাম্য নারীর মত কানে পরা অনেকগুলি পাথরখচিত কর্ণভূষণে। ক্লান্ত কালনাগিনীর মত পিঠের উপর এলিয়ে পড়ে রইল রুক্ষ বেণী।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভুলে গেলাম কুম্ভসহযাত্রীর কথা। কৌতূহলপূর্ণ মন নিয়ে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলাম, তিন ভাই ও এক বউয়ের দিকে।

বড় ভাই তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই চুপ করে গিয়েছিলেন। আবার বললেন, নীচু গলায়, 'জানেন, প্রয়াগের আর-এক নাম তীর্থরাজ। এইবারই আমাদের শেষ, আমাদের আশা-নিরাশার পরীক্ষার শেষদিন এগিয়ে আসছে। এইবারই আমাদের সমস্ত সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। সংসার পাতবে আমার ভাইয়েরা, আর আমার—'

তাঁকে বাধা দিয়ে এক ভাই নিতান্ত দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে উঠলেন। মনে হল, তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে কিছু বললেন। তিনিও স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বললেন। কিন্তু মহিলাটি কোন জবাব দিলেন না।

আমি যেন এক রহস্য-নাটকের বিস্মিত নীরব দর্শক। ভদ্রলোক এবার হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আপনি বলছিলেন, অনেক কিছু দেখতে চলেছেন আপনি। আপনার দুর্ভাগ্য যে, আমার মত একজন লোকের সঙ্গেও আপনার

আলাপ হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না। আমি আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত একটা কথা আপনাকে বলেছিলাম।'

সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে আমি বললাম, 'কিন্তু আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারি নি।'

তিনি বললেন, 'ক্ষমা করবেন। আমার স্ত্রীর বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনি আসবেন আমাদের ক্যাম্পে। পাণ্ডার কাছে আমাদের খবর পাবেন। আপনি এলে আমরা খুব খুশী হব।' বলে তিনি আমাকে সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। তাঁর স্ত্রী তাকালেন শান্ত চোখে কৃতজ্ঞতা নিয়ে। তাঁর আত্মভোলা স্বামীর দিকে আর আমার দিকে। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা, বোধ হয় আর কৌতূহল না প্রকাশ করবার জন্ত।

বুঝলাম, ভদ্রলোকের ধন মান ও বিলাসের তলে বুকে একটি পাথর চেপে আছে। নিজের অজ্ঞাতসারে কয়েক মুহূর্তের জন্ত সরে গিয়েছিল সেই পাথর। মন পেতে বসেছিলেন এক অপরিচিত নগণ্যের কাছে।

মন পাতা হল, মনের কথা হল না। এখানে পরস্পরকে গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কি। ভবিষ্যতের আশা রইল কিনা কে জানে। আশা এইটুকু, পথের দেখা পথেই শেষ হবে না। আমরা সকলেই চলেছি এক মহাসঙ্গমে। সেখানে হবে মিলন, তারপরে বিদায়। মিলন-মুহূর্তে এক হয়ে যায় হাসি কান্না। সেই হাসি-কান্নার কলরোলে যদি শুনে নিতে পারি তাঁর কথাটি, সেইটুকু লাভ।

এখন শুধু মনে রইল, তাঁদের পরিবারের মধ্যে একটা ট্রাজেডি লুকিয়ে আছে তারই প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরছেন তাঁরা। প্রায়শ্চিত্তের শেষ দিন আগত। গরলে হবে অমৃতের উদ্ভব। ভরে উঠবে তাঁদের তিন ভাইয়ের সংসার।

এমনি ভরিয়ে তোলবার জন্যে ছুটে চলেছে লক্ষ মানুষ। লক্ষ জনের লক্ষ রকম কামনা! আমিও চলেছি তেমনি এক কামনা নিয়ে।

কিন্তু আর কতদূর? পুব আকাশের কোল ঘেঁষে দেখা দিয়েছে বিন্ধ্যাচলের উঁচু-নীচু মাথা। বেলাও হয়েছে মন্দ নয়।

পায়ে মৃদু চাপ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি, পায়ের কাছে শোয়া সেই মানুষটি। মুখের চুল সরিয়ে ধুলিরুক্ষ মুখ ভরে হাসছে। তাকাতেই ওই অবস্থাতেই কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল।

অবাক হলাম! এদের কারুর লোক নয় নাকি! বললাম, 'কিছু বলছ আমাকে?'

'একটা বিড়ি দেন।'

প্রথমেই বিড়ি, তাও আবার প্রাণের ভাষায়। অর্থাৎ বাঙলা কথায় বুঝলাম, এদের কেউ নয়। বললাম, 'এখানে উঠলে কী করে?'

হেসে বলল, 'উঠি নি, উঠিয়ে দিলে নোকেরা। কাল রাত্রেই আপনার মুখখানি দেখে মনে হয়েছিল, এ আমার চেনা মুখ। এখন দেখছি, ঠিক তাই!'

'চেনা মুখ? কী করে চিনলে?'

'কেন। এই তো এতগুলোন মুখ রয়েছে। আমার দেশের মানুষের মত মুখখানি আর ক্যার আছে, আপনি বলেন।'

ভাবলাম ধন্য তোষামোদ। কি ভাগ্যি বলে নি বাড়ির কাছের মানুষ। বিড়ি তো নেই। প্রাণ ধরে দিলাম একটা সিগারেট।

তার কালা মুখের হাসিটি আরও মধুর করে বলল, 'ছিগরেট দিলেন? তবে এট্টুস নিধমের হাতটা ধরুন, উঠে বসি।'

নিধম মানে অধম করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু হাত ধরে ওঠাতে হবে কেন বুঝলাম না। বললাম, 'কেন?'

তেমনি হেসে পায়ের উপর থেকে তুলে নিল ছেঁড়া কম্বলটা। দেখলাম, পা-দুটো হাঁটুর কাছ থেকে বেঁকে ঠেকে রয়েছে পাছার কাছে। উঠে বসতে হয়তো পারে, তবে অবলম্বন চাই।

হাত বাড়িয়ে দিলাম। উঠে বসল সে। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'রাস্তায় বসে বসে খাচ্ছিলে, আবার পথে পথে কেন?'

'রাস্তায়?' হাসতে হাসতে বলল, 'ভিক্ষের কথা বলছেন? তাই-ই, তবে রাস্তায় তো বসিনি কখনো। পড়ে থাকতাম এক কোণে। রাস্তা আর পথ, যা-ই বলেন এই পেথম। থাকতে পাইরলাম না কিছুতেই। ন্যান, দিয়াশলাইটা ন্যান।'

দেশলাই দিয়ে বললাম, 'যাওয়া হবে কোথায়?'

'যেখেনে সব্বাই চইলছে, সেইখেনে। পেরাগের মেলায়।'

'আসছ কোত্থেকে?'

'নদে জিলা। আমঘাটার নাম শুইনছেন, নবদ্বীপের কাছখেনেই? সেইখেনে নকীদাসীর আখড়ায় নাম-গান করি। আমি মূল গায়েন।'

বললাম, 'বৈষ্ণবেরাও কুম্ভের মেলায় যায়?'

সে কপালে তাড়াতাড়ি হাত ঠেকিয়ে বলল, 'আয়ে-বাপরে, বোষ্টাম যাবে না তো যাবে কে? তীথখানি তো বোষ্টমের। ভাগা-ভাগির কথা যদি বলেন অন্ত মতের সাধকেরা তো জোর করে ভাগ বইসেছে। শিবভক্তরা আইসবে বটে, তবে বিষ্টু ভক্তি না চাইলে পেরাগের মাটি আপনার পেন্নাম নেবে না।'

নাকমুখ নিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এটা হল ঝগড়ার কথা। এ কথা বাদ দেন। ওঁনার কাছে, ভাগাভাগি নাই, জাত নাই! যানার কাছে এলেম, তারে না ডেকে দলের মারামারি করে লাভ?'

বললাম, 'এলে তো, ওই পা নিয়ে যাবে কী করে?'

সে হাসল। হাসি তার মুখের ভূষণ। অনর্গল ধোঁয়ার জালের আড়ালে আড়ালে দেখলাম ভিজে-ওঠা চোখ দুটো মুছে নিল। বলল, 'বাবু, আমার নাম মা-খেগো বলা। অর্থাৎ কিনা বলরাম। আমারে জন্মো দিয়ে মা আর সামলাতে পারে নাই, মরে গেছিল। এই পা দুটোর জন্তেই। জন্মো-লুলা বইসে ছিলেম, কবে সেদিন আইসবে, যেদিন বেরিয়ে পড়ব। তা এই পা দুটোর জন্তে পড়ে থাকতে বলেন? বুকে হেঁটে যাব।' বলে সে গলা ছেড়ে গান ধরে দিল,

অগো আইসবে বলে
পথের মাঝে জীবন কেটে গেল,
তুমি এমনি খেলা খেল।
সবুর-মেওয়া রইল মাথায়,
চইলব এবার যথায় তথায়,
রোদবিষ্টি আশীর্বাদী
আমার মাথায় ঢেলো॥

সকলেই কিছুটা চমকে উঠেছিলেন, আমিও। কিন্তু মা-খেগো বলার গলাটি এমনি উদার ও মিষ্টি যে, ভেসে গিয়েছিলাম। লক্ষীদাসীর মূল গায়েন বলে আর অস্বীকার করার উপায় ছিল না বলরামকে!

বোধহয়, গানটা আরও বাকী ছিল। মধ্যপ্রদেশের সগুম্ফ বিরাটকায় ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ক্যায়া, অভি গানা ভি শুরু কিয়া?'

বলরাম হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে কী বললেন কর্তা?'

'উসব কতা ফতা নহি জানতা, গানা বন্দ কর।'

অজেয় হাসি বলরামের। বলল, 'আচ্ছা বাবু, আর করেগা নেই।'

আমি তাকালাম অন্ধের পরিবারটির দিকে। তাঁরা তাকালেন আমার দিকে। একটা চাপা ও অর্থপূর্ণ হাসি বিনিময় হল আমাদের মধ্যে।

বড়ভাই বললেন, 'আপনি এই ভিক্ষুকটিকে চেনেন?'

বললাম, 'না। চেনা হয়ে গেল।'

বলরাম আমাকে আবার ডাকল, 'বাবু।'

বললাম, 'বলো।'

'বাবু, মুনিঋষিরা কথা না কইয়ে জীবন কাটিয়ে দেন। আর আমরা। কাল রাত থেকে মুখ বন্ধ। আর চুপ কইরে থাকতে পারি না। আমার কষ্ট হইবে, সেই ভেবে নক্কীদাসী আমারে এই বাবু-কামরায় উঠিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তন, নক্কী যদি নরকে থেকেও সঙ্গে নিয়ে যেইত, তবে বাঁচতাম।'

বললাম, 'লক্ষ্মীদাসীকে ছাড়া বুঝি থাকতে পার না?'

বলরাম হাসল মাতালের মত। বলল, 'বাবু, পা দুইখান নাই, কিন্তন মানুষ তো। তাই মানুষ ছাড়া থাইকতে পারি না। থাইকলে নিজে নিজে গান গেইয়ে নিজের পরান তোষ করি। যাচ্ছি পেরাগে জাগ্রত বেণীমাধবের ঠাঁই। উঁয়ার কাছে নক্কীদাসী, আপনি, সবাই যাচ্ছেন, সব্বারে পাব সেখানে। ওই যে বলে না,' বলে সে চাপা গলায়—গুনগুনিয়ে উঠল,—

'মাত্তর দুদিন রইলে কাছে।
মনে কষ্ট হয় পাছে,
তাই' যাবার সময় বইলে গেলে
আরশিখানি লয়ে কোলে
দেখিস, সে তোর বুকে আছে।'

বলে সে তার নিজের বুকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

বললাম, 'বলছ বোষ্টম। গানে তো দেখছি পাক্কা বাউল।'

বলরাম খপাত করে পায়ে হাত দিয়ে বলে উঠল, 'খাঁটি কয়েছেন। আপনি জানেন, জানেন সব। যাবার কথা শোনা ইস্তক মন বাউরা হইছে। আজ পথে আসছি, আর চাইপতে পারি না মনটারে। বাবু, বৈরাগ্য এইলে বৈরাগী হয়। আসলে আমরা সব্বাই বাউল। সব গানেতেই আপনি ওইটি পাবেন। আবাগী রাই-কিশোরী যে প্রেমে পাগল হইয়ে পথে পা দিছিল, সেও তো একই ব্যাপার।'

তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে বললাম, 'পা ছাড়ো হে।'

'কিত্তন বাবু, আপনি নিচ্চয় গুণী মানুষ। আমারে দুই-একখানা পদ শোনান।'

বলরামেরা এমনিতেই পাগল। তাদের খ্যাপালে আর রক্ষে নেই। বললাম, 'পাগলামি কোরো না বলরাম। আমি গুণী নই, গানও গাইতে জানি নে।'

কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না, বলরাম আমার এই নীরস শহুরে বস্তুতান্ত্রিক মনকে ভাসিয়ে নিয়েছে তার নিজের স্রোতে। আমার পথের ক্লান্তি, আমার এতক্ষণের ছোটখাটো সুখদুঃখ, সব ডুবিয়ে দিয়েছে সে। আমার জমকালো ওভারকোটটাকে রেয়াত করল না একটুও। বাবুর মত মানল না বাবু বলে। বিকলাঙ্গ বলরাম সমস্ত আড়ম্বর ও আবরণের ভেতর থেকে টেনে বের করে দিল আমার শুষ্ক দেহের ভেতরের মনটাকে। নিজের সঙ্গে তার তুলনা করতে গেলে কোথায় ঠাঁই পাব জানি না। কিন্তু, অন্ধ সংস্কারের বশেই কি বিকলাঙ্গ বলরাম এমনি নিরত হেসে গেয়ে মূর্তিমান আনন্দের মূর্তি হয়ে উঠেছে? বিশ্বাস করতে মন চায় না। কুসংস্কারের এক চিমটি বেলুনে-ঠাসা জীবন তো এ নয়। না-থাকা ও না-পাওয়ার বেদনা বলরামের প্রাণে তাড়া দিয়েছে। তাড়া দিয়েছে প্রেম-সন্ধানের, ভালবাসার। বলরাম ভালবাসে জগৎ সংসারকে।

বলরাম কিন্তু আমাকে ছাড়ল না। সে তেমনি গুনগুন করে চলেছে, 'পথের ধুলো সোনা হইল, এবার চোখের জল দিয়ে রসকলি কাটব। তোমারে ছেইড়ে তো দিব না।'

গান ছেড়ে আবার কথা আরম্ভ করল, 'আর ভাবব না, সে কতদূর। গাড়ি তো একসময় থামবে। সময় হইলে আপনি নামিয়ে দেবে। কী বলেন বাবু, অ্যাঁ?' বলে আবার গান,—

'সবাই বলে যৈবন জ্বালা,
তবে এ যৈবন যাক চলে যাক।
কী হবে এ কালো কেশে, নীল বেশে
এই পোড়া অঙ্গ তোমার চরণ পাক।'

কী ভাগ্যি, গলা নামিয়ে গাইছিল। মধ্যপ্রদেশের ভদ্রলোকের তন্দ্রা ভাঙছিল না তাতে। অন্দ্রের পরিবারটি অবাক হয়ে পাগলামি ও পাগলামির দর্শককে দেখছিলেন। বললাম, 'বলরাম, তোমার প্রথম গানটি বেশ। কার গান ওটি?'

'বাবু ও পদ আতাউলের। আতাউল বাউল তার নাম।'

বললাম, 'তোমাকে একটা গানের লাইন বলি শোন। তোমার ঐ গানের মতই যেন এটিও।—'

'কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে,
আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে,
আর সময় নাহিরে॥'

বলরাম আবার আমার পায়ে হাত দিতে এল, 'তবে নাকি জানেন না? আর কবে সে আইসবে, সেই আশায় আমি মরা পা নিয়ে বইসে থাকব। বাবু, পেরাগের সঙ্গমে কি আর হাঁড়ি-ভরা মধু আছে? তা নেই? আছে অমর্ত। অমর্ত-কুম্ভ যে। সে অমর্ত প্রেম-অমর্ত, ডুবলে পরান শীতল হবে। বা-বা! বা-বা! কী সোন্দর পদ! পদখানি ক্যার বাবু?'

কার পদ! আশ্চর্য! কুম্ভমেলা যাবার পথে কবিগুরুর গান নিয়ে যে এমনি এক মা-খেগো বলার সঙ্গে আলাপ করতে হবে, তা কে জানত! আর কেমন করেই বা তাকে সে কথা বলব।

বললাম, 'পদকর্তার নাম রবি ঠাকুর।'

আলোয় আলো হয়ে উঠল বলরামের চোখ, 'র-বিঠাকুর! ঠাকুর তো বটেই, রবিও বটে। নইলে এমন পদ বেয়োয়? তা উনি কোথাকার বাউল বাবু?'

কোথাকার বাউল! হায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ! বলরাম তোমাকে কোথায় টেনে নিয়ে এল। তার বুকে ঠাঁই দিয়ে তোমাকে সে খাটো করল কি না বুঝলাম না। বললাম, 'কলকাতা।'

বলরাম বলল, 'তা হোক! কেঁদুলির জয়দেবের মেলায় নিশ্চয়ই দেখছি ওঁয়ারে, এখন মনে নাই। পোষপূর্ণিমেতে সব বাউল বাবাজীকে এখানে আসতেই হবে কি না একবার।'

জানি, এক কথায় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে পারব না আমি। দু-কথায় রবি ঠাকুরের কল্পিত বাউল-মূর্তি অদৃশ্য হবে না বলরামের মন থেকে। আবার এও ভাবি, বলরামের ভুলই বা কোথায়, যে ভুল ভাঙব। মন যার বাউল হয়নি, তিনি বাউল গান গাইলেন কেমন করে।

আচমকা ঝড় এল। ঝড়-ই বলি। হঠাৎ একটা তুমুল গণ্ডগোল আর তার সঙ্গে শিলাবৃষ্টির মত কামরাটার মধ্যে এসে পড়তে লাগল বাক্স, প্যাটরা, বোচকা, পুঁটুলি। প্রতিবাদের অবসর ছিল না। অবসর ছিল না তাকাবার।

যে যার মাথা বাঁচাতেই ব্যস্ত। তার সঙ্গে একটা বাজখাই মহিলা কণ্ঠের চিৎকার, 'শ্যামা! প্রেমবতী। ইধার, ইধার মে। বুঢ়া কো উঠাও। পাতিয়া, এ পাতিয়া। ছোকরি বহেরা হো গয়ী। শুনতি কি নহি? শ্যামা, হাঁ হাঁ তু কোণে চলে যা।'

মনে হল আমার ঘাড়ের উপর একটা দু-মোণী বোঝা পড়ল।

তারপর ব্যাপারটা যখন একটু শান্ত হল, তাকিয়ে দেখি, পিঠের কাছে মস্ত বস্তা। বস্তার উপর হয় প্রেমবতী, নয় শ্যামা কিংবা পাতিয়া। তার পায়ের কাছে জুজুবুড়ির মত এক ঘাড়-নোয়ানো বুড়ো। দরজার কাছে দুটি যুবতী আর এক প্রৌঢ়া। বুঝলাম, ওই প্রৌঢ়ার-ই কণ্ঠস্বর আমি শুনেছি এতক্ষণ। তারা সকলেই মাল সাজাতে ব্যস্ত। বোধহয় উঠতে পারার আনন্দেই মহিষাসুরমর্দিনীর মত আমার ঘাড়ের উপরে মহিলাটি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'আরে বাপরে, গাড়ি মে উঠনা এক আজীব কাম হ্যায়।'

ওদিকে মধ্যপ্রদেশের পরিবারটি যুদ্ধং দেহী অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মুখ। অন্ধ্রের পরিবারটিও সামলাতে ব্যস্ত।

গাড়ি ছেড়ে দিল। তারপরেই আসল যুদ্ধ শুরু। মধ্যপ্রদেশের সেই ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠতেই নতুন দলের প্রৌঢ়া গলা সপ্তমে উঠিয়ে আরম্ভ করল। যা বলল, তার বাঙলা করলে এই হয়, 'থার্ড ক্লাসের টিকিটই হোক, আর যা-ই হোক, আমি চড়বই। নিয়ে এসো তোমার পুলিশ আর মিলিটারী। আমাকে মারুক আর কাটুক, আমি কিছুতেই পড়ে থাকতে পারব না। টাকা নেই বলে কি আমি তীর্থ টুকুও করতে পারব না। খালি তোমরাই যাবে। উঠেছি তো বটেই, এবার তোমার যা খুশি তাই করো।'

তার কথার ফাঁকে ওদিকে দুই যুবতী কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। আমার ঘাড়মর্দিনী ও যুবতী। কিন্তু আমার শক্তির তো একটা সীমা আছে। অবাক হয়ে অবশ্য এও ভাবছিলাম যে, যাবে তীর্থ করতে। কিন্তু সঙ্গে এতগুলি অল্পবয়সী মেয়ে নিয়ে কেন। বাঙলা-দেশে তো এর ব্যতিক্রমই দেখি।

বললাম, 'এই, দেখিয়ে, আপ উতর যাইয়ে হামারা ঘাড়সে।'

ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো মেয়েটি। ভাবখানা, এ আবার কে গা! তারপর হেসে পরিষ্কার গলায় বলল, 'আরে ভাই সবকোইকা তথ্‌লিফ, কিসকো তো একলী নহি। এ দেখো, আদমিলোগ ঝগড়া কর রহে!'

বলে সে তার বলিষ্ঠ দেহটি সামান্য সরিয়ে আবার ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে হাসল।

অর্থাৎ, হল তো? কতখানি হল, সে আমিই জানি। আর খানিকক্ষণ বাদে আমার উঠে পড়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু—

কিন্তু বলরাম কোথায়? বলরাম! মা-খেগো বলা? পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখি, একরাশ মাল আমার বুকসমান উঁচু হয়ে আছে। তবে কি চাপা পড়ে গিয়েছে বলরাম? এক সহযাত্রীকে রেখে এসেছি মোকামাঘাটে। বলরামকেও রেখে যেতে হবে নাকি?

কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম মালপত্র।

যা ভেবেছি, তাই। দেখি বলরাম হাসছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। ফুলে উঠেছে কপালটা, রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। তবুও হাসছে, তার সমস্ত হাসি আমার সমস্ত হৃদয় জ্বালিয়ে দিল। মরতে মরতেও সে হাসবে নাকি?

হাসুক। তার মত হাসি তো সকলেরই নেই। মুখ গোমড়া করে তুলে বসালাম তাকে। মালপত্র ছুঁড়ে ফেলতে দেখে, নতুন দলের সকলে হা হা করে তেড়ে এল আমার দিকে।—'আরে আরে, আদমি আন্ধা না কি? দিলে সব মাল চৌপাট করে।'

বললাম, 'আন্ধা তো মনে হচ্ছে তোমরাই। তোমরা যে একটা জান চৌপাট করে দিচ্ছিলে।'

জান! জান কোথায়! এতক্ষণে উঁকি মেরে দেখল তারা বলরামকে। কিন্তু বলরাম হাসছিল তার সেই কপাল-ফোলা মুখ নিয়ে। সে হাসি দেখে আমার গায়ের মধ্যে আরও জ্বলে উঠল।

এক মুহূর্তের নীরবতা। প্রথমে হেসে উঠল প্রৌঢ়া। তারপর শ্যামা প্রেমবতীয়ার দল।

হাসির কারণ বুঝলাম না। তাকিয়ে রইলাম বিস্মিত বোকার মত।

হাসেনি ওদের একজন, সেই বুড়োটি। সে হাতের লাঠির ডগায় নড়বড়ে থুতনিটি রেখে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে। মোটা সাদা ভ্রূর তলায় তার সেই চোখে বিরক্তিপূর্ণ অনুসন্ধিৎসা। এতখানি বেলাতেও তার আপাদমস্তক শাল দিয়ে ঢাকা। তার নাকের দুপাশের গভীর রেখা দেখে মনে হল সে বীতশ্রদ্ধ এ জগৎসংসারের উপর। জীবনে হাসির পালা তার শেষ হয়েছে। আর কোনদিন সে হাসবে না।

হাসি থামিয়ে প্রৌঢ়াই প্রথমে বলল, 'আহা, বেচারা!'

আর একজন, 'সাধু নাকি?'

পার্শ্ববর্তিনী, 'বোধ হয়।'

প্রৌঢ়া করুণ মুখে বলে উঠল, 'শ্যামা, দিয়ে দে বেচারাকে দু-চার পয়সা।'

শ্যামা নামধারিণী অচিরাৎ আঁচলের বদলে ট্যাঁক থেকে এক আনা পয়সা বার করে ছুঁড়ে দিল বলরামের কোলে। তারপর প্রৌঢ়া আমার দিকে ফিরে বলল, 'আরে ভাই, দেখা নহি উনকো। গোসা ন করো।'

বলেই আবার তারা তাদের মালপত্র গোছাবার জন্য লাফালাফি, ঘাড়ে ওঠাউঠি শুরু করে দিল। যত না মালপত্র সাজায়, তত সামলায় বুড়োকে। বুড়ো যেন তাদের সাত রাজার ধন এক মানিক। কেন, কে জানে! সেই সঙ্গেই স্বভাষায় কি একটা কথা নিয়ে হেসে খুন হচ্ছে সকলে। আর আড়-চোখে তাকিয়ে দেখছে আমাকে। কেন, তারাই জানে!

তারা শুধু খ্যাপা হাওয়ায় মত আসে নি। খ্যাপা তারা নিজেরাও। তাদের হাসি কথা কাজ দেখে তাই মনে হয়। যেন খাঁচার পাখি খাঁচাছাড়া হয়েছে। মাতিয়ে তুলেছে বনপালা।

তাদের চারজনের মধ্যে প্রৌঢ়াসহ তিনজনের দেহে সাবেকী ধরণের সোনার অলঙ্কার। জামাকাপড়েও গ্রাম্য অবস্থাপন্ন পরিবার বলেই মনে হয়। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে এই বাঁধনছাড়া কলকাকলীর মধ্যে তাদের স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য।

মধ্যপ্রদেশের শার্দুল তখনো হাত-পা গুটিয়ে বসে গজরাচ্ছেন। অন্ধ্রের পরিবারটিরও শান্তিভঙ্গ হয়েছে বিলক্ষণ। তবু মনে হল, তাঁরা উপভোগ করছেন সমস্ত ব্যাপারটা।

বলরাম বিকলাঙ্গ। পরিচয়ও তার সঙ্গে সামান্য। তবু মনটা আমার বিমুখ হয়ে উঠল তার প্রতি। কী বলে সে আনিটা নিয়ে হাসছে আমার দিকে চেয়ে। যারা অমনি আঘাত করে তার মাশুল দেয় এক আনা, দিয়ে আবার নির্লজ্জের মত হাসে, তাদের প্রতি বলরামের এত অনুরক্তি কিসের। বলরামেরা চিরকালই এমনি! ছি, ওর সঙ্গে আর কথা বলব না।

দুমিনিট গেল না। বলরাম অবার ডাকল, 'বাবু।'

যেন শুনতে পাই নি, এমনিভাবে তাকিয়ে রইলাম অন্যদিকে। কিন্তু বলরাম চাপা ও খুশি গলায় বলল, 'এতক্ষণে শুকনা খালে জোয়ার এইল। বাবা! এতক্ষণ এই কামরাটাতে বইসে মনে হচ্ছিল না যে পেরাগে যাচ্ছি।

এইবার দেখেন তো, কেমন কলর-বলর গমগম কইরছে।'

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু সে আপন মনে বলেই চলল, 'বুইঝলেন বাবু, বলে মানুষ নিয়ে কথা। বেঁইচে আছি যদ্দিন, তদ্দিন মানুষ ছাড়া গতি নাই। একলা সুখ, একলা দুখ, এ কি হয়। তবে মরণের ঘুনাইলে অত কান্না কিসের, অ্যাঁ? ছেইড়ে যাবার ভয়েই তো। আসুক, আরো আসুক। কী বলেন বাবু, যে কয় একলা চলি, সে তো চলে দোকলার জন্যে। নইলে চইলতে যাবে কেন, অ্যাঁ?'

কাঁচা কুয়োর উপরের জল চুঁইয়ে পড়বেই। তা রোধ করবে কে? বলরামের কথাগুলি ঠিক কানে এসে ঠেকছিল। শুধু ঠেকছিল না অবাক করছিল আমাকে। শাসন, রাজনীতি, নিরাপত্তাহীন জীবন, সব মিলিয়ে আমাদের মনে অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয়, অনেক সঙ্কীর্ণতা। দিবানিশি পা টিপে টিপে চলেছি চোরাবালি এড়িয়ে। এই জীবনেই ফাঁক পেয়ে আবার দৌড় দিয়েছি অমৃত-কুম্ভের সন্ধানে, ভারতের সেই বিচিত্র রূপের রসে ডুব দেব বলে। সে রূপ লক্ষ লক্ষ হৃদয়েরই; কিন্তু বলরামের এ কিসের রস। এ কি তার নিরক্ষর অন্তরেরই বিশ্বাস, নাকি শুধু কথার জাদু! মানুষের প্রতি তার এত টান! নাকি টানটা চার পয়সার!

ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল বলরামের ফোলা কপাল। লাল জায়গাটিতে বিন্দু বিন্দু রক্তও দেখা দিয়েছে। তবু সে হাসছে। অম্লান হাসি দেখে সহজে মনে পড়ে শুধু বৌদ্ধ শ্রমণদের কথা। কিন্তু এ যুগে তা অচল এবং অবিশ্বাস্য, গলায় আমার আপনিই ঝাঁজ এসে পড়ল। বললাম, 'তোমার কি একটুও চোট লাগে নি?'

বলরাম বলল, 'চোট আমার লাগে নি বাবু? কিন্তু কাঁদব কার কাছে বলেন। কাঁদনে লাভ? ওনারা কইবেন, দেখি নাই বাপু। মিটে গেল। তাই বলে পইড়ে থাকব না, চইলব। চইলতে চোট লাগে না বাবু? আপনার লাগে না?'

আবার সেই কথার ফুল ফোটানো। সে ফুলে এমন গন্ধও ছিল যে, চট করে জবাবও দিতে পারি না এই সামান্য বলরামের কথার।

সে আবার বলল, 'বাবু, লোকে সংসার চালায়। সংসারে কত ব্যথা, কত চোট। সেখানে পেটে চোট, মনে চোট। পেটে খেতে নাই, বুক-জোড়া মানুষটি নাই, হাজার চোট খেয়েও থেমে আছে কেন বলেন?'

তর্কের অবকাশ ছিল কি না জানি নে। কিন্তু হেরে গেলাম। জানি নে, কোন পথে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আমাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার স্রোতে। একটা সামান্য ঝুলা বলরামের কাছে হার মেনে গেল আমার বিদ্যা-বুদ্ধি। অন্তত এই মুহূর্তের জন্য সে আমার মনের দুকূল ভাসিয়ে ভরিয়ে দিল।

এর পরে আর ওই চারটে পয়সার কথা বলে তাকে আঘাত দেওয়ার কথা আমার মনে আনতে সংকোচ হল। আমার মন তো বলরামের মন নয়।

তৃতীয়বার বলরামের হাত এসে ঠেকল আমার পায়ে। ছি ছি, অমন পায়ে হাত কেন বার বার। বললাম, 'কী বলছ?'

দেখলাম বলরামেরও সঙ্কোচ হয়। বলল, 'অ্যালবাদ ইষ্টিসনে এট্টুস হাত দুইখান ধরবেন, কোনরকমে একবার টেনে-হিঁচড়ে ফেলতে পারলেই হইবে। আপনি একলা মানুষ, তাই কইলাম।'

বলে সে আমার মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইল। সেই চোখে দেখতে পেলাম বোধহয় বলরামের আসল রূপ। সে রূপ এক বিকলাঙ্গের করুণ অসহায় রূপ। এ সংসারে আয়নায় বোধহয় এটাই তার প্রকৃত মূর্তি। আর এ রূপই বুঝি তাকে দিয়েছে প্রাণ-ভোলানো সুর, গলা, কথা ও মন।

বললাম, 'পায়ে হাত দিও না। দেব, নিশ্চয় নামিয়ে দেব।'

ব্যস। আবার গুনগুন।

কথায় বলে, বানের জল একবার ঢুকলে আর রক্ষে নেই। আমার দল ঢুকে আপার ক্লাসের আভিজাত্য ও গাম্ভীর্যে চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল। এবার প্রতিটি স্টপেজ থেকে কলকল নাদে ধেয়ে এল বন্যা। এবার সাধারণ পুণ্যার্থীর সঙ্গে সাধু। গণমনের গঠনপ্রকৃতিও এমনি বিচিত্র যে, একবার যেদিকে ঢল নামে, সবাই ছুটে চলে সেদিকে। জানি নে, অন্যান্য কামরাগুলির কী অবস্থা। কিন্তু এখানে আমাদের মুখে মুখে ঠেকে গেল। যেমন ঠাসাঠাসি, তেমনি কলরব। শুধু খুশির অন্ত নেই বলরামের।

মানুষ বিরক্তিতে ও হতাশায় হাসে। অন্দ্রের বড় ভাই তেমনি হেসে বললেন, 'কিছু করবার নেই, কী বলেন? কী ভাগ্যি, আমাদের গন্তব্য আর বেশী দূরে নয়।'

বললাম, 'আমাদের সকলের বোধহয় একটাই গন্তব্য।'

বড় ভাইয়ের মধ্যেও বোধহয় বলরামের মত একটা পাগলামি ছিল। বললেন, 'কী করে বলি বলুন। সমূহ আমাদের একটা গন্তব্য এক হতে পারে না। আমি সম্পূর্ণ অন্ত পথের যাত্রী।'

বলে তিনি চুপ করে গেলেন। ঘুরে-ফিরে তাঁর সেই পারিবারিক ট্রাজেডির কথাই আসছে। পথ যত সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, তাঁর পাথরের মত নিকষ কালো মুখে তত পরিস্ফুট হয়ে উঠছে গভীর ফাটলের চিহ্ন। সম্পূর্ণ অন্য পথের যাত্রী, অথচ চলেছেন সেই প্রয়াগেই।

ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের ক্ষিপ্ত অথচ অসহায় শার্দুলের। তাঁরা মহিলাপুরুষে মিলে কিছুক্ষণ রীতিমত ঝগড়া করেছেন। এমন কি ভয়ও দেখিয়েছেন, কর্তৃপক্ষকে বলে এদের নামিয়ে দেবেন।

কা-কস্য পরিবেদনা। কাকেই বা বলা। যাদের বলছেন, তাদের ভয়ের লেশমাত্র নেই। ভয় নেই, আছে শুধু এক বিষম সংশয়। এত কাছে এসেও তাদের শুধু সংশয়, তারা যেতে পারবে কি না। ভয় তারা পেছনে ফেলে এসেছে। নিষ্ঠুরের মত এর চুলের মুঠি ধরে, ওর মুখে পা দিয়ে যেভাবে সবাই হন্যে হয়ে উঠছে যাবার জন্যে, দেখে মনে হচ্ছে প্রাণকেও তুচ্ছ করেছে তারা। যে যার নিজের ভাবনায় নিজে উন্মাদ। পাশের মানুষটির কথা ভাববার অবকাশও নেই কারুর। সে যদি অপরের পেষণে পীড়নে আর্তনাদ করে ওঠে, তাতেও ভ্রুক্ষেপ নেই কারুর।

পাগলা হাতি ছুটতে দেখেছিলাম কুম্ভমেলায়। লিখতে বসে সেই উপমা মনে পড়ছে। এক নির্মম প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে সকলে। কে পড়ে থাকবে, কে মরবে, সেটা বড় কথা নয়। আমি যাব। সামনে পড়ে আছে তার জীবন-যৌবন, আজন্মলালিত কাম্যবস্তু, তার ধ্যানধারণা।

বৃথা দোষ ধরেছিলাম শ্যামাদের দলের। এখন আর ছোট কামরাটিতে খুঁজে পাওয়া দায় শ্যামাদের। তারা চারটি মেয়েমানুষ নিজেদের সমস্ত পেষণ যন্ত্রণার মধ্যেও আগলে রেখেছে সেই বুড়োকে। আমি আগলে রেখেছি বলরামকে।

আস্তে আস্তে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে কামরার অবস্থা।

আর কতদূর। দূর নেই আর। ক্রমে এলাহাবাদ শহরের সীমানায় ঢুকল গাড়ী।

ভেবেছিলাম, সকালেই পৌঁছাব। চারটের সময় গাড়ি দাঁড়াল এলাহাবাদে।

গাড়ি এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, দেখতে পেলুম, দুমদাম করে মালপত্র পড়ছে প্ল্যাটফরমের উপর। পড়ছে আমাদেরই গাড়ির দরজা-জানালা দিয়ে।

এসে পড়েছে। একটিমাত্র কথার অপেক্ষা। সত্যিই এল কি-না, সন্ধানের প্রয়োজন নেই। শোনামাত্র সংক্ষিপ্ত স্থানে পাক-খাওয়া ঘূর্ণিজালের আবর্ত মুহূর্তে পথ পাওয়ার জন্য ফুলে ফুলে উঠল। অকস্মাৎ এই স্ফীতিতে একটা তীব্র আর্তনাদ উঠল সারা কামরাটার মধ্যে। 'মরে গেলুম, বাবারে। মেরে ফেললে, মেরে ফেললে।'

কারুর হাত ভাঙল, পা ভাঙল, গুঁতো খেয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। এরই মধ্যে বাঁদরের মত কুলিদের লম্ফ-ঝম্ফ। স্টেশনের মাইকের চিৎকার, হাজার হাজার নরনারীর কলরব। গাড়িটা ফিরোজপুর এক্সপ্রেস। যাত্রীরা নামবার আগেই অন্য যাত্রীর দল ওঠার জন্য ঠেলাঠেলি করছে দরজার কাছে।

প্ল্যাটফরমের উলটো দিকে নামবার সুবিধা নেই। আমার হাঁটু চেপে ধরে চুপ করে বসেছিল বলরাম। বুঝলাম, উপায় নেই। এর মধ্যেই নামতে হবে। আমার এই ক্ষীণ দেহে কখনো শক্তির পরীক্ষা দেব, সেটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু ত্রাণ পেতে হবে।

এক কাঁধে ঝোলা নিলাম। দুহাতে বলরামকে তুলে বললাম, 'শক্ত করে গলা ধরে ঝুলে পড়ো।'

শঙ্কিত বলরাম বলল, 'পারবেন তো ঠাকুর! আমার ঠাকুরের কোন কষ্ট হবে না তো!'

বাবু থেকে ঠাকুর হয়েছি বলরামের কাছে। এর পরে দেবতা হব। নরাধম পাপিষ্ঠও হতে পারি।

সামনে তাকিয়ে মগজের সমস্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এতক্ষণ অপরকে বলেছি, এবার নিজে একটা অন্ধ ক্ষিপ্ত মোষের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম সামনের দিকে।

অন্ধের বড় ভাইয়ের উৎকণ্ঠিত গলা একবার শুনতে পেলাম, 'এ কী করছেন, মিঃ শুনুন।'

না, শুনব না। নামতে হবে। কতটা এগিয়েছি জানি, একটা নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ শুনে তাকিয়ে দেখলাম, শ্যামা। আমার কনুই তার গলায় ঠেকেছে। প্রাণভয়ে চিৎকার করছে সেই মুক্ত পাখির দল। কোথায় প্রৌঢ়া, প্রেমবতীয়া পাতিয়া। কোথায় বা বুড়ো! দেখতে পেলাম না, শুধু চিৎকার

শোনা যাচ্ছে।

শ্যামা আমার কনুই চেপে ধরল দুহাতে। অসহ্য ভার। প্রাণ বেরিয়ে যায়। যেতে দাও যেতে দাও।

হুশ করে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল ঘাম-ঝরা মুখে। বাইরে এসে পড়েছি। দেখলাম, একসঙ্গে অনেকে এসে পড়েছি। খসে পড়েছে বলরাম ঘাড়ের উপর থেকে। না, তার লাগেনি। সে ভগবানকে ডাকছে।

ওভারকোটটা কে ধরে রেখেছে পেছন থেকে। ফিরে দেখি শ্যামা। উৎকণ্ঠিত চোখে জলের ধারা। অসহায় ভাবে বলে উঠল, 'ওদের একটু নামিয়ে দাও বাঙালীবাবু।'

আবার! কিন্তু এবার দুজন সেপাই এসে পড়েছে। সেপাই ডেকেছেন মধ্যপ্রদেশের সেই ভদ্রলোক। অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এল যেন।

পরোপকারের নেশা বলে কোন বস্তু আছে কিনা জানি না। মানুষের মনে মাঝে মাঝে একটা ঝোঁক চাপে। আমারও ঝোঁক চাপল তেমনি। শ্যামার হাতে ঝোলা ফেলে উঠে গেলাম আবার।

প্রৌঢ়া চেঁচিয়ে উঠল, 'এই বুড়োকে, দোহাই বাবু, এই বুড়োকে একটু নামিয়ে দাও!'

বলতে না-বলতে বুড়ো দু হাতে চেপে ধরল আমাকে। যেমন করে জলে ডুবন্ত মানুষ কোন আশ্রয় খোঁজে। ভেবেও দেখে না, সে-আশ্রয়সুদ্ধ সে তলিয়ে যাবে কি-না।

নেমে এলাম। নেমে এসেছে সবাই। কোথায় গেল হা-হুতাশ, যন্ত্রণা, চিৎকার ও কান্না।

শ্যামা হাসছে! হাউমাউ করে কী সব বলছে প্রৌঢ়াকে আর আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে। বুঝতে পারলাম, এমন ভালমানুষ ওরা কখনো দেখে নি, সে কথাই বলছে আর বোঝাতে চাইছে আমাকে।

বলরাম ডাকল, 'ঠাকুর!'

বললাম, 'ঠাকুর নই, জাত শুদ্দুর আমি।'

কিন্তু বলরামের আছে কথার ফুলবাগান। বলল, 'কই! আপনার গায়ে মুখে যে লেকা রয়েছে ঠাকুর বলে। তা আমি কেন। ঠাকুর, অ্যাই, অ্যাই যে নক্কীদাসী।'

দেখলাম, বলরামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পেটেন্ট বাঙালী

নামাবলীধারী বৈষ্ণব, আর-একজন কালো স্থূল চেহারার মেয়েমানুষ।

বুঝলাম, আমঘাটার লক্ষ্মীদাসী এই মেয়েমানুষটি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। থানের উপর নামাবলী। পান-দোক্তা-খাওয়া ঠোঁট ফেটে চৌচির হয়েছে। স্থূল ঠোঁট, বিস্ফারিত করে বেচারী হাসতেও পারছে না। বোধ করি তার মূল গায়েনকে রক্ষা করেছি বলেই মুগ্ধ কৃতজ্ঞতায় বাকরহিতা হয়েছে সে।

বললাম, 'বেশ, এবার চলি বলরাম।'

জবাব দিল লক্ষ্মীদাসী। সেও বলল, 'ঠাকুর—'

ফিরে তাকালাম তার দিকে। চল্লিশ বছরের লক্ষ্মীর কালো কালো ডাগর চোখ দুটি এখনও বালিকার মত কৌতূহলিত ও নম্র। বলল, 'একবার আমাদের আশ্রমে পায়ের ধুলো দিবেন।'

'কোথায় তোমাদের আশ্রম?'

'কোথায় জানি না। দেখি নাই তো কোনদিন। আশ্রমের নাম ছিরি নন্দগোপাল মাধবাচার্য বাবাজীর মন্দির। আমাদেরও খুঁজে নিতে হবে।'

বললাম, 'পারলে যাব। না যেতে পারলে কিছু মনে কোরো না। তবে তোমার মূল গায়েনের গলাটি বড় মিষ্টি। ওর গান শোনবার ইচ্ছা রইল মনে।'

অন্ধ্রের পরিবারটি নেমে এসেছেন। দেখলাম, ড্রাইভারের উর্দি-পরা একটা লোক তাঁদের পথ করে দিয়ে নিয়ে চলেছে। সকলেই আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। বড় ভাই বললেন, 'আমাদের ক্যাম্পটার নাম মনে আছে তো? আসা চাই।'

সাধারণ যাত্রীদের বেরুবার পথে এগিয়ে গেলাম। জানি, আমার দিকে তাকিয়ে আছে বলরাম। জলে ভেসে যাচ্ছে তার দুচোখ। মা-খেগো বলা মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু!

এই মহামেলার জনারণ্যে আর কোনদিন ওকে খুঁজে পাব কি-না জানি না।

মানুষের মন নদীর কূলে সৈকতভূমি, সেখানে দিবানিশি পলি পড়ছে। পলের পলি, মিনিটের পলি, ঘণ্টার পলি, মহাকাল ও যুগের পলি। একটা বেলার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে মৃত-সহ তীব্র স্মৃতি। এর পর হারিয়ে যাবে বলরামও।

আবার কোন ঘটনার ঢেউ আছড়ে পড়ে যেদিন জাগিয়ে দেবে এই কুম্ভ-

যাত্রার স্মৃতি, সেইদিন হয়তো এই বিচিত্র মুখগুলি ভেসে উঠবে চোখের সামনে। কত কথা মনে পড়বে।

স্মৃতি যেন কণ্ঠলগ্না প্রেয়সী। প্রেয়সীর আদরে অবিমিশ্র সুখ থাকে না। সুখ ও দুঃখ, এ দুই ধারার মিলনে সেখানে নোনা জলের ধারাও গড়িয়ে আসে। স্মৃতিও তেমনি। এমন কি, কণ্ঠলগ্ন হয়েও তীব্র দহন সময়ে সময়ে অনুভব করি আমরা। তবুও স্মৃতি বিনা প্রাণ বাঁচে না।

মাইক অনবরত বলে চলেছে, 'কলেরার ইন্‌জেকশন নিতে ভুলবেন না। ভুলবেন না সার্টিফিকেট নিতে। বিনা সার্টিফিকেটে আপনার মেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

তার ব্যবস্থাও হয়েছে কম নয়। সমস্ত স্টেশনটি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে একটি অস্থায়ী কারাগার সৃষ্টি হয়েছে। দরজায় দরজায় ডজন ডজন পুলিশ।

স্টেশনের খোলা আঙিনাতেই ছাউনি পড়েছে মহামারী প্রতিষেধক-ওয়ালাদের। কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ বাগিয়ে ধরে আছেন চকচকে সিরিঞ্জ আর তুলো।

শ্যামার দল এখানেও হট্টগোল পাকিয়েছে। ইন্‌জেকশন তারা কিছুতেই নেবে না। শুধু শ্যামারা কেন, অনেক শ্যামার দলই মূর্ছিতের মত পড়ে আছে ছাউনির পাশে। ভগবানের কাছে হত্যে দেওয়ার মত অসহায়ভাবে পড়ে আছে।

পুণ্যার্থী নারীবাহিনীর কোন কোন দল তো কান্নার রোল তুলেছে।—'হে ভগবান, হে মহাদেব তোমার রাজত্বে এ কি কাণ্ডকারখানা চলেছে।'

অবাক হয়ে দেখি পাশে একজন মস্ত মরদ জোয়ান পাগড়ি নিয়ে চোখের জল মুছছে। বললাম, 'কাঁদছ কেন?'

সে আমার দিকে কয়েক মুহূর্তে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, 'বিনা সুঁইসে ইনলোগ হম কো যানে নাহি দেগা।'

সত্যি, ভগবানের রাজত্বেরই কাণ্ডকারখানা বটে। মরদটিকে দেখে মনে হচ্ছে, সে রাজস্থানের কৃষক। শরীর তার আমার চার ডবল। তার চওড়া থাবাটাই আমাকে বোধহয় টিপে মেরে ফেলতে পারে। সে যে সামান্য একটি ছুঁচ হাতে বেঁধবার ভয়ে রীতিমত কান্না জুড়েছে, এ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি, শুধু সে কেন, এমনি কয়েক জনেরই চোখ ছলছল

করছে। অথচ এই মানুষই হয়তো সামান্য আলপথের জমি নিয়ে দাঙ্গা করে নজের ও পরের মাথা ফাটায়, অনায়াসে। তখন সে রক্ত দেখেও ভীত নয়। হয়তো ধর্মের নাম করে তার নাক কান ফুটো করে দিলেও সে সহ্য করবে। কিন্তু ইন্‌জেকশন! সে যে বড় সাংঘাতিক।

কিন্তু তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়। ইনজেকশন-রূপী দেবতাটি বড় নির্দয়। ছুঁচ হয়ে না ঢুকে সে ছাড়বে না। আর তার পরোয়ানা না পেলে স্বর্গের দরজাও বন্ধ। যারা ভীত অথচ বুদ্ধিমান, তারা কেউ স্বীকার করছে না। নিচ্ছে আর পালাচ্ছে। ভাবখানা, যা হয় পরে দেখা যাবে। এখন তো যাক।

শ্যামার দল শেষটায় টাকা বের করছে। কিন্তু টাকা নিয়ে যারা নিষ্কৃতি দেবে, এ দিনের আলোয়, সহস্র চোখের সামনে তাদের ইচ্ছা থাকলেও লজ্জা বলে একটা বস্তু তো আছে।

বৃথা দেরী করা। যেতে হবে। এদিকে বেলা যায়। ইন্‌জেকশন নিয়ে, এক টুকরো কাগজের সার্টিফিকেট পকেটে পুরে বেরুতে গেলাম।

সামনেই দেখি শ্যামা ও প্রৌঢ়া। পেছনে প্রেমবতীয়া, পাতিয়া ও বৃদ্ধ।

শ্যামা উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'চোট লাগে নি?'

ভাবলাম, বলরামের মত জবাব দিই যে, চোট ছাড়া চলা যায় নাকি? হেসে বললাম, 'সামান্য। ও কিছু নয়।'

শ্যামা বলল, 'সচ বলছ?'

'ঝুটা বলে লাভ কি আমার। নিয়ে দেখো।'

এত ভয় যে, শ্যামা আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। বলল, 'আমাদের এই বুড়া মানুষটি নিতে পারবে তো?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই। একশোটা নিতে পারবে।'

বলে হাসতে হাসতে বাইরে এসে দাঁড়াতেই এক কাণ্ড। একটি বাঙালী বৃদ্ধা শণ-নুড়ি চুল উড়িয়ে ভাঙা গলায় খনখন করে উঠল, 'দাঁত বের করে নিয়ে তো এলে বাছা। এমনি করে তোমরা প্যাঁক প্যাঁক করে নিলে মড়ারা কি আর আমাদের ছাড়বে? একটু বলে কয়ে ব্যবস্থা তো করতে হয়।'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমাকে বলছেন?'

'তবে আর কাকে বলব।'

'কিন্তু বলে কয়ে কাকে বোঝাব, বলুন তো?'

'কেন, ছিন্দিমিন্দিওয়ালাদের বলে দাও, আমাদের এই বুড়িহুড়িদের সাত-কাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে। মরি মরব। আমরা সব ইঞ্জিশনফিঞ্জিশন নিতে পারব না।'

তাই ভাল। ভেবেছিলাম, না জানি কী করেছি। দেখলাম, বুড়ির পাশে এক বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়সের যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যেই সে আপাদমস্তক মোটা শালে ঢাকা দিয়েছে। শীত আছে সত্যি কিন্তু যুবকটিকে শীতের জুজুবুড়িতে ধরেছে বলে মনে হল। ঠেলাঠেলির ঠেলায় আমাকে তো সব গরম জামা খুলে ফেলতে হয়েছে।

যুবকটির পাশে দেখলাম একটি অবগুণ্ঠিতা বালিকা। বালিকা উৎকণ্ঠিতা। আমার চোখে চোখ পড়তেই যুবকটি বলে উঠল, 'কী করা যায় বলুন তো ?'

আমি বললাম, 'কেন, আপনিও নেন নি নাকি ?'

যুবকটি লজ্জিত হল না একটুও। মুখটা আরও করুণ করে বলল, 'মানে কথা, কখনো নিই নি কি-না, তাই বড় ঘাবড়ে যাচ্ছি। দেখুন না, আমার পরিবারটি তো একেবারে মরিয়া হয়ে গেছে দাদা। আর দিদিমার কথা তো শুনলেনই।'

পরিবার অর্থাৎ বালিকাটি। বুড়ি হল দিদিমা। লোকটির অবস্থা সবদিক দিয়েই কাহিল হয়ে পড়েছে, বুঝতে পারলাম। কিন্তু অবাক হলাম ওর কাণ্ড দেখে। ইনজেকশন যে এমন করালরূপে এখনো দেশে বিরাজিত, তা জানতাম না।

বললাম, 'জানতেন তো আসবার আগেই। ব্যবস্থা একটা করলেন না কেন ?'

যেমনি বলা, অমনি যুবকটি শাল খুলে একেবারে রুদ্র মূর্তিতে জ্বলে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'মশাই, এই বুড়ি যত নষ্টের মূল। পইপই করে বলেছিলুম, ছটা টাকা দে দিমা (অর্থাৎ দিদিমা), মিউনিসিপালের হেল্‌থ্‌ অফিসারকে মাথা পিছু দুটাকা করে দিয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে নিই। তখন বলে কত কথা। ছটা টাকা। এখন কোন্ শালা এ বোত্‌রনি পার করবে, অ্যাঁ ?'

যুবক স্বমূর্তিতে বিরাজিত। দিদিমাও কম্ যায় না আদুরে নাতির চেয়ে। সেও গলা চড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ রে, একালষেঁড়ে, দুপয়সা কামাবার মুরোদ নেই, ছটা টাকা আসে কোত্থেকে। আর তখন কি অত জানতুম যে, মিনসেরা এমনি করে ধরবে।'

যুবক আরও উগ্র হয়ে উঠল। শাল কোমরে বেঁধে জামার আস্তিন গুটিয়ে বলল, 'আমি শালা এখুনি ইনজেকশন নেব, যা খুশি তুই কর।'

সর্বনাশ! বুড়ি একেবারে ক্ষেপে উঠল। বলল, 'মাথা কুটে মরব পেল্লাদ, তোর দিমার তালে আজ এখেনেই মিত্যু আছে। খবরদার।'

কিন্তু পেল্লাদ আস্ফালন করতে ছাড়ে না।—'হোক মরণ তবু নেব।'

বলে, কিন্তু এগোয় না। আর আমিই কি জানতাম যে এলাহাবাদে স্টেশন-প্রাঙ্গণে এমনি একটি নেহাত বাঙলা নাটক দেখব!

দর্শক অনেক ছিল। বোধকরি ভারতের প্রতিটি প্রদেশের নরনারী দেখল এই নাটক। প্ল্যাটফরম থেকে জনতা ক্রমে আঙিনাতে ভিড় করতে আরম্ভ করছে। মহামারী ক্যাম্পের লোকেরা তাড়া দিলেন ভিড় কমাবার জন্য।

ইতিমধ্যে অনেকেই বেরিয়ে গিয়েছে। বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। জানি না দিদিমা-নাতির এ নাটকের যবনিকা কিভাবে কখন পড়বে। সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এলাহাবাদ শহর। প্রাচীন হিন্দু-রাজত্বের প্রয়াগ প্রদেশ। শুধু হিন্দুর তীর্থভূমি বলে নয়, যে কোন ইতিহাস-কৌতূহলিত ব্যক্তি রোমাঞ্চিত হবেন আজকের উত্তরপ্রদেশের এই শহরের ইতিহাস শুনলে।

দলবদ্ধ তরুণীদের কলহাসির মত অনেকগুলি বেল বাজছে সাইকেল রিক্সার। এখানে কর্ণবিদারী ভেঁপু নেই। ঘাড় নুইয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে উত্তরপ্রদেশের রিক্সাওয়ালারা। সময় সেই আজ তাদেরই পৌষ মাস। এক টাকার জায়গায় চার টাকা চাইলেও না বলার মত কেউ নেই। রথ যাদের চাই, তাদের আজ রথীদের মনোমত ব্যবস্থায় রাজী হতেই হবে।

কিন্তু সে-কথা বলছিলাম না। বলছিলাম এ দেশের কথা। বাঙলা থেকে খুব দূরে বলব না এ দেশকে। বিশেষ এই বিজ্ঞানের যুগে। তা ছাড়া বাঙালী বাসিন্দার সংখ্যাও এখানে কম নয়।

আজ এই দেশের রাজপথের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখছি পিচ-ঢালা রাস্তা, দু'পাশে ইমারতের সারি। ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে মোটর লরি আর প্রাইভেট কার। সাইকেল রিক্সা আর রকমারি টাঙ্গা। টাঙ্গাগুলিই বোধহয় প্রাচীন ভারতের ঘোড়ায়-টানা রথের স্মৃতি বহন করছে। মানুষ চলেছে অসংখ্য।

শহরের চেহারা বাঙলার মফঃস্বল শহরেরই মত। বিশেষ, বর্তমান বাংলা-

দেশের রাজধানী ঢাকা শহরের ছাপ এলাহাবাদে পরিস্ফুট।

কাল থেকে কালান্তর, যুগ থেকে যুগান্তর। কাল যায়, যুগ যায়। যাওয়ার সময় সে তার ছাপ রেখে যায়। সবই মানুষের কীর্তি। মানুষই ভাঙে, আবার মানুষই গড়ে। তবু পেছন দিকে তাকালে আমাদের দু চোখ জলে ভরে আসে। এ চোখের জল অবস্তুবাদীর নয়, নয় ইতিহাস-বিমুখের। বরের গৃহে মেয়ে পাঠাবার জন্য পিতা কত সুন্দর অনুষ্ঠান করেন। মেয়ের প্রতিষ্ঠা, তার নারীত্বের মহিমাপ্রকাশের জন্য এক নতুন জীবনে তুলে দিয়ে আসেন তাকে। তবুও যাকে লালন করেছেন, জন্মের পর থেকে যার বিকাশের জন্য প্রতিদিন কষ্ট করেছেন, তারই নব জীবনের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদে ভাসান।

প্রয়াগ নাম আমাদের তেমনি মুগ্ধ করে। হাজার হাজার বছর আগে থেকে ভারতের নামের সঙ্গে প্রয়াগের নাম জড়িত। ভাবি, যে-পথের উপর দিয়ে আজ রিক্সায় চেপে চলেছি, একদিন এখানকারই ভয়াবহ বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অযোধ্যার দশরথ-পুত্র রাম, ভাই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতাকে নিয়ে বনবাসের পথে গিয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন দূর-আকাশের ধোঁয়ার কুণ্ডলী! ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠেছিল ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম থেকে।

কাব্য নয়, বাস্তবে কি একবার চোখ বুজে ভাবতে পারিনা, সৎমায়ের তাড়নায় দুইভাই আর এক বউ বহুকাল পূর্বে একদিন ঘর ছেড়ে এ পথে এসেছিলেন। তাঁদেরই দিয়ে আমাদের রাজকথা কাব্য, গৌরবগাথা, রূপকথা, আমাদের ইতিহাস।

চমকে উঠলাম। হঠাৎ কানে এল, 'এই যে বাঙালী ভাই!'

কথার সঙ্গেই জলতরঙ্গের চড়া সুরের মত এক ঝলক হাসি। হাসি, ঘোড়ার পদশব্দ, ঘোড়ার গলায় বাঁধা বক্‌লেশের ঘুঙুরে ঝুম-ঝুম বাজনা।

চোখ চেয়েছিলাম কিন্তু মন-চোখ হারিয়ে গিয়েছিল রামায়ণ কাব্যলোকের স্বপ্নরাজ্যে। সুপ্তোত্থিতের মত চমকে তাকিয়ে দেখি, মাত্র দুহাত দূরে শ্যামা। টাঙ্গার প্রান্তে বসেছে পা ঝুলিয়ে। একটা টাঙ্গায়ই স্বল্পপরিসর জায়গায় তারা সকলে বসেছে বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো রয়েছে মাঝখানে। তাদের টাঙ্গা চলেছে আমারই রিক্সার গায়ে। এত গায়ে গায়ে যে ঠেকে না যায় আবার।

সামনে পিছনে টাঙ্গা ও রিক্সার ভিড়। পথের দুপাশে ভিড় মানুষের। মেয়ে, পুরুষ, শিশু ও বুড়ো। সারবন্দী চলেছে সকলে। চলেছে সাধুর দল।

ক্রিং ক্রিং নয়, রিনি-রিনি করে বাজছে রিক্সার বেল। তাড়া দিচ্ছে আমার রিক্সা শ্যামাদের টাঙাকে।

শ্যামা হাসছে, হাসছে ওদের সমস্ত দলটা। বুড়োটিও কি হাসছে? হাসছে না, কিন্তু নাকের পাশের গভীর রেখা দুটিতে তার প্রসন্নতার আভাস!

প্রৌঢ়া কী বলল শ্যামাকে। যাত্রী ও যানবাহনের কলকোলাহল ছাপিয়ে গলা চড়িয়ে শ্যামা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাঁহা জানা হ্যায়?' বাংলা করলে বোধহয় অর্থ দাঁড়ায় 'কোথায় যাওয়া হবে?'

বললাম, 'মেলা। কুম্ভমেলা।'

'সচ্?' সত্যি! চমকিত বিস্ময় ও মুহূর্তের নীরবতা। আবার হাসি। সে-হাসিতে পথচারী নরনারী চমকায়, জানোয়ার চমকায়। বোধহয় চকিতের জন্ত থমকে যায় অবিরাম বয়ে-চলা এই জন সমুদ্রের পায়ের তলার মাটি, উত্তর-প্রদেশের হালকা মেঘ-ছাওয়া বেলাশেষের রক্তিম আকাশ, উত্তরের সর্বনাশী বাতাস। কেন-না, এ-হাসিতে মুক্তির স্বাদ নেই।

কেন এত হাসি, জানি নে। বলরামের যেমন দেখলাম, হাসি প্রাণ, হাসি গান, হাসি অঙ্গের বসন-ভূষণ। বুঝি এদেরও তাই। কিন্তু বলরামের নীরব হাসিতে খুলে যায় প্রাণের বন্ধ দরজা। নীরব অথচ এক প্রাণখোলা মানুষের মুক্তির উদার ডাক। আর এই চড়া হাসির লহরে লহরে অনুভূত হয় এক চাপা-পড়া বন্দীর নিঃশব্দ যন্ত্রণার ছটফটানি।

রিক্সার সামনের চাকা গিয়ে ঠেকেছে শ্যামার পায়ের কাছে। ঠেকে ঠেকে, তবু ঠেকে না। শ্যামার একটি খেলা আরম্ভ হয়েছে দেখছি। কার সঙ্গে? আমার সঙ্গে, না রিক্সাওয়ালার সঙ্গে, তা জানি নে।

বাঙালী ছেলে বলে ভাবি, দেশের মেয়েরা ছাড়া বুঝি কেউ আলতা দিয়ে পা রাঙায় না। কিন্তু শ্যামারও দেখি আলতারাঙানো পা, প্রজাপতির নকশাকাটা স্যাণ্ডেল, আবার বাঁকা মল। মলের উপরেই পেখম-উন্মুক্ত-ময়ূর-ছাপা শাড়ি। তার বলিষ্ঠ অঙ্গ জুড়ে ছড়াছড়ি নৃত্যরত ময়ূরের। খুলে গিয়েছে ধূলিরুক্ষ চুল, সিঁথিতে মেটে সিন্দুর। কাঁচা সোনার স্থূল কাজ-করা কঙ্কণ-শোভিত দুহাতে কোলের উপর জড়িয়ে ধরেছে একটা পেতলের কলসীর গলা। বসেছে বেঁকে, ঘাড় হেলিয়ে। মুখে তার খেলার হাসি।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ আশ্রমে থাকবে?'

বললাম, 'জানি নে।'

'জান না?' বোধহয় নিজেদের মধ্যে সেই কথাটি বলাবলি করে আবার তারা সকলে হেসে উঠল। কী করে জানব। যেখানে কোনদিন যাই নি, দেখি নি কেমন জায়গা, কী রকম আশ্রয়, সেখানে কোথায় থাকব সেই ভেবে তো বেরুই নি। কি ভেবে বেরিয়েছিলাম, আজ পথ চলতে সব যেন গুলিয়ে গিয়েছে। বক্তৃতা আর যুক্তি গিয়েছে ভুলে। ভেঙে পড়ি নি ক্লান্তিতে, তবু মনেও হচ্ছে না কখন কেন বেরিয়েছিলাম।

মনকে জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। বেরুবার জন্য মন অস্থির হয়েছিল। অস্থিরতা ঘুচেছে, এখন মন পাগল হয়েছে। নিজের সেই পাগল রূপটি দেখতে কেমন জানি নে! এখন চলা নামের মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে। মনের বুকে কান পাতলে শুনি শুধু, চলো চলো চলো। এত মানুষ চলেছে, অবিরাম চলেছে। বন্যার জলে আমি জল হয়ে মিশে গিয়েছি।

কোথায় গিয়ে ঠেকব জানি নে। ঠেকব কি ভেসে যাব তাও জানি নে। আশ্রয়ের কথা কে ভেবেছে!

পথের দুধারে চলেছে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ। কী বিচিত্র তার রূপ। কোথাও রঙিন পায়জামা পাঞ্জাবি ও ওড়নার সঙ্গে ঘাড়ের উপর এলানো খোঁপা, দোলানো বেণী। বাঁকা খোঁপায় ফুল গুঁজে রঙিন রেশমী শাড়িতে টেনে দিয়েছে কাছা। গলায় ঝোলানো বেল্টের সঙ্গে খাপে ঢাকা ছুরি, কোমরে তলোয়ার নিয়ে চলেছে পাঞ্জাবী শিখ। হাজার কুচি-ঘেরা ঘাগরায় ঢেউ তুলে চলেছে দিল্লীওয়ালী, বিচিত্র বর্ণবহুল চৌদ্দ হাত শাড়িতেও সর্বাঙ্গ উদাস করে চলেছে রাজপুতানী। মাথায় সোনার টিকুলি, হাতে পায়ে সোনা। কারুর বা রুপোর হাঁসুলি, কান-ছিঁড়ে-পড়া ছ-ইঞ্চি ভারী কর্ণাভরণ। নাকের দুপাশে নাকছাবি, কপালে দেশী গোলাপী রঙের সিঁদুরটিপ, সামনে কুচি দিয়ে বাঁ-দিকে আঁচল এলিয়ে চলেছে দক্ষিণদেশীনী। বাবরি-কাটা, লুঙ্গি-পরা, মুখে চুরুট পুরুষবাহিনী। কোথাও চোস্ত পাজামা আর চুড়িদার পাঞ্জাবি, কোথাও নকশা-ফোটানো নাগরা জুতো, ধুতি আর ঝোলা পাঞ্জাবি পরা গোঁফ-পাকানো হিন্দুস্থানের পুরুষ। এরই চোখে চোখে পড়ে কস্তাপেড়ে বাংলা শাড়ি আর বাংলা সিঁদুরের আগুনের মত লাল উজ্জ্বল টিপ ও শাঁখা। সর্বহারা শুভ্রবেশিনী বিধবা। কচিৎ বাঙালী কুমারীর মস্ত বড় আঁট খোঁপা, স্নিগ্ধ মুখে উত্তরপ্রদেশের ধূলি-রুক্ষতা আর কোঁচা-ঝোলানো,

কিংবা পায়ের গোড়ালি অবধি মালকোঁচা-দেওয়া পুরুষ, আমারই মত সব টাইপ চেহারার বাঙালী !

দেখে শেষ হয় না, আশ মেটে না পথের এই বিচিত্র রূপ দেখে। ভাবি, যার বেশ এত বিচিত্র, তার হৃদয় ও চরিত্রের গতিবিধি না জানি আরও কত বিচিত্র। সে বিচিত্রকে জানব কেমন করে। মন ভারী হয়ে উঠল। এত মানুষ, কত রূপ। এ রূপের শেষ রূপ কোথায়। সে রূপকে খুঁজব, সেই অপরূপকে দেখব। ভুলি নি তো! ডুব দেব সেই হৃদিকুম্ভে। রূপে তাকে চিনব না, প্রাণে প্রাণে বুঝব বলে ডুব দিতে চাই। প্রাণের দরজা যদি থাকে বন্ধ, করাঘাত করব। চাবি হয়ে ঘুরব কুলুপ ছিদ্রের মধ্যে।

কেন এলাম ছুটে উদ্‌ভ্রান্তের মত। দেখব বলেই তো। ভারতের এই বিচিত্র আরশিতে নিজের মুখটি ভাল করে যাচাই করব বলেই তো এসেছি। সে মুখ আমার মন। আমার ধর্ম।

চলো চলো, আর কত দূর। নিজের মনের কথা নিজে বলতে পারি নে, মা-খেগো বলা হলে হয়তো গান গেয়ে শুনিয়ে দিত আমার মনের কথা।

এরই মাঝে আর এক রূপ যেন মসলিনের ওড়নার সর্বাঙ্গে ধূলিমলিন ন্যাকড়ার তালিতে ভরা। ভারতের দরিদ্র নরনারী এই সমারোহপূর্ণ মিছিলের সবচেয়ে বড় অংশ। জীর্ণ কম্বল, ছিন্ন কাঁথা, ময়লা জামা-কাপড়, উসকো খুসকো চুল, ধুলো-মাখা মুখ। তাদের ঘাড়ে মাথায় বোঝা! শত শত মাইল, শত গ্রাম-গ্রামান্তরের ধুলো তাদের সর্বাঙ্গে ছাওয়া। তবু নিজের প্রদেশ-পরিচয় লেখা রয়েছে তাদের মলিন পোশাকে।

এই রূপের স্রোত চলেছে টাঙ্গায়, রিক্সায়, পায়ে হেঁটে। দূর-গ্রামের মানুষ এসেছে মোষের গাড়ি, বলদের গাড়ি নিয়ে। ভারতের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য, ভারতের মলিন ছাইচাপা সোনা। আমি দু-হাতে কুড়িয়ে নেব এই সম্পদ।

চারিদিকে কলকোলাহল। গাড়ির ঘর্ঘর, ঘোড়ার খুরাঘাত, ঘুঙুরের বাজনা, রিক্সার জলতরঙ্গ। পথচলতি মেয়েরা গান ধরেছে। মেয়েদের দেখে মনে হয় তারা মাড়োয়ারের ঝি-বহুড়ি। হাত দিয়ে নথ নোলক সাপটে ধরে গান করছে তারা। গান চলেছে একটি টাঙ্গায়, মোষ-বলদের গাড়ীতে। এই তো বিরাট মেলা। চলন্ত মেলা। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে হাতে হাত ধরেছে, আঁচলে আঁচলে বেঁধেছে সকলে।

তৃষ্ণার্ত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, কোথাও হাসি, কোথাও গান,

কোথাও কান্না, কোথাও বিবাদ। ভাষা বুঝি নে, ভাব বুঝি নে, সকলের।

সব যখন এমনি ভাঙা রেকর্ডের বিকৃত শব্দের মত তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে, তখন শুধু স্তব্ধ বনের মাঝে যেন একটি ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ও নিধিরাম, বাবা নিধিরাম, কোথায় গেলি। আমি যে হাতছাড়া হয়ে গেছি বাপ। আমার হাত ধর, তোর কাছে টেনে নে।'

একটি ক্লান্ত মোটা গলায় জবাব শোনা গেল আরও দূর থেকে, 'এই যে পিসি, আমি এখানে। ভয় নেই, চলো। আমি তোমাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি, তুমি হারাবে না। ভয় নেই!'

ভয় নেই। নির্ভয়ে চলো। কারা কথা বলছে। মানুষ দেখার জো নেই। কথা বলছে ভিড়। এক গানের ভাষা বুঝতে পারি নি, আর-এক গানের ভাষা বুঝতে পারছি। শুনতে পাচ্ছি খোল-করতালের ঝিমানো বাজনা, তার সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ।'

শুনেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বলরামের মুখ। কারা গাইছে। লক্ষ্মীদাসীর দল নাকি।

রাস্তার বাঁ-দিকে একটা প্লেটে লেখা রয়েছে, কমলা নেহেরু রোড, রাস্তার দু পাশের কাঁচা অংশে ঝাঁট দিচ্ছে ঝাড়ুদারনীরা। বাঁশের ডগায় ঝাড়ু বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁট দিচ্ছে, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে যাত্রীদের। এক ফোঁটা জল নেই, ঝাঁট দিয়ে শুধু কেন ধুলো ওড়ানো হচ্ছে বুঝি নে। ধোঁয়ার মত ধুলো ছেয়ে ফেলল সারাটা রাস্তা। ঝাপসা হয়ে গেল হাজার হাজার মুখ।

এই রাস্তায় আজ আমরা চলেছি, কুম্ভের যাত্রীরা। যদি খুলে দিই এই রাস্তার পুরানো ইতিহাসের পাতা, তবে খুঁজে পাব বুঝি গৌতম বুদ্ধের পদরেণু। কান পাতলে শুনতে পাব বিজয়ী মৌর্য-বাহিনীর পদশব্দ। দেখতে পাব মুগ্ধচিত্ত গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিসকে, চীন পর্যটক ফা-হিয়েনকে। শুনতে পাব সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের রথচক্রের ঘর্ঘরানি। পদচিহ্ন খুঁজে পাব হিউ-এন সাঙ আর শঙ্করাচার্যের!

তবে, সে ইতিহাস প্রয়াগের। এলাহবাদের নয়। গবেষকদের মতে, একসময়ে এই প্রয়াগের নাম ছিল বৎসদেশ। ত্রিশ মাইল দূরে, যমুনাকূলে ছিল তার রাজধানী কৌশাম্বী নগরী। প্রয়াগেরই নাম বৎসদেশ। তারপর মুঘল-

যুগের দুর্ধর্ষবাহিনী ছুটে এসেছে এই পথের উপর দিয়ে। মুঘলের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর প্রয়াগে এসে তার নাম রাখলেন ইলাহাবাস। ভিত্তি স্থাপন করলেন ইলাহাবাস দুর্গের। ক্রমে বাদশাহের রম্যভূমি হয়ে উঠেছে এই ইলাহাবাস। জাহাঙ্গীর তৈরি করলেন তাঁর শখের খসরুবাগ। শাজাহান ইলাহাবাসের নাম দিলেন ইলাহাবাদ।

তার পরেও ইলাহাবাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিদ্রোহী বুন্দেলা আর মারাঠাদের নির্ভীক অশ্ববাহিনী। আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণে রক্তে ভেসে গিয়েছে এলাহাবাদের মাটি। কখনো মুঘলদের গোলা আর কখনো মারাঠাদের তলোয়ার অধিকার করেছে এই দেশ।

তারপর অন্ধকার। অযোধ্যার নবাব দেনার দায়ে বিকিয়ে দিল এ দেশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে।

আর আজ চলেছি আমরা। আমরা ঐতিহাসিক যাত্রী নই ; কিন্তু ইতিহাস রচিত হচ্ছে আমাদের মনে। আমাদের ইতিহাস আমরা।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উলটে পড়বার মুখে সামনে হাত বাড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করলাম। সামনে হাত বাড়িয়ে যে-বস্তুটি ধরলাম, সেটি শ্যামার কলসী। রিক্সার সামনের চাকা খানিকটা বেঁকে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেছনে সর্বত্র আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে চলন্ত মিছিল। পুলিশ হাত তুলেছে মোড়ে।

তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। তাকিয়ে দেখি শ্যামা হাসছে খিলখিল করে।

বললাম, 'একেবারে দেখতে পাই নি।'

শ্যামা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। বলল, 'ঘরের কথা ভাবছিলে বুঝি ?'

বলে আবার হাসি। আশ্চর্য। হাসি মেয়েটার রোগ নয় তো ?

প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ?'

শ্যামা আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে এবার নিঃশব্দে হাসল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কিছু না, বাঙালী ভাই আমার কলসী বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

কলসী বাঁচিয়ে দিলাম কেমন করে ? কলসী ধরে তো নিজেকে বাঁচালাম। অবাক হয়ে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে শ্যামার দিকে তাকিয়ে আমার পথচলা মন চমকে উঠল।

অমন করে কী দেখছে শ্যামা ? ঠোঁটের কোণে তার সেই সর্বক্ষণের হাসি চমকাচ্ছে। তার শাণিত চোখের খর তারা দুটি নেচে নেচে যেন কী খুঁজে

বেড়াচ্ছে আমার মুখে। সে চোখের দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মনের এক গোপন খেলায় দুষ্টামিতে ভরা।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। নিজে অপ্রতিভ হলাম। পথে লজ্জা পেতে হবে, সেকথা ভেবে বেরুই নি। পথে আবার লজ্জা কিসের। পথের দেখা পথেই শেষ হয়ে যাবে। জানি নে শ্যামা কতখানি নির্লজ্জ। জানি নে, শ্যামার এই উদ্ধত চটুলতার মধ্যে তার হৃদয়ের কোন্ গোপন লীলা নিহিত রয়েছে। তার নিজের লীলা নিয়ে সে চলে যাবে এক পথে, আমি যাব অন্য পথে। আমি কেন লজ্জা পাব।

লজ্জা নয়, লোকলজ্জা। সামনে মানুষ, পেছনে মানুষ, মানুষ দিগন্তজোড়া। তার মধ্যে শ্যামা ভিন্ন হয়ে উঠেছে, লোকলজ্জার কারণ সেইটুকুই।

উচ্চকণ্ঠের হাসি একরকম। নীরবে হেসে তাকিয়ে থাকা আর একরকম। অস্বস্তিও তো হয়।

বললাম, 'কী দেখছ?'

বাতাসে-ঝরা চুলের গুচ্ছ মুখ থেকে সরিয়ে দিল শ্যামা। তেমনি হেসে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'আমি কোথায় দেখছি। দেখছ তুমি।'

তা বটে। আজ সকাল থেকে অনেকবার দেখেছি তাকে। ভেবে দেখি নি দেখব বলে। যে দেখা দেয়, তাকে না দেখে উপায় কী। পথ চলতে আকাশ না দেখে কে। বাগানে ফুল চোখে পড়ে না কার। শূন্যে ডিগবাজি খাওয়া গান-পাগলা বিহঙ্গ কে না দেখতে পায়!

শুনেছি, তাও অনেকে দেখতে পায় না। আমি যে দেখব বলেই এসেছি। আর শ্যামাকে দেখতে পাব না, তা কেমন করে হয়।

কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিলাম এক কথা একরকম ভাবে। জবাব পেলাম আর এক কথা, আর-এক রকম ভাবে। উপরন্তু পালটা অভিযোগ। এ অভিযোগ অভিযোগ না হয়ে যদি খেলা হয়, তবে শ্যামার কাছে হার মানা ছাড়া উপায় নেই। এই ব্যাপারে শ্যামাদের কাছে আমরা চিরকাল হার মানি।

আমাকে জবাব না দিতে দেখে শ্যামার চাপা হাসি ফেটে পড়তে চাইল। খানিকটা ঝুঁকে আবার জিজ্ঞেস করল, এবার বল, 'তুমি কী দেখছিলে?'

শুধু শ্যামাকে দেখছি, সে তো মিছে কথা। তবু বললাম, 'তোমাকেই। তোমার আলতা-রাঙানো পা, তোমার ময়ূর ছাপা শাড়ি...'

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল শ্যামা। এই সামান্ত কথায় অন্তমনস্কতার ভান করতে হচ্ছে উদ্দাম রহস্যময়ী শ্যামাকে? জনতার মাঝে কী দেখবার জন্ম মুখ ফেরাতে হল তাকে! আমাকে বেশী প্রশয় দিয়ে ফেলেছে এই অনুশোচনা, নাকি লজ্জা পেয়েছে?

কিন্তু অপ্রতিভ হতে চায় না শ্যামা। যেন আমার আগের কথা শুনতে পায় নি, এমনি ভাবে ফিরে বলল, 'গলাটা আমার এখনো ব্যথা করছে। গাড়ির ভিড়ে তুমি আর একটু চাপ দিলে আমাকে মরতে হত।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইছে শ্যামা নিজেই। কিন্তু রহস্যের আভাস যায় না তার মুখ থেকে তবু। আবার বলল 'ওই বাঙালী মুলা সাধুকে তুমি অমন করে ঘাড়ে নিয়েছিলে কেন? তোমার জান-পহচন নাকি?'

'না।'

'তবে?'

বললাম, 'তুমি আমার মত এই ক্ষীণ মানুষটার কনুই ধরে ঝুলে পড়েছিলে। কিন্তু তুমি তো আমার জান-পহচন নও।'

হাসির সঙ্গে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-লেখা খেলে গেল শ্যামার মুখে। তারপর হেসে উঠে বলল, 'আজীব আদমী।'

হাত উঠেছে পুলিসের। যানবাহনের মিছিল চলতে আরম্ভ করছে আবার। এক হ্যাঁচকায় শ্যামাদের টাঙ্গা এবার এগিয়ে গেল অনেকখানি। কানে শুনতে পেলাম না, দেখলাম, শ্যামা তার তিন সঙ্গিনীর সঙ্গে কী কথায় হাসিতে মেতে উঠল।

সামনে তাকিয়ে দেখি উত্তর-দক্ষিণের লম্বালম্বি রাস্তার পোস্টে লেখা রয়েছে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড। আমরা চলেছি পশ্চিম থেকে পুবে। কিছুটা অবশ্য কোণাকোণি। জনসমুদ্রের কলরোলের সঙ্গে মাইক-যন্ত্রের সেই চির-পরিচিত কান-পচা গান ভেসে আসছে।

মাথা তুলে দেখি বিস্তৃত মাঠের উপর তাঁবুর সারি। ভাবলাম, এই কি মেলা। বীচিবিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মত তাঁবু আর চালাঘরের দিগন্তহীন সমুদ্র একদিকে। কিন্তু কী বিপদ! ঝাড়ুদারনীরা এখানে ধুলো নিয়ে যেন হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। বাঁ-দিকে বিশাল প্রান্তর। একগাছা ঘাস নেই, একচ্ছত্র ধুলোর রাজ্য। জানি নে, কি সুখে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝাড়ুদারনীরা, আর কি ভেবে তাদের হুকুম দিয়েছেন শহরের স্বাস্থ্যরক্ষী কর্তা।

এদেশে কি একফোঁটা জল নেই!

বেলা যায়। কিন্তু অন্ধকার হয় নি। অথচ সামনে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভারী কুয়াশার মত ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সম্মুখ দিগন্ত। মানুষ তো দূরের কথা, ঘোড়াগুলি ঘড়ঘড় করে নাক ঝাড়তে আরম্ভ করেছে। অনেকে চলেছে গাধার পিঠে করে। সে বেচারীরাও ভেঁপু ফুঁকতে আরম্ভ করেছে।

আর কী নিদারুণ ব্যাপার! গাড়ি-ঘোড়াগুলি সব ঢালু পথ বেয়ে হু হু করে নেমে চলল সেই ধুলো-মাঠের দিকে। জিজ্ঞেস করলাম রিক্সাওয়ালাকে, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

বলল, 'বাবু, এখানে সব গাড়ি দাঁড় করাতে হবে। গাড়ির টিকিট নিতে হবে। ছ-আনা পয়সা দিন।'

'এ আট আনার পথটুকু দু'টাকায় রফা করেও আবার ছ-আনা কিসের?'

রিক্সাওয়ালা তার ঘর্মাক্ত ধুলোমাখা মুখে একগাল হেসে বলল, 'কাহুন বাবুসাহেব। বাঁধ পর্যন্ত যেতে হলে টিকিট কাটাতে হবে। নইলে রিক্সা নিয়ে যেতে দেবে না।'

বলে সে এদিক-ওদিক একবার দেখে, সোজা একটা টাঙ্গার কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল আমার রিক্সা। আবার সেই হাসি। ধুলোয় অন্ধকার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি টাঙ্গাটা শ্যামাদের। রিক্সাওয়ালার নজরটা পরিষ্কার। কিন্তু এর জন্য বকশিস দেওয়ার মত মনে কোন প্লাবন আসে নি।

ছ-আনা পয়সা দিয়ে বললাম, 'জলদি আসবে।'

তাতাতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে মুখে চাপা দিলাম। বীজাণুর ভয়ে নয়! কেন না, এখানে খারাপ বীজাণু থাকলে, দেবতারও সাধ্য নেই দেহে প্রবেশ করা তিনি রোধ করবেন। কিন্তু দম যে বন্ধ হয়ে আসছে।

কানের কাছেই একটি শব্দ শুনতে পেলাম, 'আহা বেচারী!'

মুখ ফিরিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখি শ্যামার মুখ, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি সঙ্গিনীদের মধ্যে আর একজন তাকিয়ে আছে। ধুলো তাদের চোখ বন্ধ করতে পারে নি। সেই সঙ্গিনীর পিছনের দিকে চোখ পড়তেই চমকে গেলাম। সর্বনাশ! বুড়ো আমার দিকে একটা ক্ষিপ্ত বাঘের মত এক নজরে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম, লোকটির দোষ নেই। অভিভাবক হয়ে আর কতক্ষণ এ আলাপন সে সহ্য করবে!

শ্যামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই মানুষটি কি তোমার বাবা?'

'বাবা! হট্! বাবা কেন হবে?'

কথা কটি অত্যন্ত দ্রুত ছিটকে বেরিয়ে এল শ্যামার গলা থেকে। ঠাওর পেলাম না, মনে হল হেসেই মুখটা সরিয়ে সে অন্যদিকে তাকাল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে?'

জবাব না পেয়ে মুখ তুলে দেখি শ্যামা দূরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এমন গাম্ভীর্য ও অন্যমনস্কতা তার! আশ্চর্য! একি ধুলোর ধাঁধা দেখছি, না সত্যি একটা ছায়া ঘনিয়ে এসেছে শ্যামার মুখে! আর কিছু না জিজ্ঞেস করাই উচিত ছিল। কি-ই বা পরিচয়। তবু কৌতূহল চাপতে পারলাম না। বললাম, 'বলো না।'

অন্ধকারে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তীক্ষ্ণ হাসি চমকে উঠল শ্যামার মুখে। বলল, 'আমার স্বামী।'

স্বামী! ওই অশীতিপর বৃদ্ধ! এও শ্যামার রহস্য নয় তো! কিন্তু ফিরে আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করবার সাধ্য ছিল না আমার।

প্রৌঢ়াকে দেখিয়ে বললাম, 'উনি?'

তেমনি হেসে শ্যামা বলল, 'আমার সতীন।'

'আর এরা দুজন?'

'একজন আমার সতীনের বোন, আর একজন নোকরানী।'

আমার ঠোঁটের ডগায় হু হু করে একরাশ প্রশ্ন ছুটে এল। কিন্তু একরাশ এলেই তো হয় না। রাশ টানতে হয়! জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কী জাত?'

শ্যামা বলল, 'ভুঁইয়ার।'

ভুঁইহার। জানা ছিল আমার। ভুঁইহারেরা ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মতই বর্ণহিন্দু। শুনেছি, তাদের কৌলীন্যপ্রথা বড় প্রবল। মনের মত পাত্র না জুটলে মেয়েকে অনেক সময় আজীবন কুমারী থেকে বাপের ঘরে কাটাতে হয়। বাঙালীর ছেলের কাছে এ জিনিস নতুন নয়। কৌলীন্যপ্রথার কাছে অনেক বাঙালী কুমারী নিজেকে আহুতি দিয়েছেন। ভুঁইহাদের কথা যখন শুনেছিলাম, তখন বাঙলার কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে তুলনা করতে পারি নি। আজ চোখের সামনেই দেখছি সেই বাস্তব চিত্র।

কিন্তু শ্যামার এমন কি বয়স হয়েছে যে কুমারীত্ব ঘোচাবার জন্য এই লোলচর্ম বৃদ্ধের অঙ্কশায়িনী হয়েছে সে! ভুল ভাবলাম। অঙ্কশায়িনী হয় নি, করা হয়েছে। শুনেছি, এদের অর্থের অভাব নেই। অধিকাংশ ভুঁইহার পরিবারই ধনী। সান্ত্বনা বোধ করি সেইটুকুই।

কিন্তু তাকাতে ভরসা পেলাম না আর শ্যামার দিকে। একবেলার পরিচয়। পুণ্যার্থী নয়, বোধহয় সামান্য একজন মুসাফির ছাড়া তার কাছে আমার আর-কোন পরিচয় নেই। আমরা কেউ কারুর জীবন-ধারণের রীতি জানি নে। পথ চলার সামান্য হৃদ্যতা। এই চলতে থাকলে বন্ধুত্ব জন্মায়। বোধ-করি, তারই ক্ষীণ সূত্রপাতও হয়েছে। তা ছাড়া শ্যামার মত মেয়ের অপরিচয়ের বাধা ভেঙে ফেলতে বেশী সময় লাগে না।

তবু তাকাতে পারলাম না। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত যে হাসি তার মুখে দেখেছি, সে হাসি যে সমস্ত পুরুষ জাতির হৃদয় পুড়িয়ে দিতে পারে। আকাশের বিদ্যুৎ যখন বজ্র হয়ে নেমে আসে, তখন রূপবতী সৌদামিনী আগুন হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে।

চাপা ও তীব্র কণ্ঠে শ্যামা বলে উঠল, 'কই, আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না?' বলে হেসে উঠল খিলখিল করে।

কিন্তু আর ও-হাসিতে ভোলার কিছু নেই। যে বলিষ্ঠ ঘোড়ার দুরন্ত দৌড়ের কান-ফাটানো টকাটক শব্দ শুনে ভেবেছিলাম প্রসন্নময়ের মুক্ত দূত ছুটে আসছে, এখন দেখি সে সার্কাসের ঘোড়া। সে আছে তারের বেড়ার ঘেরাওয়ের মধ্যে। গতি নির্ধারিত তার চাবুকের নির্দেশে।

তার হাসি শুনে প্রৌঢ়া আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে শ্যামা?'

মুহূর্তে মুখভঙ্গি বদলে শ্যামার ঠোঁট বেঁকে উঠল। আমার প্রতি বিদ্বেষের বাঁকা কটাক্ষ করে বলে উঠল, 'দেখ না, খুঁটিয়ে আমাকে কত কথা জিজ্ঞেস করছে। ও কে, সে কে, কী জাত? কেন রে বাবা?'

'তাই নাকি?'

তারা সকলে হেসে উঠল। যেন আমাকে অপমান করবার জন্যই শ্যামা একটি নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ের মত হঠাৎ ন্যাকা হয়ে উঠল। যেন প্রতিশোধ নিতে চাইল আমার কোন কৃত অপরাধের।

আমার অপ্রতিভ হবার কথা। কিন্তু শ্যামার এই চকিত রঙ বদলানোর বহুরূপিনী রূপ আমাকে একটুও বাজে নি। তাঁদের সশব্দ হাসির সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম নীরবে।

শ্যামার বিদ্বেষ তো আমার প্রতি নয়। বিতৃষ্ণা তার ও সংসারের প্রতি। অসতর্ক মুহূর্তে নিজেকে সামান্যতম প্রকাশ করে ফেলতেও মর্যাদাহানি ঘটেছে তার। সেই অপমানের জ্বলুনিটুকু সে রেখে গেল।

আরও কিছু বলবার সাধ ছিল হয়তো শ্যামার। কিন্তু তাদের টাঙা দুলে

উঠল। টিকেট কেটে এনেছে টাঙ্গাওয়ালা।

মনে মনে প্রার্থনা করলাম, বলুক, বলে যাক শ্যামা যা তার প্রাণ চায়। এই জনারণ্য হয়ে উঠুক তার কাছে দুর্গম বন-জঙ্গল, আমি রইলাম সেই বনের বিষভোবা হয়ে। সেখানে তার সঞ্চিত বিষ ফেলে দিয়ে সে চলে যাক অমৃতকুম্ভে ডুব দিতে। পুণ্যসঞ্চয়ে ভাসুক প্রাণ-সঞ্চারের সঙ্গম।

কিন্তু তা হয় না। তাদের টাঙ্গার চাকা দুটো একটা তীব্র আর্তনাদ করে এগিয়ে চলে গেল। ধুলোরাশির উপর ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে গেল আরও খানিকটা।

কিছুক্ষণের জন্য জনারণ্যের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল আমার কানে। উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম শ্যামার দিকে। এবার সেই মিলিত হাসির ঝঙ্কার শুনব বলে।

শ্যামা এদিকে তাকিয়েছিল। গাড়ি চলতে চলতেই ঠোঁটের কোণের বিদ্বেষটুকু অদৃশ্য হয়েছে। বিদ্বেষ নেই, আনন্দ নেই, হাসিও নেই। মুখ তার হঠাৎ ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি চলে গিয়েছে শূন্যে। চোখে তার তীব্রতা নেই, জ্যোতি নেই। সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার পেছনেই চকিতের জন্য জ্বলতে দেখলাম, বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের ভ্রূ ঢাকা একজোড়া চোখ। তারপর ধুলো-আস্তরণের ভাঁজে ভাঁজে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই টাঙ্গা।

আর হাসি শোনা গেল না। ধূলি-ধূসরিত এই যানবাহন ও জনতাপূর্ণ প্রান্তর যেন পাতালের বদ্ধ জলের আবর্তের মত নিঃশব্দে পাক খেয়ে ছটফট করে উঠল।

উঃ, কী ধুলো! ধুলোয় অন্ধ হয়ে গিয়েছে আমার চোখ। মুখ বিস্বাদে ভরে গিয়েছে, কিচকিচ করছে ধুলোয়।

জীবনযুদ্ধে প্রাণ তিক্ত হলাহলে পূর্ণ। পথে বেরিয়েছি নিতান্ত একান্তে নিজের হৃদয়-একতারায় সুর তুলে। সেখানেও একটানা আনন্দ থাকবে কে বলেছে? সুরে যদি বেসুর না বাজে, তবে আর বাজিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন ছিল। কিছুক্ষণ পরেই এল রিক্সাওয়ালা। ধুলোমাঠ থেকে ছুটে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল রিক্সা। বাঁধের পথের দুদিকে বিপণি সাজিয়ে বসেছে ব্যবসাদারেরা। একটি একটি আলো জ্বলে উঠেছে এখানে সেখানে। কোলাহল ক্রমে আরও বাড়ছে।

চোখ ভরে দেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এতক্ষণে ক্লান্তি এসে গ্রাস করছে। বুজে আসছে চোখ। বুঝেছি গন্তব্য আগতপ্রায়। তবু মন বলছে আর কতদূর।

রিক্সা থামল। বললে, 'বাবু, এই যে বাঁধ।'

তাকিয়ে দেখি সামনেই পথ বন্ধ। বাঁধের উঁচুজমি আড়াআড়ি চলে গিয়েছে উত্তর-দক্ষিণের কোণাকোণি। যেতে হবে বাঁধের ওপরে।

রিক্সাওয়ালাকে পয়সা দিয়ে বাঁধে উঠে এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম। অদূরেই গঙ্গা। উত্তর থেকে দক্ষিণে তীব্র স্রোত ছুটে চলেছে। বারো মাসের অন্ধকার গঙ্গার তীর আজ বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছে। তারই আলোর ঝলক গঙ্গার পূর্বতীরের বাঁকা স্রোতে শাণিত বঙ্কিম অস্ত্রের মত ঝিকমিকিয়ে উঠেছে।

ওপারের আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তাঁবু-সমুদ্রের ঢেউ। সন্ধ্যার গাঢ় ধূসরতায় ঢেকে গিয়েছে পেছনের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। আর পূর্বে মাথা উচিয়ে উঠেছে উঁচু ভূমির বুকে গাছপালা-ঘেরা গ্রাম। হয়তো ওখানেই আছে কোথাও সমুদ্র গুপ্তের উঁচু টিলার বুকে কাটানো কূপ।

আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না এখন। দক্ষিণে দেখতে পাচ্ছি ঘষা রুপোর পাতের মত একটা চলন্ত জলের ধারা।

এই প্রয়াগ (প্র=প্রকৃষ্ট, যাগ=যজ্ঞ)। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট স্থান হল প্রয়াগ। পুরাণ শাস্ত্রের প্রজাপতি-ব্রহ্মার যজ্ঞবেদী, যজ্ঞের মধ্যবেদী এই প্রয়াগ। প্রজাপতের্যজ্ঞ আসীৎ প্রয়াগে। ভারতের আদিম যুগের ধর্মীয় ইতিহাসের লীলাক্ষেত্র। পৃথিবীর প্রথম যজ্ঞের ধূম সঞ্চারিত হয়েছে এখানকার মাথার উপরের আকাশে। প্রয়াগ সেই পুণ্যভূমি।

> সিতাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে
> তত্রাহপ্লুতাসো দিবমুৎপতন্তি।
> যে বৈ তন্বং বিসৃজন্তি ধীরাঃ
> তে বৈ জনাসোঽমৃতত্বং ভজন্তে॥

কিন্তু তা তো হল। ঘরবাসী মানুষ, পথে বেরিয়েছি। মাথা গুঁজব কোথায়! ঠাঁই নিশানা করে বেরুই নি, খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু এই মুক্ত আকাশের বুকে উতরঙ্গ তাঁবু-সমুদ্রের কোথায় ঠাঁই পাব, সে কথা তো একবারও ভাবি নি। মন বাউল হোক, হৃদয় হোক বৈরাগী, তবু ইতিমধ্যেই শীতে যে রকম কুঁকড়ে উঠছি, আচ্ছাদন না পেলে তো নিছক বাউলের মতই মরতে হবে।

সব ছাড়তে পারি, কিন্তু প্রাণ ছাড়তে পারি নে। তাড়াতাড়ি ঠাঁই খোঁজার জন্য নেমে গেলাম বাঁধের নীচে।

বাঁধের নীচে নেমে দেখলাম, জমকালো ব্যবস্থা। সে জমকালো ব্যবস্থা দেখবার মত চোখ বা মন কোনটাই এখন নেই। কালকে এ সময়ে প্রায় ঘর ছাড়ার উদ্যোগ করেছিলাম, আজ এখনো মাথা গুঁজতে পারি নি কোথাও। চোখ আর মনের দোষ দিতে পারি নে।

সামনে লোক, পেছনে লোক, লোক ডাইনে বাঁয়ে। এখানে কারুর গতি একমুখী নয়। বহুমুখে চলেছে জনতার মিছিল। সকলেই চলেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। আমি ঝোলাঝুলি নিয়ে একবার এদিকে ধাক্কা খেয়ে ওদিকে যাই, ওদিক থেকে এদিকে। বেশীর ভাগই চলেছে গঙ্গার ওপারে।

ওপারে যাওয়ার জন্য রয়েছে অস্থায়ী সেতু। ভাসন্ত সেতু। আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের জন্যই এই সব সেতুর প্রয়োজন। পাশেই রয়েছে সামরিক বাহিনী এবং পি ডব্লিউ ডি-র ক্যাম্প। উর্দি-পরা সৈনিকেরা দেখলাম পুলের উপর যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। সারি সারি আলোক মালা জলে উঠেছে পুলের উপর। তীব্র স্রোতে তার প্রতিবিম্ব হারিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কাছাকাছি মনে হল, দুটো মাত্র পুল রয়েছে।

কিন্তু ওপারে গিয়েই বা কী করব। যাব কোথায়। দেখতে পাচ্ছি, ওপারের হালকা কুয়াশার আড়ালে জলছে অজস্র আলো, অজস্র ধূসর বর্ণের তাঁবু। মানুষ আসছে শত শত, যাচ্ছে হাজার হাজার। এপারে ওপারে মাইক-নিনাদিত স্তোত্র, ভজন কীর্তন ও পুণ্যার্থীর কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত। কিন্তু আমি যাই কোথায়।

মন পাগল হয়েছিল, কিন্তু এখন পাগল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় কি করে। সামনেই একটা বটতলায় দেখলাম, থরে থরে খাবার সাজানো রয়েছে। সর্বনাশ! সারা দিনটাতে যে চা-সিক্ত প্রাণ বাউল হয়েছিল সে প্রাণ খাবার দেখেই মুহূর্তে ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল! সেই তেলসিঁদুর আর ভবীর ব্যাপার। পোড়া পেট যে বাউল হয় না, বৈরাগ্যও মানে না। খাবার দেখা মাত্র চকিতে ক্ষুধার্ত চোখ পড়ে ফেলল, 'খাঁটি ঘিউকে পুরী, দুধকে মালাই, লাড্ডু, প্যাড়া, সন্দেশ…।' থাক থাক, আর পড়ে লাভ নেই। ইতিমধ্যেই চোখের ভিতর দিয়ে সে মরমে পশেছে। এবার মরমের রস জিভ দিয়ে গড়াবার যোগাড় হয়েছে। তবে এই প্রয়াগ কা লাড্ডু এখন দিল্লী কা লাড্ডুর সমান। খেলে ভেদবমি হবার আশঙ্কা খুবই, না খেলেও জিভের জল তো কারুর হাতধরা নয়।

এদিকে 'ইদ্‌ধে যাও,' উধার হটো,' নানান প্রাদেশিক বুলি ও ধাক্কা খেতে খেতে সরে এসেছি অনেকখানি। সামনেই দেখলাম, একটা তাঁবুর গায়ে

সাইনবোর্ড ঝুলছে, এনকোয়ারি। দেখি, এনকোয়ারিতে এনকোয়ারি করে কিছু মেলে কি না।

আগে থাকতে শুনিনি কিছুই। ভেবেছিলাম ভারতবর্ষের ধর্মীয় পীঠস্থান প্রয়াগ। পাণ্ডাদের জ্বালায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারব না। আপনিই আশ্রয় যোগাড় হয়ে যাবে। কথায় বলে, ধরলে যম ছাড়তে পারে, পাণ্ডা ছাড়ে না। কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা না ছিল এমন নয়।

বছর কয়েক আগে একবার পুরী যেতে হয়েছিল। অসময়ে মানে, মরসুমের বাইরে। শুনেছি কোন কোন সময়ে, বনগাঁয়ের ইয়ে রাজা থেকে শুরু করে ভুতো-গদা-পুঁটীরা,-স্বপ্না-শিপ্রা-শুভ্রা বাহিনী, আওয়ারা গ্যাং, কলমদ্বেষী কেরানী, বাগ্মী অধ্যাপক ও যাদুকরী, কলমবাজ সাহিত্যিক বিদগ্ধজনেরা সকলেই পুরীর সমুদ্রসৈকতে মরসুমী ফুল হয়ে ফুটে থাকেন কিছুদিনের জন্য। মরসুমী ফুল হওয়ার সুযোগ পাইনি। মেঘভারাতুর আকাশ আর নিয়ত-ক্ষিপ্ত ভয়ঙ্করমূর্তি সমুদ্রের দারুণ ঝাপটায় আমার মত অনামী ফুলের সব পাপড়িগুলি ঝরে গিয়েছিল।

যাক সে কথা। পুরী স্টেশনে দেখেছিলাম, যাত্রীর দ্বিগুণ পাণ্ডাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের উপর। যেন একরাশ মানুষের উপর ক্ষুধার্ত সিংহ-বাহিনী। কে কাকে সাপটে নেবে সেই চিন্তা। আমি একলা মানুষ, কোন রকমে যদিও বা পাণ্ডাব্যূহ ভেদ করে রিক্সায় উঠেছিলাম, খানিকটা এগুতেই দেখি এক আধবুড়ো চলন্ত রিক্সাতে উঠেই আমার পাশে বসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?' সে একগাল হেসে তার নাম-ধাম পরিচয় দিলে। বুঝলাম, সে একটি পাণ্ডা। আরও বুঝতে হয়েছিল, বাঙলাদেশের অনেক নামী ও মানী পরিবারের পাণ্ডা। অতএব তার নিজস্ব মন্দিরেই আমার প্রথম প্রবেশ। কিন্তু কোনরকমে যদিও বা তার এঁটো-কাঁটা-ছড়ানো ভয়াবহ পিছল পাতকুয়ো-তলা থেকে ফিরে এসেছিলাম, খেতে বসে কান্না পেয়েছিল।

হলুদ-গোলা ফ্যান হল ডাল, আর কচুর তরকারী দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে আলুর তরকারী। কাছে বসে আত্মীয়তা করছিল পাণ্ডা আর হাতির মত ফোলা দুটি পা নিয়ে তার বউ। খেতে দিচ্ছিল একটি কলা বউ। ঘোমটার নীচে দেখা যাচ্ছিল তার দোলানো নোলক আর ছুঁচলো স্থূল ঠোঁট।

সে রকম হলে, পরিবেশ একটি বাঙালী গৃহস্থের দ্বিপ্রাহরিক রান্নাঘরের সুখে দুঃখে ভরে উঠতে পারত। কিন্তু এখানে স্নেহ ও অনুরাগ-ভরা উপরোধ ও এক হাতা ঘণ্টো ধপাস করে পাশে ফেলে দেওয়ার ব্যাপার নয়। কচু দিয়ে

আলুর দাম নেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র।

শুনলাম দেড় টাকা এর দাম। দুবেলায় তিন টাকা হয় বটে, আট আনা প্রেস দেওয়া হবে। এ ছাড়া জগন্নাথের মন্দির দর্শন করবার দর্শনী তো আছেই।

মাথায় থাকুন জগন্নাথ ঠাকুর। জানি না কচুকে আলু করতে পারেন কি না তিনি। মাথায় দিই তাঁর লীলাভূমির ধুলো নিয়ে। দেড়খানি রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে গলায় জলুনি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম সমুদ্রতীরে। কপাল ভাল, আকাশে ছিল মেঘলা ভাঙা রোদ। দিগন্তহীন শান্ত সমুদ্র প্রাণভোলানো হাসির লহর তুলে সম্বোধন ও সংবর্ধনা জানিয়েছিল আমাকে। সেই ছিল আমার সান্ত্বনা, আমার কচুজলুনি গলায় অমৃতের প্রলেপ, আমার জগন্নাথ দর্শন।

যাক। একেবারে গল্প ফেঁদে বসেছি। প্রয়াগ থেকে ছুটে গেছি সমুদ্রে। গল্প বলার নেশা ছাড়তে পারি নে। কথা হচ্ছিল পাণ্ডা নিয়ে। কিন্তু এখানে পাণ্ডার প্রাদুর্ভাব অন্তত আমার চোখে পড়ল না। পড়লে সদ্‌গতি হোক আর দুর্গতি হোক, গতি একটা হত।

'এনকোয়ারি' ক্যাম্পে ঢুকে দেখলাম, একজন পুলিশ অফিসার বসে কী লিখছেন আর সেপাই একজন রয়েছে দাঁড়িয়ে। বললাম, 'দেখুন মশাই, আপনাকে একটা কথা—'

অফিসারটি লেখনী বন্ধ করে চকিতে একবার আমার আপাদমস্তক দেখেই আবার নিজের কাজে মন দিয়ে বললেন, 'আপ ফোটো খিচনে মাংতা হ্যায় না? আই অ্যাম সরি, মেলা-কা ফোটো খিচনা বিলকুল মানা হ্যায়।'

মেলা-কা ফোটো! সামনে আয়না নেই, তবু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার। ধূলি-ধূসরিত জামা-কাপড়ের আসল রঙ চেনা দায়। তাহলে মাথা-মুখের অবস্থা কী হয়েছে, সেটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। কাঁধে ওভার-কোট, দুহাতে ঝোলা। গলায় ক্যামেরাও ঝোলানো নেই, পোশাকটাও যা হোক আর ট্রাভেলারের মত রম্য নয়। ফোটোর কথা কেন এল ভেবে বিস্মিত হলাম। বুঝে নিলাম, মেলার ফোটো তোলা নিষিদ্ধ হয়েছে। বললাম, 'ফোটোর কথা বলছি না, এখানে কোথায় আশ্রয় পেতে পারি, বলতে পারেন?'

এবার অফিসারটি বিস্মিত হয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'কেন, আপনি যেখানে খুশি আশ্রয় নিতে পারেন। কোন আশ্রমে কিংবা পাণ্ডাদের ক্যাম্পে। নয় তো আপনি নিজেই বেড়ার ছাউনি দিয়ে আশ্রয় তৈরী করে নিতে পারেন। কোথেকে এসেছেন?'

বললাম, 'কলকাতা।'

অফিসারটি এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'আপনি রামকৃষ্ণ আশ্রম কিংবা ভারত সেবাশ্রমের ক্যাম্পে খোঁজ করলে আপনার সুবিধা হতে পারে।'

কেন সুবিধে হতে পারে, সেটা উহ্য রেখেই তিনি আবার কাজে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু আবার আমাকে জিজ্ঞেস করতে হল, 'আচ্ছা বলতে পারেন, সেবাশ্রম সংঘটা কোথায়? কিংবা রামকৃষ্ণ আশ্রম?'

মুখ না তুলেই তিনি বললেন, 'একটা বাঁধের ওপারে, আর-একটা গঙ্গার ওপারে।'

বলে তিনি অত্যন্ত দ্রুত গলায় সেপাইটিকে কি নির্দেশ দিতে লাগলেন। বুঝলাম, আমার এনকোয়ারির পালা শেষ। এবার আমাকে বাঁধের ওপার অথবা গঙ্গার ওপার বেছে নিতে হবে। যে কোন ওপার ছাড়া গতি নেই।

কতদূর চলে মনে মনে হাঁপিয়ে মরছিলাম। ভেবেছিলাম, এসে পড়েছি। কিন্তু সে যে কতদূর এখনো, কে জানে।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই, মনে হল শিস দিয়ে উঠল একটা চাবুক আর সর্বাঙ্গে কেটে বসল তার আঘাত। একবার শিউরে উঠে সামলাতে না সামলাতে আর-একটা ঝাপটা। সর্বনাশ! শীতের প্রকোপ যে এত ভীষণ তা জানতাম না। তাড়াতাড়ি ঝোলা নামিয়ে ওভারকোট চাপালাম গায়ে।

সন্ধ্যার পরমুহূর্তের এই সময়টা অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। ধুলো আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চারদিক। আলো থাকা সত্ত্বেও আপাদমস্তক-ঢাকা মানুষগুলি ছায়ামূর্তির রূপ ধরেছে। আধ-অন্ধকার মঞ্চের এক গোপন রহস্য দৃশ্য হয়ে উঠেছে সঙ্গমের উন্মুক্ত আকাশতলে। তারই মাঝে ছায়ামূর্তির খেলা।

এ-সবই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত মস্তিষ্কের আজগুবি স্বপ্ন কি-না বুঝতে পারছি না। কাছে এত ভিড় ঠেলাঠেলি, এত কল-কোলাহল। তবু মনে হচ্ছে সবই অনেক দূরে। যেন শীতের নিশীথে আমি দাঁড়িয়ে আছি এক গ্রামের সীমান্ত মাঠে। আমার কানে ভেসে আসছে সেই গ্রামের কোলাহল। অস্পষ্ট, অথচ কত স্পষ্ট! ঝাপসা, অথচ সবই দৃশ্যমান!

হঠাৎ আমার মন বেঁকে বসল। থাক, যাব না কোন আশ্রয়ের সন্ধানে। একবারও নিজের মন খোঁজার চেষ্টা করলাম না। একটু ছলও খুঁজলাম না। কেবল মনে হল, এইটুকু দেখবার জন্যই তো এসেছিলাম। এইটুকু আরও প্রাণভরে দেখব। কী করে মনে এ ভাবের উদয় হয় জানি নে। এ কিসের হতাশা, কিসের গ্লানি বুঝি নে। এ কি নিজের মন থেকেই কোন অভিমানের

সৃষ্টি, না কি নিজেকে পীড়ন করার এক ভয়াবহ বিলাস-বাসনা সুপ্ত রয়েছে আমার মনের মাঝে, তাও আন্দাজ করতে পারি নে। দূরে ফেলে এসেছি জীবনধারণের সংগ্রাম। সেখানে প্রতি মুহূর্তে বাঁচার অভিযান। এখানে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার তেমন কোন নির্দয় ইচ্ছা নেই, তবুও ভাবলাম, পড়ে থাকব এই বালুপ্রান্তরে। কেন আবার নিজের ভাবনায় অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করব এখানেও! রাত কেটে যাবে, সম্ভবত কেটে যাবে এখানে থাকার অঙ্ক-কষা দিনগুলিও। যে মনকে ফাঁকা ভেবে এসেছি ছুটে, তাকে ভরে নিয়ে যাব চলে। তবু আর টেনে নিয়ে যেতে পারি নে। দেহের চেয়ে মন ভারী। এর বাড়া ভারী সংসারে আর কী আছে।

আমি নয়, হঠাৎ চমকে উঠল আমার কানের পর্দা। কী শুনলাম! কার গলা শুনলাম! চকিতে শিথিল দেহ ঝাড়াপাড়া দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ভিড়ের দিকে ধুলোভরা দুচোখ তুলে ধরলেম আকুল আগ্রহে।

দেখতে পেলাম না, কিন্তু আবার শুনতে পেলাম ফাটা বাঁশের চেরা গলা, 'আর জ্বালাস নি আমাকে পেল্লাদ। এবার আমি গঙ্গায় ডুবে প্রাণটা দেব।'

জবাবে পেল্লাদের ক্রুদ্ধ হেঁড়ে গলা শোনা গেল, 'যা খুশি তাই করগে যা। আমি আমার পরিবারকে নিয়ে কাল চলে না যাই তো—'

'খবরদার পেল্লাদ, দেবতার থানে দিব্যি কাটিস নে।'

'কাটব। হাজারবার দিব্যি কাটব। দেখি আমাকে কে কী করতে পারে।'

'কাট, কাট তাহলে। দ্যাখ আমিও গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে পারি কি-না!'

কিন্তু পেল্লাদের সেই কথা, 'কাটবই তো। তুই দে ঝাঁপ। শালা জন্মে অবধি গায়ে কোনদিন ছুঁচ ফুটাই নি। আর তোর কিপটেগিরির জ্বালায় আমাকে তো নিতেই হল, আমার পরিবারকেও কিনা ছুঁচ ফোটালে। এখন যদি একটা কিছু হয়?'

'আর আমার এই বুড়ি হাড়ে বুঝি ছেড়ে দিয়েছে রে ড্যাকরা?'

এবার কার মোটা গলা শোনা গেল, 'আঃ তোমরা এবার থামো দিকিনি বাপু।'

উঃ, সেই নাটক। এখনো তার শেষ হয় নি। এর দেখছি বিরাম নেই, অন্ত নেই, বোধহয় যবনিকাও পড়বে না। শুধু বহির্দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে মাত্র।

কিন্তু আমার মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। আহা, ফাটা বাঁশের চেরা গলা

ও প্রহ্লাদের হেঁড়ে গলা যে এমন মিষ্টি, তা কে জানত। এ যে ডুবন্ত মানুষের খড়-কুটার আশ্রয়। কেন পড়ে থাকবে এই বালুপ্রান্তরে। কিসের গ্লানি, কিসের হতাশা।

ওই তো! ওই তো দেখতে পাচ্ছি প্রহ্লাদ ভিড় ঠেলে চলেছে। তার আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো শাল খুলে পড়েছে। এক হাতে ধরেছে দিদিমাকে, আর-এক হাতে বউকে। বউ তো নয়, প্রহ্লাদের ভাষায় পরিবার। বাবা, হারিয়ে যাবার ভয়ে এত হাত ধরার কথাকথি, তার মধ্যেই গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ও দিব্যি কাটার ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা চলছে। তাহলে তাদের তিনজনকেই ইনজেকশন নিতে হয়েছে। যাক বাঁচা গেল। রুগীকে কোন কোন সময় ওই ভাবেই জোর করে ঔষধ দিতে হয়।

ভিড় ঠেলে তাদের কাছে গেলাম। প্রথমেই নজর পড়ল দিদিমার। আর যায় কোথায়? অমনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'থাক, আর দাঁত বের করে হাসতে হবে না।'

সত্যি। তাড়াতাড়ি দাঁত ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কী করব। তাদের আগ বেড়ে ইনজেকশন নিয়েছি, অপরাধ তো আমারই।

প্রহ্লাদ বলল, 'অ্যাই যে মশাই, ব্যাটারা ছাড়লে না কিছুতেই। কুট করে দিলে ঢুকিয়ে।' বলেই গলার স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'উঃ, কী ব্যথা! নির্ঘাত আমার জ্বর এসেছে।'

অমনি দিদিমা বলে উঠলেন, 'সেই অলক্ষুনে কথা। কক্ষনো তোর জ্বর আসে নি।'

'আমি বলছি এসেছে। আমার যদি কিছু হয়।'

'হঠাৎ একটা গোঙানি শুনে তাকিয়ে দেখি বুড়ি দিদিমা উদ্গত চোখের জল চেপে বিড়বিড় করে বলছে, 'ভগবান, ওর কথা যেন মিথ্যে হয়। আমি এত দূর থেকে ছুটে এসেছি, আর আমার পেল্লাদের জ্বর করে দেবে?'

কী জানি প্রহ্লাদ টের পেয়েছে কি-না। সে কিন্তু গলার স্বর একটু নামিয়েছে। জ্বর আসে নি, প্রহ্লাদের ওটা মন-জ্বর। একবার যখন পেয়ে বসেছে, ও সারতে দেরি হবে। সে আমাকে উদ্দেশ করে বকবক করেই চলল, 'মোশাই, এমন কিপটে বুড়ী, রোজ দুআনা পয়সা দিতে আমার কালঘাম বার করে ছাড়ে। রোজ নয়, মাসে নয়, বছরেও নয়, একবারের জন্য ছটা টাকা। দিলে তো কাউকেই এ ভোগ পোয়াতে হত না।'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'রোজ দু আনাটা কিসের?'

হিক্কা তোলার মত সরু গলায় হি হি করে হেসে উঠল প্রহ্লাদ। পরমুহূর্তেই আবার বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'আর জিজ্ঞেস করবেন না মোশাই, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওঃ, দু দুটো দিন নিরম্বু উপোস যাচ্ছে! আগে জানলে কোন্ শালা আসত এখানে!'

কথাটা না বুঝে তার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকে একটু ঝুঁকে গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝলেন না? আপনি দেখছি নেহাত অবস্য। আরে মোশাই, বাবার পেসাদ, বুঝলেন, বাবার পেসাদ। যাকে বলে কলকে সেবা।'

'মানে গাঁজা?'

প্রহ্লাদ জিভ কেটে বলল, 'ছি, ও কথা বলতে নেই।'

পাশ থেকে দিদির গলা শুনতে পেলাম, 'মরণ! ওর মুণ্ডু বলতে নেই। নেশাখোর যম, তীর্থ করতে এসেও আমার হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছে। বলি ও পাঁচ-বত্তি, কোমর যে ভেঙে গেল বাবা, আর কদ্দূর?'

এতক্ষণে সামনের লোকটি মুখ ফেরালো। অর্থাৎ পাঁচ-বত্তি। পাঁচ-বত্তি কেন, অতবড় চেহারাটার নাম দশ-বত্তি হলেও ক্ষতি না। কিন্তু মুখটা দেখে শিউরে উঠলাম। মনে হল, নিষ্ঠুর লগুড়াঘাতে কেউ ফুলিয়ে দিয়েছে লোকটার মুখ। মাথাটা সামনে পেছনে নোড়ার মত লম্বা। কপালটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের দিকে, চোখের কোল দুটো ঢুকে গিয়েছে ভেতরে। থ্যাবড়া নাক, মোটা ঠোঁট। নাম পাঁচ-বত্তি। কেন, তা জানি নে। কিন্তু পরণে রয়েছে ফুলপ্যান্ট আর বুশ শার্ট। কোট চাদর কিছুই নেই। তবু এই শীতে সে একটুও কুঁজো হয়ে পড়ে নি। বলল, 'এই পুলটা পার হয়ে খানিকটা যেতে হবে।'

বলে একবার আমার দিকে ফিরল। চোখ না দেখলেও বুঝলাম, আমার দিকেই তাকিয়ে দেখল সে।

পুল পার হতে গিয়ে দেখি বাধা। সেপাই ছুটে এসে বলল, 'এ পুল দিয়ে ওপার থেকে আসা যায়। ওই দক্ষিণের পুল দিয়ে যেতে হবে।'

তাই গেলাম। ভিড় ঠেলাঠেলি করছে পুলের মুখে। যারা এসেছে রিক্সায়, টাঙ্গায়, তাদের নামিয়ে দিচ্ছে সেপাইরা। পুলের উপর দিয়ে মানুষ নিয়ে যেতে পারবে না কোন যানবাহন। হেঁটে যেতে হবে। তাই নিয়ে লেগেছে চীৎকার আর গণ্ডগোল।

ভাসন্ত পুল। মানুষের পায়ের চাপে চাপা আর্তনাদে ক্যাঁ কোঁ করে উঠছে। দুলে দুলে উঠছে। বাধা পেয়ে ফুলে ফুলে উঠছে পুলের নীচের জল। চাপা গর্জন তুলে ছুটে চলেছে নিয়তবাহী গঙ্গা।

এখানে শুধুই চলা, শুধুই যাওয়া। যাওয়া-আসা নেই। আমরা সমুদ্রোপকূলের বাঙালীরা গঙ্গায় যাওয়া-আসা দেখতে অভ্যস্ত। এ-বেলার জলে আমরা ও-বেলা পলিমাটি দেখতে পাই। কিন্তু এখানে নিরবধি সুদূরের ডাক। অজানা ও অচেনার পথে নিরন্তর রোমাঞ্চকর অভিযান। সে অভিযানের প্রত্যাবর্তন নেই।

গঙ্গা পার হয়ে এসে শীতের ডিগ্রী যেন আর-একটু চড়ল। পুলের নীচেই সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে কতকগুলি লোক। চেঁচাচ্ছে, 'ঘিউ কা-দীয়া। চার চার পয়সা। গঙ্গা মায়ীকী সেবা করো বাবু।'

দেখলাম অনেকগুলি জ্বলন্ত প্রদীপ গঙ্গাকিনারের নিস্তরঙ্গ জলে চলেছে ভেসে। ঘৃত-দীপ। জলের বুকে প্রতিবিম্ব পড়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে তার সংখ্যা।

এই দীপ গঙ্গা কীভাবে গ্রহণ করেছেন জানি না। চোখে দেখতে পাচ্ছি, ন্যাংটো, আধ-ন্যাংটো হা-ভাতে ছেলের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। দুহাতে সন্তর্পণে নিয়ে চলেছে হয়তো নিজেদের অন্ধকার ডেরায়। কেউ মেতে উঠেছে খেলায়। ঢেউ দিয়ে প্রদীপ সরিয়ে দিচ্ছে গঙ্গার দূর অকূলে।

মাতালের মত চলেছি। ঠাণ্ডা বালুর মধ্যে গোড়ালিসুদ্ধ পা ডুবে যাচ্ছে। গাঁয়ের বাড়িঘরের আগ-দুয়ার দিয়ে চলার মত চলেছি তাঁবুর এ-পাশে ও-পাশে। ধুনুচি জ্বালিয়ে এখানে সেখানে বালুর উপর বসে আছে সাধুর দল।

প্রহ্লাদ ডাকল, 'ডাক্তারমামা।'

জবাব দিল পাঁচ-বস্তি, 'বল।'

'আর কত দূর ?'

'এই এসে পড়েছি। ওই যে দক্ষিণপুবে দেখছিস অনেকগুলো আলো জ্বলছে, ওইটে আমাদের আশ্রম।'

প্রহ্লাদ খুশী হয়ে বলল, 'বাঃ, বেড়ে আশ্রমটি দেখছি। মাইকে গানও হচ্ছে নাকি ডাক্তারমামা ?' বুঝলাম, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত পাঁচ-বস্তির আর এক নাম ডাক্তারমামা। যেরকম গম্ভীর দেখছি, ডাক্তার বলেই মনে হয়।

বলল, 'হুঁ হুঁ, এ যার তার কাজ নয়। দেখেশুনে এমন জায়গা করেছি, বুঝলে খুড়ি, মনে হবে নিজের ঘরে রয়েছি।'

খুড়ি হল প্রহ্লাদের দিদিমা। বলল, 'গুণের শরীর তোমার বাবা। তুমি না থাকলে আর আমার এ-যাত্রা আসা হত না। তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল ?' আফসোসের মধ্যে বোধহয় প্রহ্লাদের প্রতি অভিযোগ প্রকাশ করল দিদিমা।

কিন্তু তাতে প্রহ্লাদের কিছু যায় আসে বলে মনে হল না।

বুড়ি হাঁপাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। হাঁপাচ্ছে বোধহয় প্রহ্লাদের পরিবারও। প্রহ্লাদের পরিবার কিন্তু জোর তেরো-চোদ্দর একটি বালিকা মাত্র। একে ক্লান্তি তায় শীত। বেচারীর ঘোমটা খুলে গিয়েছে। প্রহ্লাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চলেছে অন্ধের মত টলতে টলতে।

পাঁচ-বস্তি না ফিরেই জিজ্ঞেস করল, 'খুড়ি, ওই ছোঁড়াটা কে?'

ছোঁড়া? আশে পাশে তাকিয়ে দেখলাম। কই, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি জানি, আমি তো জানিনে বাবা।'

আমাকেই বলছে নাকি? সর্বনাশ, প্রথমেই একেবারে ছোঁড়া! তা হলে যা আশ্রয় পাব, বুঝতেই পারছি।

পাঁচ-বস্তি আমার দিকে ফিরে নীরস গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাওয়া হবে?'

বললাম, 'কোথাও একটু আশ্রয়ের দরকার।'

ঠেলে-ওঠা কপালটা এগিয়ে নিয়ে এসে প্রায় ধমকে উঠল, 'তা আমাদের সঙ্গে কেন?'

অভ্যর্থনার বহর দেখে প্রায় থেমেই পড়লাম। বললাম, 'থাকতে হবে তো। অন্তত আজকের রাতটার মত—'

পাঁচ-বস্তি তেমনি গলায় বলে উঠল, 'যাক, ও-সব চালাকি ঢের দেখেছি, এখন কেটে পড়।'

নতুন জায়গা। নিয়মকানুন জানি নে। জানি নে এখানকার হালচাল। কিন্তু পাঁচ-বস্তির ভাষায় কেটে পড়ে, নিজেকে খণ্ডিত করে যাব কোথায়।

একটু আশা নিয়ে তাকালাম প্রহ্লাদের দিকে। প্রহ্লাদ হেসে বলল, 'দিব্যি আসছিলেন, বাধা পড়ে গেল। যান, কেটেই পড়ুন।'

এমনভাবে বলল, যেন কেটে পড়াটা তার কাছে কিছুই নয়। দিদিমার দিকে তাকালাম। দিদিমা আমার দিকে ফিরে অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'ঝাড়া হাত-পা নিয়ে তো ছুটে এসেছ, তা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করতে পার নি?'

সত্যি। ভগবানকে পাব বলে দিদিমার মত পাগল হয়ে আসি নি। আসিনি পুণ্যসঞ্চয়ের কথা ভেবে। মাততে আসিনি তীর্থ নিয়ে। বৈষয়িক বুদ্ধি-বিবেচনা থাকা উচিত ছিল আমারই। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে বিপরীত। কিছু বললে, উলটো উৎপত্তির লক্ষণ।

চেরা গলা মোলায়েম করে বলল দিদিমা, 'পাঁচুগোপাল, বলছিলুম, দেশের ছেলে। তীর্থক্ষেত্রে কুকুর-বেড়ালকেও তাড়াতে নেই। ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিবি?'

পাঁচ-বখ্যি বলে উঠল, 'ও-সব তুমি বুঝবে না খুড়ি। এর নাম কুম্ভমেলা, বুঝলে? মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে মানুষসুদ্ধ চুরি যায়। রাত্রে যদি গ্যাঁড়াফাই করে ভাগে, তখন?'

কথাটা অপমানকর। কিন্তু প্রতিবাদ নিরর্থক। এদিকে এসে পড়েছি আশ্রমের কাছে। আশ্রম বলতে, সুদীর্ঘ ঘেরাওয়ের মধ্যে দেবতার মঞ্চ, আর গোটা-দশেক যাত্রীদের তাঁবু। মঞ্চের উপরে কয়েকজন গেরুয়াধারী গান করছেন মাইকের সামনে বসে। জটাজুটধারী ভস্ম-আচ্ছাদিত একজন সাধু বসে আছেন কাঠের সিংহাসনের উপর। কয়েকশো মেয়ে-পুরুষ বসে শুনছে গান।

ঢোকবার মুখে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে নমস্কার করলে দিদিমা। নমস্কার করে উঠে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল, 'পাঁচু, ছেলেটাকে নিয়ে নে। রাত করে যাবে কোথায়?'

'যেখানে খুশি যাক, তোমার অত ভাবনা কিসের খুড়ি! এখানে ও থাকবে কোথায়?'

বলে সে এগিয়ে গেল। দিদিমা শণনুড়ি মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এস, চলে এস। আমার যেন মরণ নেই, সব হয়েছে একতরো।'

পাঁচ-বখ্যির হুঙ্কারের কাছে এই চেরা-গলার আশ্বাস ও বিশ্বাস অনেক বেশী। কে ভেবেছিল, এলাহাবাদ স্টেশন-প্রাঙ্গণের সেই বুড়ি এমন মহীয়সী মূর্তিতে দেখা দেবে আমার কাছে। ইচ্ছে হল তখুনি পায়ের ধুলো নিই। কিন্তু আবেগ বাগ মানাতে হল। কেন না এখনো সংশয় দূর হয় নি।

এবার প্রহ্লাদও বলে উঠল, 'চলে আসুন না মোশাই, ডাক্তারমামা ওরকম বলেই থাকে! মাথা খারাপ কি না।'

জানি নে কার মাথা খারাপ। খানিকটা যেতেই পাঁচ-বখ্যি একজন সাধুকে নিয়ে এসে হাজির। মনে হল বৈষ্ণব। নাকের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত পুণ্ড্ররেখা টানা। ঘাড় অবধি চুল। পরণে গেরুয়া কাপড়। বোধহয় এ আশ্রমের অধ্যক্ষ। আমাকে বললেন পরিষ্কার বাংলায়, 'একলা পুরুষের জন্য কোন তাঁবু আমাদের নেই। আপনি সপরিবারে এলে আমরা ব্যবস্থা করতে পারতাম। এখানে সকলেই বউ-ঝি নিয়ে আছেন। আপনাকে তো আমরা থাকতে দিতে পারি নে!'

জানি নে কেমন করে বুড়ি-বুকে ঠাঁই পেয়ে গিয়েছিলাম। দিদিমা আশ্রমের মধ্যেই গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'পাঁচু, এ তোর বড় অন্যায় কিন্তু বাপু! ছেলেটা একলা কোথায় দেখলি তোরা? ও কারুর বউ-ঝিকে উঁকি মেরে দেখতে চায়, তখন বলিস। এখন ও আমাদের তাঁবুতে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। এতে যদি না হয়, তবে বলে দে আমরাও পথ দেখি।'

পাঁচ-বক্সির ভয়ঙ্কর মুখটা অপ্রতিভ হয়ে উঠল। সাধুও অবাক হয়েছিলেন। তারা দুজনে বিস্মিত হয়ে পরস্পর মুখ দেখাদেখি করল। বিস্মিত আমিও কম হই নি! দিদিমা যে এতখানি এগুবে, তা আমিও জানতাম না।

প্রহ্লাদ মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'হাঁ বাবা, বলে দেও, তাহলে আমরাও কেটে পড়ি। দেখছ ছেলেটা আমাদের চেয়ে ভদ্দরলোকের মত দেখতে।'

সাধু বললেন দিদিমাকে, 'না, আপনার সঙ্গে যদি থাকে, তবে আর আমাদের আপত্তি কি?'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি এদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নেবেন। আমি সাধারণ নিয়মের কথা বললাম মাত্র।'

বলে তিনি চলে গেলেন। সকলেই চুপচাপ। পাঁচ-বক্সি আমার দিকে একবার ক্রুদ্ধ চোখে দেখে দিদিমাকে বলল, 'এস, তোমাদের তাঁবু দেখিয়ে দিই।'

একটি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে ভাগাভাগি করে এক-একটি পরিবারের আস্তানা করা হয়েছে। মাটির উপর বিছিয়ে দিয়েছে বিচুলি। ব্যবস্থা আছে ইলেকট্রিক আলোর। সত্যি, বাড়ির মত ব্যবস্থাই বটে।

মনে মনে খুব সঙ্কুচিত হলেও দিদিমার সঙ্গে ঢুকে আগে ঝোলা-মুক্ত করলাম নিজেকে। তারপর ধপাস করে বসে পড়লাম বিচুলির গদিতে।

সকলেরই সেই অবস্থা। সকলেই বসে পড়েছে। কেবল পাঁচ-বক্সি যাবার আগে বলে গেল, 'ঘাট হয়েছে আমার তোমাদের আনা। আগে জানলে এ আপদ আমি আনতুম না। বাট, ইও ছোকরা,—'

আমাকেই বলছে। তাকালাম তার দিকে। পাঁচ-বক্সি একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বুক ঠুকে বলল, 'মাই নেম ইজ ডক্টর পাঁচুগোপাল রায়। একটু এদিক ওদিক করবে তো, ঘাড়টি মটকে ছেড়ে দেব, মনে থাকে যেন। থাক আজকের রাতটা, তারপরে তোমাকে কাল আমি দেখছি।' বলে সে চলে গেল।

আমি বসেছিলাম একটি ভীত সন্ত্রস্ত বালকের মত। সবই সময়ের ব্যাপার। পাঁচ-বক্সিকে জবাব দেওয়ার সময় পাব একদিন। আপাতত আমি তার

চোখের বিষ। সেই বিষ বুকে নিয়েছে দিদিমা।

তাকিয়ে দেখি দিদিমা দিব্যি নাতবউ নিয়ে ঘর গোছাবার উদ্‌যোগ করছে। সে সব আমার কানে গেল না। দিদিমাকে দেখে ভাবছিলাম একটা কথা। সেই কথা, রূপে তাকে চিনব না। ডুব দেব তার হৃদিসায়রে। রূপের পরে যে রূপ থাকে লুকিয়ে। মনের অন্ধকারে। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত দেহ। তবু চোখ ভরে জল এসে পড়ল। উঠতে চাইলাম। আড়ষ্ট হয়ে রইল হাত-পা। বোধহয় এই-ই দেখতে এসেছি। যা দেখতে এসেছি, তাই তো দেখছি নিজের অপমানের মধ্যে, অসহায়তার মধ্যে, আমার চোখের জলে।

একটু জলের জন্য হাঁপিয়ে উঠলাম। কোনরকমে এলাম বাইরে বেরিয়ে। ঘুরে পিছন দিকে গিয়ে দেখি জলের কল রয়েছে। সেখানে ভীড় করেছে মেয়ে-পুরুষ। বাসন মাজছে, হাত-পা ধুচ্ছে।

কে বলছে, 'বিন্নু, তরকারিটা পোড়ারমুখী পুড়িয়ে ফেলেছিস।' কে হেসে উঠল খিলখিল করে। বোধহয় বিন্নুই। কে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেও, নেও, বাসনকোসন নিয়ে সর বাপু, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।'

পাশের তাঁবুতেই নারীকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি, 'অনিলের শ্বশুরের কথা বলছ তো? সে মিনসে নাকি মস্ত চাকরি করে। ওই গোমরেই তো অনিলের বউ অত বাপ-সোহাগী!'

হঠাৎ আমার মনে হল যেন বাঙলার কোন মফস্বল শহরের এঁদো গলির বস্তি অঞ্চলে ঢুকে পড়েছি। সন্ধ্যেবেলার বস্তি। চারদিকে কলকোলাহল, ঝগড়া, গান, ফুটকাটা, সাংসারিক প্যাঁচাল। তারই মাঝে জলের ছড়ছড়, বাসনের ধাতুর ঝনঝন শব্দ।

ভুলে গেলাম তীর্থক্ষেত্র। দাঁড়িয়ে আছি বাঙলাদেশের কোন এক পাড়ায়। মনটা তাজা হয়ে উঠল। তাজা হয়ে উঠল আরও জল দেখে। উঃ, যেন কতদিন গায়ে দিই নি। থাক শীত, তবু গায়ে জল না দিয়ে বাঁচব না।

আর থাক পাঁচ-বস্তি। কে জানে, রূপে তাকে চিনলাম না। মনের মাঝের অন্ধকারে তার রূপ আরও কত ভয়ঙ্কর, সেটুকু না দেখে গেলেও সে-দেখা আমার পূর্ণ হবে না।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীচু হয়ে আবার ঢুকলাম তাঁবুর মধ্যে।

তাঁবুতে এসে তাড়াতাড়ি ঝোলা হাতড়ে বের করলাম সাবান আর গামছা।

আগে দেহটি আবর্জনামুক্ত করি, তারপরে অন্য কথা।

কিন্তু বেরুতে আর পারলাম না। দিদিমা বুড়ির চেরাবাঁশের গলা আচমকা তাঁবু কাঁপিয়ে থরথর করে উঠল, 'ওমাঃ! একি মেলেচ্ছ কাণ্ড গো বাবা!'

কাকে বলছে। ওরে বাবা, তাকিয়ে দেখি, শ্বেত-পিঙ্গল শণনুড়ি উঁচিয়ে বুড়ি কুঞ্চিত অগ্নিকটাক্ষ আমার দিকেই হানছে। শরীর আমার শুধু সিঁটিয়েই গেল না, আবার একটি কেলেঙ্কারির লজ্জায় ও ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, 'কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে?' বলে দিদিমা আবার গলা চড়াল। অর্থাৎ যা আমি সবচেয়ে ভয় পাচ্ছিলাম। বলল, 'প্যাণ্ট পরে ইস্তিসন না হয় নিয়ে এলে। নইলে যমে ছাড়বে না। কিন্তু দেবতার থানে সাবাং মাখতে যাচ্ছ কী বলে। তীর্থক্ষেত্রে তেল সাবাং-এ অপবিত্তর হয়, তাও জানো না বাছা?'

জানা ছিল না এত বড় কথা। প্রতিবাদও নিরর্থক। কে জানত যে তেল সাবানে দেবতার মাহাত্ম্যও ধুয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মানুষ চেনার বড়াই আর এ জীবনে করব না। কয়েক মুহূর্ত আগে যার পায়ে হাত দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম, এখন তার কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। স্নেহ ভালবাসা, রাগ ও বিরাগ, এই উভয় ভাব প্রকাশের মধ্যে কি এদের ভাবেরও তারতম্য ঘটে না? অনেক মানুষেরই ঘটে না। সে উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু নিজে বড় একটা সে বিষয়ে ভুক্তভোগী নই। তাই মন বড় সহজেই দমে যায়।

ইচ্ছা থাকলেও এখান থেকে আর পালাবার উপায় নেই। এইটুকুই তো আমার পরম ভাগ্য যে, বুড়ির চেঁচানি শুনে ডাক্তার পাঁচুগোপাল রায় তার ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে আসেনি ছুটে।

বিশ্রামের আরামে প্রহ্লাদের রসভরাট গলা গদগদ হয়ে উঠেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানলি দিমা, ছেলেটা একেবারে ভদ্দরলোক।'

দিদিমা বলল, 'তাই না বটে।'

সেইটাই অপরাধ। সাবান রেখে গামছা নিয়েই বেরিয়ে গেলাম। গায়ে জল লাগিয়ে আর ফিরে আসতে পারি নি। দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার যোগাড়। উঃ বড় ভুল করেছি। এ যে কম্প দিয়ে জ্বর আসার মত। ম্যালেরিয়ার সর্বনাশ কাঁপুনির মত হৃৎপিণ্ড ছরকুটে যাবে দেখছি। উত্তর প্রদেশের শীত না ব্যক্ত করতে পারি, বাঙলা দেশের জল-হাওয়ায়, এই ম্যালেরিয়া-প্রুফ ক্ষীণ দেহের অভিজ্ঞতাটুকু জাহির করতে পারি খুব। মাসের পর মাস ঘড়ি না দেখে

সময় বলে দিতে পারি জ্বর আসার ক্ষণটি লক্ষ্য করে। এ অভিজ্ঞতা কম নাকি! বেশ বড়-সড় একটি পিলেযুক্ত নিটোল পেট আর কাঠি-কাঠি হাত-পা নেড়ে, ভাসা-ভাসা টানা-টানা চোখে বাঙলার জল আকাশের দিকে তাকিয়ে তবু আমরা দিব্যি কবিত্ব করি, 'আয় লো আয় রাই বিনোদিনী, রসের হাটে কালো মানিক করব বিকিকিনি।' হাড়কাঁপুনিকে বলি, ওদিকে থাক। দোষ ধোরো না ভাই। পিলের গৌরব করছি নে। ওই রূপ দেখেও তো শুনেছি, 'বাইরী বাঙালিনী নাকি, নিশি নিশি গুঞ্জরে।'

মধুর মধুর রসরাজ

মধুর বৃন্দাবন মাঝ।

থাক, রসিকতা আর পোষায় না। উত্তর প্রদেশের হাওয়া পারে নি, জল যে একেবারে কাবু করে দিল। কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুতে এসে মনটা একেবারে ভরে উঠল। বাঃ! প্রহ্লাদের ক্যাটকেটে দিদিমা দেখছি টাকি মুরগীর মত বহুরূপিণী। আমার ধারণা ছিল ওটা তরুণীদেরই একচেটিয়া। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলানো! দিব্যি দেখছি, আমার ঝোলা উজাড় করে বিচুলির উপর পাতা হয়েছে কম্বল। ঝোলা শিয়রে রেখে হয়েছে বালিশ। গায়ের কম্বলটিও ভাঁজ করা হয়েছে পায়ের দিকে। এবার শুয়ে পড়ার ওয়াস্তা।

যাক, আর কিছু চাই নে। দেখেই মন গরম হয়ে উঠেছে। শরীর গরম হতে আর কতক্ষণ। তাড়াতাড়ি গা-হাত-পা মুছে গায়ে দিলাম ওভারকোট। সেটি গায়ে নিয়েই বিচুলির উপর কম্বল শয্যায় অঙ্গ পেতে টেনে নিলাম আর-একটি কম্বল।

কিন্তু এতক্ষণ প্রহ্লাদ সপরিবারে, অর্থাৎ দিদিমা সহ আমার দিকে তাকিয়েছিল বিস্ফারিত চোখে। তারপরেই বুড়ির শ্লেষ্মা-জড়িত গলার হাসি তো নয়, হাসির হিক্কা। কিন্তু এও যে সম্ভব, তা জানতাম না। বুড়ি বলল, 'বলি ও ভাল মানুষের ছেলে, সাবাং তো মাখতে যাচ্ছিলে, তোমার আবার এত ছুঁচিবাই কিসের বাপু?'

বললাম, 'কিসের ছুঁচিবাই?'

'এই যে গায়ে জল ঢেলে এলে। বারো জেতের ছোঁয়া নিয়ে আমরাও এসেছি, কিন্তু এই শীতে কি আমরা জল ঢালতে গেছি?'

এখন সত্য বলে বোঝানো নিরর্থক যে ছুঁচিবাই নয়, পরিষ্কার হওয়ার জন্যই জল ঢেলেছি। হয়তো বিশ্বাসই করবে না। তবু এমনি অবিশ্বাস ভাল। কিন্তু চেঁচামেচি যেন না হয়। কিছু না বলে শুধু হাসলাম।

দিদিমা আবার বলল, 'দেখো বাপু, শেষে নিমুনি বাধিয়ে বোসো না। ওসব ঝক্কি পোয়াতে পারব না।'

কি দরকার পারবার! রাত পোহালে যাদের রেহাই দেব, তাদের ভাবনার প্রয়োজন নেই। ওদিকে খাবার বন্দোবস্তও হচ্ছে বলে মনে হয়। রান্না করা তো এখন আর সম্ভব নয়। চিঁড়েমুড়কি বেরুচ্ছে টিনের পাত্র থেকে। অস্বস্তি ঘিরে ধরল আমাকে। অন্তত খাওয়ার সময়টাও বাইরে থাকতে পারলে হত। শুয়ে পড়েছি যে।

আবার দিদিমার গলা, 'নেও দুটো চিবিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।'

এরা না জানুক, নিজে তো জানি, চিবোবার স্পৃহা এখন আমার একটুও নেই। গতকাল সকালে বিছানা ছেড়েছিলাম। পথের ধকল কাটিয়ে এবার গা পেতেছি। এই বিশ্রামের ভোগ এখন খাওয়ার চেয়ে বড় ভোগ। কিন্তু পরিস্থিতি আমার এ সত্য ভাষণের মর্যাদা দেবে না।

কথা না বাড়িয়ে, যতটা পারলাম, চিবিয়েই শুতে হল। এখনো এ আশ্রমের মাইকে দেবমাহাত্ম্য আলোচিত হচ্ছে। সারা কুম্ভমেলা জুড়েই এখনো কল-কোলাহল চলছে পুরো দমে। শুধু আমি রয়েছি যেন অনেক দূরে। শুনতে পাচ্ছি আশপাশের তাঁবুগুলিতে বিচিত্র গুঞ্জন। কিন্তু সবই অস্পষ্ট। এটুকু না থাকলে হয়তো গাঢ় ঘুমের আলিঙ্গনে অচেতন হয়ে পড়তাম।

অমনি অর্ধচেতন অবস্থায় আমার কানে এল ভাঙা-ভাঙা অর্ধস্ফুট একটি গলার গুঞ্জন —

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু-বাছাধন॥

দিদিমার গলা। বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন গলা। আমার কানের শিরাগুলি চকিত মুহূর্তে একেবারে জেগে উঠল। তারপর কানের পর্দা থেকে একটা বিচিত্র শিহরণ আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করে তুলল।

কৃষ্ণের শতনাম। কোনদিন জীবনে মুখস্থ হয় নি। মহিমাও কিছু বুঝিনে ও নামের। কিন্তু ভাঙা জড়িত গলার এই বিচিত্র সুর, আমার শৈশবের নিদ্রাহীন চোখের উদ্ভট স্বপ্নের, আমার দুষ্টামির, আমার বিশ্বজোড়া কৌতুহলের সমাপ্তি এনে দিত। আমার শিশুরক্তের শিরায় শিরায় ঘুমের মায়া হয়ে থাকত লুকিয়ে। না-ছোঁয়া থাকলেও সর্বাঙ্গ ভরে থাকত, জড়িয়ে থাকত আমার মায়ের আলিঙ্গন, এমনি ছিল রাত্রের ঘুমে, ভোরের জাগরণে। যে সুরে ঘুম আসত, আবার সেই সুরেই একটু একটু করে খুলে যেত চোখের পাতা।

তারপর জীবনের স্রোতে আমি ভেসে গিয়েছি একটি বৃন্তহীন ফুলের মত। যৌবন এসেছে অসহ্য বেদনা ও সংগ্রামের ডাক নিয়ে। পায়ের তলার মাটি বাঁচাতে করে হারিয়ে গিয়েছে সেই সুর। মায়ের রূপ ধরেছে এই কঠিন পৃথিবী।

কিন্তু সেই হারানো সুর যে আমার এই দীর্ঘ জীবনের রক্ত-প্রবাহে অজান্তে অনুসরণ করছে, তা জানতাম না। সমস্ত কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। গাঢ় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম আমি। তখনো একটু একটু কানে আসছে :

কালোসোনা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী,

কুব্‌জা রাখিল নাম······

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। খসখস শব্দ হচ্ছে ঠিক কানের কাছেই। কত রাত হবে, কে জানে। শুয়ে ছিলাম বাইরের পর্দার সামনে। প্রথমটা চোখ মেলতে পারলাম না। পর্দার তলা দিয়ে তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত এসে বিঁধছে কনকনে হাওয়া। কাঁটা দিয়ে উঠছে গায়ের মধ্যে। মনে হল, সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। রক্ত জমে গিয়েছে হাতপায়ের। বিচুলি-শয্যা বরফের মত ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। দূরাগত মেঘগর্জনের মত গুড়গুড় করে উঠল বুকের মধ্যে।

বোধহয়, এই ভয়ানক শীতেই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। মেলা নিস্তব্ধ। কোলাহল নেই। হঠাৎ দু-একটা সংক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে দূর থেকে। আচমকা শোনা যাচ্ছে স্খলিত ঘণ্টাধ্বনি। আবার নীরবতা। কেবল কানের কাছে খসখস।

চোখ মেললাম। চোখ মেলেই চমকে উঠলাম। পর্দার কাছেই একজোড়া বুট। তাঁবুর মধ্যে আলো জ্বলছে। একটু একটু করে বুট বেয়ে বেয়ে দৃষ্টি তুললাম। বুটের উপরেই মেটো, খাকি প্যাণ্ট। হাঁটুর উপর থেকে ভারী কালো কম্বল।

সর্বনাশ! ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ছবির মনস্টার! পাঁচ-বত্তি! ভয়ঙ্কর মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডক্টর পাঁচুগোপাল। টের পায় নি যে, আমি জেগে আছি। হাত আড়াল করা আমার চোখের কোলে ছায়া। দেখলাম, ডক্টর পাঁচুগোপাল রীতিমত রাত-প্রহরীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে চারদিক। কী দেখছে কে জানে। কিন্তু একটা বুট যদি চাপিয়ে দেয় গলার উপর!

কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কাটল বুকের ধুকধুক তালে। তারপর কানে এল চাপা চীৎকার, 'শালা, নো জায়গা নট কিচ্ছু। চলো বাহার।'

পরমুহূর্তেই পর্দাটা তুলে বেরিয়ে গেল সে। আর-এক ঝলক কুচো বরফকে ছুঁড়ে মারল আমার গায়ে। কোনরকমে হজম করলাম ঠাণ্ডা চাবুকের কষাঘাত।

কিন্তু ডক্টর কেন এই শীতনিশীথে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'নো জায়গা নট কিচ্ছু'র বাংলা মানে তো তাই বোঝায়। বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। ঘুম আর এল না। অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম। চব্বিশ ঘণ্টার ক্লান্তিতে এখনো চোখ জুড়ে আসারই কথা। কিন্তু আশ্চর্য! এপাশ ওপাশ করেও ঘুম আর কিছুতেই আসছে না। অনেক সময় অতিরিক্ত ক্লান্তিতে দেহতন্ত্রী যেন টানটান হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে মনটিও। এই হঠাৎ-ঘুম-ভাঙা মনেও আমার কোন শৈথিল্য নেই। সেখানে অনেক তাড়া, অনেক কৌতূহল। মন যেন ছেঁড়া পালের টুকরো ফালির মত থরথর করে কাঁপছে। হয়তো এর কোন অর্থ নেই, আশা নেই। তবু মন মানে না। মানে নি বলেই তো এসেছি ছুটে। হোক ডক্টর, অদ্ভুত, অবাক কাণ্ড। তবু আর শুয়ে থাকতে পারি নে। উঠে পড়লাম। উঠে দেখি প্রহ্লাদকে মাঝখানে রেখে একপাশে তার পরিবার আর-একপাশে দিদিমা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই ঘুম দেখে হঠাৎ বোঝার উপায় নেই, এরা এসেছে ঘর ছেড়ে দূরে। এসেছে তীর্থ করতে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম ওভারকোটের বোতাম এঁটে। কিন্তু এসে কয়েক মুহূর্ত চলৎশক্তি রহিত হয়ে গেল। মনে হল, মনের আশা মনে নিয়ে ঢুকে পড়ি তাঁবুর মধ্যে। শুনেছি, ইওরোপ শীতপ্রধান দেশ। সেখানকার শীতে জল জমে বরফ হয়। পথে ঘাটে উঠোনে ছাদে বরফ। লোকে পথে বেরুতে ভয় পায়। কিন্তু আমার বাঙালী হাড় যে উত্তর প্রদেশের গঙ্গার পাড়ে জমে যাওয়ার দাখিল।

পকেটে ছিল মাফলার। বার করে জড়ালাম মাথায়। জুতো মোজা পরেই শুয়েছিলাম। সুতরাং দরকার থাকলেও শীত আটকাবার আর কোন উপায় ছিল না।

আশ্রমের বাইরের আলোগুলি নেভানো। মঞ্চের পেছনেই অস্থায়ী মন্দির হয়েছে মাটির দাওয়ার উপরে, গোলপাতার বেড়া ও মন্দিরের ঝাঁপ বন্ধ। মঞ্চের উপরে ও নীচে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুঁটলির মত দেখাচ্ছে আপাদমস্তক মুড়ি-দেওয়া ঘুমন্ত কতকগুলি মানুষকে। মনে হল না কেউ জেগে আছে।

আশ্রমের প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম। শিশির-ভেজা বালি থস-থস করছে। চলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ থসথস করে। আটকে যাচ্ছে পা। রাশি

রাশি ভেজা বালি জুতোর মধ্যে ঢুকে মোজাসুদ্ধ পা সিক্ত করে তুলছে অন্ধকারে চিকচিক করে উঠছে বালির বুকে অভ্রকুচি।

পশ্চিমদিকে মুখ করে চলেছিলাম। ওপারে অস্পষ্ট এলাহাবাদ দুর্গপ্রাকার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। দুর্গের মাথায় পতাকাটিও লক্ষ্য করা যায় একটা গাছের ফাঁক দিয়ে। নজরে পড়ে না শুধু সতর্ক প্রহরী।

সম্ভবত, কিছুক্ষণ পূর্বেই চাঁদ ঢলে পড়েছে দুর্গের আড়ালে। তাই পশ্চিমের আকাশে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস। কিংবা এলাহাবাদ শহরের আলোকমালার হাল্কা আভাস মাত্র।

লক্ষ মানুষের মেলা এখন নিঃশব্দ। এই নিঃশব্দের মধ্যে মিশে গিয়েছে ঝিঁঝির ডাক, আমার পদশব্দের খসখসানি। নিয়ত ধাবিত গঙ্গার কলকলধ্বনি এই নিঃশব্দ রাত্রির সঙ্গীতপ্রবাহের মত চলেছে ভেসে। যেন অদৃশ্যে বসে কোন এক নিঃশব্দের সঙ্গীতবিলাসী নিয়ত জলের বুকে ঢেলে চলেছে ধাতব বস্তু।

সন্ধ্যার সেই আলোর ছড়াছড়ি নেই। এখানে সেখানে দু একটা আলো জ্বলছে। দিগন্ত জুড়ে তাঁবুগুলি দেখাচ্ছে যেন সমুদ্র-সৈকতে নিশ্চল নীরব অসংখ্য পাখির মত। যেন ধূসরবর্ণের পাখা মেলে বসে রয়েছে বাদুড়ের দল।

আবার সেই স্খলিত ঘণ্টাধ্বনি। কানের কাছেই শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, কয়েক হাত দূরেই একটা হাতি বাঁধা রয়েছে। সুরের মাঝে ডুবে গিয়ে মানুষ যেমন করে দোলে, হাতিটা তেমনি দুলছে সামনে পেছনে। তারই তালে তালে বাজছে ঘণ্টা।

অদূরেই কিছু পোড়া কাঠ থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে। আগুন জ্বালা হয়েছিল, নিভে গিয়েছে। সেই অগ্নিকুণ্ডের গা ঘেঁষেই বালির উপর কয়েকজন শুয়ে আছে আপাদমস্তক ঢেকে। ভাবাও দুষ্কর এই ভয়াবহ শীতের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলে কেমন করে মানুষ শুয়ে আছে।

দূরে দূরে কোথাও দু-একটি প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে আগুনের চেয়েও পুঞ্জীভূত ধোঁয়ারাশি।

আচমকা কানফাটানো দুম দুম ঝম-ঝম শব্দে চমকে উঠলাম। উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, গঙ্গার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে রেলওয়ে ব্রীজ। ট্রেন চলেছে তার উপর দিয়ে। মনে হল, জমাট নৈঃশব্দ ভেঙে সেই ঝম-ঝম শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এখুনি জেগে উঠবে মানুষের মেলা।

কিন্তু ট্রেনের বিলীয়মান শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বালুচর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। ট্রেন দেখবার জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম। এই গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে একটি ভাঙ্গা

ভাঙা গলা শুনতে পেলাম। যেন কাকে কী বলছে। এই তাঁবু-সমুদ্রের মধ্যেই কোথাও কেউ কথা বলছে। কিন্তু কোথায়? মানুষ তো দেখতে পাই নে।

একটু কৌতূহল হল। কান পাতলাম। কথাগুলি হিন্দী ভাষায় বলছে। কী বলছে? আর-একটু এগিয়ে আবার থমকালাম। কথা তো নয়, কে যেন কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'বহুত, বহুত পাপ কিয়া ভগবান! হে ঈশ্বর, আমার অর্থ নাও, আমার সোনা নাও, আমার খাওয়া নাও, আমাকে বিবস্ত্র কর, আমার সব নিয়ে, আমাকে মৃত্যু দাও। আমার এই পাপের প্রাণ আমি তোমার পায়ে দিচ্ছি। গ্রহণ করে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।'

আমার হাত-পা একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আমি কার পাপের স্বীকারোক্তি শুনছি! মৃত্যুকামনা শুনছি কার? আমি কোথায় এসেছি, যেখানে মানুষ অসঙ্কোচে প্রকাশ করছে তার পাপ! নিবেদন করছে প্রাণ।

ভুলে গেলাম, আমি এক সভ্য দেশের সৃষ্টি ও কৃষ্টি-ভরা নগরের নাগরিক। আমি যেন হাজার বছরের অতীতে এসেছি ফিরে। কোন অদৃশ্য থেকে আমাকে দুহাতে আলিঙ্গন করল এই বালুচরের নিশি। নিশি-পাওয়া অন্ধ ও বোবার মত আমি চারিদিকে হাতড়ে ফিরতে লাগলাম।

ওই যে দূরের অগ্নিকুণ্ড ও ধোঁয়া, হয়তো ভরদ্বাজ মুনির যজ্ঞের কাঠ পুড়ছে ওইখানেই। দিনের পর দিন শত শত মানুষ প্রয়াগের গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ নাশ করেছে! প্রাণনাশের এই ভয়াবহ মহাপুণ্যলীলা আজ ঘিরে ধরল আমাকে। অনেক মানুষ, অনেক মানুষের ছায়া চারিদিক থেকে ঘিরে আসছে আমাকে। ভারতের এক বিস্মৃত যুগের ছায়ারা ভিড় করেছে আমার চারপাশে। ওভারকোট-পরা একটি ক্ষীণ মানুষরূপী জীবের দিকে তারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, এ কোন্ দেশের মানুষ। গঙ্গাতীরে তাদের শত শত বছরের এই নির্জন বিচরণক্ষেত্রে রাত্রি নিশীথে এ কোন্ রক্তমাংসের জীব। অনেক পরিবর্তন তারা দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছে। যে অক্ষয়বটগাছের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ভগবানের কাছে তারা প্রাণ দান করেছে, তাদের সেই অক্ষয়বট অসঙ্কোচে কেটে দিয়েছেন আকবর বাদশা। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দাঁড়িয়ে তারা দল বেঁধে সবাই সেই নিষ্ঠুর কাজ দেখেছে। তারপরও শত শত বছর ধরে তারা দেখে আসছে, মরজগতের লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে, তাদের সেই অক্ষয়বটের স্মৃতিচিহ্নে মাথা ঠুকতে। দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে তারা। সে হাসি কেউ শুনতে পায় না। গঙ্গা ও যমুনার তলে

চাপা পড়ে থাকে সেই হাসি। বিদ্রূপে বেঁকে উঠেছে তাদের চোখ, যখন দেখেছে মরজগতের মানুষগুলি বেঁচে থাকতে কত ভালবাসে। পাপকে গোপন করতে তাদের কত আয়াস। মুদ্রা নিক্ষেপ করে কত সহজে সে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে চাইছে। তারা দেখেছে, তাদের অক্ষয়বটের পরিবর্তে একটা অন্য বটের ডাল দেখিয়ে পাণ্ডা পয়সা নিচ্ছে মানুষের কাছ থেকে।

তারা ফিসফিস করে কথা বলেছে আর হাওয়ার গায়ে ভেসে বেড়িয়েছে। কেউ জানে না, কিন্তু তারা জানে প্রয়াগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভারতের কি ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

কিন্তু তাদের এই অবাধ মুক্ত বিচরণ সময়ে এ কোন্ জীব! গঙ্গার কোল থেকে একে একে তারা সকলে উঠে এসেছে। তারা কেউ হাজার বছরের, কেউ পাঁচশো বছরের, কেউ দুশো বছরের।

আমি কথা বলতে গেলাম। কিন্তু আমার কথা হারিয়ে গিয়েছে। তারা পরস্পরের গা টিপে হাসছে। আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে। তারপর, তাদেরই সমবেত কণ্ঠের হাসির মত আমার কানে এসে বাজল গঙ্গার কলকল ধ্বনি

তাকিয়ে দেখলাম, আমার পায়ের কাছে জল। গঙ্গার তীরে এসে পড়েছি। দূর-গঙ্গার বঙ্কিম স্রোতে হঠাৎ কারা হেসে উঠছে নিঃশব্দে। বাঁকা স্রোতের আলোর ঝিলিকে হেসে হেসে, আবার সেই হাসি হারিয়ে যাচ্ছে স্রোতেরই বুকে। ছায়ারা সব গুপ্ত শত্রুর মত চোখের সামনে অতলে ডুব দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

কে যেন গান করছে। নারীকণ্ঠের গান। নিশি-পাওয়া মন ভেসে গেল আর-এক দিকে। বেহালার চাপা সুরের মত মিষ্টি গলা অকস্মাৎ এক নতুন স্বপ্নজাল বিছিয়ে দিলে বালুচরে।

না, গান তো নয়। সুর করে আবৃত্তি করছে,

চিরং নিবাসং ন সমীক্ষতে যো
হ্যুদারচিত্তঃ প্রদদাতি চ ক্রমাৎ।
কল্পিতার্থাংশ্চ দদাতি পুংসঃ
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ।

কণ্ঠ লক্ষ্য করে কয়েক পা অগ্রসর হয়েই থামলাম। দেখলাম, গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী। মনে হল, শাড়ি পরে আছে। আলুলায়িত কেশরাশি ছড়িয়ে পড়েছে তার পিঠ জুড়ে। দূরের অস্থায়ী ভাসন্ত পুলের সামান্য আলোর রেশ এসে পড়েছে তার মুখে। সে আলো সামান্য।

তার মুখাবয়বটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে। তার সু-উচ্চ নাক, কম্পিত ঠোঁটা, নিষ্পলক চোখের ঘনপল্লব।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম, আপাদমস্তক-আবৃত একজন পুরুষ এসে দাঁড়াল তার পাশে। সেও কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল প্রয়াগস্তোত্র।

আরও খানিকক্ষণ পরে আর-একটি মেয়ে এল, একটি বালকের হাত ধরে। আগে যাকে দেখেছিলাম, তার চেয়ে এর বয়স কম মনে হল। পুষ্ট যৌবনের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে বঙ্কিম রেখায় উদ্ভাসিত। মুখে তার হাসির আভাস। বালকের সঙ্গে সেও আবৃত্তিতে যোগ দিল।

তাদের নীচু ও চাপা গলার মিশ্রিত আবৃত্তির সুর একাত্ম হয়ে গেল গঙ্গার কলকলধ্বনিতে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারা সকলে চলল দক্ষিণে সঙ্গমের দিকে।

আমি সেই দিকেই এগুলাম। যত সময় যাচ্ছে, উত্তরে হাওয়া তত যেন ক্ষেপে উঠছে। ওদের মিলিত গলা থেকে ঝাপটা মারছে আমার কানের পর্দায়।

মানুষের দেখা পেয়ে আমিও অনেকখানি যেন নিশিমুক্ত হয়ে উঠেছি আবার, চারিদিক পরিষ্কার হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

হঠাৎ মনে হল, কে যেন আমার পেছনে আসছে! তাকিয়ে দেখলাম। মনে হল একটা মূর্তি সরে গেল তাঁবুর অন্ধকার কোলে। হয়তো কোন মানুষ বেরিয়েছে পথে। বেরুক। সামনে ফিরে আমি ওই চারজনের পিছে পিছে আবার চললাম।

এখনো কত রাত্রি অনুমান করতে পারি নে। কেল্লার পেছনের আকাশ ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। পূর্বাকাশের কোলে দূর ঝুসির পাহাড়ের মত উঁচু ভূমির অস্পষ্ট রেখা ফুটছে ধীরে ধীরে। বিশাল নিকষ কালোপটে কোন এক অদৃশ্য শিল্পী যন্ত্র দিয়ে খুঁটিয়ে ফুটিয়ে তুলছে নতুন দৃশ্য।

মন্থর গতিতে আমার আগে আগে চলেছে তারা চারজন—দুটি নারী, একটি বয়স্ক পুরুষ, বালক একটি। তারা মিলিতকণ্ঠে সুর করে আবৃত্তি করে চলেছে প্রয়াগমাহাত্ম্য। চাপা সুর, আবৃত্তিও মন্থর তাদের চলার মত। সুস্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ। এই দারুণ শীতে একটুও বিকৃত শোনাচ্ছে না তাদের গলা।

আমি দূরে থেকে, চলেছি তাদের পেছনে পেছনে। কেন চলেছি, তার সঠিক অর্থ জানি নে। জানি কিঞ্চিৎ প্রয়াগের ইতিহাস। মাহাত্ম্য জানি নে তার অলৌকিক কীর্তির। আমা মাত্র গণ্ডুষেভরা গঙ্গাজল নিয়ে দিই নি মাথায়।

রাশি রাশি ধুলো ছড়িয়ে দিই নি নিজের গায়ে। তবুও চলেছি তাদের পেছনে পেছনে।

নিশির দলে নিশি পেয়েছে আমাকে। সুরে আমাকে ডাক দিয়েছে। ইতিহাস কথা বলছে আমার কানে কানে। আমি মন্ত্র বুঝি নে প্রয়াগের। বুঝি নে পুজো।

শ্রাবণ মাসে বাঙলার গাঁয়ের গৃহস্থে মেয়ে-বউরা পুজো করে 'ঢ্যালা প্যালা।' পুজো করে মাটি ও বনপালার। তার অর্থ বুঝি, হে ধরিত্রী, তুমি উর্বর হও। তোমার প্রতিটি মাটির টুকরো ভরে উঠুক সবুজ শস্যে। আমার পুজো নিয়ে তুমি তৃপ্ত হও, তুমি সিক্ত হও, আমি জীবনভর তোমার সেবা করব।

এই আদিম সংস্কারের মধ্যে দেখি মানুষের বাঁচার অভিযান। নবান্ন উৎসবে শুনি জীবনের জয়গান। ফসলের গুণকীর্তন।

কিন্তু এই বালুচর। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের লীলাভূমি। ধর্মীয় ইতিহাসের স্মৃতিভূমি! কিন্তু কেউ এখানে ডুব দেয় না সেই স্মৃতিসাগরে। সন্ধান করে না জ্ঞানের। জনপদ ও তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই বালুচরের গুণকীর্তন তাহলে কেন বুঝি নে? মানুষের রূপে মুগ্ধ হই। অলৌকিকের অনুভূতি নেই মনে। কী করে বুঝব।

তবুও আমি মোহপাশে আবদ্ধ হয়েছি। মোহ নয়, মুগ্ধ প্রাণ নিয়ে চলেছি আমি। এই মৌন রাত্রি, আলো-আঁধারিতে ওই নারী ও পুরুষ, আর কী বিচিত্র তাদের মিলিত গলার হারমনি। এই সঙ্গীতে নেই যন্ত্র-সঙ্গত। যন্ত্র হয়ে উঠেছে তাদের বিভিন্ন গলার সুর। এই সুরের অঙ্গে সুর মিলিয়েছে নিয়তবাহী গঙ্গা।

ক্রমে শেষ হয়ে এল তাঁবুর সারি। যেন পিছনে ফেলে এলাম লোকালয়। এবার বালু আর বালু। বালুপ্রান্তর। পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে গভীর বালুতে। মনে হল, অনেক দূরে ফেলে এসেছি কুম্ভমেলা। হারিয়ে গিয়েছে বালুর উপর আঁকাবাঁকা পথের দিশা। বালুর নীচে কোথাও ভেজা মাটির ইশারা। জেগে উঠেছে টুকরো ঘাসবন। জলো ঘাস। আবার বালু।

হাওয়ায় নুয়ে পড়েছে ঘাসের মাথা। ক্রমে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠেছে। পবন উন্মাদ হয়েছে। শিস দিয়ে চলেছে কানের কাছে। আর কানে ভেসে আসছে ওই সুর। সুর চড়ছে। বেহালার চাপা সুর হয়ে পড়েছে মুক্ত ও ব্যাপ্ত। তার টান পড়েছে। উচ্চতর গ্রামে মিশেছে হাওয়ায়।

বয়স্ক পুরুষটির কম্বল উড়ছে ফরফর করে। মেয়ে দুটির আলুলায়িত

কেশপাশ শূন্যে আছাড় খাচ্ছে হাওয়ার দমকে।

হাওয়া নয়, নিষ্ঠুর চাবুক। আমার হাত আর পা ফেটে পড়তে চাইছে টনটনানিতে। শিউরে শিউরে উঠছে পায়ের মধ্যে।

একটু পরেই গতি মন্দ হল সামনের চারজনের। সামনেই ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে বালুচর। ছিলাম প্রায় বিশ-ত্রিশ হাত দূরে। বুঝতে পারলাম না কতটা নীচু। নীচেও খানিকটা সমতল চর। তারপরও দূর-আলোকের অস্পষ্ট রেখায় চকচক করছে জল।

তারা চারজন নেমে গেল নীচের সমতলে। আমি দূরেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারা চারজনও দাঁড়িয়েছে। এবার স্তিমিত হয়ে এসেছে গলার স্বর। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি ও চাপা গুনগুনানি।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল দুদল। চর বাঁদিকে বাঁক নিয়ে সরে গিয়েছে। কম্বলধারী চলে গেল সেই দিকে। বুঝতে পারলাম না, ওদিকটা আরও নীচু কি-না। কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না। তারপরে একটি নারী গেল। সেও হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

বালকটিকে নিয়ে রইল আর-একজন নারী। কিন্তু আর দাঁড়াল না। বালকটি এই ভয়াবহ শীতে জামা-কাপড় খুলে এগিয়ে গেল জলের দিকে।

শিশু বালকের এই দুঃসহ পীড়নে হৃদয় বিস্মিত ব্যথায় চমকিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই, নতুন দৃশ্যে আমার সর্ব চেতনা আড়ষ্ট হয়ে গেল। দেখলাম, সেই মেয়েটিও বিবস্ত্রা হয়েছে। এত শীতেও কোন তাড়া নেই। সবই মন্থরভাবে চলেছে। বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়াল সে কয়েক মুহূর্ত।

একেবারে স্পষ্ট নয়, কিন্তু অস্পষ্টও নয়। আমার সভ্যতাগর্বী মন থমকে গেল। নিজেকে আড়াল করার কিছু নেই এখানে। চোখের পাতা একবার চকিতে আনত হয়েও, মনের পাতা উঠল আবধ্য হয়ে। কোন পাপ তো করি নি। পালাব কেন।

কিন্তু সে-ও কি আমাকে দেখতে পায় নি! মুক্ত আকাশের তলে, দারুণ হিমেল হাওয়া-মুখরিত চরে, মনে আমার অস্পষ্ট ভয় ঘিরে এল।

শূন্যে-ওড়া কালনাগিনীর মত তার উড়ন্ত দীর্ঘ কেশরাশি, তার বলিষ্ঠ দেহের সুস্পষ্ট রেখা, তার চাপা গুনগুনানি, সব মিলিয়ে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেল আমার চোখের সামনে।

সে নেমে গেল জলের দিকে। চাপা পড়ে গেল গুনগুনানি। কিন্তু আমি তেমনি আড়ষ্ট, স্তম্ভিত। তাকিয়ে দেখি, চারদিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

উঠছে। আলো, এত আলো এল কোথা থেকে। পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পূর্বের প্রতিষ্ঠানপুরের আকাশের কোল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দূর-পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দেখি, কালো অথচ তীব্র আলোকময়ী জলের স্রোতরেখা ছুটে আসছে আমার দিকে। আসতে আসতে আচমকা বাঁক নিয়ে চলে যাচ্ছে দক্ষিণে। যাচ্ছে এই প্রাক-উষা মুহূর্তে গঙ্গার অস্পষ্ট হিম-বিধূ-মুক্তা ধবল তরঙ্গের গায়ে গায়ে। এই মুহূর্তে নীল যমুনার রং হয়েছে নিকষ কালো। দূর পশ্চিমে তার ঝাপসা রেলওয়ে সেতু। উত্তর কোলে জলের বুক থেকেই উঠেছে দুর্গের পাথুরে ইমারত। কী হাওয়া! প্রাণনাশী ঠাণ্ডা হাওয়ায় যমুনার উত্তর তীরের উঁচু গাছের মাথা দুলছে। যেন ঝাঁপ দিতে চাইছে যমুনায়! ব্যাকুল হাওয়ার শনশন; যেন কোন অদৃশ্য-চারিণীর ব্যাকুল গুনগুনানির মত আসছে ভেসে। আর মুরারিকায় কালী যমুনার বাঁকা স্রোতে ঝলকিত বাঁকা হাসি। সে হাসি গোপনে হেসে ভেসে চলেছে দূরে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার গঙ্গার কোল থেকে ভেসে এল সেই কণ্ঠের বাঁশির স্বর ঃ

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে।

গঙ্গার অদৃশ্য কোল থেকে উঠে এল সেই বালক। সে কাঁপছে থরথর করে। দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার ফাঁক দিয়ে এবার বিকৃত শোনাচ্ছে তার উচ্চারণ। শুকনো কাপড় থাবা মেরে তুলে নিল সে গায়ের উপর। বালকের পেছনেই উঠে এল সে। সর্বচরাচরের মত সে আরও সুস্পষ্ট। সম্মুখ তার পূর্বদিকে। উষার সিন্দুরকণা ছড়িয়ে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। ভেজা চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে দুপাশ দিয়ে। তার শরীর অকম্পিত নয় কাঁপুনি রয়েছে তার গলার স্বরে।

চোখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। নিলামও তাই। ধার্মিকের ভক্তি নেই। চোখে আছে কিঞ্চিৎ নিতান্ত মানুষিক মোহের অঞ্জন। এসেছি যেন বানের জলে ভেসে যাব বলে। ডুব দেব বলে। কিন্তু সত্তা তো পেছন ছাড়েনি। নিজেকে ভুলি কেমন করে।

তবু, আমার নগরসভ্য চোখ দেখেছে অনেক ছবি। বিদেশী শিল্পীদের অসংখ্য ভেনাস, মনের মানসী, নগ্ন নাগরী। দেখেছে দেশী শিল্পের আঁকা হৃদয়মাধুরীমেশানো নগ্ন-বিচিত্রার ছবি। তা ছাড়াও এ সভ্য চোখ বিবে

আচ্ছন্ন দেশের দিগন্তজোড়া দেওয়ালের ছবি দেখে। সেলুলয়েডের বুকে বীভৎস নগ্নতা দেখে।

কিন্তু এই নগ্নতা! ওই আকাশের মত, এই চরের মত, ওই গঙ্গা ও যমুনার মত দ্বিধামুক্ত নগ্নতা। নগ্নতা পরিবেশ-অন্ধ। নগ্নতা কী ভয়ঙ্কর অথচ কী অপরূপ!

বুঝি পথ ভুল করেছি! কিন্তু ভুল করে এসেছি কোন্ যুগে। ভারতের কোন বিগত শতাব্দীতে। বিষের ধোঁয়া নিয়ে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছিলাম সেই বিষের ফোঁটা কপালে নিয়ে। যখন থেকে দেখতে শিখেছি, দেখেছি বিষ-ক্ষতে ভরা দেশ। নিরন্নের মিছিল, অবিশ্বাস, ভয়, নিষ্ঠুরতা আর হাহাকার।

তবু আরও দেখি দেখি করে ছুটে এলাম। কিন্তু কোন্ যুগের হাত ধরে এসে এ ছবি এল আমার চোখের সামনে। এও দেশেরই রূপ। বাছ-বিচারের কী ধার ধারি। যা ভাবতে পারি নি, তাই দেখলাম। তাই তো দেখব। ঘুরে ফিরে এ নিজেকেই দেখা। না দেখলে চিনব কী করে? বিস্ময় আর সন্দেহ? তার নিরসন তো পরে।

এবার তারা মিলেছে আবার চারজন। বস্ত্রে আবৃত করেছে নিজেদের। গঙ্গাস্তোত্র শেষ করে নতুন সুরে আবৃত্তি ধরেছে:

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্তিশাস্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমজনাভম ··,

আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে আসছে তারা। নিশ্বাসের তালে তালে যেন ফুটছে দিনের আলো। পুরুষটিকে দেখেই ভড়কে গেলাম। এ যে একমাথা রুক্ষ চুল। আর বিরাট গুঁফো পুরুষ। চোখও বেশ লালবর্ণ। লজ্জা যে কিন্তু ছিল না মনে, তা নয়; কিন্তু এ যে ভয় ধরিয়ে দিল। ধমকালে যাব কোথায়। তা ছাড়া কুম্ভমেলা সম্পর্কে নানান কথা শুনে একটা শিউরোনি ছিলই মনের মধ্যে।

কাছাকাছি এসে বয়স্ক পুরুষটি আমার দিকে বারকয়েক দেখল। সন্দিগ্ধ ও সপ্রশ্ন দৃষ্টি। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। লোমশ বুক ভরে ছড়িয়ে পড়েছে। ডানায় ও মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষের মণিবন্ধনী। কানের ছিদ্রে পরানো রয়েছে রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল।

তার পেছনে মেয়েদেরও তাই। মনে হল, দুজনেই যুবতী। তাদেরও রুদ্রাক্ষের অলঙ্কার রয়েছে গায়ে। ছেলেটিরও তাই। কিন্তু দেখবার অবসর ছিল না।

আমার কাছে দাঁড়িয়ে যেন অবাক বিস্ময়ে ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করল পুরুষটি। অবিশ্বাস্য হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখের ভাঁজে ভাঁজে। সঙ্কোচের হাসি। মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল, একেবারে ঠেট হিন্দীতে, 'আপনি কি সেপাই নন?'

আমি? কোন দুঃখে? তাই ভেবেছে বুঝি লোকটি? ওভার কোটটার গুণ আছে দেখছি। বললাম, 'না তো!'

সে তার বড় বড় দাঁতগুলি বের করে বলল, 'মহারাজ, আমি ভেবেছিলাম আপনি সেপাই। নমস্কার মহারাজ, নমস্কার। সন্ন্যাসীকে কিছু দান করুন।'

কি ভেবেছিলাম, কী হল। এ যে দান চায়। কিন্তু নারী-শিশু-পরিবৃত, এ আবার কোন্ রকমের সন্ন্যাসী, তা তো বুঝলাম না। বললাম, 'তু-আপ-আপনি সন্ন্যাসী?'

সে হা হা করে হেসে উঠল। বাবা! এ যে অট্টহাসি। মনে হয় মেয়েরা ও শিশুটি মনে মনে মন্ত্র আবৃত্তি করছে।

সে হেসে বললে, 'জী মহারাজ, আমি সন্ন্যাসী। অবধূত আমি।'

অবধূত! কথাটি শুনেছি জীবনে কয়েকবার কিন্তু অর্থ জানি নে। তবু অবধূতের সঙ্গে, এরা করা? জিজ্ঞেস করলাম, 'সন্ন্যাসীজী, অবধূত কাকে বলে বুঝলাম না তো।'

সন্ন্যাসী হেসে পিছন দিকে তাকাল। আমিও সেদিকেই দেখলাম। মেয়েদের মধ্যে যে বালকের হাত ধরে ছিল, সে মাথা নীচু করে হাসছিল। সলজ্জ মিষ্ট হাসি তার মুখে। কুণ্ঠাজনিত লজ্জা। তার বয়স আমার মনে হল সতেরো-আঠারোর ঊর্ধ্বে নয়। আর একজন, সেও হাসছিল। তার লজ্জা নেই। সে তাকিয়ে ছিল অকুণ্ঠ হাসি নিয়ে। তার বয়স অনুমান করতে পারি নে। সে কিঞ্চিৎ খাটো, কিন্তু বলিষ্ঠ শরীর। একটু স্থূলতার লক্ষণও আছে। আর একজনের চেয়ে তার বয়স কিছু বেশীই মনে হয়। ছেলেটি নিতান্ত শিশু। বোধহয় আট-নয় বছরের বেশী নয়। তার কাঁপুনি, তার মন্ত্র, তার বিস্ময়, সব মিলিয়ে সে একটি নিপীড়িত বেচারী মাত্র।

রুদ্রাক্ষ খুলে নিয়ে কাপড় পরিয়ে দিলে এরা যে গৃহস্থের বউ আর ছেলে হয়ে উঠবে এখনি। ওই হাসি-উচ্ছলিত মুখের উপরে ঘোমটা টেনে দিলে, এ মুখের পরিচয় যে বদলে যাবে মুহূর্তে। সন্ন্যাসী বলল, 'মহারাজ, আমার তো এখন সময় নেই। অবধূতের অনেক কথা। চলতে চলতে দুকথায় কিছু বলতে পারি।'

কৌতূহল দুর্নিবার। পেট থেকে পড়েই শিশু অন্ধকারে চেয়ে দেখে অবাক চোখে। দেখে দুর্বোধ মনের কৌতূহল নিয়ে, কুতকুতে চোখ বিস্ফারিত করে।

ছাড়ব কেন। শুনেই নিই, কী বলে। তাদের সঙ্গে আবার চললাম উত্তর দিকে।

ইতিমধ্যে মেলা জেগে উঠেছে। কল কোলাহল শুরু হচ্ছে আস্তে আস্তে। এর মধ্যেই কোন কোন আশ্রমের মাইকে গীতাপাঠ ও প্রাতঃস্তোত্র আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সন্ন্যাসী বলল, 'এক কথায় অবধূত কাকে বলে জানেন? সন্ন্যাসীকেই অবধূত বলে। শৈব উদাসীনকেই বলে অবধূত। তার মধ্যে আছে রকমফের। সকলের তো এরকম নয়। কেউ হংসাবধূত, কেউ ব্রহ্মাবধূত। কিন্তু ওসবে কিছু যায় আসে না। ওসবে বিলকুল গণ্ডগোল আছে। আসলে দুই দল মহারাজ। ভগবান মহাদেবের আপনি ক-টা রূপ দেখতে পান?' বলে সে আমার দিকে সপ্রশ্ন হাসি নিয়ে তাকাল। আমি? আমি তো কিছু জানি না। বললাম, 'আপনিই বলুন।'

সন্ন্যাসী আবার আচমকা হা হা করে হেসে উঠল। বলল, যখন তিনি ঘরে যান, তখন তিনি গৃহী। যখন তিনি বাইরে যান, তিনি উদাসীন। আমিও গৃহাবধূত। আমি ঘরে থাকতে পারি, আমি বাইরেও যেতে পারি। আমি কৌপীন আঁটতে পারি, ইচ্ছা করলে নাও আঁটতে পারি। যে-কোন আওরতকে আমি আমার সঙ্গিনী করতে পারি। আওরত মহাদেবী। মহারাজ, আমার মত অবধূত সিদ্ধিলাভে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।'

হবে হয়তো। কিন্তু গৃহাবধূতের মত এমন বিচিত্র কথা আর কখনো শুনি নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা আপনার কারা?'

সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ বয়স্কাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার অবধূতানী। আমার জেনানা। আর ওই আমার লেড়কি আর লেড়কা। ওদের দীক্ষা হয় নি। হবে।'

আমার মাথায় সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল। দেখলাম, লেড়কি নিতান্ত গৃহস্থ লজ্জাবতী বালিকার মত হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু বালক বেচারী বোধহয় স্তোত্র ভুলে গেছে। সে আমাকেই দেখছে হাঁ করে। আর অবধূতানী যে একজন খাঁটি মা, তা বোঝা যাচ্ছে তার স্নেহমুগ্ধ চোখ দুটি দেখে। কোথাও তো এদের সন্ন্যাসের ছাপ দেখি নে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি দান নিয়েই দিন চলে?

সন্ন্যাসী বলল, 'সাধুকে দান করবার লোক কোথায় মহারাজ। আমার ঘর আছে। আছে কিছু ক্ষেতি-বাড়ি। তাইতেই দিন চলে যায়। এখন তীর্থ করতে এসেছি। ভিক্ষামাত্র সার।'

ক্ষেতি-বাড়ির কথা শুনে অবাক হলাম। বললাম, 'কিন্তু এই ভোর রাত্রে তো কোন সাধুকে স্নান করতে দেখলাম না।'

সন্ন্যাসী আবার হেসে উঠল, 'দেখেন নি, কিন্তু অনেকেই করেছে। সব জিনিস কি দেখা যায়? শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী, এরই নামে মাঘব্রত, কল্পবাসীর অবশ্য কর্তব্য।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝলেন না? মকর সংক্রান্তি থেকে গঙ্গাচরে বাস করতে হয়। থাকতে হয় উপোস করে। শুনতে হয় ধর্মের কথা। শোনাতে হয়, আপনা সাধন করতে হয়। আর ব্রাহ্মমুহূর্তে নগ্ন হয়ে নাইতে হয়। তবে পরম ব্রহ্মা তুষ্ট হন।'

পরম ব্রহ্মাকে তুষ্ট করবার জন্য এই ভয়াবহ শীতে স্নান! অবধূতানীর কথা বাদ দিই। কিন্তু ওই যুবতী আর বালক, ওরা কেমন করে দ্বিধামুক্তভাবে নগ্ন হয়ে স্নান করে। আবার আমি তাকাতে আরক্তিম হয়ে উঠল অবধূতের মেয়ের মুখ। সে এক ভাবী অবধূতানী, কিন্তু গৃহকন্যার চারিত্রিক অলঙ্কার ভরে রয়েছে তার আপাদমস্তকে। তার আলুলায়িত কেশের আড়াল দিয়ে ঢেকেছে সে তার মুখ ও বুক। সামনে যে তার পরপুরুষ।

আমার মনে হল সন্ন্যাসী অবধূত হোক, আর গৃহাবধূতই হোক, আমি দেখছি, সে পরম ধার্মিক সদাহাস্যময়, প্রেমিকা স্ত্রীর স্বামী, আদুরে ছেলেমেয়ের বাবা।

এখন আর আমার এগুনো সম্ভব নয়। আবার তাঁবুর সারি আরম্ভ হয়েছে। লোকালয়ে এসে পড়েছি। সামনেই তাঁবুর পায়খানা সারবন্দী। ফিনাইল আর ব্লিচিং পাউডারের হালকা গন্ধ লাগছে।

পকেটে হাত দিয়ে ব্যাগ বার করলাম। অবধূতানীর চোখে এবার কৃতজ্ঞতার চড়া হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। বালকটি অপলক বিস্ময়ে দেখছিল আমার পয়সার ব্যাগ। আর কুমারী তার এলোচুলের আড়ালে আড়চোখে দেখছিল আমি কী করি।

সন্ন্যাসীকে পয়সা দিয়ে বললাম, 'আমার ক্ষমতা কিছু নেই। এই সামান্য .....'

সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বিস্ফারিত চোখে বাধা দিল আমাকে, 'খবরদার মহারাজ, ওকথাটি বলবেন না। আপনার যা কৃপা, সেই ভগবানের কৃপা। এই কৃপা ভিক্ষা করে বেড়াব আমি সারাদিন। মহারাজ, আজকে নেয়ে উঠে আপনাকে দর্শন করেছি। একদিন সে এমনি করেই হয়তো আমার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে, কিংবা যাবে। কিন্তু আমি তো কোনদিন জানতেও চাইব না! কৃপাভিক্ষাই আমার ভিক্ষা।'

সন্ন্যাসীর হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। লাল চোখ চিন্তামগ্ন। ঠিক চিন্তামগ্ন নয়, যেন পাগলের মত দিশেহারা হয়ে উঠল।

বললাম, 'চলি তাহলে।'

সন্ন্যাসী বলল, 'মহারাজ, আপনি কোথায় থাকেন?'

আশ্রমের নাম বললাম। সে বলল, 'তুলসীমার্গের পথ জানেন আপনি?'

তুলসীমার্গ? ভাবলাম হয়তো মেলার বাইরে কোথাও। বললাম, 'না তো।'

সে বলল, 'দু নম্বর পুলের রাস্তা দিয়ে পুবে গেলে নির্বাণী আশ্রম। সেই পুবের রাস্তাই তুলসীমার্গের পথ। সেই পথে গেলে পাবেন ১০৮ শঙ্করাচার্যের আশ্রম। ওই আশ্রমের পেছনে আমার পাতার ঘর। সন্ধ্যাবেলা আপনি আসবেন সেখানে। কৃপা করে আসবেন।

হঠাৎ কেন তার এই ব্যাকুলতা, বুঝতে পারলাম না। আমার মত নিতান্ত ধর্মবিমুখ আর বস্তুবাদী মানুষের সঙ্গে তার কী কথা হবে। বললাম, 'সময় পেলে যাব।'

'আচ্ছা, মহারাজ, আপ—কা—কৃপা।'

বলে তারা সদলবলে এগিয়ে গেল। অবধূতানী বিদায় নমস্কার জানাল ঘাড় বাঁকিয়ে হেসে। বালকটি দাঁড়িয়েই ছিল আমার দিকে তাকিয়ে। দিদি টের পেয়ে, পেছন ফিরে নিঃশব্দে হেসে উঠল। হেসে এসে তাড়াতাড়ি ভাইয়ের হাত ধরে নিয়ে চলে গেল।

বিদায় দিয়েও দাঁড়িয়ে ছিলাম। গৃহাবধূত। কে কেমন জানি নে। কিন্তু এ যে পুরো মানুষ। হোক তার নাম গৃহাবধূত। তার পিতৃত্ব, তার স্বামিত্ব, তার ঘর ও সংসার এই নিয়ে যদি তার সব সুন্দর হয়ে ওঠে, তবে উঠুক। আজ আর তার বাইরে তার প্রতি শুভেচ্ছা আমার কী থাকতে পারে।

তাঁবু-লাইনের এপাশ-ওপাশ দিয়ে যেতে যেতে হারিয়ে গেল ওরা চারজন। হারাল না মন থেকে। মানবী মোহের অঞ্জনটুকু একটি অপরূপ রঙের ছোপ

লাগিয়ে রেখেছে মনের মধ্যে। সেই সঙ্গে কিছু বিস্ময়, একটু সংশয়।

ভাবলাম, কোনটুকু সত্য। একদিকে অপরিসীম উদাসীনতা, আর একদিকে সীমাহীন লজ্জা। যেন নিরালার লজ্জাবতী লতাটির মত। ডাঁটোসাঁটো লতাটি, দিব্যি চিকন পাতা মেলে সর্বাঙ্গ উদাস করে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। ছোঁয়ামাত্র মুখ ঢেকে মিশে যায় মাটির বুকে।

কিন্তু লতা নয়, মানবী যে। সে সন্ন্যাসী-বালা ঘরে-বাইরে, জীবনে-মরণে নারী আমাদের সঙ্গিনী। নানান বেশে নানান সম্পর্কে পরস্পরের অসঙ্গতি চোখে লাগে। বৈচিত্র্যে কৌতুহলী হই। দুঃখে জানাই সমবেদনা, সুখে দিই সঙ্গ। মনের চারপাশে খাড়া রয়েছে সমাজের প্রাচীর। তাই ভাবি। তাই ভাবলাম। ঘর ছেড়ে চলে এসেছি পথে। 'কোন বাঁধন রাখবো না গো' গেয়ে গেয়ে পথে বেড়ালেও মন মাঝে মাঝে থমকায় বৈ কি। সেটুকুনই তো বাঁচোয়া। নইলে আকাশ বাতাস সবই যে একাকার হয়ে যেত। ফুল, জল, পাতা, পাখি সবই ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন অনুভূতি জাগায়। গানে আর সুরে আনে বৈচিত্র্য। নইলে চোখ থেকেও কানা। মন থেকেও পাথর।

তাই ভাবি, যে মেয়ে লজ্জায় লজ্জাবতী, সে মেয়েই অকুণ্ঠ উদাসীনতায় প্রকৃতির মত নগ্ন। কোনটা সত্য?

রূপ দেখে বোঝা যায় না। বোঝা যায় না হাত দিয়ে স্পর্শ করলে। মন দিয়ে ছুঁতে হবে। জানি নে কোথায় নির্বাণী আশ্রম, আর কোথায় তুলসী-মার্গের পথ। বালুচরের কোন সীমানায় আছে অবধূতের পর্ণকুটির। তবু দেখার দেখা নয়, দেখার মত করে দেখতে চাই। নইলে দেখা সাঙ্গ হয় না। সে হোক ভারতের গৌরব কিংবা হোক কলঙ্ক।

পূর্ব-দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সোনালী রোদ। রোদ তো নয়, মৃতের প্রাণসঞ্জীবনী। শীতার্তের ব্যথিত আড়ষ্ট দেহে উষ্ণ দেহের আলিঙ্গন। কী মিষ্টি, কী সুন্দর, কত আরাম! দুদিন যাক, আবার এই রোদকেই আড়াল করে গাল দেব মনে মনে। এই-ই নিয়ম।

রোদ উঠেছে। ঝুসির সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছে বালুচরের বেলায়। তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নরনারী। মাইলের পর মাইল জুড়ে গুনগুনানি উঠেছে, কোলাহলের নিত্যনৈমিত্তিক স্নানের জন্য চলেছে সবাই জলের দিকে। একদিকে মাইক-যন্ত্রের যান্ত্রিক চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর আশে-পাশে দেখছি স্নানার্থী অর্ধনগ্ন সাধুরা চলেছে স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে, কখনো বর্ণবিদারী শব্দ উঠছে, 'জয় মহাদেও কি জয়', 'রাম রাম, সীতারাম'। দূর থেকে ভেসে

আসছে অনেক কাড়া-নাকাড়ার আওয়াজ। তার সঙ্গে স্তিমিত শিঙাধ্বনি।

জাগছে মেলা। আর দাঁড়াতে পারি নে। আবার তো ফিরে যেতে হবে সেই দিদিমা আর পেল্লাদের তাঁবুতে। তার চেয়ে খুঁজে নিই আশ্রয়।

কিন্তু কোন দিকে যাই। কোন দিকে যাই ভেবে পিছন ফিরতেই দেখি, আপাদমস্তক কম্বলে-ঢাকা পাঁচ-বষ্ঠি। আমার পিছনেই যেন গুপ্ত আততায়ী। কী সাংঘাতিক! পাঁচ-বষ্ঠি তো নয়, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বইয়ের সেই দৈত্য। কিন্তু কেন, কী করেছি, কারোর বাড়া ভাতে তো ছাই দিই নি। তবে এমন বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত লেগে রয়েছে কেন সে। না, বাঘের পেছনে ফেউ বলি কি করে। শিকারের পেছনে বাঘ। রাত না পোহাতে এ কি বিভ্রাট! মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবু কথা না বলাটা বিসদৃশ দেখায়। হেসেই বললাম, 'ডাক্তারবাবু যে?'

ডাক্তার মুখিয়ে ছিল। বলামাত্র মাথা থেকে কম্বলটা খুলে ফেলল সে। পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার ভয়ঙ্কর মুখটা। যেন কোমর বাঁধছে। কিসের যে এত রাগ, তা জানি নে। প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ডাক্তার নয়, ধন্বন্তরি। রোগের ওষুধ জানি।'

সে তো ভাল কথা। কিন্তু কী কথার কী জবাব। পৃথিবীতে একরকমের মানুষ আছে, ভাল বল, মন্দ বল, তাদের মন পাওয়া দায়। এগুলে ভেড়ের ভেড়ের, পেছু নিলেও নির্বোংশের ব্যাটা। ছেলেবেলায় দেখেছি, পাড়ার মোড়ে থাকত একটা ছেলে। নাম বেচা। ছেলে নয়, প্রায় মিনসে। বেচা ছিল এমনই এক মানুষ। তার কিছুই করি নি কোনদিন। কিন্তু তার সামনে পড়লেই চোখ কুঁচকে তাকাত খপিসের মত। আর প্রাণভরে কষাত গাঁট্টা, ঘুষি, চড়। একেবারে অকারণ। বাড়ী থেকে বেরুনো এক আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাউকে বলতেও বাধতো। খালি মা কালীকে ডাকতাম, 'হে মা কালী, হয় বেচাদের ও বাড়ী থেকে উঠিয়ে অন্য পাড়ায় নিয়ে যাও, না-হয় ওর হাত দুটো দাও ভেঙে।'

এই পাঁচ-বষ্ঠি' যেন তেমনি। আমার ছেলেবেলার বেচা। কিন্তু সেই ছেলেবেলার রাজ্যে আমরাই ছিলাম আমাদের নবাব-বাদশা-খলিফার দল। দুর্বল হলে বহু আজগুবি সন্ধিসূত্রে বশ্যতা স্বীকার করতেই হত।

কিন্তু এখানেও কি সেই! ডানা মেলে উড়ে এলাম পায়রাটির মত, ওদিকে বাজপাখি ঠোঁট শানাচ্ছে। তবু বললাম, 'কোথায় চললেন?'

ডাক্তার এক পর্দা গলা চড়াল, 'যেখানেই চলি, তোমাকে চোখে চোখে

রাখছি ঠিক। হ্যাঁ।'

আমিও একটু উষ্মাভরেই বললাম, 'কেন বলুন তো?'

'আমার খুশি।' বলে ডাক্তার বুক চাপড়াতেই গাদা খানেক ধুলো ঝরে পড়ল তার কম্বল থেকে। আর গলা কি—একেবারে বাজখাঁই। রাগও যেমন হল লজ্জাও হল তেমনি। আশেপাশে লোক। সবাই কৌতূহলী হয়ে দেখছে হাঁ করে।

থামাতে গেলাম। কে শোনে। ডাক্তার ঠিক তেমনি গলায় বলে চলল, 'মনে করেছ, আমি তোমাকে বেরুতে দেখি নি? রাত করে কেন ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছ? কথা নেই, বার্তা নেই, বেরুলেই হল?'

চেষ্টা করে গলা চড়াতে পারি নে। বললাম, 'কেন বেরুনো কি নিষেধ?'

'চোপ! চোপরাও! বলেছিলাম না, তোমাকে দেখে নেব। আই অ্যাম ডক্টর পাঁচুগোপাল রায়।'

তা ঠিকই, কিন্তু এ অপমানের কারণ কি? কারণ কি খ্যাপামির? দেখে নেওয়ার ব্যাপার হলে দেখতে হবে। তা কি এমন করে? স্বভাবতই কৌতূহলী লোক দু-একজন জমেছে আশেপাশে। মেলার ব্যাপার। কে রোধ করবে। হায় রে, এ কোন্ অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ছুটে এলাম! বললাম, 'ডাক্তার নয়, ধন্বন্তরিই। কী দেখবেন, দেখুন। অত চেঁচাচ্ছেন কেন?'

'আলবত চেঁচাব।' বাংলায় যাকে বলে তড়পানি, ডাক্তার সেরকম শুরু করল।

তারপর যা হয়। একজন সাধুবেশী মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল ডাক্তারকেই, 'ক্যায়া হুয়া বাবা?'

যা বলো, সবই আগুনে ঘি। সাধুকেই তেড়ে গেল, 'যো হুয়া সো হুয়া, তুম্‌কো কেয়া? তুম্ আপনা রাস্তা দেখো।'

সাধুর বৈরাগ্যের মিষ্টি হাসি চকিতে উধাও। বেচারা মুখ গোমড়া করে চুপ করে গেল।

ডাক্তার আমার মুখের সামনে তর্জনী নেড়ে আবার বলল, 'আবার আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে ধন্বন্তরী বলে?'

'কেন আপনিই তো—'

কে শোনে। কোথায় আগুন লেগেছে না জানলে জল ঢালবে কোথায়! ডাক্তার প্রায় লাফিয়ে ওঠে আর কি! 'জানো, আমি তোমার বাপের বয়সী?'

তাতে আর আশ্চর্যের কী? বললাম, 'তা তো দেখছিই। তা আমাকে

কেন? বাপের বয়সী আছেন, ঘরে গিয়ে নিজের ছেলেকে শাসন করুন।'

'কেন আমার কি ছেলে মেয়ে থাকতে নেই?'

কথায় কি অদ্ভুত অসঙ্গতি। ডাক্তারের কোয়ালিটি ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। শেষটায় কি একটা বদ্ধ পাগলের হাতে পড়লাম? বললাম, 'থাকবে না কেন? একশোটা থাকতে পারে।'

'একশোটা?'

'না হয় দুশোটাই?'

'তার মানে, আমার কিছু নেই? আমাকে আঁটকুড়ো বললি তুই?'

একেবারে 'তুই'! ট্রেনের ভিড়ে একবার মোষের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বিপদে পড়ে। এও প্রায় তেমনি বিপদ। উদ্ধার পেতে হলে পালটা রূপ ধরতে হবে। উপায় নেই। রুখে-মুখে চড়া গলায় ডাক্তারকে শেষবারের জন্য সাবধান করতে গেলাম।

কিন্তু কাকে বলব। ডাক্তার ততক্ষণে কম্বলটি বগলদাবা করে হাঁটা ধরেছে। হাঁটছে খ্যাপা মোষের মতই। পদাঘাতে বালু ছিটকে যাচ্ছে। খানিকটা গিয়ে আবার দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই বলল, 'আমি আঁটকুড়ো? আচ্ছা, দেখে নেব তোকে, দাঁড়া।'

বলে আবার চলতে আরম্ভ করল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল যেন। ঝড় বয়ে গেল একটা। ছিলাম সুস্থ, করে গেল উদ্‌ভ্রান্ত। এতই আকস্মিক ব্যাপার, এমনিই অদ্ভুত যে, তার না বুঝলাম অর্থ, না কারণ। হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ যে উন্মাদ!

কে জানত। কে জানত, পথে বেরিয়ে এমন মানুষের হাতে পড়ব। ভেবেছিলাম, দু-চোখ ভরে দেখব। বাজাব আপন মনে, তাল দিয়ে যাব নিজেরই সুর। এ যে তাল আর সুর, সব ছরকুটে যায়।

তবে হ্যাঁ, বেরিয়েছি, একটা কথা ভাবি নি তো! প্রকৃতির ঘরের কোন্ রূপসী আমার জন্য সাজিয়ে রাখবে শুধু নির্মেঘ আকাশ, ফোটা ফুল আর সুকণ্ঠ বিহঙ্গী! তার বিচিত্র দেহ জুড়ে নেই গুমসোনি গুমোট? ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগের ঘনঘটা? তবে? পথের দশাই এমনি!

কত রূপ! কিন্তু কই, কালকেও তো ডাক্তারকে এতখানি গণ্ডগোলে মানুষ মনে হয়নি! কিছুটা মনে হয়েছিল, কিন্তু একেবারে এত অসঙ্গত ঠেকে নি। আর, একি শুধু আমার কাছে? এই পাগলামি, খ্যাপামি, এ অসঙ্গতি?

অসঙ্গতি। মনে পড়ল, রাত্রে নিঃসাড়ে ডাক্তারের তাঁবুতে প্রবেশ। জায়গার অভাবে চলে যাওয়া। তারপরে এত কথা। তার শেষের কথাগুলি। শেষের কথাগুলিতে শুধু রাগ নয়। চোখ তার যন্ত্রণায় লাল হয়ে উঠেছিল যে! এই অসঙ্গতির মধ্যে কোথায় একটু সঙ্গতি রয়েছে। বেসুরের মধ্যে সুর। ডাক্তার চলে গেল না, যেন পালাল। পালাল যেন অসহায়ের মত।

মন ফিরে গেল আমার। যা বল, তাই বল। লজ্জা-ঘেন্না-ভয়, তিন থাকতে নয়। উৎসুক হয়ে তাকালাম ডাক্তারের পথের দিকে। ওই যে দেখা যায় এখনো। মস্ত লম্বা মানুষ। ছোট হয়ে আসছে। চলেছে গঙ্গার ধার দিয়ে, উত্তরে। ভুল করেছি। ছেড়ে দেব না, ধরব ডাক্তারকে।

কী আমার কপাল! পাশে জড়ো হয়েছে সব অবাঙ্গালী মেয়ে-পুরুষ। গুলতানি করছে নিজেদের মধ্যে। আবিষ্কার করছে আমার আর ডাক্তারের সম্পর্ক। দুই বাঙালী, আপনা-আপনি ঝগড়া বাধিয়েছে। হবে দুই ভাই, নয়তো বাপ্-ব্যাটা। আপসে ঝগড়া মিটিয়ে নাও বাপু। কি বল, অ্যাঁ?

ঠিকই, দাঁড়িয়েছি মঞ্চে, ভূমিকা নিতে হবে না? না নিলে দর্শক ছাড়ে? নিজেই কি ছাড়ি?

সেই ভাল। আপস করব ডাক্তারের সঙ্গে। হাঁটা ধরলাম। মিলিয়ে যাচ্ছে ডাক্তারের চেহারা। ডাকলে শুনতে পাবে না। পা চালিয়ে দিলাম দ্রুত। আশ্রয় খুঁজব পরে।

দোকানপাট খুলেছে। কত দোকান কত রকমের। দেখবার সময় নেই। পদে পদে বাধা, মানুষের দঙ্গল। মেয়েমানুষের হাত ধরে সব লাইনবন্দী হয়ে চলেছে। একেবেঁকে যেতে হয়।

অনেকখানি এসেছি। ডাক্তার তেমনি চলেছে। একেবারে নাক বরাবর! ডাকলে শুনতে পাবে কি-না জানি নে। তবু একবার ডাক দিলাম, 'ডাক্তারবাবু!'

ঠিক শুনেছে। থমকে দাঁড়াল ডাক্তার। বাজে-মাথা-মুড়নো তালগাছের মত বিরাট চেহারা। হঠাৎ মনে হয়, অনেকদিনের পরিখাবাসী নিগ্রো সৈনিক। পেছন ফিরে একবার দেখল আমার দিকে। দেখেও আবার চলল হনহন করে।

ডাকলাম, 'শুনুন ডাক্তারবাবু!'

আর নয়। ডাক্তার ততক্ষণে সেতুতে পা দিয়েছে। ওপারে চলল যে! চলুক, ভেবেছি যখন, ডাক্তারকে একবার ধরবই।

ওপারে, কেল্লার প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে ধরে ফেললাম ডাক্তারকে। প্যারেড

গ্রাউণ্ড, সঙ্গমের ত্রিকোণ ভূমি। এখন মেলার আসর। ডাক্তারকে ধরে ফেললাম একটা ভিড়ের কাছে। অনেক মেয়েপুরুষের ভিড়। কিসের ভিড় না দেখেই ডাক্তারকে ডাকলাম।

বোধহয় ভিড়ের বাধাতেই দাঁড়াতে হল ডাক্তারকে। দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। মুখে কোন কথা নেই। গুঁতোবার আগে সিং কাত করে যেমন আড়চোখে তাকায় ষাঁড়, তেমনি ভাবখানা ডাক্তারের।

কিন্তু কী যে বলি। আশ্চর্য! এত যে ছুটে এলাম, এখন আর মুখে আমার রা ফোটে না। সত্যি, কী বলব?

সামনেই ভিড়। ভিড়ের কাছেই একটা মস্ত মোটরগাড়ি। গাড়িটাতে রেকর্ডে গান দিয়েছে সেই মাতাল মেয়ের। মাতলামির হিক্কা আর 'হম্ পী-কে আয়ে।' কী যেন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে গাড়িটা থেকে। কী দিচ্ছে। চা! আরে, আরে, তাকিয়ে দেখি গাড়িটাতে লেখা রয়েছে, 'অন্নপূর্ণা উইমেনস্ রেস্টুরেন্ট'।

চৌরঙ্গীর কাফেটেরিয়া। কোথা থেকে এসেছে? দিল্লী, না লক্ষ্ণৌ। সামনে যমুনা, আর এই চলন্ত কাফেটেরিয়া। দিব্যি ফোল্ডিং চেয়ার-টেবিল পেতে আসর জমিয়ে তুলেছে এই বারো-মাসের বালুচরে। টেবিলে টেবিলে উষ্ণ চায়ের কাপে ধোঁয়া। শীতে আঁটো-সাঁটো হয়ে সুড়ুত সুড়ুত করে চুমুক দিচ্ছে সুবেশিনী মেয়ে আর সুবেশ পুরুষের দল। ওদিকে কুপন আর ক্যাশ নিয়ে বসেছেন ক্যাশিয়ার বাবু। মোটা-সোটা টেকো মানুষ। শীতে হাত কাঁপছে থরথর করে।

একটু যে ভয় না ছিল, তা নয়। তবু বললাম, 'চা খাবেন ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারের মুখে কথা নেই। আড়চোখে যেমন আমাকে দেখছিল, তেমনি একবার দেখল অন্নপূর্ণার গাড়ির দিকে। দেখল চায়ের মজলিসের দিকে। তারপর গাড়ির শো-কেসের খাবারের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

মৌনতা সম্মতির লক্ষণ কি-না জানি নে। কিন্তু কথা আর ফুটবে বলে মনে হল না। যেন—যা বলার তা বলা হয়ে গেছে। আর মুখ খুলবে না।

বললাম, 'দাঁড়ান একটু। আমি কুপন কেটে নিয়ে আসি।'

বলে কুপন কেটে আগে দু হাতে খাবারের ডিশ নিয়ে এলাম। এসে দেখি ডাক্তার নেই। যেমন হতাশ হলাম, মনটাও খরাপ হল তত। ডাক্তার একদৃষ্টে তাকিয়েছিল খাবারের দিকে। খাবার নিতে নিতেও তাই লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে সে কোথায় গেল। মজলিসের দিকে ফিরে দেখি, ডাক্তার দিব্যি

চেয়ারে বসেছে! চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে তার টেবিলের একমাত্র সঙ্গিনীর দিকে। পাঁচ-বত্তির বসার ভঙ্গি ও চোখ দেখে বোধহয়, চা আর নামছে না সে বেচারীর গলা দিয়ে।

আমি তাড়াতাড়ি খাবারের ডিশ দুটো ডাক্তারের সামনে রেখে জল আর চা আনতে চলে গেলাম।

চা আনতে গিয়ে দেখি মস্ত বড় কিউ পড়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম সারবন্দী লাইনের পিছনে। একটু অস্বস্তি লাগল। অস্বস্তি লাগল এই ভেবে, ডাক্তার না আবার সরে পড়ে। কিন্তু লাইনে দাঁড়াতেও বড় আনন্দ হচ্ছে।

সত্যি, মেলা যেন নতুন রূপে জমে উঠেছে। মেতে উঠেছে সকলে। বোধহয় একেই বলে মেলা। ইংরেজীতে যাকে বলে মুড, সেই মুড এসেছে সকলের মনে; মেলার মুড। অন্ততঃ আমার চারপাশে যা দেখি তাই।

অন্নপূর্ণার গাড়ির রেকর্ডে 'হম পী-কে আয়ে'র মাতলামি শেষ হয়েছে। হঠাৎ বেজে উঠেছে সেই মান্ধাতা-আমলের বাংলা রেকর্ড। লম্ফর আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশী। রেকর্ডে আর গানের কথা শোনা যায় না। যন্ত্রসংগতের অস্পষ্ট অথচ কর্ণবিদারী ধ্বনি শোনা যাচ্ছে কাঁসর-ঘণ্টার মত। তারই ভেতর থেকে পিঁ পিঁ করে শোনা যাচ্ছে, 'প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে, রয় না বাহিরে'।

তা হোক। প্রয়োজন হচ্ছে একটা শব্দের। গান শুনছে ক-জনা? ওদিকে কাড়া-নাকাড়ার ধ্বনি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঁধের উপর যাচ্ছে যত লোক, নেমে আসছে তার চেয়ে অনেক বেশী। যেন পিল-পিল করে নেমে আসছে পিঁপড়ের সারি; আসছে লটবহর নিয়ে। টাঙ্গা আর রিক্সা, ঘোড়া আর গাধা, লরি আর বেঁটে চ্যাপ্টা প্রাইভেট কার। আর দিগন্ত থেকে দিগন্তে শুধু মানুষ। নর আর নারী। রঙ আর রঙ। কথা আর কথা। গান আর গান। মাইকের কথা কতবারই বা বলব।

চারিদিকে এত কোলাহল। কিন্তু ধন্য সেই আর্তস্বর, 'হেই বাবু ভাইয়া পঙ্গু লোক সকল, হেই ধর্মীবাবা।'.. আশেপাশের সব গণ্ডগোল ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে সেই অদৃশ্য ভিখারীর তীব্র চিৎকার। চীৎকার খাবার-ফেরিওয়ালাদের। আম্রুদ্। লে সস্তা আম্রুদ্। পেয়ারার নাম আম্রুদ্। আম্রুদ আর পুরি। পুরি আর প্যাঁড়া। প্যাঁড়া আর মোম্ফালি। মোম্ফালি হল চিনেবাদাম। দেখতে পাচ্ছি, ফেরিওয়ালাদের পেছনে লেগেছে পুলিশ। লাইসেন্সের ব্যাপার। হাজার হাজার টাকা জমা দিয়ে দোকান করেছে মহাজনেরা। ফেরিওয়ালাদের অনধিকার প্রবেশে বাধা পড়বেই, কিন্তু

তাড়া দেবে কত। কত লাগবে পেছনে। পাঁচিল নেই, গেট নেই। মুক্ত সঙ্গম-প্রান্তর চারিদিকে করছে হা হা। খাওয়া করবে কোথায়। যাবে এপার থেকে ওপারে। প্রান্তরের এপাশ থেকে ওপাশে। যেখানেই যাবে, মানুষ। মানুষ থাকলেই পেট। আর মেলার মানুষের পকেটের পয়সা। সে তো খাবার সন্ধানী পিঁপড়ের মত। ফুটোর এপাশ ওপাশ দিয়ে বেরোয়।

যে কিউতে দাঁড়িয়েছি, সেখানে আর এক রূপ। কুম্ভমেলারই ভিন্ন রূপ। কিউ দিয়েছে মেয়েপুরুষ। চোখ-ঝলসে-যাওয়া উলেন পোশাকের ছড়াছড়ি। মেয়ে-পোশাক আর পুরুষের হাল-ফ্যাসানের আমেরিকান স্যুট ঝকঝকে আর চকচকে। খুবই দামী, নিঃসন্দেহে। এই সাত-সকালেই ঠোঁটে আর নখে রঙ পরেছে। পরিপাটি অ্যালবার্ট ফ্যাশানের চুল।

ওরকম চুল দেখলেই আমার একটি কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে একটা মজুর বস্তির কথা। বাপ শাসন করছে ছেলেকে। কারখানার মজুর দুজনেই। শাসন নয়, বোধ হয় বিদ্রূপই করছিল বাপ ছেলেকে। ছেলের পোশাকের বড় পরিপাটি। তাই বাপ বলছিল, 'বড়বাজারের ফোকট্ কা পাতলুন, চোরাবাজার কা জুত্তা, ঔর চুল কো সিঙ্গাড়া বনা কর কাহাঁকা লাটসাহিব কা ভাতিজা আইলান তু?'

বড়বাজারের ফোকোটের প্যাণ্ট আর চোরাবাজারের জুতোর একটা মানে বুঝি। কিন্তু চুলকে সিঙ্গাড়া বানানো? সে আবার কি! পরে শুনেছিলাম ওই অ্যালবার্ট ফ্যাশান হল সিঙ্গাড়া। হেসেছিলাম, কিন্তু সিঙ্গাড়ার সঙ্গে অ্যালবার্টের এই আঙ্গিকগত সাদৃশতা সত্যই লক্ষণীয়!

যাক সে কথা। পরিবেশটি নতুন রকম। ফ্যাশানটা স্বভাবতই আজকালকার স্টুডিও-ঘেঁষা। গ্রেগরি পেক আর সুশান হেওয়ার্ড, দিলীপকুমার আর...। যাক নাম বাড়িয়ে লাভ নেই। ফ্যানবৃন্দ আহত হতে পারেন। এ বিষয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের বক্তব্য বলার ইচ্ছা রইল পরে। তা বলে আমার মত ব্যতিক্রমও আছে বৈকি কিউতে। রাজস্থানী নাগরা আর গালপাট্টা, চৌদ্দ হাত শাড়ি আর তিন ইঞ্চি ডায়মেটারের নথ। তাদের হাসির আর অন্ত নেই। 'টিকস্' কেটে চা কিনতে হয়? আজব কাণ্ড! এটা জেনানা-লোকেদের চায়েখানা? আরে রাম রাম কহো। এসে পড়ো, এসে পড়ো। চার পয়সা দিয়ে টিকস্ কাটাও আর লাইন দিয়ে পেয়লীভর চা পিয়ে নাও।

চা পাওয়ার ও খাওয়ার এ অভিনব পন্থা দেখবার জন্যই ভিড় করেছে কত

মানুষ। পুরুষ আর মেয়েমানুষ। কৃষাণী ঘোমটা-খসা উদাসিনী। এ কি গো বিস্ময়! জেনানা তক্ লাইন দিয়ে চা খাচ্ছে। দিনে দিনে কতই হবে! তা ছাড়া বে-আব্রু মেয়েদের পোশাকই কি। পাক্কা মেমসাহেব বনে গিয়েছে সব।

খুব গা টেপাটেপি আর হাসাহাসির ধুম। এমন কি পুরুষদের মধ্যেও। আমার সামনেই হাল-ফ্যাশানের স্যুট-পরা এক যুবক। তার সামনে এক সুবেশিনী যুবতী। সম্ভবত স্ত্রী। ভেবেছিলাম, গান কেউ শোনে না, কিন্তু এরা দুজনে কিউতে দাঁড়িয়ে সেই আলোচনাতেই মশগুল। তারা কান পেতে আবিষ্কার করছে, কী গান বাজছে রেকর্ডে। যুবতী বলল, 'বোধহয় ওড়িয়া গান।' যুবক বলল, 'আমার মনে হচ্ছে মাদ্রাজী।'

আর আমি বাংলা গানের এ ভাষা-আবিষ্কার শুনে হাঁ। যত অস্পষ্টই বাজুক, তা বলে, 'প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে' একেবারে ওড়িয়া না-হয় মাদ্রাজী! কপাল আমার বাংলা ভাষার। ধন্য আমার বাংলা গানের শ্রোতা!

মেলা সরগরম! এই আবেষ্টনী, আর চেয়ার-টেবিলের ছড়াছড়ি রেকর্ডে কী বাজবে? ঘরছাড়া মানুষের গলায় গান আপনি গুনগুনিয়ে ওঠে। এ পরিবেশ দেখে ভুলে যেতে হয় অবধূতের কথা। বিস্মৃতি আসে কুম্ভমেলার। শহুরে জীবনের এক নতুন পকেট যেন।

চা পেতেই ছুটে এলাম। ছি ছি, ডাক্তার এখনও সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কটমট করে। তার-টেলিফোনের নেহাত এক সুন্দর-মুখ ভালো মানুষ সঙ্গিনী। অবাঙালিনী নিঃসন্দেহে। কোন কোন শিকারীর নজরেই বন্দী হয়ে পড়ে শিকার। মহিলাটির অবস্থা প্রায় সেইরকম।

আমি আসতেই বোধহয় একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বেচারী। চোখে তার বাসি সুর্মার দাগ। নেহাৎ বাঙালিনীর মত চোখ তুলে তাকাল। ভাবখানা, কী রকম মানুষ! একটা পাগলকে বসিয়ে রেখে গেছ এখানে?

অপরিচয়ের মধ্যেও মানুষ কথা বলে বৈ কি। বলে নীরবে, চোখে চোখে। মহিলাটি একটি কটাক্ষ করে উঠে গেল। দেখলাম, পেয়ালায় চা রয়েছে এখনো। চুমুক দেবারও সুযোগ পায় নি।

সে উঠে যেতে ডাক্তারও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দলা-করা কম্বলটা টেবিলে রেখে ফিরে তাকাল মেয়েটির চলার পথের দিকে। তারপর আমার দিকে। খ্যাপামিটা এখনও একেবারে যায় নি মুখ থেকে। কোন কথা না বলে দিব্যি পেয়ালা টেনে নিয়ে চুমুক দিল। খাবারটি খাবে না নাকি? কি জানি!

যা মানুষ!

ভাবতে না ভাবতেই থাবারে হাত পড়ল ডাক্তারের। যত হাত পড়ে ততই ডাক্তারের ভয়ঙ্কর মুখের নিষ্ঠুর রেখাগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! অবিশ্বাস্যরকম কোমল হয়ে উঠেছে ডাক্তারের মুখ। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের. মনস্টারের মুখে মানবিক স্ফুরণ। নিজে খাব কী। ডাক্তারের মুখে কোন অদৃশ্য জাতুদণ্ডের স্পর্শ লেগেছে, তাই খুঁজছি। শুধু কোমল নয়, তৃপ্তিতে, সুখে, নতুন সুষমায় ভরে উঠেছে ডাক্তারের মুখ!

লোকে বলে, বিশেষ করে গৃহিনীরা বলেন, 'খাওয়া দেখেও সুখ।' সে কোন্ খাওয়া। এমনি খাওয়া কি? বিস্ময়ের সঙ্গে খুশীর আমেজ দেখা গেল আমার মনে। এ আবার কেমন খুশী, তা তো জানিনে। খেয়ে খুশী বরাবর। খাইয়ে খুশী তো হই নি কখনো।

কী বিচিত্র! আমার ছেলেবেলার বেচা এল ফিরে। আমার যৌবনে এল এই কুম্ভমেলার দিগন্তের হাটে, পাঁচ-বস্তির বেশে।

ছেলেবেলায় আমার পিঁপড়ের মত খুঁটিয়ে বেড়ান সঞ্চয়। সেই সঞ্চয়ের ঐশ্বর্য দিয়ে একদিন ভয়ে দুঃখে, আশায়-নিরাশায় খাইয়ে দিয়েছিলাম বেচাকে। নোটনের ডালপুরি, লালমোহনের সন্দেশ, লজেন্স, বাখরখানি। কত কি! সেই থেকে সন্ধি স্থাপন হয়েছিল। বেচার খাওয়ায় সুখ পেয়েছিলাম, তা নয়। বরং সঞ্চয়ের শূন্য থলিটা দেখে, লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। সন্ধি হয়েছিল চোখের জল দিয়ে। কিন্তু বেচার কথা তো ভুলি নি। ভুলি নি, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেন তুই রোজ খাস? দেখিয়ে দেখিয়ে কোনদিনই খাই নি। ওর দেখার মধ্যে ছিল আমার দেখানো।

দুটো প্লেটই সাবাড় করেছে ডাক্তার। করে ডাক্তার একটু বা অপ্রস্তুত যেন। তাকাতে পারছে না আমার দিকে। চা-ও শেষ।

দেখলাম, ডাক্তারের মোটা স্থূল ঠোঁটজোড়া ভিজে উঠেছে। এবড়ো-খেবড়ো মুখের চামড়া উঠেছে টান-টান হয়ে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সেলাই-বহুল মোটা জামা আর তালি-মারা প্যান্ট। একটা রীতিমত বলিষ্ঠ মানুষ। কিন্তু কী করুণ!

উঠে গেলাম ক্যাশিয়ারের কাছে। কুপন কিনে খাবার নিলাম। হিসাবের কড়ি পকেটে। টায়টিকে খরচের কড়ি। পথে বেরিয়েছি, এক পয়সা মা-বাপ। না থাকলে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করবে না। দৈবজ্ঞ মরবে কাঁথা বয়ে।

তবুও। উপোস দেব একটি বেলা। ভাবছ, আবেগে হয়েছি অচৈতন্য।

হবেও বা। কিন্তু মনের খুঁত-খুঁত রাখব কোথায়। হৃদয়জোড়া বিষকুম্ভ। মনে অশান্তি দিয়ে তাকে আরও ভরে দিই কেন। অমৃতকুম্ভের খোঁজ পাই নে এখনো। ছাড়ি কেন আত্মতৃপ্তিটুকু। চোখের উপর ভেসে উঠছে খালি বলরামের মুখটি।

খাবার দেখে ডাক্তার আরও অপ্রস্তুত। অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল আমার দিকে। কি জানি, আমিই আবার রেগে গিয়েছে কি না, সেটুকুই তার সংশয়।

বললাম, 'খান।'

খাবারের দিকে দেখে ডাক্তার আবার তাকাল আমার দিকে। তারপর টেনে নিল একটা প্লেট। সে প্লেটখানিও শূন্য হল। দু প্লেট এনেছিলাম আবার।

বাকি প্লেটটি দেখিয়ে বললাম, 'ওটাও খেয়ে ফেলুন।'

এতক্ষণে মৌনব্রত ছাড়ল ডাক্তার। বলল, 'তুমি?'

'আমি চা খাব।'

ডাক্তার আমার দিকে তাকাল। সর্বনাশ! আবার খ্যাপামির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু খেপল না। খেল না। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বার করল একটি ছোট কলকে। তেঁতুলবিছের মত একটি চকচকে লাল গাঁজার কলকে। আবার এ-পকেট ও-পকেট করে বেরুল খানিকটা পাটের ফেঁসো আর নারকেলের ছোবড়া। কিন্তু আর কিছু নয়। বিরক্ত হয়ে সেগুলি পকেটে রেখে বলল, 'বিড়ি-টিড়ি আছে?'

বিড়ি তো নেই। পকেট থেকে বার করে দিলাম সিগারেট। বুঝলাম, ওই বস্তুটি তেমন মনঃপুত নয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'পেট ভরেছে আপনার?'

ডাক্তার বলল, 'পেঠ আবার কখনো ভরে? না, ভরেছে কোনদিন কারুর? কী করে ভরবে?'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ডাক্তার বলল, 'কালকে যাও বা পেল্লাদের দিদিমা দিত দুটো খেতে, সে তো তুমি পেল্লাদ এসে ঘোচালে।'

বললাম, 'আমি?'

'তবে কে?'

'কি রকম?'

ডাক্তার আবার প্রায় স্বমূর্তিতে দেখা দিল। বলল, 'ওই যে, বুড়ির মন কেড়ে মেজাজ খারাপ করে দিলে। কিপটে বুড়ি। বুড়িগুলো সব কিপটে।

ওরকম ঘোলটা বুড়িকে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছি দেশ থেকে। তখন বলে, কত কথা। সব বেটি পাঁচুগোপালের ঘাড় বেয়ে সগ্‌গে যাওয়ার তালে আছে। যাওয়াব'খন! ভেবেছে, প্রয়াগে এসে সব সগ্‌গ ধরে ফেলে দিয়েছে। আবার ফিরতে হবে না?'

বললাম, 'আপনি নিয়ে এসেছেন নাকি?'

'তবে? কে নিয়ে আসবে? পাঁচুগোপাল ছাড়া আর সব জানে কে? নিয়ে এসেছি, নিজের জানাশোনা আশ্রমে ক্যাম্প খুঁজে দিয়েছি।'

বলে ডাক্তার আমাকেই যেন আসামী করে ধমকে উঠল, 'এমনি নিয়ে এসেছি, অ্যাঁ? এমনি নাকি বল? সবাই কণ্টাক্‌ট করে এসেছে, দু-বেলা খেতে দেবে আর রাত্রে শুতে দেবে পালা করে। তা দু-বেলা ঠিকমত খেতে দেওয়া দূরে থাক, রাত্রে একটু শুতে পর্যন্ত দিচ্ছে না।'

মনটা বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠল। দু-বেলা দুটো খাওয়া, আর একটু আশ্রয়ও যে ডাক্তারের কপালে নেই, এতটা তো অনুমান করতে পারি নি। মনে পড়ে গেল, কাল রাত্রে শীতার্ত ডাক্তারের ক্যাম্পে প্রবেশ। সেই 'নো জায়গা, নট কিচ্ছু।' ডাক্তার! পেশা ও বিশেষণের কি বিড়ম্বনা। রহস্যাচ্ছন্ন ব্যাপার। এই পাঁচুগোপাল রায় ডাক্তার হল কী করে?

ডাক্তার আপন মনে বলেই চলল, 'এই বুড়িগুলো একটাও সগ্‌গে যাবে? একি গাড়ির টিকিট কেটে আর ভিড় ঠেলে মরতে যাওয়া, যে সগ্‌গে গিয়ে পৌঁছুবে। তিন সত্যি করে এল সব আর এখানে এসে আমাকে চিনতেই পারে না। দিব্যি নিজেরা খাচ্ছে দাচ্ছে, সাধুদর্শন করে বেড়াচ্ছে। ভগবান না, সঙ্‌ দেখতে এসেছে। দেখো তুমি, সবগুলো নরকে যাবে।'

কী করে দেখব, তা তো জানি নে। ডাক্তারের অবস্থাটাই খালি ভাববার চেষ্টা করছি। কিন্তু ডাক্তার থামে না—'ওই পেল্লাদের দিদিমার জন্য ক্যাম্পে বলে রেখেছি। এলাহাবাদ ইষ্টিশান থেকে নিয়ে এলাম। পথে বললে, 'পাঁচু, আজ আমার কাছেই খাবি থাকবি।' কিন্তু একবার ডাকলে! যখন নিজেরা খেলে? ক্যাম্পের বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলাম।'

লজ্জায় ও ব্যথায় এতটুকু হয়ে গেলাম। আমিও তখন খাচ্ছিলাম। আমিই কালকের রাত্রিটা ডাক্তারকে উপোস রেখেছি। নিরাশ্রয় করেছি। তাই ডাক্তার ক্ষেপে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি বললাম, 'সত্যি, কালকে রাত্রের ব্যাপারটা আমার খুব ..'

'তুমি?' ডাক্তার আবার ধমকে উঠল আমাকে। 'তুমি কী করবে।

ওসবে আমার আর বাজে নাকি? তাই ভেবেছ তুমি? আরে ছোঃ। অত সস্তা কলজে পাঁচ-বস্তির নয়, বুঝেছ? দশ-দশ বছর সাধু হয়ে সারা দেশ ঘুরেছি। সারাটা দেশ।'

বলে হাতের বুড়ো আঙুল দুটি দেখিয়ে বলল, 'সব নখদর্পণে আছে, যতরকম সাধু আর যতরকম মানুষ। জিজ্ঞেস কর, বলে দেব।'

'আপনি সাধু হয়েছিলেন?'

'তব্‌বে?'

'কেন?'

'কেন আবার? বার করে নিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘর-বার সমান করে দিলে। জোর করে নিয়ে গেল টেনে।'

'কে?'

'কে আবার? যার নেওয়ার। জ্বালা, প্রাণের জ্বালা।'

'ছেড়ে দিলেন কেন?'

'ছাড়াছাড়ির কী আছে? কিছুই ধরি নি, তার ছাড়ব কী। কপ্‌নি এঁটেছিলাম, ফেলে দিয়েছি। আছি, যেমন ছিলাম তেমনি। জ্বালা টানে, জ্বালাই নিয়ে আসে। জ্বালা কখনো ছাড়ে?'

বলে ডাক্তার সোজাসুজি তাকাল চোখের দিকে। তাকিয়ে দেখি ডাক্তারের চোখের মণি নেই। অন্ধকার দুটি গর্ত শুধু। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে চোখের মণি দুটি। অন্ধ গহ্বরে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার চমকানি। স্থূল ঠোঁট দুটি ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। বিকৃত গলায় বলল, 'বল, জ্বালা কখনো ছাড়ে?'

জবাব চায় ডাক্তার। কী জবাব দেব। জ্বালা ছাড়ে কি-না জানি নে। কিন্তু ওই মুখের দিকে তাকিয়ে বলি কেমন করে যে, ছাড়ে।

ডাক্তার আবার মুখ খুলল। তখনো কে জানত, অজান্তে এক কুলুপ ছিদ্রে সুড়ুত করে ঘুরিয়ে দিয়েছি চাবি। ধাক্কা দিয়েছি বহুদিনের মরচে-পড়া বন্ধ দরজায়। ডাক্তার বলল, 'কোথায় না গিয়েছি। অসময়ে একলা একলা বরফ ভেঙে ছুটে গেছি হিমালয়ের উপরে। মানুষথেকো জন্তু পালিয়ে গেছে, তবু থামি থামি নি। ভীতু কাপুরুষ সাধু পুরুত দরজা খোলে নি মন্দিরের। মরণের, খেতে দেবার ভয়ে। বয়ে গেছে। জীবন মরণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সব জ্বালা, জ্বালা হয়ে গেছে। আমাকে রুখবে কে? কিন্তু প্রাণ জুড়োল? জ্বালা জুড়োল?'

ডাকলাম, 'ডাক্তারবাবু।'

'ডাক্তারবাবু?' আবার সেই ভয়ঙ্কর মুখ। 'আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে? আমি ডাক্তারবাবু? জড়ি বুটি ছাড়ি, জড়ি বুটি। রাস্তায় ফেরি করি! দাদ কাউরের মলম তৈরী করে বেচি। নিয়ে দেখ, সারে কি-না! মাদুলি? তাও দিই। তা বলে ডাক্তার?'

সর্বনাশ। আবার সেই মূর্তি। এখন কি আর মনে আছে পাঁচ-বস্তির ডাক্তার পরিচয় সে নিজেই দিয়েছে। বলতে গেলে উল্টো উৎপত্তি হবে। যাক, বলে যাক। চায়ের আসর জমজমাট। বেশী গণ্ডগোল হলে ভিড় বাড়বে। আগেই টের পেয়েছিলাম, ডাক্তার নামের মধ্যে আছে পাঁচুগোপালের বিড়ম্বনা। বুঝলাম, নির্মম বিদ্রূপ মাত্র। খ্যাপার প্রতি শ্লেষ। পাঁচ-বস্তি আর ডাক্তার। পাঁচুগোপাল রায়। ওই নামে নিজেকেও বিদ্রূপ করে সে। করে যে, তাও বোধকরি নিজে সঠিক জানে না। কিসের জ্বালা, সেটুকু জানার বড় ইচ্ছা হল।

ডাকলাম, 'পাঁচুগোপালবাবু।'

ডাক্তার তাকাল। অবাক কাণ্ড! সে হাসছে নাকি? এও কি বিশ্বাসযোগ্য? বিকশিত তার বড় বড় দন্তরাজি। যদি হাসি হয়, তবে কী ভয়ঙ্কর হাসি। বলল, 'মিষ্টি কথা বলা হচ্ছে। দিব্যি ওলটানো চুল, ঠাণ্ডা চোখ, ভালো মানুষের মত দেখতে। ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। খুব জানি তোমাদের মত ছোঁড়াদের।'

আমাকেই বলছে। কিন্তু বাধা আর দিচ্ছি নে। তা হলেই ডাক্তারের ক্ষিপ্ততা দেখা দেবে।

গলার স্বর নেমে এল ডাক্তারের। বলল, 'ওই যে একটি কেটে পড়ল টেবিল ছেড়ে। দিব্যি টানা-টানা চোখ, টিকলো নাক, সুন্দর মুখ। কেমন শান্ত মেয়েটি।'

বুঝতে দেরী হল না, টেবিল-সঙ্গিনী সেই মহিলাটির কথা বলছে ডাক্তার। কিন্তু বেচারী সত্যি ভাল মানুষ। আমি তো তাই দেখেছিলাম, 'না, সে মহিলাটিকে তো—?'

'সব করতে পারে।' বাধা দিয়ে বলে উঠল ডাক্তার।—'ওসব ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক। আমার চেয়ে বেশী জানো তুমি?'

তা হয়তো জানি নে। কিন্তু একটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আছে তো।

ডাক্তার বলল, 'বিশ্বাস হল না বুঝি?' বলে পকেট থেকে বার করল একটা

ময়লা কাগজ। এত ময়লা, কুঞ্চিত চামড়ার মত হয়ে গিয়েছে। অতি সন্তর্পণে সেই কাগজের ভাঁজ খুলতে চকচক করে উঠল একটি ফটো। একটি মেয়ের ফটো। ফটোটি আমার সামনে মেলে বলল ডাক্তার, 'দেখো তো কেমন?'

সুন্দর, সত্যি সুন্দর! টানা-টানা শান্ত চোখ। সু-উচ্চ নাক। কপালের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া চুলের গোছা। বয়স অনুমান করা শক্ত। তবে তরুণ বয়স, সন্দেহ নেই।

'কেমন?'

বললাম, 'সুন্দর।'

'হুঁ হুঁ, বিষ। ভয়ানক বিষ, সুন্দর বিষ।'

মনে বড় কুণ্ঠা এল। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ইনি?'

শুনতে পেল না ডাক্তার। ভয়ানক বিষ, সুন্দর বিষের দিকেই সব ভুলে তাকিয়ে ছিল সে। গর্তে-ঢোকা কালো চোখে তার বিগলিত দৃষ্টি। খাওয়ার সময় যেমন কোমল হয়ে উঠেছিল তার মুখ, এখন সেই মুহূর্তে তার চেয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে সেই মুখের শ্রী।

পরমুহূর্তেই ফটোটা কাগজে মুড়ে পকেটে ঢুকিয়ে দিল। বলল, 'কে জিজ্ঞেস করেছিলে? আমার বউ ওকে জন্ম দিয়ে মরেছিল।'

'আপনার মেয়ে?'

বুঝলাম, 'আমার মেয়ে' কথাটি উচ্চারণ করতে নারাজ সে!

চারিদিকে কথা, হাসি ও চীৎকার। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি আর মোটরের গর্জন। সব মিলিয়ে একাকার। তার মধ্যে পাঁচুগোপালের চাপা মোটা গলা অদ্ভুত মিষ্টি শোনাল। যেন ক্লারিওনেটের খাদের সুরে বেজে চলেছে বিচিত্র রাগিণী।

সে বলল, 'ওই যে ফটোটি দেখলে, বললে বিশ্বাস করবে না, ওই ফটোর মেয়ের চেয়েও তার মা ছিল আরও সুন্দর। এই পাঁচুগোপাল, প্রাণগোপাল রায়ের ছেলে বসে আছে তোমার কাছে। চেয়ে দেখো, আমি কি কুৎসিত। চেহারা দেখে মানুষ আমার কাছে আসে না। তবু, সে আমাকে ভালবাসত। এত ভালবাসত যে, আমিই এক এক সময় ভাবনায় পড়ে যেতাম। আমার খেতে বসতে শুতে তারও ভাবনার অন্ত ছিল না। ওই মেয়ে জন্ম দিয়ে সে মরে গেল। ভালবাসার কদর বুঝতে না বুঝতে সে চলে গেল। অন্ধ আর বোবার মত আমি দিবানিশি হাতড়ে ফিরেছি, খুঁজেছি। মনে হত, কেউ ষড়যন্ত্র করে তাকে লুকিয়ে রেখেছে আমার কাছ থেকে। মানুষের খ্যাপামি

কতদিন থাকে? ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাঁথায় শুয়ে কাঁদছে সে আমারই মেয়ের বেশে। প্রথমে বড় রাগ ছিল মেয়েটার উপর। পাড়ার মেয়েরাই দেখতো ওকে। তা ছাড়া কে বাঁচাবে। দিনে দিনে সেই মেয়ের চোখ ফুটল, নাক ফুটল, হাসি ফুটল। মায়ের মতই। নাম হল শিউলী। শেফালির মতই সুন্দর, নরম আর মিষ্টি। নজর যখন দিলাম, আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। কাজ করতাম কারখানায়। মন বসত না। কখন বাড়ি আসব, শিউলিকে বুকে নেব, সেই আমার ভাবনা। আমার ধ্যান জ্ঞান, আমার প্রেম ভালবাসা, আমার স্বর্গ, আমার ভগবান, আমার সব। আদেখলের ঘটি হলে যা হয়। কুঁড়েঘরে রাজকন্যের সাজপোশাক, খাওয়া। সবাই হাসত আর ঠাট্টা করত।··· বড় হল, বুলি ফুটল। কী মিষ্টি কথা। প্রাণ ধরে ইস্কুলে দিলাম। দিনে দিনে বড় হল। আমার ধুলোভরা রোদপড়া বাগানে ফুল ফুটল, ছায়া হল, পাখি ডাকল।···লুকিয়ে শুনতাম, মেয়েকে দেখে লোকে বলত, হ্যাঁ পাঁচুগোপালের মেয়ে। কত আমার ভাবনা। অনেক লেখাপড়া শেখাব গান শেখাব। কত কী।'

বলে একটু থামল। আর আমি ভাবছিলাম এমন অভাবিত সুন্দর বিন্যাসও বেরোয় তার মুখ থেকে? গলার স্বরটা আরও নেমে এল তার।—'সতেরো বছর হল। মেয়ের ভরা যৌবন। কিন্তু কী শান্ত। তার মায়ের মত। আমি ছিলাম তার বাপের চেয়েও বড়, তার একলার সঙ্গী, তার বন্ধু। বিয়ের কথা হলে কতদিন বুকে মুখ রেখে বলেছে, বাবা, 'তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমি পারব না।'

এই পর্যন্ত বলে আচমকা ব্রেক কষার মত পাঁচুগোপালের কথা থামল। তাকিয়ে দেখি, সারাটা মুখ কুঁচকে বিকৃত হয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। যেমন আচমকা থেমেছিল, তেমনি হঠাৎ বলল, 'মিছে কথা। একেবারে শয়তান। সুন্দরের মধ্যে বিষ। চলে গেল। না বলে, না জানিয়ে পালিয়ে গেল একটা ছেলের সঙ্গে। পাড়ারই ছেলে!'

এ পর্যন্ত বলতেই নাটকীয়ভাবে যবনিকা পড়ল। চলন্ত অন্নপূর্ণার আর্দালি টেবিল ওঠাতে এল। লক্ষ্য করিনি, কখন আসর ভেঙে গিয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে রেকর্ড। পথের রেস্তোরাঁ গিয়েছে উঠে! উঠে পড়লাম। পাঁচু-গোপালের সঙ্গে চললাম পুলের দিকে। বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে কথা মনে নেই। তাকিয়ে ছিলাম ডাক্তারের দিকে।

বোধহয় তার কথা ফুরিয়েছিল। আর কিছু বলার দরকারও ছিল না।

কিভাবে পাঁচুগোপালের জীবন আজ এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, কেন সে সাধু হয়েছিল, তার কারণ ব্যাখ্যারও আর প্রয়োজন ছিল না। দরকার নেই আর বলার, কেন তার এত হাঁকাহাঁকি, কথার খেই হারানো, পাগলামি আর সুন্দর ছেলেমেয়ে দেখলেই একটা তিক্ত সন্দেহে ও যন্ত্রণায় জ্বলে উঠা।

জ্বালার কথা তো নিজেই বলেছে সে। ঘরের বাইরে, অসীম সমুদ্র আর বিরাট হিমালয়, কোথাও তার জ্বালার নিরসন হয়নি। সব মিলে সে আজ অস্বাভাবিক, অবাস্তব রূপ ধরেছে।

পুল পেরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল সে। সাপের মত এঁকেবেঁকে দাগ পড়েছে চ্যাটালো পাড়ে। কলকল শব্দ। পাঁচুগোপাল এসে দাঁড়াল।

বললাম, 'পাঁচুগোপালবাবু, আপনার মেয়ে কোথায় ?'

বলল, 'তা জানলে কি আর ভাবনা ছিল ? ভাবি, এ কেমন যাওয়া ? একটু কি খোঁজও দিতে নেই ? দশ বছর বাইরে ঘুরে এসেও খোঁজ পাই নি।'

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। অজান্তে একটি নিশ্বাস পড়ল আমার। আর নয়। এবার আশ্রয়ের সন্ধান না করলে আর নয়।

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।...

চলে যাওয়ার আগে সেই কথাটিই বার বার মনে পড়ছিল। জীবনভর এই খোঁজার পালা পাঁচুগোপালের শেষ হবে কি-না জানি নে।

খুব উত্তেজনার পর মানুষ যখন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, অনেকক্ষণ কাঁদার পর শোকাতুর যেমন নীরব ও বিহ্বল হয়ে পড়ে, পাঁচুগোপাল তেমনি শান্ত হয়ে গিয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে বিদায় নিতে গেলাম। পাঁচুগোপাল আচমকা প্রশ্ন করে বসল, 'কী করা হয় ?'

কী যে করি, সে জবাব দেওয়া বড় মুশকিল। যা করি, সে কাজটি ভাল কি মন্দ, দশজনের বিচার্য। কিন্তু বলতে গেলেই সঙ্কোচ হয়। বিশেষ পাঁচুগোপালের কাছে। সাত-পাঁচ ভেবে তবু সত্যি কথাই বললাম।

বললাম, 'লিখি।'

পাঁচুগোপাল অবাক হল! জিজ্ঞেস করল, 'কী লেখ ? বই ?'

পাঁচুগোপালের বিস্ময় দেখে একেবারে এতটুকু হয়ে গেলাম। কেন, বই লেখাটা কি পাপ ? বললাম, হ্যাঁ।'

'কী বই লেখা হয় ? এমনি সব জ্ঞান-ট্যানের বই, না গপ্পো-নভেল ?'

বুঝলাম, জ্ঞান-ট্যানের বই বললেই বোধহয় খুশী হয় সে। কিন্তু সত্যি

বলতে কি, পাঁচুগোপালের কাছ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করিনি।

বললাম, 'হ্যাঁ, গপ্পো আর নভেলই লিখি।'

পাঁচুগোপাল বলল, 'তা বুঝেছি। মাথার উপর রোজগেরে বাপ আছে নিশ্চয়ই ?'

'কেন বলুন তো ?'

'তা নইলে চলে কী করে ?'

জবাব দিতে পারলাম না। চলে কি না চলে, সে বিষয়ে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করে লাভ কি। বললাম, 'কেন, বাংলাদেশের লেখকদের কী চলে না ?'

পাঁচুগোপাল বলল, 'কই, আমাদের কেষ্টকান্ত তো বাপের পয়সাতেই বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে খায় আর কাঁড়ি কাঁড়ি বই লেখে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেষ্টকান্ত কে ?'

'আমাদের পাড়ার ছেলে।'

বললাম, 'তা হবে। তবে, আমার বাবা মারা গেছেন।'

পাঁচুগোপাল আরও বিস্মিত হয়ে বলল, 'তোমার মাথায় তো বাউড়ি-কাটা চুলও নেই দেখছি।'

বললাম, 'কেন ?'

'আমাদের কেষ্টকান্ত তাই বলে। বই লিখলে নাকি মাথায় বাউড়ি রাখতে হয়, চশমা পরতে হয়, উড়নি চাপাতে হয়।'

পাঁচুগোপালের মুখের দিকে নজর করে দেখলাম। না, ঠাট্টা নয়, কথাগুলি সে সরল বিশ্বাসেই বলছে।

জানি নে কে কেষ্টকান্ত। তার রচিত সাহিত্য পড়ার সৌভাগ্যও আমার হয় নি। বললাম, 'সকলের তো একরকম নয়। আপনাদের কেষ্টকান্ত হয়তো ওই রকমটিই পছন্দ করেন।'

পাঁচুগোপাল একটি দীর্ঘ হুঁ দিল। মানে যার অনেক কিছুই হতে পারে। আবার বলল, 'আর এ লাইনে কতদিন ?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন লাইনে ?'

বললে, 'এই তীর্থ ঘুরে বেড়ানো ?'

বললাম, 'এই প্রথম।'

ঘাড় নেড়ে বললে পাঁচুগোপাল, 'সেইজন্যেই। সেইজন্যেই রাত করে একলা বেরুনো হয়েছিল!'

'বেরুলে কী হয় ?'

'কী আর হবে! ঘাড়টি মটকে বালুতে পুঁতে রেখে দেবে।'

পুঁতে রেখে দেবে। অপরাধ? বললাম, 'কে? কেন রাখবে?'

পাঁচুগোপাল দ্বিতীয় বার হাসল। বলল, 'যার দরকার সে-ই রাখবে। পকেটে নিশ্চয়ই কিছু রেঁস্তোও আছে?'

রেঁস্তোর মানে পয়সা। তা কিছু তো আছেই। তা বলে সে পয়সার জন্য একেবারে ঘাড় মটকানো!

পাঁচুগোপাল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'মনে রেখো, এই কয়েক মাইলের মধ্যে সব জায়গায় ওৎ পেতে আছে সব ভয়ঙ্কর মানুষ। অনেকে সাধুর বেশেও আছে। সুযোগ পেলেই তারা কখনো ছাড়বে না। আর সাধুদের কাছে রাত্রে কখনো ভিড়ো না।'

বললাম, 'কই, কাল রাত্রে তো সেরকম কিছু—'

'টের পাও নি। রোজ রাত্রেই কি আর এমনি হয়। তা ছাড়া আমি ছিলাম কাল তোমার পেছনে পেছনে। আর-একটা কথা বলি। অনেক পেতনি আছে এখানে, তারাও ছেড়ে কথা কইবে না।'

পেতনি! পাঁচুগোপাল যে মনের মধ্যে রীতিমত একটা ভয় ধরিয়ে দিল। বললাম, 'পেতনি! সেটা আবার কী?'

পাঁচুগোপাল মুখ বিকৃত করে বলল, 'সেটা দেখলেই চোখ ভুলে যাবে। আড়ে আড়ে চাইবে, ফিকফিক করে হাসবে, মনে হবে হাতছানি দিয়ে বুকের কাছে ডাকছে, বুঝেছ? খুব সাবধান।'

বলে মুখ ফিরিয়ে বলল আপন মনে, 'কত দেখলাম এরকম। এই গেলবারের হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় তিনজনকে এরকম খুন হতে দেখেছি। তারা সবাই তোমার মত ভদ্দরঘরের ছেলে।'

ভয়টা প্রায় চেপে বসল মনে। বক্তব্য অনুযায়ী পাঁচুগোপাল এ বিষয়ে আমার চেয়ে অভিজ্ঞ নিঃসন্দেহে। তার কথা একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারি নে। বললাম, 'কিন্তু এই তীর্থক্ষেত্রে?'

সে বলল, 'এইখানেই তো সহজ। তীর্থক্ষেত্তর বলে তো আর কারুর আসতে মানা নেই। দেখতে চাও? অনেক কিছু দেখতে পাবে। দেখিয়ে দেব তোমাকে। মাল-টাল টানা হয়?'

মাল? মানে মদ। বললাম, 'না। কেন?'

সে সব বন্দোবস্তও আছে। এখানে সব পাবে। বে-আইনী চোলাই-করা মদ এখানে খুব আসে।'

এতক্ষণে মনে হল পাঁচুগোপাল যে দিকটা ইঙ্গিত করতে চাইছে, সেদিকে আমার ভয় নেই। কিন্তু তার কথা শুনে আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলাম।

এই দুস্তর বেলাভূমি। চারিদিকে গিজগিজ করছে সাধু-সন্ন্যাসী আর পুণ্যার্থী নরনারীর দল। এই উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে কোথায় থাকতে পারে সেই বেসাতির আস্তানা? জানি নে কোথায় থাকতে পারে! তবে থাকাটা অসম্ভব বলে বোধ হয় না। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।

যাবার আগে পাঁচুগোপালকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বলতে পারেন, এখানে বাঙালীদের আস্তানা আর কোথায় আছে?'

পাঁচুগোপাল বলল, 'সব জায়গায় আছে, কেন?'

বললাম, 'আমাকে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে তো।'

'কেন? তুমি ওই ক্যাম্পে থাকবে না?'

বললাম, 'কী করে থাকব বলুন? বলেছিলাম, একটা রাতের জন্য থাকব, আজকে আমাকে নতুন জায়গা দেখে নিতে হবে।'

পাঁচুগোপাল বিস্মিত ব্যাকুল চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বললে, 'ও, এতক্ষণ ধরে মনে মনে এই সব মতলব ভাঁজা হচ্ছিল। চলে যাবে বলে বুঝি এত কথা বলছিলে আমার সঙ্গে?'

হঠাৎ করুণ হয়ে উঠল পাঁচুগোপালের মুখ। এখনো বুঝতে পারলুম না তাকে। বুঝতে পারলুম না মানুষটির সঠিক ধাত। এই একরকম, তার পরেই আর একরকম। কালকে এই মানুষই আমাকে তাড়াবার জন্য কত করেছে। সেকথা এখন মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। ভেবেছিলাম, পাঁচুগোপালের অপমানের শোধ তুলব। কিন্তু যার উপর শোধ তুলব, তার শোধবোধ কোনটারই বালাই নেই। সে চলে নিজের হৃদয়াবেগে। হৃদয়াবেগে চলায় মানুষের সুখের চেয়ে দুঃখ বেশী। সে দুঃখ কেউ কেউ রোধ করতে পারে না। কিন্তু নিজে সে সেই দুঃখের বিষয়ে সচেতন নয়। আসলে পাঁচুগোপাল আমাকে কাল অপমান করে নি। ওটাও তার হৃদয়াবেগেরই একটা ঘটনা মাত্র।

পাঁচুগোপাল বলল, বলল খুবই ঠাণ্ডা গলায়, 'ওখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে?'

বললাম, 'দেয় নি। তা ছাড়া প্রহ্লাদবাবুদের ক্যাম্পটাও তো আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

পাঁচুগোপাল ঈষৎ চটল। বলল, 'তোমার মাথা। যেখানে উঠেছ, কপালগুণে উঠে পড়েছ। একবার যখন বুড়ি তোমাকে ঠাঁই দিয়েছে, তখন

আর ফেরাবে না। তাড়াতাড়ি গিয়ে বুড়ির হাতে খোরাকির পয়সা গুঁজে দাও তো! তোফা খাবে আর বেড়াবে। নইলে মরবে।'

বলে আপন মনে বলল ফিসফিস করে, 'এ লাইনে পয়লা হাতে খড়ি কি না, তাই এখনো সব ফালতু কথা নিয়ে—'

তবু ভাবছিলাম। শীতের বেলা। দেখতে দেখতে বেলা অনেকখানি বেড়ে উঠেছে। বেলা বাড়ছে আমার। মেলার কোন বেলা নেই। মেলায় কলরব ও চীৎকার, যাওয়া-আসার শেষ নেই। ভাবছিলাম প্রাণভরে দুদিন ঘুরব। কত ঘোরা আমার এখনো বাকি। কত কিছু বাকি। কিন্তু ওই ক্যাম্পে থেকে আমার মনের সুখটুকু, শান্তিটুকু যাবে না তো!

কী ভেবে পাঁচুগোপাল দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। বলল, 'ছাখ, একটা কথা বলব?' গলায় আবার তার খ্যাপামির আভাস। বললাম, 'বলুন।'

গলা আর-একটু চড়িয়ে বলল, 'তোমার মত দেখতে ওরকম ছেলে ভাল হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি যদি চলে যাও, তাহলে সত্যি বলছি, মনে বড় দুঃখু পাব। এই বলে দিলাম।'

বলে যেমন দ্রুত ঘুরেছিল, তেমনি দ্রুত মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল সে। দাঁড়িয়ে বোধহয় উৎকর্ণ হয়ে রইল।

ব্যাপারটা এমনই হাস্যকর। কিন্তু হাসতে গিয়ে পারলাম না হাসতে। হাসিটা ছুটে আসতে গিয়ে খচ করে আটকে রইল বুকের মাঝে।

ওই ভঙ্গিতে তাকে এখন যে দেখবে, সে হাসবে। তাই তো হয়। পাঁচুগোপাল তার দুঃখ দিয়ে পরকে হাসায়। ওটাই পাগলের বিড়ম্বনা। মানুষ জ্বলেপুড়ে পাগল হয়। আমরা পাগল দেখে হাসি। বিশ্বের নিয়মটাই এমনি বিচিত্র।

সেই বিচিত্রের মতই, পাঁচুগোপালের বিচিত্র মনের গতি কখন এক সময়ে আমার দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বোধহয় বন্ধুত্ব পেতেছে; পেতেছে মন। ভালবেসেছে। হৃদয়াবেগের গতিই এমনি।

আসলে বোধহয় আমাদের মত ছেলেমেয়েদেরই সে ভালবাসে সবচেয়ে বেশী। কে জানত, পাঁচুগোপালের মত মানুষের সঙ্গে এখানে দেখা হবে। কে জানত, গলা চড়িয়ে সে আবার বলবে, 'তুমি চলে গেলে দুঃখু পাব।' বলে ছেলেমানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকবে মুখ ঘুরিয়ে। যে অমনি করে বলে, তাকে ছেড়ে গেলে মনের মধ্যে অশান্তি হবে।

বললাম, 'তাহলে চলুন, যাওয়া যাক।'

পাঁচুগোপাল মুখ ফেরাল না। আড়চোখে দেখল। দেখে ধীরে ধীরে হাঁটা ধরল।

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম। নিল না। বলল, 'ওতে কিছু হয় না। দেও তো, দু-আনা পয়সা দেও, একটু নেশা করি।'

বুঝলাম, গাঁজা কেনা হবে। কিন্তু এখানে কোথায় পাওয়া যাবে? দু-আনা পয়সা দিলাম তাকে।

এদিক ওদিক দেখে, পাঁচুগোপাল একটি সাধুকে দেখে ডাকল, 'হোই বাবা।'

সাধু দাঁড়াল। ভিড়ের ঠেলাঠেলি। বেচারী বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া বেটা?'

পাঁচুগোপাল বলল, 'থোড়া ইধার কৃপা কর বাবা।'

সাধু এল। পাঁচুগোপাল পয়সা দু-আনা তাকে দিয়ে বলল, 'থোড়া সপ্তমী কৃপা কর বাবা। অব শহর যানা বহুত মুশকিল।'

সাধু একবার সংশয়ান্বিত নজরে তাকাল আমার দিকে। আমি ভাবছিলাম, সপ্তমীটা আবার কী বস্তু।

সাধু জিজ্ঞেস করল পাঁচুগোপালকে, 'কৌনা জমাত?'

পাঁচুগোপাল জবাব দিল, 'অব ঘর কি জমাত বাবা। ঢুঁরতে হ্যায় গুরু। পহলি গুরুকো ছোড় দিয়া।'

সাধু জিভ দিয়ে করুণা ও আক্ষেপসূচক ধ্বনি করে বলল, 'বিষ্ণু ব্রহ্মচারীকে আশ্রমমে ভেট কর বাবা। গুরু মিল যায়েগা।'

বলে পয়সা দু-আনা নিল। ঝুলি হাতড়ে বের করে দিল ছোট্ট একটি পুরিয়া। তারপর নমস্কার করে চলে গেল আবার।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সপ্তমীটা কী?'

পাঁচুগোপাল বলল, 'মহাদেবের ধূমপান। যার নাম গাঁজা। অনেক সাধুদের মধ্যে গাঁজাকে ওই নামে ডাকা হয়।'

বলে পাঁচুগোপাল বিকৃত মুখে বলল, 'হুঁ, এবার গুরু ধরব ওর বিষ্ণু ব্রহ্মচারীর আশ্রমে। বলে, কত হাতি গেল তল, মশা বলে কত জল। ভাগ ভাগ।'

ব্যাপারটি সব বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করব ভাবলাম। পাঁচুগোপাল তখন গাঁজা তৈরীতে মনোযোগ দিয়েছে।

প্রায় পনেরো মিনিট হেঁটে আবার সেই ক্যাম্পে এসে হাজির হলাম। রান্না খাওয়া, মাইকের মর্মোপদেশ, সব মিলিয়ে আশ্রম একেবারে জমজমাট।

প্রহ্লাদ কোত্থেকে ছুটে এসে বলল, 'ও বাবা, তোমরা বেড়ে ডুবে ডুবে জল খাও, শিবের বাবাও টের পায় না। আর আমি শালা মুখ চোকাচ্ছি তখন থেকে। খুব তুমি যা হোক ডাক্তার খুড়ো।'

প্রহ্লাদের কথাটা ঠিক অনুমান করতে পারলাম না। ডুবে জল খাওয়ার মত পাপ তো কিছু করি নি। যা করেছি, তা বিশ্ব-সংসারের মত শিবের বাবাও জানেন বৈ কি।

পাঁচুগোপাল ধমকে উঠল, 'মাকড়া কোথাকার। কাকে কী বলছিস। ছেলেটা আমাকে দু-আনা দিল, তাই দিয়েই তো'—বলে পাঁচুগোপাল মুঠো খুলে দেখিয়ে দিল পরমবস্তুটি।

প্রহ্লাদ আনন্দে পেল্লাদ হয়ে উঠল। বলল, 'মাইরি। ওর চলে না বুঝি? তাই বল। আমি যে এদিকে হেঁপ্সে মরছি কাকা তোমার জন্যে।'

পাঁচুগোপাল হাত পেতে বললে, 'কই, দেখি, আগে আসল চীজটি বার কর দিকিনি।'

বলতে না বলতে প্রহ্লাদ কয়েক আনা পয়সা তুলে দিল পাঁচুগোপালের হাতে। পয়সাগুলি পকেটে রেখে পাঁচুগোপাল বললে, 'চলে আয় আমার সঙ্গে।'

প্রহ্লাদের আনন্দ আর ধরে না। পাঁচুগোপালের পেছনে পেছনে চলল ঘাড় উঁচিয়ে। বুঝলাম, ওদের দুজনেরই এখন আর অন্য কিছু ভাববার সময় নেই। আমি তো দূরের কথা। ফিরেও তাকাল না। ওতেই আনন্দ। মুঠোয় আছে প্রাণের সার। আর কিছু চাই নে।

কিম্ আশ্চর্যম্! নেশা নয়, পাঁচুগোপালের কথাই ভাবছি। ভাবতে গিয়ে হাসিও পেল। হাসি নয়, হাসির নামান্তর। নিজের কথা ভেবে কাউকে করুণা করতেও লজ্জা পাই। হাসিটা দুঃখের।

সবাই আমরা মনের মত বস্তুটি খুঁজছি। মনে মনে খ্যাপা আমরা সবাই। আমাদের রকমারি বিচিত্র বেশ। পাঁচুগোপাল গাঁজা নিয়ে মাতামাতি করছে, যেন ওই ছাড়া আর কাম্য ধন নেই। কখন দেখব, সব ফেলে চেঁচামেচি হাঁক-ডাক করে একলাই মাথায় করে তুলেছে সারা কুম্ভমেলা। কিন্তু সবটাই উপরের জিনিস। মনটা কে দেখে।

হেসে ফিরতে গিয়ে দেখি কালকের সেই গেরুয়াধারী। পাঁচুগোপাল যাকে সঙ্গে করে এনেছিল। মন চমকালো। ফাঁড়া কেটেছে কি-না কে

জানে ? পাঁচুগোপাল তো ঠেকিয়ে দিয়ে গেল।

গেরুয়াধারী বলল, 'হাসছেন যে ?'

বললাম, 'পাঁচুগোপালের কথা ভেবে।'

গেরুয়াধারী হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে ওর আলাপ হয়ে গেছে নাকি ?'

বললাম, 'একরকম।'

গেরুয়াধারী হাসল রহস্যের হাসি। বলল, 'একরকম তো বটে। কী রকম সেটা বলুন।'

বলে চোখাচোখি হতেই হেসে উঠল সরবে। নিজেই বলল আবার, 'থাক আপনাকে বলতে হবে না। আন্দাজই করা যাচ্ছে। ও আমাদের কাশীর আশ্রমে এক নাগাড়ে তিন বছর ছিল এক সময়ে। তখন সাধু হয়েছিল। জ্বালিয়ে খেয়েছে আমাদের সবাইকে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বলুন তো ?'

সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও তো পাগল। বদ্ধ পাগল। আমাদের মোহান্তকেই মারতে গেছল। কোন কোন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু গুহ্য কর্তব্য করণীয় আছে তো। সেগুলো ও সহ্য করতে পারত না। সাধুদের উপরও ও খুব চটা জানেন তো ?'

হবে হয়তো। কিন্তু সেরকম কোন কথা শুনি নি তার মুখে। কোন জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলাম পাঁচুগোপালের চলার পথের দিকে। সত্যি, বদ্ধ পাগলই বটে।

গেরুয়াধারী বলে উঠল, 'অবশ্য কালকে ওর কথাতেই আপনার কাছে আমাকে আসতে হয়েছিল। যা-ই হোক, ওগুলো আমাদের কর্তব্য তো !'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'তা তো বটেই।'

সে আবার বলল, 'তা ছাড়া, আশ্রমে আপনাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে আমার নজর রাখাও কর্তব্য। অর্থাৎ duty। আমি একাধারে এ আশ্রমের হিসাবী, অর্থাৎ মুহুরী। আর একাধারে কোতোয়াল। বলতে পারেন ম্যানেজার।'

শুনে কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের আবার এসবও আছে নাকি ?'

'নেই ?' ভ্রূ তুলে বলল, 'কী নেই বলুন। একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে যা যা দরকার, আমাদের সবই আছে। সব পাবেন এখানে। যা চাইবেন। অফিস চালাতে হলে অফিসার চাই, ম্যানেজার চাই, কেরানী চাই।

সংসার চালাতে নিয়মের দরকার নেই? দরকার নেই নিষ্ঠার? আশ্রমেরও তেমনি নিয়ম আছে বৈকি। বিশেষ, বাইরে যখন আমরা জমায়েত হই। মোহান্তের নীচে আছে পূজারী, কুঠারী কারবারী, হিসাবী, কোতোয়াল, ভাণ্ডারী, পাহারাদার, তুরীবাদক। কত কি! নইলে কি মনে করেছেন, এত বড় ব্যাপারটা আপনি আপনি হচ্ছে?'

তা তো নয়-ই। কিন্তু এত সব জানতাম না। বাংলাদেশের কোন কোন আশ্রমে আধুনিক নিয়ম কানুনের ব্যবস্থার কথা শুনেছি। কারণ ধর্মের গণ্ডি ছেড়ে সেখানে তাদের গতি সমাজের বুকে। কিন্তু সন্ন্যাসীর আবার এত নিয়ম-কানুন কিসের। এ যে জমিদারী সেরেস্তা চালানোর ব্যাপার।

সন্ন্যাসী ব্যাখ্যা করে চলল কার কী কাজ। ভাণ্ডারী দেখবে ভাণ্ডার, পাহারাদার দেবে পাহারা। মনে হচ্ছে বুঝি, এখানে কোথায় কী ঘটেছে কেউ জানে না। সব নখদর্পণে আছে। পাহারাদার নজর রেখেছে কড়া। একটু এদিক ওদিক হলে ধরবে এসে চেপে। খোয়া যাবার উপায় নেই কিছু। টাকাপয়সা? সব জমা আছে কারবারীর কাছে। কারবারী হল আশ্রমের ক্যাশিয়ার। টাকা দিচ্ছে নিচ্ছে, হিসাব রাখছে মুহুরী। একটি আধলা এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই। মায় গাঁজা-সুখার হিসাবটি পর্যন্ত। হাতে নিয়ে ডললাম, হাঁক দিলাম আর কলকে ফুঁকলাম, তা নয়। যে যা পাচ্ছ, আগে জমা দাও। তারপর নিজের পাওনাটি নিয়ে ভোগ কর। তুমিও শিব, আমিও শিব। তাহলে আর কি! এস সবাই মিলে ন্যাংটা হয়ে নাচি। উঁহু! সেটি চলবে না। আইন মেনে চলতে হবে সবাইকে। সন্ন্যাসী তো সকলেই। যে আইন দেখে আর আইন মানে। পূজারী রয়েছে। সময়মত নিয়মমত পুজো কর আগে। হ্যাঁ, অন্যায় অপরাধ আছে বৈ কি। বিচার হয়। সবাই মিলে যে পঞ্চায়েত তৈরী হয়েছে, সেই পঞ্চায়েত বিচার করে। বিচারকর্তা মোহান্ত বলতে পার। ওখানে বড় একটা কারুর হাত চলে না। বিচারে সাজা হয়। কতরকম সাজা আছে। জেল ফাঁসি দড়ি কেন? সন্ন্যাসীর সাজা তার চেয়েও কঠিন। সকলে বুঝবে না। সাজা মানলে ভাল। নইলে বহিষ্কার! সন্ন্যাসী-জীবনের দফা গয়া। বেরিয়ে গেলো তো সে মরে গেল। মৃতের সমান। তার কাজের দায় আর নিচ্ছে কে? অধিকার? সমানাধিকার? ওই কথাটা নিয়েই দেশে আজকাল বড় বাদানুবাদ, হ্যাঁ, তাই তো। যার যেমন, তার তেমন। গুণ বুঝে কদর। কাজ বুঝে দাম। আমি নারকেলগাছ। উঁচু হয়ে মাথা তুলেছি আকাশে। ফল দিই ডাব আর নারকেল। সে এক

রস। ঝাপা ঝোপা ছোট্ট আমগাছটি দেয় আম। নিংড়ে খাও। সে আর এক রস। যারটি যেমন, তারটি তেমন বলব। পেয়ারাকে জামরুল বলে খেলে তুমিই ঠকবে। কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে আর ছাই মেখে জটা নেড়ে সবার উপর তম্বি করে বেড়াবে, সেটি হচ্ছে না। তার কোন অধিকার নেই। সমান অসমান, কোনটাই নয়।

বলে কি, এ তো দেখছি সংসারের কথা। সমাজের কথা। এই থেকেই আসে রাষ্ট্রের কথা। বললাম, 'আপনাদের আবার এত নিয়ম-কানুন কিসের? ওসব তো আমাদের। সাধারণ মানুষের।'

নিয়ম-কানুন থাকবে না কেন? বিশ্বের নিয়ম-কানুন আছে। দিন হয়, রাত্রি হয়, ঋতু বদলায়। সবই সেই নিয়মের মধ্যে। মাস গেলে রোজগারটি করতে হলে, মুখে ভাত গুঁজে ছুটতে হয় না অফিসে? সকাল হলে ঝাঁপ খুলতে হয় না দোকানের? খালি অ্যালাকাড়ি বুঝি ভগবান পাওয়ার বেলায়? সেখানে আইন-কানুন নেই বুঝি? ওটা হল ফোকোটিয়া, না? তা হবে না।

কিন্তু আমরা তো জানি সিদ্ধপুরুষেরা ভাব ভোলা। সময় জ্ঞান রহিত। কখন কী করেন আর কখন কী বলেন, অন্য মানুষের উপায় নেই।

সন্ন্যাসী হাসল! হেসে বলল, 'সিদ্ধপুরুষ? সে কজনা? এই যে দেখছেন, এত বড় কুম্ভমেলা আর দেশের তাবৎ সাধু সন্ন্যাসী যোগী, এর মধ্যে কার সিদ্ধিলাভ হয়েছে, কে বলতে পারে। যার হয়েছে তাকে কে চিনতে পারবে? সে যে কী বেশে, কী রূপে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে বলবে? তার নিয়ম নেই? তার নিয়মের যে চাড়া নেই। এই বাহ্যিক জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ কতটুকু? নিয়ম তার অন্য লোকে, অন্যখানে। সে-নিয়মের সুতো-কাঠি কে দেখতে পাবে? তার যে চলতে নিয়ম, নিয়ম খেতে-বসতে।'

বলতে বলতে দিব্যি হাসিমুখে সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি তার স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হল না। হাত জোড় করে আপন মনেই বলে চলল, 'যেখানেই থাক, এখানে তাকে আসতে হবে। মাঘ মাসের প্রয়াগ ছেড়ে তার কোথাও যাবার উপায় নেই। কিন্তু কে চিনতে পারবে। যে মোহান্তের সঙ্গে বছরের পর বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি, হয়তো উনিই সেই মানুষ। দত্তাত্রেয়ের পাদুকা-পূজারী হয়তো ছদ্মবেশে ঘুরছে আমারই সঙ্গে সঙ্গে। কে জানে? কে জানে—'

বলে আমার দিকে চেয়ে এবার অদ্ভুত হেসে বলল, 'এমনি প্যাণ্ট পরে আর অলেস্টার গায়ে দিয়ে তিনি হয়তো দিব্যি ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

কী করে জানব।'

আজ ভোরবেলা অবধূতের মুখেও যেন এমনিধারা কথাই শুনেছি। সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক—ভগবান কখন কোন্ বেশে তার সামনে দিয়ে চলে যাবে। খ্যাপা খুঁজে খুঁজে কখন পরশ পাথরটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবে নদীর জলে। এমনি একটি বিশ্বাস যেন এদের সকলের মনে রয়েছে। সেই বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে একটি বিচিত্র আবেগ ও ভক্তি। তাই, ওই কথা বলতে গেলেই ভক্তি ও বিশ্বাসের আবেগে সে হঠাৎ অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। এখানে আমার বক্তব্য ও মন্তব্য, দুই-ই নিষ্প্রয়োজন।

সন্ন্যাসী নিজেই আমায় পরিষ্কার গলায় বলল, 'যাক, ওসব কথা পরে এক সময় হবে। আজ বিকেলে রামজীদাসী আসছেন। কোথাও যাবেন না যেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কে?'

'সে কি, রামদাসজীর কথা শোনেন নি? তিনি একজন সাধিকা। আমাদের মাইকে তো অনেকবার বলা হচ্ছে আজ সে কথা। তিনি রোজ রোজ এক-একটি আশ্রমে ঘুরে বেড়াবেন। খবর পাঠিয়েছেন, আজ এখানে আসবেন। তিনি হিমাচল প্রদেশের মেয়ে। এলে বুঝতে পারবেন সব। যান, আপনার আর দেরি করাব না, অনেক বেলা হল।'

বলে, যাবার উদ্যোগ করে ফিরে দাঁড়াল আবার। বলল, 'আপনার তাঁবু চিনতে পারবেন তো?'

পারব না কেন? তাঁবুর সারির দিকে ফিরে তাকালাম। সর্বনাশ! তাই তো! সবই একরকম দেখতে, আর একেবারে গায়ে গায়ে। বেরিয়েছিলাম রাত্রি থাকতে। কোনখান থেকে বেরিয়েছিলাম, মনে থাকার কথা নয়। তা ছাড়া এমনিতে বোঝা মুশকিল। সেই রেল কলোনির ব্লকের মত না চিনে খালি পরের বাড়ি উঁকিঝুঁকি। নির্দোষকে শুনতে হয় কটূক্তি।

আমার বিভ্রান্তি দেখে গেরুয়াধারী হাসল। গেরুয়াধারী নয়, কোতোয়ালই বলা যাক। বলল, 'কেমন, ঠিক ধরেছি তো? অবশ্য দু-একদিন গেলে ঠিক চিনতে পারবেন। তবে প্রথম প্রথম বড় অসুবিধা হয় নিজেই বুঝি। তবে তার দরকার হবে না। ওই যে তাঁবুটা দেখছেন, একটি বুড়ি বসে আছে, তার ডানদিকের তাঁবুটা আপনাদের। দেখবেন, খড়িমাটি দিয়ে হিন্দীতে লেখা আছে বারো নম্বর।'

হেসে ফেললাম।—'সত্যি, আপনি না বললে ভারি বিপদে পড়তাম। কিন্তু

একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব।'

'করুন।'

'আপনি কি বাঙালী?'

কোতোয়াল হাসল। হাসিটি সব সময়েই একটু অর্থবোধক। বলল, 'ওটা কি খুব বড় কথা? তবে হ্যাঁ, আমি বাঙালী। জন্মেছিলাম বাংলাদেশেই। দেখুন, মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই, আর অন্ত নেই জবাবের। আমি হয়তো আপনাকে সব কথার জবাব-ই দিতে পারব না।'

বলে হেসে চলে গেল কোতোয়াল। অদ্ভুত ভদ্র তো লোকটি। প্রশ্ন না করার অভিপ্রায় জানিয়ে গেল হাসতে হাসতে।

ওদিকে মঞ্চের উপর মোহান্ত। তার পাশে বসে গায়ক ধরেছে গান। গলা মিলিয়েছে তানপুরার সঙ্গে। একটি করে গান হয়। গানের শেষে মোহান্ত উপদেশ দান করেন, ধর্মের কথা শোনান।

ভিড়ও হয়েছে কম নয়। অধিকাংশই এই আশ্রমের নরনারী নয়। যেখানে হোক ছুটে ছুটে এসে বসেছে সবাই। কোথাও বসে কিছুক্ষণ ধর্মের গীত ও কথা শোনা নিয়ে কথা। এর মধ্যেই চলেছে দেখছি নানান গল্পগুজব। সামনেই দাঁড়িয়ে হেসে জটলা করছে জনা পাঁচ-ছয় পাঞ্জাবী মহিলা। পায়জামা, পাঞ্জাবী আর ওড়নার রঙ রূপে একগোছা ফুলের মত রয়েছেন ফুটে। কিসের কথা, বুঝি নে। হাসিতে বাজছে শত নূপুরের রিনিঝিনি। তাই দেখে কয়েক জন মহিলা রয়েছেন চোখ বাঁকিয়ে। ভাবখানা, হাসতে হয় বাইরে গিয়ে হাসো, এখানে কেন?

কয়েক বিঘা জুড়ে আশ্রমের পরিধি। কতকগুলি অপোগণ্ড দিব্যি চালিয়েছে ছুটে ছুটে খেলা। ধরাধরি আর পাকড়াপাকড়ি। তাদের হঠাৎ-হাসির ঝলকে চমকে তুলছে আশ্রমের গুরু-গম্ভীর জমায়েত ও পরিবেশ। এদিকে বাতাসে ভাসছে ঘিয়ের গন্ধ। তারই সঙ্গে সঙ্গে যেন বাংলা রান্নার ফোড়নের পরিচিত গন্ধটিও নাকে এসে লাগছে।

তাঁবুর সামনে এসেও ভাবনা। আধাআধি বখরা। কোন্‌দিকেরটি? বোধহয় বাঁদিকেরটিই। সামনে পর্দার মত ক্যাম্বিসের ঢাকনা। তুলে দেখব অন্য লোক।

তুলে দেখলাম, সত্যি তাই। হাঁটু মুড়ে বসে একটি ছোট মেয়ে। বোধহয় বাঙালী।

ফ্রকের নীচে গাছকোমর করে বাঁধা রঙীন তাঁতের শাড়ি। ঘাড়ের কাছে

ঝুলছে বাসি বিনুনি। কিছু একটা গালে পুরে, গাল ফুলিয়ে দিব্যি চিবুচ্ছে আর মাথা নেড়ে নেড়ে গুনগুন করছে। এক মুহূর্তের ব্যাপার। নজরটা তীক্ষ্ণ করলাম। সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে মনে হল। আর মনে হওয়া! মনে হতে না হতেই মেয়েটি অস্ফুট চীৎকারে একেবারে লাফ দিয়ে উঠল! তড়িঘড়ি করে খুলল গাছকোমর। বাঁধা আঁচল খুলেই মাথার উপর টেনে একেবারে কলাবউ! কোল থেকে ছড়িয়ে পড়ল এক রাশ টোপা টোপা বিলিতি কুল।

ছি ছি ছি, আমারই ভুল। বালিকা যে আমাদের পেল্লাদের পরিবার। লজ্জার চেয়ে হাসি পেল বেশী। তার চেয়ে বেশী বিস্ময় এক ফোঁটা মেয়ের সর্বাঙ্গে এত লজ্জা এল কোত্থেকে। অন্য দেশের মেয়ের কেন, আজ নিজের দেশের এমনি মেয়েরাই তো এ বয়সে বই-শ্লেট নিয়ে দিদিমণির দ্বারস্থ হয়। অবশ্য পুতুলরূপী পুত্রকন্যাদের বিয়ের ভাবনায় এখন থেকেই ভাবী শ্বাশুড়ী হওয়ার মকশ করা হয়। দিব্যি মাথার উপর বউ দিয়ে, অর্থাৎ ঘোমটা টেনে বউ বউ খেলা হয়।

কিন্তু এ যে সত্যি বউ। মাথায় উঠল কুল খাওয়া। পর পুরুষের সামনে এ যে রীতিমত লজ্জাবতী বাঙালী বধূ। কালকেও দেখেছি। কিন্তু শাড়ির আড়ালে প্রহ্লাদের পরিবারটি এত ছোট, তা অনুমান করতে পারিনি! শত হলেও পরস্ত্রী। ইচ্ছে হলেও কি করে বলি, খুকি, কুল কটা খেয়ে নাও। খুকি বলা দূরের কথা, তুমি করে বলাটাই সমীচীন কি-না বুঝতে পারছি নে।

কিন্তু বেচারা এমন জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিছু না বলাটাও ঠিক নয়। আহা, ছড়ানো টোপা কুলগুলিও বালিকার আঁচলহারা হয়ে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

না, অত আর অগ্রপশ্চাৎ ভাবা চলে না। বললাম, 'কুল কটা কুড়িয়ে নাও।'

বলার অপেক্ষা মাত্র। অমনি ছোট্ট হাত বাড়িয়ে টুক-টুক করে আঁচল-জাত করল কুলগুলি। করেও আবার দাঁড়িয়ে রইল তেমনি।

বললাম, 'এবার খাও। আমি ততক্ষণ জামাকাপড় ছাড়ি।'

বলে ওভারকোটটা খুলতে গিয়ে দেখি বালিকা ঘোমটার আড়াল থেকে দিব্যি পিট-পিট করে দেখছে আমার দিকে। বোধহয় যাচাই করা হচ্ছে আমাকে। চোখাচোখি হতেই আবার আড়াল হল মুখ।

মনে মনে ভারি হাসি পেল। ওভারকোট ছেড়ে জামা খোলবার উদ্যোগ করছি। ভাবছি, প্রয়োজনীয় দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করব কি-না একে।

ভাবতে ভাবতেই এক অভাবিত ব্যাপার।

প্রহ্লাদের পরিবার ফরফর করে বাইরের পর্দার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ঘোমটার আড়াল থেকেই ঝাঁজমিশ্রিত বালিকা-কণ্ঠ ভেসে এল, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল? দিমা আসুক, দেখাবে 'খনি।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে একেবারে অদৃশ্য। বিস্ময়ে আমি জিভটা কামড়ে ফেললাম কি-না, সেটুকুও মনে নেই। এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। জামা খোলার উদ্যোগ করে যেমন দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে রইলাম তেমনি। আমাকেই বলল তো! রীতিমত শাসন! শাসন নয়, ঝগড়া ঘোষণা করে গেল। আর আমি কোথায় ভাবছি, ঘোমটা-ঢাকা এক লজ্জাবতী বালিকা মাত্র। কুলের শোকে কেঁদে না ফেলে। সে যে এমনিধারা মুখঝামটা দিতে পারে, কে জানত? বাইরে মাইকে ব্যাখ্যা হচ্ছে মাণ্ডুক্যোপনিষদ্। আর আমি একলা এই তাঁবু-কোটরে পাগলের মত হেসে উঠলাম। কুম্ভমেলায় এমনি এক বাঙালী গিন্নিও যে আছে, তা কি কেউ জানে!

একটু পরেই দেখি যে, আবার এসে হাজির। ঘোমটার আড়াল আছে ঠিক তেমনি। এসে ছোট্ট একটি তেলের শিশি রাখল আমার সামনে। রেখে বসল গিয়ে আবার নিজের জায়গায়। যেখানে বসেছিল আগে। বসে আবার ঘোমটার আড়াল থেকে শাসানির সুর শোনা গেল, 'তাড়াতাড়ি নেয়ে এসো। দিমা বলে দিয়েছে। নইলে দেখবে 'খন।'

সত্যি আর দেখাদেখির দরকার নেই। কিন্তু তেল মাখব কী করে? তীর্থক্ষেত্রে তো আবার তেল সাবাং মাখা বারণ। বললাম, 'তেল দিলে কে? দিদিমা?'

এক মুহূর্ত চুপ। তারপর একটু চাপা গলা শোনা গেল, 'না। আমিই এনেছি। চটপট নাও। নইলে দিমা আমার মুণ্ডুপাত করবে।'

লুকিয়ে তেল এনেছে! এতখানি দয়া সুবুদ্ধি তার হয়েছে। প্রহ্লাদের পরিবার দেখছি শুধু কাঁচা নয়, হৃদয়টি তার রীতিমত কাঁচা-মিঠের স্বাদে অপূর্ব। এর পর বালিকা বলে অবজ্ঞা করব, তেমন সাহস আমার নেই।

নির্দেশ মাত্র খালি গায়ে বসে গেলাম তেল মাখতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা কী করছে?'

বালিকার মেজাজটি সব সময়েই যেন চড়ে আছে। বলল, 'কী আবার করবে, রান্না করছে। তোমাদের মত তো নয় যে, খালি টো-টো করে বেড়াবে।'

বলার পরই কটাস করে একটি শব্দ উঠল ঘোমটার মধ্যে। বুঝলাম, একটি ডাঁশা কুলে কামড় পড়ল।

কিন্তু এত ভৎর্সনা কেন? বকুনিটা প্রহ্লাদকে নয় তো! মুখ দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু বুঝতে পারছি, বালগিন্নীর চোখে-মুখে কথা! জবাব দিতে গেলে এঁটে ওঠা দায় হবে। শক্ত হলেও ওই দিমার নাতবউ তো!

কিন্তু সত্য কোন্‌টি? ওই ঘোমটা, না খর-কণ্ঠের ধমকানি? বোধহয়, উভয়ই। তা হোক, তবু শাসন আর ধমকানির রূপ কী বিচিত্র উপভোগ্য! বিচিত্রের সন্ধানে ফিরি। ঘরের কানাচে চারাগাছের পাতায় পাতায় যে কত বিচিত্র, তা তাকিয়েও দেখি নে। দেখতে জানি নে, তাই দেখি নে।

একটু বা ভয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নামটি কি?'

অমনি কুল-পোরা মুখের ফোলা গাল নিমেষে দেখা দিল একবার। দেখা দিল দুটি ডাগর চোখ। চোখে সেই বকুনির আভাস। ভাবখানা, বউ মানুষের আবার নামের দরকার কি?

তারপরই ঘোমটার তল থেকে জবাব এল, 'কী আবার, ছিরিমোতি বেরজোবালা দেবী।' অর্থাৎ শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী। হোক বালিকা, তবু ব্রজবালা বলে তো আর ডাকতে পারি নে তাকে। মনে মনে হেসে বললাম, 'আচ্ছা, তোমাকে আমি না হয় বৌঠান বলেই ডাকব, কি বল?'

'বৌঠান?' বলে বিস্মিত গলার অস্ফুট একটি শব্দ শোনা গেল। তারপরে হাসি। ফিকফিক করে হাসতে হাসতে একেবারে খিলখিল হাসিতে তাঁবু-কুটির চমকে উঠল। বুঝলাম, কথাটি ভারি খুশী করেছে তাকে। হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আচ্ছা, বোলো।'

ইতিমধ্যে ঘোমটা উঠে গিয়েছে মাথার মাঝখানে। পরমুহূর্তে আবার অন্য ভাব! বেশ খানিকটা ঝুঁকে, চাপা গলায় চোখ বড় বড় করে বলল, 'এখেনে একটা ভীষণ কিপটে বুড়ি আছে, জানো। ঠিক পয়সা চাইবে তোমার কাছে। সকলের কাছে খেতে চায়। সব্বাই বলেছে, বুড়িটার অনেক পয়সা আছে। তুমি দিও না যেন!'

বললাম, 'তাই নাকি?' গম্ভীর্ হয়ে বললাম, 'কখখনো দেব না।'

ঘোমটাটি এবার ঘাড়ে নেমেছে। কিন্তু সেদিকে ব্রজবালার খেয়াল নেই। বোধহয়, এতক্ষণে সে একটি সঙ্গী পেয়েছে। কথা তার এখনো শেষ হয় নি! আবার তেমনি চাপা গলায় বলল, 'জানো, একটা খুব সোন্দর বউ এসেছে এখেনে। কী চোখ, কী মুখ! আমার চেয়েও মাথায় বড় বড় চুল। সেই

বউটা না, কারুর সঙ্গে কথা বলে না কেন জান ?'

থতিয়ে গেলাম প্রশ্ন শুনে। 'অ্যাঁ ? তা তো জানিনে।'

আমাকে অপ্রতিভ দেখে ব্রজবালার ঠোঁট দুটি করুণভাবে উল্‌টে গেল। বলল, 'জান না তো। তার স্বামী নাকি দশ বচ্ছোর আগে সাধু হয়ে বেরিয়ে গেছে। সেইজন্যে দেওয়ের সঙ্গে এখেনে এসেছে। এখেনে দেশের সব সাধুটাধু আসে কি না, তাই এসেছে। যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাই।'

কে সেই নির্বাক সুন্দরী বউ তাকে দেখি নি, জানিও নে কিছু। 'তাই নাকি' ছাড়া ব্রজবালাকে কী বলতে পারি! রীতিমত সিরিয়স হয়ে বললাম, 'তাই নাকি ?'

ব্রজর ছোট্ট মুখে কী বিচিত্র ব্যথিত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি! বলল, 'হ্যাঁ গো। আমি দেখেছি যে! আচ্ছা তোমাকে চুপি চুপি দেখিয়ে দেব'খনি।'

চুপি চুপি সেই দেখাটা কতখানি বুদ্ধিমানের কাজ হবে জানি নে। আপাতত বলতে হল, 'আচ্ছা।'

কিন্তু ব্রজবালার কথা তখনো শেষ হয় নি। রামধনুর রঙের খেলা তার চোখে মুখে। এই একরকম। তারপরেই আর একরকম। আচমকা তার মুখে ফুটল এক দিশেহারা ভয়ের চিহ্ন। বলল, 'জানো এখেনে বড় চোরের উপদ্দোরব।'

উপদ্দোরব নিশ্চয়ই উপদ্রব। ভাষাটাই একটা উপদ্রব বিশেষ। কিন্তু কী চুরি হল ব্রজবালার ? আমার ভাবনার ফাঁকে ব্রজ আবার হেসে কুটিপাটি। বলল, 'জানো, আজ ভোর রাত্রে সবাই একটা চোরকে তাড়া করেছিল। মেয়েমানুষ চোর!'

মেয়েমানুষ চোর! কিম্ আশ্চর্যম্! এত গূঢ় সংবাদ ব্রজবালা কী করে সংগ্রহ করল। এ তো রীতিমত খবরের কাগজের রিপোর্টারের চেয়েও দুরূহ কাজ। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়েমানুষ কী করে জানা গেল ?'

ব্রজ কুলের বীচিটিকে এবার মুখ থেকে মুক্তি দিল। বলল চোখ বড় করে, 'ওমা সব্বাই বলল। তা ছাড়া, সে যে আবার এসেছিল। ত্যাখো নি, পুবদিকের বেড়া অনেকটা ভেঙে ফেলেছে। সেখান দিয়ে সকালবেলা মাথা গলিয়েছিল। একজন দেখে ফেলল, তাই তো আবার পালিয়ে গেছে।' তারপর গলাটি আরও চেপে বলল ব্রজবালা, 'মেয়েমানুষটা নাকি খারাপ। ওকে ধরতে পারলে না—পুলিশে দিয়ে দেবে বলেছে, হ্যাঁ!'

ডবল সিরিয়স হওয়া যায় কি-না জানি নে। আমি গলার স্বরটা অদ্ভুত

রকম করে আবার বললাম, 'তাই নাকি ?'

ব্রজ তার ছোট্ট, সুন্দর মুখটি বেঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো।'

পরমুহূর্তেই ব্রজবালার চোখ দুটি চকিত আগুনের ঝিলিকে জ্বলে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ গো! সেই মেয়ে চোরটাকে আমি নিজের চোখে দেখিছি। খু-উ-ব সুন্দর। ধবধবে গায়ের রঙ। একজন নয়, ওরকম অনেক আছে। দিমা বলেছে, ওরা নাকি ছেলেও চুরি করে।'

চোখ কপালে তুলে বলতে হল আমাকে, 'সর্বনাশ!' তারপর বললাম, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, 'যাকগে, যার ছেলে নেবে তার ছেলে নেবে। তোমার তো ছেলে নেই।'

ওমা! ব্রজবালার ঠোঁট ফুলে উঠল অমনি ওই টোপা কুলের মত। পাকা বউটির মত টেনে দিল ঘোমটা। কি ভাগ্যি, মুখ ঢাকা পড়ে নি। দুশ্চিন্তাভরা ডাগর চোখ দুটি তুলে বলল, 'তা বলে ভাবনা নেই বুঝি? তোমার দাদা বলছিল, ওকেও নাকি চুরি করে নিয়ে যেতে পারে।'

আমার দাদা! মানে পেল্লাদ? তা, ব্রজবালাকে যখন বৌঠান বলেছি, প্রহ্লাদ আমার দাদা বৈ কি! কিন্তু কি অকপট হৃদয় ব্রজর! কি অকুণ্ঠ বিশ্বাস! কী অপরূপ তার ভঙ্গি! কে বলবে, এ এক নাবালিকা বধূ। ভারি হাসি পেল। সাহস হল না হাসতে। তা হলে অনর্থ ঘটবে না!

সত্যিই, পেল্লাদ তো শুধু বর নয়, ও যে ছেলেও বটে! ব্রজর খেলাঘরের ছেলে, ব্রজর আঁচল-চাপা ছেলে, হৃদয়-জোড়া ছেলে, ব্রজর সংসারের একমাত্র ছেলে। হলই বা সে লিকলিকে কালো গঞ্জিকাসেবী। ব্রজবালার ছোট্ট বুকে ভাবনার অন্ত কোথায়।

কী বিচিত্র সংসার! আর ধন্য প্রহ্লাদের রসজ্ঞান। সে তার এ নাবালিকা প্রিয়াকে কী বলে এমন এক অসহায় ভাবনায় ফেলেছে!

বললাম, 'তোমার অত ভাবনা কিসের। আমি তো আছি?'

বুক ফুলিয়ে বলি নি। খালি গায়ে তৈল মর্দনে বুকটা এমনিতেই টান হয়েছিল একটু। কিন্তু ব্রজ বৌঠান তাতে ভরসা পেল বলে মনে হল না। এক মুহূর্ত দেখল আমাকে ঘাড় কাত করে। চোখে চাপা সংশয়। তারপর একটি টোপা কুলে কামড় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বে করেছ?'

হঠাৎ বিয়ের কথা? বললাম, 'কেন?'

ব্রজবালা বলল, 'আইবুড়ো ছেলেদের ভয়-ই তো বেশী, জানো না?'

জানি নে আবার! কিন্তু ব্রজও যে সেটুকু জানে, তা আবার আমি

জানতাম না। দেখি যত, অবাক মানি তত। ব্রজর যৌবনের সোনায় কুঁড়ির পাপড়ি এখনো দল মেলে নি। বহু সংসারে আগে-পাছে চোরাবালি। তার রকমই বা কত। সংসারের বোঝা মাথায় নিয়ে, সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলেছে যে বাংলার চিরকালের মেয়েটি, সে মেয়েটি কিন্তু এর মধ্যেই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ব্রজবালার মধ্যে। ফুলফলহীন লকলকে লাউডগাটির মত। ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা তার ওই চরিত্রের মধ্যে। সংসারের ফুল আর ফল চাপা আছে ওই চরিত্রের মধ্যে। চরিত্রই তো রূপ। ওই রূপ-ই তো চরিত্র। হাঁড়ি-কড়া-ঘর-পুরুষ, ক্ষেত-খামার-মরাই-লক্ষ্মী, সব আগলে সামলে চলার সংগ্রামী প্রবৃত্তি। ওইটিই তো আদিম প্রবৃত্তি।

ব্রজ বালিকা! তা আমি জানি। তবু, সংসারের সব ভালমন্দ বোঝার মধ্যে তার পাপ কোথায়? অকাল-পক্কতা? কিন্তু ওই দিয়ে তার সংসারের প্রথম পাঠ শুরু। দিদিমণির ক্লাস রুমে যে সে যেতে পারে নি, সে জাতির দুর্ভাগ্য। ব্রজর চেয়ে সরলা কে আছে। দিল্লী সেক্রেটারিয়েট থেকে ঘরামি পাড়ার পুরুষটি পর্যন্ত, ব্রজবালাদের না হলে যে সকল সংসারের ভিত-ই বালি আর বালি। ভিত গড়ার সেই বজ্র-আঁটনি আঁঠাল মাটি কোথায়।

ব্রজকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'বিয়ের কথা বলছ? সে কাজটি আমি অনেক আগেই সেরে রেখে দিয়েছি। ওই মেয়ে-চোর আমার কিছু করতে পারবে না।'

বলল, 'সত্যি বলছ?'

হেসে বললাম, 'মিছে মনে হল?'

ব্রজ গম্ভীর হয়ে বলল, 'বলা যায় না। আজকালকার ছেলেরা তো এ বয়সে বে করে না। তোমাকেও চোখে চোখে রাখা দরকার বাপু। কী জানি কি হয়। বলা তো যায় না!'

ব্রজর শঙ্কাব্যাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে হাসি আর বাধা মানতে চায় না। মনে মনে বলি, বটে! সেই ভাল। এই মেলা জুড়ে খু-উ-ব সোন্দর চোর-মেয়েরা রয়েছে ছেলে ধরার ফাঁদ পেতে। তার মাঝে, ব্রজর চোখে চোখে থাকার চেয়ে নিশ্চিন্ততা আর কী থাকতে পারে।

তবু বললাম, 'কেন, তোমরা বুঝি আজকালকার ছেলেমেয়ে নও?'

কোঁচড়ে তার অগুণ্তি কুল। আর-একটাতে কামড় বসিয়ে গম্ভীর বালিকা বলল, 'হলেই বা!' তারপর মুখের কুলটি গালে আটকে রেখেই বলল চাপা গলায়, 'তোমার দাদা তো ভাল মানুষ না। ব্যামোয় ভোগে তবু নেশা-ভাঙ

করে। যদি আর কিছু করে, তাই দিমা আগে থাকতেই বে দিয়ে দিয়েছে। পুরুষ মানুষ তো।'

পুরুষ মানুষ তো! ওই কলঙ্কটি আর আমাদের ঘুচল না। যেমন ওদিকে একটু মাথা বেড়ে উঠল, দেখা দিল গোঁফের রেখা, আর অমনি আমরা উঠলাম মাথা ঝাড়া দিয়ে। দিবানিশি মন আনচান। গুমরে উঠছে বুকের মধ্যে, পরান যারে চায় তারে নাহি পায়। কোথা গেলে প্রাণসখি, দেখা দেও, এ পোড়া নয়নপথে। অচিরাৎ বাবা মা আর ঠাকমা দিমার দল বিস্মিত উৎকণ্ঠায় চমকিত। ওমা! ড্যাকরার যে মরণ ধরছে গো। ড্যাকরা, অর্থাৎ হাতে পায়ে বেড়ে ওঠা ডাগর ছেলেকে ওটি স্নেহের গাল। মরণ ধরেছে কিসের। না, মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান। অমনি একটি ব্রজবালাকে এনে ঘুরিয়ে দিল সাত পাক। ওই-ই হল মরণ। ব্যাস, ড্যাকরার সব জারিজুরি খতম। তখন ব্রজবালা একা-ই একশো।

কথাটা আর নিছক সত্য না হোক, সত্য আংশিক। যুগে যুগে পালটাচ্ছে রূপ। কিন্তু মেয়েদের বেলা? সে তর্ক করব কার সঙ্গে? প্রহ্লাদ অত বড় একটি প্রমাণ। ব্রজর কাছে হারমানা ছাড়া উপায় কী। তবু বললাম, 'তা সে আর কিছু করে না তো?'

দপ করে জলে উঠল বালিকা ব্রজ। ওইটুকু মেয়ে। খসা ঘোমটা, দোলানো বেণী। ডাগর চোখে চমক কী! যেন ধ্বকধ্বকে আগুন। এক ফোঁটা নীল বিষের মত নাকছাবিটিও জলে উঠল ঝিকিমিকি। কুল মুখে তুলতে ভুলে গেল। বলল, 'করুক না একবার, দেখি।'

ব্রজর মূর্তি কী! ভয় ধরে গেল আমারই। ওইটুকু মেয়ের এত আত্মসম্মানবোধ! অনাচারে এত ঘৃণা! স্বাধিকার-জ্ঞান এতখানি!

মনে আমার হাসি বিস্ময়, দুই-ই। বললাম, 'যদি করে?'

'যদি করে?' ব্রজ তাকাল তেমনি করেই। অসহায় রাগে বেঁকে উঠল ঠোঁট। যেন টঙ্কার-দেওয়া ধনুকের ছিলা। আবার বলল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'ইস। করুক তো!'

আমিও যেন খেলাচ্ছলেই বললাম আবার, 'তবু যদি করে?'

ব্রজর চোখে রক্ত ছুটে এল। তার সারা মুখে চকিত আলোছায়ার ঝিলিমিলি। নিঃশ্বাস দ্রুত। গলার শিরা থেকে ঠোঁট কেঁপে উঠল থরথর করে। আচমকা যেন ফণা মেলল ফণিনী। বলল, 'তবে চলে যাব।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কোথায়?'

বলতে বলতেই দেখি, বালিকার দুই চোখে জলের ধারা। চাপা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যেখানে মন চায়, চোখ যায়, চলে যাব সেখানে। ঠিক, হ্যাঁ।'

আমি চকিত লজ্জায় ও ব্যথায় এতটুকু হয়ে গেলাম। ছি ছি ছি! মনে মনে হেসে খেলছিলাম। বালিকা ভেবে তার ছোট্ট হৃদয়টুকুর সঙ্গে পেতেছিলাম খেলাপাতি। কিন্তু, সে খেলা যে বালিকার এতখানি বাজবে, তা কে জানত। আবার বলি,

জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।

বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে আমার যুক্তি নেই। কিন্তু যে দেহলতায় ফোটে নি ফুল, তার হৃদিসায়রে ফুটেছে ভালবাসার পদ্ম। কে অস্বীকার করবে, বালিকা ভালবেসেছে। ওই প্রহ্লাদ প্রাণেশ্বর হয়েছে ব্রজর। তাই এত রাগ, এত ব্যথা, এত কান্না।

নিজেকে ধিক্কার দিয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'ওকি, তুমি কাঁদছ কেন? আমি এমনি বললাম। তাই কি কখনও হয়? অমন সুন্দর বউ।'

জলভরা চোখেই ব্রজ আমাকে দেখল একবার চকিতে, তারপর মুখ ফিরিয়ে মুছল চোখের জল। আমি হেসে আবার বললাম, 'এঃ, তুমি ভারি ছেলেমানুষ বৌঠান। তোমার মত বউকে কেউ ঠকাতে পারে?'

অমনি হাওয়া এল, মেঘ গেল। আকাশ নীল ঝকঝকে। ব্রজর আলোকিত মুখে মিটি-মিটি হাসি। লজ্জা পেয়েছে একটু একটু।

মনটা তার অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললাম, 'তা কুম্ভমেলায় কেন এলে ছুটে?'

ব্রজ পরিষ্কার বলল, 'ওর জন্য।'

ওর জন্য, অর্থাৎ প্রহ্লাদের জন্য। বললাম, 'কেন?'

ব্রজ বলল, 'দিমা বললে।'

'কী বললে?'

ব্রজ একটু চুপ করে রইল। হাত দু'খানি এলিয়ে পড়েছে নিজের ছোট্ট কোলে। দুটি ছোট ছোট শাঁখায় সোনালি প্যাঁচ, পাত্‌লা নোয়া আর চুড়ি। আবার ঘোমটা দিয়েছে টেনে। টেনে দিতে বড় ভাল লাগে বোধ হয়। বলল, 'কী আবার! বললে, এখেনে ত্রিপুন্নিতে নাইতে হবে, আর···'

ত্রিপুন্নি হল ত্রিবেণী। বললাম, 'আর?'

'আর ওর যেন ব্যামো সেরে যায়। মতিগতি ভাল হয়। ওর যেন একশো

বছর পরমায়ু হয়।

কী গম্ভীর ব্রজবালা! কত গম্ভীর তার কণ্ঠ, তার যত হাসি, তত রাগ। ততোধিক গাম্ভীর্য। ব্রজবালা বালিকা। আর সমাজ আমাদের অজস্র কুসংস্কারে ঠাসা। অভিলাষ ও অভিপ্রায় নিয়ে আমরা কখনো পড়ি বদ্ধ জলায়, যাই কখনো অন্ধকারে।

কিন্তু কোথায় বালিকা ব্রজবালা। দিদিমার কাছ থেকে জীবনের পাঠ নিয়ে যে কথা সে বলল, তাতে দেখি সে বালিকা নয়, যুবতী নয়, বৃদ্ধা নয়, ব্রজবেশিনী সেটি মঙ্গলাচারিণী নারী। সুখে, দুঃখে, কামনা ও বাসনায় অতি সাধারণ ও অসাধারণ মানুষী। তার সেই আদিম বাসনা। সেখানে তো কুসংস্কার নেই। কবিগুরুর শেষ জন্মদিবসের উক্তি মনে পড়ছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস আমি কোনদিন হারাই নি। সেই মানুষের এক বিচিত্র রূপ নিয়ে সামনে আমার ব্রজ।

ক্ষণিকের জন্য মন আমার আবেগে আপ্লুত। রূপমুগ্ধ হৃদয় বোবা হয়ে গেল। মানুষ খোঁজার ছলে খুঁজি মন। সেকথাটি মনে নেই। রূপসায়রে ডুবে দেখি, তলিয়ে গিয়েছি হৃদিকুম্ভে। ওইটি কি মন?

এসেছিলাম অমৃতের সন্ধানে। তাঁবু-খুপরিতে পেলাম ব্রজবালাকে। বালিকা বধু। মুখে তার পাকা কথা। আমার মনে কুসংস্কার নেই। নব্য-সংস্কারবাদী আমার শহুরে মনের নতুন-কাটা খালের জলে আর-এক জলের বন্যা এনে দিল সে তবু। এই পরম বিস্ময় ও খুশিটুকু আমার ঘরছাড়া মনের অনুভূতির থলিতে দিল সে ভরে। আমার পথের সঞ্চয় ও লাভের থলি।

হঠাৎ তাঁবুর পেছন থেকেই শোনা গেল চেরা বংশধ্বনি, 'বেরজো, মুখপুড়ি গেলি কোথায়।'

বোঝা গেল, রান্নার স্থান তাঁবুর পেছনেই। একাধিক হাতা-খুন্তির ঘটং ঘটং শব্দ আসছে ভেসে। ব্রজ লাফ দিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'কী বলছ?'

বলেই কুলের কামড়। বিলিতি কুল নামক বস্তুটি দেখছি তার ভারি প্রিয়।

জবাব এল সেই কণ্ঠে, 'তেলের শিশিটা কোথায় গেল?'

চমকে উঠে ভীত চাপা গলায় বলল, 'ও মা গো!' বলেই গালে হাত। আমারও অবস্থা তথৈবচ। সারা দেহ আমার তৈলাক্ত। যদি আসে তা হলে আর লুকোবার উপায় নেই।

ব্রজ ভীত, কিন্তু ঠোঁটের পাশে তার চাপা হাসির ঝিলিমিলি। চেঁচিয়ে

বলল, 'তেলের শিশি ? আমি তো জানি নে দিমা।'

বলেই চাপা গলায় ব্রজর কি হাসি। আমাকে বলল, 'শিগগির পালিয়ে যাও ' তাড়াতাড়ি গামছা খুলে দিলাম গায়ে। ব্রজ ছোঁ মেরে তুলে নিল তেলের শিশি। তার ছোট্ট দেহের চেয়ে অনেক বড় শাড়ির তলায় তা নিয়েবে হল অন্তর্হিত। কোথায়, তা সেই জানে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তার আবার একটু করুণা হল বোধহয়। সে বউ। নাত-বউ। তার হাসি-কান্না সব ছাড়িয়ে তবু সে বালিকা। খেলা তার যাবে কোথায়। আর আমার মত দেবরের সঙ্গে সে পাতিয়াছে খেলা। ছাড়ে কখনো। কাছে এসে চুপি চুপি বলল। তাও বলল অনেক কষ্টে। মুখ ভরতি যে কুল। বলল, 'আমার পিছু পিছু এস চলে। জলের কলটা দেখেছ তো ? ঢুকে পড়বে আর আমি চলে যাব, অ্যাঁ ?'

তাই হোক। চললাম ব্রজবালার পশ্চাতে।

আশ্রমপ্রাঙ্গণ শূন্য। বেলা হয়েছে অনেক। এবেলার মত অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। জলকলের ধারে এসে দেখি কল নেই। একরাশ মহিলার ভিড়। চাকের বুকে মৌমাছির মত। জলকল এখন নারীবাহিনীর এক্তিয়ারে। সুবোধ ছেলের মত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অন্যথায় ছুটতে হয় গঙ্গার ধারে।

ওদিকে দিদিমার গলা শোনা যাচ্ছে, 'এই তো এখানেই ছিল শিশিটা। কি চোরের জায়গা বাপু। এরকম হলে তো গায়ের কাপড়ও চুরি করে নেবে কখন।' নিজের মনেই মাথা নেড়ে বললাম, 'তা কি করে সম্ভব। সে কাজটি তো একজনই পারত। গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করা যার অভ্যাস ছিল।'

কিন্তু মনের রসিকতা রইল মনে। কানে এল, 'তুই জানিস বেরজো ?'

ব্রজ ধরা পড়লেই আমিও পড়ব। ব্রজ বলল তেমনি ভালো মানুষটির মত, 'না তো। আচ্ছা, আমি দেখছি খুঁজে।'

দিদিমা বলল, 'আর কোথায় দেখবি। আমার বড়ি কটা আর ভাজা হবে না। কী সব্বোনেশে জায়গা বাপু। পাপীগুলাদের পাপের ভয় নেই গো। এই তীত্থক্ষেত্তোর জায়গা, জাগ্রত ঠাকুরের ঠাঁই। তবে আমিও বলি, যে নিয়েছে…'

সেই মুহূর্তেই শোনা গেল, 'পেয়েছি দিমা।'

'কোথায় পেলি লো ?'

'এই উনুনের পেছনে।'

'কই, আমি তো দেখতে পেলুম না।'

তা পারবে কী করে। ব্রজবালা যে জাদু জানে। সে খবর তো রাখে না

দিদিমা। কলের ধারের মহিলারাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। একটি বিশাল-বপু বিধবা তখন থেকেই বিষয়টিতে ফুট কাটছিল। এবার আর একজনকে সাক্ষী মেনে ঠোঁট উল্টে বলল, 'মাগীর গলা আছে বাজখাঁই। ওদিকে চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে। দেখলে তো, আশ্রমের তাবৎ বেটিদের চোর করে ছাড়লে বুড়ি।'

কিন্তু কেউ-ই সেই কথার জবাব দিল না। জল না হলে চলবে না। তাতেই ব্যস্ত সকলে। বোধহয় বিষয়টি নিয়ে ঘোঁট হবে অবসর সময়ে।

কিন্তু বিশাল বপুধারিণী ছাড়বার পাত্র নয়। মুখের একটি বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, 'আমাকে একবার বললে হত। মুখ একেবারে থুড়ে দিতুম না।'

বলে একবার অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল ভিড়ের দিকে। উদ্দেশ্য বোধহয়, কথাগুলি তার কেউ শুনছে কি-না। অর্থাৎ গ্রাহ্য হল কি-না।

হ্যাঁ, একজন তাকিয়েছে তার দিকে। একটি প্রৌঢ়া সধবা। তাকেই বলল, 'আচ্ছা তুমিই বলতো ভাই.........'

গণ্ডগোল। একেবারে গণ্ডগোল। সধবা বলল শান্ত কণ্ঠে, 'কই আপনাকে তো কিছু বলে নি। সত্যি, চোরের যা দৌরাত্ম্য। ওইটুকু তো বলবেই।'

আর যায় কোথায়। ক্ষেত্র পাওয়া গিয়েছে। বিশালবপুধারিণী গলা চড়াল, 'কি রকম। তেলের শিশি রইল ইয়ের গোড়ায়, আর আমাদের করবে শাপমন্যি। এ যে চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা গো।'

অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। এখানে কোন মধুসূদনই সালিসি করতে সাহস পাবে না। গঙ্গাতেই যেতে হবে দেখছি।

এই সময় যুবতী-কণ্ঠ, 'কই, খনপিসী, তোমার ভাঁজা পড়েছে যে।'

'পড়েছে? বাব্বা বাব্বা।' বলেই বিশালবপু, অর্থাৎ খনপিসী সম্ভবত খনা ঠাকরুণ হুড়হুড় করে ঢুকল কলে। ধাক্কা খেল অনেকে। কিন্তু সবাই শুধু মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করেই ক্ষান্ত। বুঝলাম, খনপিসী আত্ম-পরিচয়ে ইতিমধ্যেই আশ্রমে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সকলের চোখে মুখে সেটাই পরিস্ফুট।

দিদিমার হাতের রান্না মিষ্টি শুধু নয়। কুম্ভমেলায় এই বালুচরে, বাঁধা-কপির পাতার সঙ্গে বড়ি দিয়ে যে এমন অবিস্মরণীয় নিরামিষ চচ্চড়ি জুটবে কপালে, তা কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি। রাত্রে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য

দিদিমা দেয় যত গঞ্জনা, তত নিরামিষ ব্যঞ্জনে ভরে ওঠে পাত। একেই বলে বোধহয়, ভগবান যখন দেয়, ছপ্পর ফুঁড়ে দেয়। এমন খাওয়া তীর্থক্ষেত্রে! রাজি আছি বারো মাস পড়ে থাকতে এখানে।

কিন্তু প্রহ্লাদ ফেরে নি এখনো। সে-ই দিদিমার ভাবনা। ব্রজবালারও।

আহারের পর বিশ্রাম। বিশ্রাম আর নয়। গত দু-রাত্রির সমস্ত ক্লান্তি আমাকে এই দিনের বেলা একেবারে গ্রাস করে ফেলল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, জানি নে। জেগে দেখি, অন্ধকার। ঠাওর করে দেখলাম কেউ নেই। মেলার চারিদিকের গণ্ডগোলের সঙ্গে আশ্রমের গীত কানে এল। পর্দা উঠিয়ে দেখি, আশ্রম প্রাঙ্গণে জনসমুদ্র। নারী, পুরুষ ও শিশুর মেলা। জ্বলে উঠেছে আলোর সারি। রঙে রঙে রঙের বান ডেকেছে চারিদিকে। হাসি, কথা ও গানে মুখরিত দিগন্ত।

মনে হয়, কত কী না-জানি দেখতে পেলাম না। কত কী না-জানি হারালাম। তাড়াতাড়ি উঠে জামা-কাপড় বদলালাম। রাত্রির সেই শীত আবার খুলছে তার মুঠো-করা থাবা। আস্তে আস্তে নেমে আসছে এই বালুচরের উপর তার ভয়ঙ্কর আক্রমণ। এখন থেকেই দিচ্ছে হাড়ে কাঁপুনি।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আশ্রমের গেটের সামনে দেখলাম এক আলোর ঝলক। সে আলো শুধু আলো নয়, নারীর রূপের আলো। পৃথিবীতে এত রূপও যে ছিল, তা জানতাম না।

কানের কাছে শুনলাম, কে যেন বলছে ফিসফিস করে, 'ওই যে, ওই রামজীদাসী আসছেন।'

'রটি গেল সেই বার্তা' কান থেকে কানে গেল ছড়িয়ে। এসেছে রামজীদাসী, ব্রহ্মচারিনী। শুধু কানে কানে নয়, বুঝি 'পশিল' মরমে মরমে। যারা জানে আর জানে না যারা, সকলেরই চোখে অপার বিস্ময় ও কৌতূহল।

দাঁড়িয়েছিলাম. দাঁড়িয়েই রইলাম। পলক পড়ল না চোখের। মনে রইল না সাড়া।

স্বপন বাধা টুটি
বাহিরে এল ছুটি
অবাক আঁখি দুটি
হেরি তারে।

অবকাশ রইল না ভাববার, রূপ সে কেমন। মনের মাঝে গুনগুন করে উঠল শুধু আপনি আপনি,

যেন মঞ্জরী দীপশিখা

নীল অম্বরে রাখে ধরি।

অন্তহীন গুনগুনানি বেজে চলল মনের তলে চাপা বীণার তারে। চোখের দৃষ্টি আটকে ছিল নীল আকাশের গায়ে। আদিম রহস্যসন্ধানী মন বারবার দেখতে চেয়েছে, কী আছে ওই নীল আকাশের ওপারে। ভাবলাম, কল্পচারী মনে, 'মাথার পরে খুলে গেছে আকাশের ওই সুনীল ঢাক্না'। চোখভরা শুধু মানুষের রূপ। মানুষ নয়, মানবী, নারী। এত রূপ! দেখি নি তো কোন-দিন। একি ব্রহ্মচারিণীর রূপ!

শুনেছি আর পড়েছি, নারীরূপের তীব্র ছটা জ্বালিয়েছে সোনার সিংহাসন। ছারেখারে দিয়েছে রাজ্য। ধ্বসিয়ে দিয়েছে রাজধানী।

প্রাণ নাশ করেছে লক্ষ লক্ষ প্রজার। বিদেশে কেন যাই। নিজের দেশে পদ্মিনীর কথা মনে নেই?

সে রূপ কি এমনি? সে রূপ কি এর চেয়েও বেশী? কে জানে। মরু-জগতের রূপ-পাগল চোখ আমার। রূপ-ক্ষুধায় অম্লান আমার দুচোখের দীপ্তশিখা। কোতোয়াল বলছিল, হিমাচলের মেয়ে। ঠিকই! এ তো সূর্যচ্ছটাদীপ্ত বরফশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ।

রূপের বর্ণনা আর দেব না খুঁটিয়ে। কৌতূহলটা প্রকাশ না করে পারব না। এ কেমন ব্রহ্মচারিণী। প্রাচীন মলমলের মত শুভ্র সূক্ষ্ম তার শাড়ী। চাপা রূপালী তার পাড়। আধুনিকার মত কুঁচিয়ে আঁচল এলিয়ে দিয়েছে। সারা গায়ে নেই অলঙ্কার। কিন্তু সুদীর্ঘ বেণী কালো সাপের মত এলিয়ে পড়েছে তার পিঠ বেয়ে। বয়স? সে অনুমানের ক্ষমতা আছে কোন্ পুরুষের!

পদক্ষেপে নেই তার রূপসীর অহঙ্কার! কিন্তু চোখে আছে সচেতন দৃষ্টি। রক্ত-রেখায়িত ঠোঁটে তার চাপা ও মুগ্ধ হাসি। আকর্ণবিস্তৃত কালো চোখে বিচিত্র আলো।

পেছনে তার অনেক নরনারী। একটি পুরুষ চলেছে পাশে পাশে। পোশাকে তার ভারি চাকচিক্য। মাথায় শাদা পাগড়ি। হাতে একখানি সরোদ।

রামজীদাসী গিয়ে বসল মঞ্চের এক ধারে। বাহু প্রসারিত করে লুটিয়ে প্রণাম করল মোহান্তকে। ভস্মাচ্ছাদিত জটাজুটধারী মোহান্তের পরণে কপনি। নেত্র রক্তবর্ণ। ফিরেও তাকাল না। শূন্যে তাকিয়ে হাত তুলে আশীর্বাদ করল।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। সুগোল নয়, কাণা-ক্ষয়া থালার মত। হাল্কা

কুয়াশা পড়েছে ছড়িয়ে। যেন হাল্‌কা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে মেলা। তার মাঝে বালুর বুকে অভ্রকুচির চাপা হাসির ঝিকিমিকি।

সমস্ত মেলা জুড়ে মাইক ও জনতার হট্টগোল। আলোয় আলোময় চারিদিক। তাকিয়ে দেখি, যেন কোন্ আধুনিক নগরে আলোকিত কেন্দ্রে এসে পড়েছি। লাল নীল আলোকমালায় সাজানো হয়েছে কোথাও। আধুনিক বিপণির চমকিত আলোক-বিজ্ঞপ্তি। কোন গাছে রঙীন আলোর ঝাড়। রঙীন হীরা ফলেছে সোনার গাছে। অজস্র ফুলের মত রয়েছে ফুটে। গোধূলির আধো-আলোয় মাধবীবিতান। আর এই বালুচরের বুকে হাডসন ও অষ্টিনের অভিজাত শহুরে হর্ণ-নির্ঘোষ। নগর-কেন্দ্রকে মনে করিয়ে দিল বেশী করে। আমাদের সামনে বালু ঠেলে দাঁড়াল এসে কয়েকটি গাড়ি। বাহারী পোষাক ও রঙের হাট নেমে এল আশ্রমের মধ্যে।

কোন এক মহিলা নেমে আসছিলেন চেন-বাঁধা কুকুর সমেত। হয়তো তাঁর আদরের পপি টমি গোছের একটি স্নেহের জীব। বাধা পড়ল। পাহারাদার সন্ন্যাসী আটকেছে তার পথ। আশ্রম-প্রাঙ্গণ অপবিত্র করবেন না মায়জী। কুকুরের প্রবেশ নিষেধ।

তাহলে ? রঙ-রঞ্জিত ঠোঁটে বিরক্তির আভাস। তবে যেতে হবে। গাড়ির ভেতর পুরতে হল আদরের জীবটিকে। তুলে দিতে হল কাঁচের শার্সি। তারপর ঢুকলেন ভেতরে।

স্যুটপরা তরুণের দল করছে ভিড়। পকেটে দুহাত, আর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল। চাপা হাসি আর গা টেপাটিপি।

ওদিকে গণ্ডগোল মহিলা-চত্বরে। পাঞ্জাবী মহিলাদের রঙিন ওড়নার পালেই হাওয়া বেশী। বেশী কণ্ঠের তেজ। দুই অবুঝ ভাষায় লেগেছে কলহ। বাঙালী ও পাঞ্জাবী।

কে বলছে, 'ওমা, সরব কোথায় গো আর ? এ বেটি বলে কি ?'

প্রতিবাদে গাঁক গাঁক করে উঠল যে নারীকণ্ঠ, তার ভাষা বুঝি নে আমিও। লিখব কেমন করে। সম্ভবত যে স্থানটিতে বসেছে, সেটি কারুর পিতৃপুরুষের কেনা জায়গা নাকি, সেটাই কূট তর্কের বিষয়বস্তু। এর পরের প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই, সারা কুম্ভমেলাটাই কারুর স্বামী বা পিতা কিনেছেন কি-না, সেই বিতর্ক।

শোনা গেল, 'কি খাণ্ডার মেয়েমানুষ বাবা! আমাদের বাড়ির পাশে যে পাঞ্জাবী বউটা আছে, সে তো অমন ঝগড়াটে নয় ?'

কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসরণের আভাষ। তাকিয়ে দেখলাম, কল-পাড়ের সেই বিপুলকায়িনী। বোঝা গেল, তার বাড়ির পাশের প্রবাসিনী পাঞ্জাবী বউয়ের তুলনায় সে কয়েক ডিগ্রি উচ্চে অবস্থান করে। অবশ্যই কলহে। কিন্তু পাঞ্জাবী তীর্থযাত্রিনী তার চেয়েও উচ্চে। বোধহয়, জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হল। উত্তর প্রদেশের মহিলাকুলও কম যাচ্ছে না দেখা গেল।

মাইকে শোনা গেল, 'জাগ্রত ভগবান এখানে অধিষ্ঠিত। মায়িজী আপনারা দুদিনের জন্য ভগবানের নাম করুন। সদা ভগবানের সেবা করুন। ঝগড়া করবেন না। ভগবান বিমুখ হবেন। রামজীদাসী ব্রহ্মচারিনী আপনাদের ভগবান শ্রীরামের মহিমা শোনাবেন।'

কথাগুলো বলা হল হিন্দীতে। উর্দুমিশ্রিত নয়, বরং খানিকটা বাঙলা-মিশ্রিত যেন। বুঝতে অসুবিধা হল না অধিকাংশেরই।

একটু স্তিমিত হল কলহের কলকণ্ঠ। গুঞ্জন উঠল তানপুরার তারে। দুহাত জোড় করে বসেছে রামজীদাসী। নিমীলিত চোখ। জানি নে কি ছিল ওই মুখে। কিন্তু মনে হল, ওই একখানি মুখ আলো করে রেখেছে সমস্ত মঞ্চ। আবার বলি, সে আলো রামজীদাসীর রূপ শিখা। এ রূপ শীতল জলরাশির মত ঢলঢল নয়। শান্ত গভীর জলের বুকে ভাব-পাগলের অবগাহনের ডাক নেই তাতে। একটি অসহ্য দ্যুতি, একটি দূরন্ত দীপশিখা। কাঁপছে আর জ্বলছে ধিকিধিকি। আর দর্শক আর শ্রোতা পুণ্যার্থী নরনারী এই দীপশিখারই আলোয় আলোকিত। নিমেষহারা চোখ। মুগ্ধ মনের ছায়া-চাপা মুখ।

মন ভুলেছিল রূপে। কথাহারা মন কথা বলল এবার। সুদূর হিমাচলের, তার দূর গুহাকন্দরের রহস্যের মত মনে হল আমার এই ব্রহ্মচারিণীকে দেখে।

দূরে সরে গেলাম ভিড়ের কাছ থেকে। দূর থেকে দেখব। একলা একলা দেখব, মনে মনে দেখব। ঘুরে গেলাম বেড়ার কাছে। ছিন্ন কম্বল আর কাপড়-জড়ানো কতকগুলি কালো কালো মূর্তি গায়ে গায়ে জড়িয়ে বসেছে দূরের আধো আলোয়। বেড়ার গা ঘেঁসে বসেছে। এখানে মাথার উপর ঢাকনা নেই। দূরের আধো আলো আর কুয়াশা-চাপা চাঁদের আলো মিলে সৃষ্টি করেছে যেন একটি রহস্যঘন অন্ধকার। লক্ষ্য করে দেখলাম। মূর্তিগুলি সব তাকিয়ে আছে মঞ্চের দিকেই। আরো লক্ষ্য করলাম, গুটি দুয়েক জ্বলন্ত গাঁজার কলকে, পাঁচুগোপালের ভাষায় সপ্তমী, ঘুরছে সকলের হাতে হাতে।

গায়ে মুখে তাদের ভস্মমাখা। বুঝলাম, সকলেই সাধু।

কে একজন সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল হন হন করে। গায়ে ধাক্কা লাগল, তাকিয়ে দেখলাম, কোতোয়াল। ডাকলাম, 'কোতোয়ালজী, সাধুজী।'

কোতোয়াল ফিরল। 'কে? ও! আপনি। এখানে কেন, সামনে যান।'

বললাম, 'না, দূর থেকেই দেখি। দূর থেকেই ভাল দেখা যায়।'

কোতোয়াল একবার তাকিয়ে দেখল মঞ্চের দিকে। দেখে মুখ ফেরাল ফিরে রইল এক মুহূর্ত। জানি নে, ভুল দেখলাম কি না। কিংবা চাঁদের এই কুহকী আলোর-ই এমনি কারসাজি। কোতোয়ালের সারা মুখে একটি বিচিত্র ভাবান্তর খেলে গেল। সে ভাবান্তরে গম্ভীর ও থমথমে হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'তাই দেখুন। হয়তো দূর থেকেই ভাল দেখা যায়।'

আশ্চর্য! কোতোয়াল কথা বলল। কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকাল না। বললাম, 'চললেন কোথায়?'

কোতোয়াল এবার হাসল। বলল, 'সেই সর্বনাশী ঘুরছে আশেপাশে। দুবার সে চেষ্টা করেছে আশ্রমে ঢোকবার। ঢুকতে পারে নি। বেড়ার ধার দিয়ে গেছে ওই দিকে, পশ্চিমে। দেখি, কোথায় গেল! বেড়া ভেঙে ঢুকলে আর রক্ষে নেই। কার সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

সর্বনাশী! সে আবার কে? কোতোয়ালের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ সর্বনাশীর কথা বলছেন? কে সর্বনাশী?'

কোতোয়াল বলল, 'জানেন না? খবর রাখেন না দেখছি। নারী চোরবাহিনীর সে সেরা মেয়ে। সে তো সব সময়েই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। পুলিশে ধরে নিয়ে গেলেও যে কি করে বারবার ছাড়া পেয়ে যায়, সেটাই আশ্চর্য।'

খবর ঠিক রাখি নে বটে। তবে শুনেছিলাম ব্রজবালার মুখে। তাকিয়ে দেখলাম, বেড়ার বাইরে চলেছে শত শত নরনারী। চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে। উত্তর থেকে দক্ষিণে। এর মধ্যে সেই নারী-চোর কী করেই বা বেড়া ভাঙবে, আর ঢুকবেই বা কী করে। সে তো জাদুকরী নয় যে অদৃশ্য হয়ে ঢুকবে।

বললাম, 'এত লোকের মাঝে কী করে চুরি করবে সে?'

কোতোয়াল একটু বিচিত্র হেসে বলল, 'লোকের মাঝেই তো চুরি করে সে। যত মানুষ, তত তার সুবিধে।'

পশ্চিমের বেড়ার ধারের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল কোতোয়াল। বালুচরের ভিড়টা এদিকে একটু হালকা। তাকিয়ে রইল সেই ভিড়ের দিকে। তারপর আমাকে বলল, 'ওই দেখুন, একটি মূর্তি ছুটছে। ছুটে চলেছে গঙ্গার দিকে। লক্ষ্য করেছেন?'

বলা মাত্রই দেখতে পেলাম না। লক্ষ্য করলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেখলাম, সত্যি, ভিড়ের মাঝে ডুব দিয়ে দিয়ে হঠাৎ জেগে উঠছে একটি মূর্তি। মেয়েমানুষ নিঃসন্দেহে। ছোটার বেগে আঁচল উড়ছে তার।

কোতোয়াল বললে, 'ও যাদের চেনে, তাদের দেখলেই পালায়। তবে, ওর পালানোর কথা বলা যায় না। এই দেখছেন গঙ্গার দিকে ছুটছে। আবার হয়তো এখুনি দেখবেন, ঝুসির কোলআঁধার থেকে পা টিপে টিপে আসছে ক্যাম্পের দিকে। আর-জন্মে বোধহয় চিতাবাঘ ছিল।'

হবে হয়তো। চোর, তাও আবার নারী। ব্রজবালার মুখে যা শুনেছি, তাতে চোরটি যুবতী ও সুন্দরীও সম্ভবত। রহস্যের মধ্যে কিঞ্চিত রসিকতার কথাই স্বভাবত মনে আসে।

এমন সময় মাইকে কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালাম। রামজীদাসী নিমীলিত চোখ খুলেছে। তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠ মিশিয়ে একটানা গেয়ে চলেছে শুধু, রাম রাম, রাম রাম, রাম রাম, রাম রাম। বারকয়েক রামজীদাসী একক কণ্ঠে রাম নাম গেয়ে গেল। কণ্ঠে কোথাও সঙ্গীত অধ্যাবসায়ের কারুমিতি ঠেকল না কানে। যেন গ্রাম্য বালিকার সরু চাপা কণ্ঠের সুর। একটু পরেই তার কণ্ঠে কণ্ঠ দিল কয়েকজন পুরুষ ও আরও দুটি নারী। এরা আবার কারা? জিজ্ঞেস করবার জন্য ফিরে দেখলাম, কোতোয়াল নেই, আশ্চর্য তো! চোখে পড়ল, অদূরেই বেড়ার বাঁশে হেলান দিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। কোতোয়াল ভেবে কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম।

লোকটি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মঞ্চের দিকে। লোক নয়, সাধু নিশ্চয়ই। ঝাপসা আলোয় মনে হল ফর্সা মুখ। কুঞ্চিত ঘন দাড়ি সেই মুখে। এত শীতেও গায়ে শুধু মাত্র সুতী কাপড়ের গেরুয়া কাপড় একখানি। ঘাড় অবধি বেয়ে পড়েছে ঘন চুলের গোছা। জটাজুটের কোন চিহ্ন নেই। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

মঞ্চের দিকে শুধু দৃষ্টি নয়, বোধহয় মনটিও পড়েছিল। আমি যে উঁকি দিলাম, প্রথমে নজরেই পড়ল না তার। কোতায়াল নয় দেখে ফিরতে গেলাম।

হঠাৎ বোধহয় সম্বিত ফিরে পেল সে। পরিষ্কার হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী, আপনি কী দেখলেন?'

সঙ্কুচিত হলাম। উঁকি দেওয়াটা ঠিক হয় নি বোধহয়। বললাম, 'আমি একজনকে খুঁজছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনিই বুঝি সে।'

ভেবেছিলাম মিটে গেল কথা। কিন্তু সাধুটি হাসল। হাসিতে তার একটি চাপা উত্তেজনার আভাস। একটু যেন অপ্রকৃতিস্থ! একটু যেন রহস্য করেই বলল, 'ভেবেছিলেন, আমি-ই সেই। হা হা হা—সে কোথায়! তাকে এখানে কোথায় পাবেন আপনি!'

আবার সেই কথা। সেই ভাব। সে আবার বলে উঠল, 'আপনি খুঁজছেন, বাবুজী, আমি খুঁজছি। দুনিয়াভর তাঁকে খুঁজছি। জীবন কেটে গেল, তবু পাত্তা মিলল না।'

একথার কোন জবাব নেই। কী জবাব দেওয়া উচিত, তাও জানিনে। অতএব সরে পড়াই ভাল।

কিন্তু সে আবার হেসে উঠে বলল, 'কাকে খুঁজছিলেন বাবুজী?'

বললাম, 'এ আশ্রমের কোতোয়ালজীকে।'

সাধু বলল, 'রামানন্দজীকে? এই তো এখান দিয়ে চলে গেল সে।'

রামানন্দ! বললাম, 'কে রামানন্দ?'

'কেন, এ আশ্রমের কোতোয়ালজী।'

'আপনি চেনেন?'

সাধু হাসল। চাপা গলায় হা হা করে হেসে বলল, 'চিনিনে? অনেকদিন থেকে চিনি।'

'আপনি কি আশ্রমের লোক?'

সাধু বলল, 'না।' বলে তাড়াতাড়ি বলল, 'দেখুন, দেখুন রুক্মিণী নাচছে।'

ফিরে তাকালাম। দেখলাম, রামজীদাসী কোমরে বেঁধেছে আঁচল। নেমে এসেছে মঞ্চ থেকে। মঞ্চোপরি মোহান্তের পাশে দেখলাম, যাত্রার দলের পোশাক পরে বসেছে তিনজন। তিনজনই বালক মনে হল। দুজনের ধনুকধারী পুরুষের বেশ। আর-এক জনের রানীর বেশ বলেই মনে হল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার? এরা কারা?'

সাধু হাসল। তার হাসির মধ্যে কোথায় একটা বিদ্রূপ ও কৌতুকের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যেন। বলল, 'ওরা রাম লক্ষ্মণ আর সীতা। সাজিয়ে এনেছে

একটি কীর্তন মণ্ডলেশ্বরের দল। রুক্মিণী এবার নাচবে। সে যে রামজীদাসী। মীরাবাঈয়ের কথা শুনেছ বাবুজী? কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী মীরাবাঈ। মহাপ্রেমিকা কিষেণজীর নাম শুনলে প্রেমে অবশ হয়ে যেত রাজরানীর অঙ্গ। আর এই রামজীদাসী রামপ্রেমে পাগলিনী। সে যেখানে যায়, কীর্তন মণ্ডলেশ্বর সেখানেই রাম-সীতার মূর্তি নিয়ে হাজির থাকে। নইলে রামজীদাসী পাগলের মত ঘুরবে, খুঁজবে, দেখবে। কোথায় সেই মোহন মূর্তি। নাম গান করতে কখনো প্রাণ তার অবশ হয়ে যায়। কখনো নাচে গায় হাসে কাঁদে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'রুক্মিণী কাকে বলছেন আপনি?'

সাধু বলল, 'কি বলব তবে? মনিয়াবাঈ?'

'মনিয়াবাঈ কে?'

'রামজীদাসীর আর এক নাম ছিল। কিন্তু মনিয়াবাঈ মরে গেছে অনেকদিন।'

বড় কৌতূহল হল। কুহেলিকাময় চাঁদের আলোয় সাধুর মুখে এক বিস্মৃত যুগের রহস্যকাহিনী যেন উঁকি মারছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করবার অবসর পেলাম না। বাজনা বেজে উঠল। সরোদ আর তবলায় বেজে উঠল নাচের বোল।

রামজীদাসী ধরেছে গান।

> কৌন্ বন্ পহুঁছে সখী দো পেয়ারা, দো পেয়ারা
> যা'কে ভোজন মেওয়া মিঠাই তে করসে বনবল।
> করত্ আহারা॥

গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ। আশ্চর্য। এই নৃত্যভঙ্গিমা, পদ সঞ্চালন, হাত ও আঙুলের মুদ্রা তো অশিক্ষিত অপটু নাচিয়ে মেয়ের নয়! এ শুধুমাত্র ভাবের ঘোরে ঘুরে ঘুরে নাচ নয়। প্রতিটি পদক্ষেপে তার নৃত্যকুশলী প্রতিভার অপূর্ব স্ফুরণ। হৃদয়তল ছন্দায়িত হয়ে উঠল তার নাচের ছন্দে ছন্দে। ভুলে গেলাম, রয়েছি এক বালুচরের আশ্রমে। মনে হল, কোন নামকরা নৃত্যকুশলার নাচ দেখতে বসেছি কোথাও।

নাচের নাম জানি নে, তাই বলতে পারব না। নাচের দোলায় দোলায় রামজীদাসীর রূপের ছটা বিচ্ছুরিত হল দিকে দিকে। যে রূপ দেখেছি, সে রূপ ছিল ছাইচাপা। নাচের হাওয়ায় উড়ছে ছাই। আর-এক বিচিত্র রূপে

রূপবতী হয়ে উঠেছে রামজীদাসী। আধুনিক ভঙ্গিতে পরা তার মখমলের মত শাড়ি। ভাঁজে ভাঁজে তার রূপের শিহরণ। পিঠের বেণী তার চঞ্চল কালো নাগিনীর মত হিস্‌হিস্‌ করে উঠছে অস্থিরতায়।

যাকে আচোয়ান সরযু গঙ্গাজল

তে কয়সে পিওত্‌ জঙ্গল জল খাড়া ॥

তারপর করুণ কণ্ঠের মিনতি, 'কহো কহো মেরী রাজা।' গানের ভাষা দেহাতি মনে হয়। সব কথার অর্থ বুঝিনে। মনে হল, বনবাসী রামকে জিজ্ঞেস করছে, 'রাজার ছেলে তুমি। নিয়ত খেতে মেওয়া মিঠাই। কিন্তু বনে এসে তুমি কি করে বনফুল খেয়ে রয়েছো? নির্মল গঙ্গাজল তোমার পানীয়, কিন্তু হে রাম! জঙ্গলের জল তুমি কেমন করে পান করছ? চরণ তোমার নিত পলঙ্‌ 'পর, কেমন করে তুমি ঘুরছ বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে। ওগো রাজা রাম! ঐ দুঃখ তুমি সয়েছ, আমার যে সয় না।'

একটা মাতন লাগিয়ে দিয়েছে রামজীদাসী। তাকিয়ে দেখি, সভাস্থ সকলের চোখে মুখে একটি ভক্তিরসের ছোঁয়া লেগেছে। রস করুণ, নিঃসন্দেহে। রামজীদাসীর রূপমুগ্ধ মানুষের হৃদয়ে কোন চোরাপথ দিয়ে এসে পড়েছে একটি ভক্তিরসের শীর্ণধারা। জানি নে প্লাবনের সৃষ্টি হবে কি-না।

আমার পার্শ্ববর্তী সাধু বলে উঠল, 'উলারা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?'

'এই গানের নাম বাবুজী। এদেশের ঝি-বহুড়িয়া পালা-পার্বণে এ গান গায়।' দেখলাম, সাধুর চোখে মুখেও ওই গানের রসের তরঙ্গ লেগেছে।

তারপর শুধু নাচ। সন্ন্যাসীর দিক থেকে চোখ ও কান দুই-ই চলে গেল রামজীদাসীর দিকে। তবু, সন্ন্যাসীকে ছাড়তে মন চাইছে না। একটা তীব্র ও চাপা কৌতূহল অদৃশ্য চুম্বকের মত টেনে রেখেছে আমাকে। টেনে রেখেছে রুক্মিণী আর মনিয়াবাঈ। শুনতে পাচ্ছি, সন্ন্যাসী বিড় বিড় করছে আপন মনে। অস্পষ্ট কথা আর চাপা হাসি।

তবু মন ভাসিয়ে নিয়ে গেল রামজীদাসী। রামজীদাসীর নাচ। নাচ আর বাজনা। সরোদ বাজছে যেন স্রোতস্বিনীর টানে, কিনারে কিনারে নুড়িমালার রিনিঠিনি। তার সঙ্গে তবলা-সঙ্গত। রামজীদাসীর পদক্ষেপের তালে তালে একজন হাতে নিয়ে ঝঙ্কার দিচ্ছে নূপুরের গোছা।

যন্ত্রসঙ্গীতের এই সুর যেন একটি ছবি। একটি নিখুঁত প্রাকৃতিক দৃশ্য নিরন্তন তানপুরা-ধ্বনি যেন ছবির পিছনের বিস্তৃত অসীম নীল আকাশ।

কোলে তার একটি রূপের দ্যুতি। রামজীদাসী।

ভাবের ঘোরে নাচ নয়। নাচে লেগেছে এবার ভাবের ঘোর। কথা ফুটেছে নাচের ছন্দে। সেই নিঃশব্দ কথা : হাসি ও আনন্দের, বেদনা ও অভিমানের, কখনো নির্বাক ব্যথা ব্যক্ত হয়ে পড়েছে দেহ-ভঙ্গিতে। নিথর আড়ষ্ট বঙ্কিম দেহ। তারপরে অকস্মাৎ ব্যথার পাথর সরিয়ে নির্ঝরিণী ছলছল। সর্বাঙ্গ আনন্দে থরথর কম্পিত কিংবা কপট অভিমানে চটুল নারী চোখে হাত দিয়ে খেলে আঁখমিচোলি। আবার ভক্তি-উচ্ছ্বাসে মাটিতে লুটানো প্রণাম।

রামকে নিয়ে রামজীদাসীর লীলা। নির্বাক বিস্ময়ে ছেলে তিনটি গোল গোল চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা। বেচারীরা অন্যদিকে তাকাবার অবসরও পাচ্ছে না একটু।

আরো জানিনে, ভক্তি-উচ্ছ্বাসে কতখানি মেতে উঠেছে মণ্ডপের নরনারী। কিন্তু অভূতপূর্ব স্তব্ধতা বিরাজ করছে সর্বত্র। মোহমুগ্ধ নির্বাক সকলে। যেন তাদেরই নির্বাক হৃদয়ের তালে তালে নাচছে রামজীদাসী।

ভিড় হয়েছে প্রচণ্ড। গেটের সামনে আর বেড়ার ধারে ধারে গিজগিজ করছে কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। সারা কুম্ভমেলাটাই ভেঙে পড়েছে যেন রামজীদাসীর নৃত্য-আসরে।

পাশ থেকে সন্ন্যাসী হেসে বলল, 'একদিন যার নাচ দেখার জন্য লাখপতি ধর্না দিত বন্ধ দরজায়, আজ সে মেলার মাঝে নেচে নেচে ভগবানের সেবা করছে।'

লাখপতি ধর্না দিত! সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই রামজীদাসীর নাচ দেখার জন্য ?'

সন্ন্যাসী বক্র হেসে, গম্ভীর গলায় বলল, 'ছি বাবুজী, রামজীদাসী বলতে আছে! আমি বলছি লক্ষ্ণৌয়ের মনিয়াবাঈয়ের কথা। রূপে যার জুড়ি ছিল না দিল্লী-লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজীকুলে। মনিয়াবাঈ। কেউ বলত রুক্মিণী। কার ফুলে মধু আছে, ভ্রমর ছাড়া কোন্ রসিক তার সংবাদ রাখে। কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ের রসিক ভ্রমরেরা আসত ছুটে, মনিয়াবাঈয়ের সন্ধানে। সংবাদ চাপা থাকত না তাদের কাছে। কেউ দেখা পেত, কেউ পেত না। সহজ কথা ? একি সেই লেড়কী, সেই আওরত, যে সড়ক-কি-কিনারে পেতেছে আপনা বেসাতি। হাসি যার ঠোঁটে লেগে থাকে, নাগরকে খুশি করা ছল-কথা যার মুখে ঝরে হরবখত ? নহি, নহি বাবুজী। সেই রকম বাঈজী

ছিল না মনিয়াবাঈ। গানের কলি দিয়ে ভোলানো ? আরে রাম রাম!'

বলতে বলতে কিছু ভাবান্তর ঘটল সন্ন্যাসীর মুখে। বক্র হাসিটি চাপা ব্যথায় করুণ হয়ে ওঠে। যদি ঠিক দেখে থাকি, যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে দেখেছি ঠিক। দেখলাম, কোন এক সুদূরের বুকে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। যেন কোন-এক দূরে মঞ্চে, কী এক খেলা খেলছে সে। দেখছে, আর তার চোখে সে খেলারই আলোছায়ার ঝিলিমিলি। তার কথাগুলি বুঝলাম। কিন্তু ব্যক্ত করতে পারব না তার ভাষায়। ঠেট্ হিন্দী নয়। গ্রাম্য ভাষার মধ্যে গ্রাম্য অলঙ্কার দিয়ে কবিতা আবৃত্তির মত বলল সে। বলল, 'বাবুজী মানো, অনেক খেলা ভগবান আমাদের দেখাচ্ছে। মনিয়াবাঈকে দিয়ে ভগবান আমাদের একটা খেলা দেখিয়েছে। মনিয়াবাঈ সোনার পালঙ্কে বসে মহারাণীর আদর পেয়েছে, কিন্তু বুকের ভেতর তার আঁকা কিছু রঘুনন্দনের মূর্তি। রঘুনন্দন!' যেন সে ডাক দিল রঘুনন্দনকে। জানি নে কে সেই রঘুনন্দন। ব্যাকুল গলায়, জোড় হাতে বলল সন্ন্যাসী, 'হে মহাপ্রাণ, সাধকগুরু আমার প্রণাম নাও।' বলে সে চুপ করল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'রঘুনন্দন কে ?

বলল, 'সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী শুধু কপিন এঁটে জটা বাঁধবার জন্যে ? চোখ পাকিয়ে খালি ব্যোম্ ব্যোম্ ? উঁহু, বাবুজী, সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের মধ্যে প্রেমাবতার বাসা নিয়েছিল। যে তার কথা শুনেছে, প্রাণ জুড়িয়েছে তার। মনে হত, যুগযুগান্তরের কোন্ সিদ্ধাচার্য নতুন রূপে এসে দাঁড়িয়েছে তোমার সামনে। সেই রঘুনন্দনের ছায়া পড়েছিল মানিয়াবাঈয়ের বুকে। পর-ছায়া নয়। রঘুনন্দনের সাচ্চা ছায়া। যত ছাড়ো, যত মারো, যত বুক চাপড়াও, সে ছায়া সরবে না। আগুনে ঝাঁপ দেবে ? তোমার ছাইয়ের, তোমার আত্মার মধ্যে বিরাজ করবে সে। হা-হা-হা…লক্ষ্ণৌয়ের রাজ ইমারত, বিজলী বাতি আর সোনার খাট! হীরে-জহরতে-ভরা মনিয়াবাঈয়ের সর্বাঙ্গ। বাবুজী, লালসামন্ত পাগলেরা বাঈজীর খোলা গায়ে মদ ঢেলেছে। তার সুন্দর পা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়েছে সেই মদ। লোভী কুকুরের মত কামাসক্ত মানুষ তাই চেটেছে। মানুষ নয়, জানোয়ার। জানোয়ারের উল্লাস। যৌবন যার ক্ষেত-জমিনের মাটির ঢ্যালা। আজকে পাথরের মত শক্ত, কালকের বর্ষায় সে কাদা হয়ে গলে যাবে। আর এই জানোয়ারের মাঝে পাগলীর মত খিলখিল করে হেসেছে নটী মনিয়াবাঈ। হেসেছে, নেচেছে, গান করেছে। তারপর জিন্-পাওয়া আওরতের মত চীৎকার করেছে, লণ্ডভণ্ড করেছে ঘরদোর,

ভেঙে দিয়েছে সভা। সে ভৈরবী মূর্তি দেখে পালিয়েছে কামার্ত পশুরা। মনিয়াবাঈয়ের আর এক নাম ছিল পাগলী বাঈজী। রূপ ছিল তার পাপ। সেই পাপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল আলো। সেই আলো যখন জ্বলে উঠত পাপের ভারে, মনিয়া তখন পাগলী হত। হবে না! আরে 'বাপরে! রঘুনন্দন এসে দাঁড়াত যে তার সামনে। তার দিব্যদৃষ্টির সামনে। তাকে বুকে নিত, আদর করত, সোহাগ করত। তারপর একদিন—' বলতে বলতে সে থামল আচমকা। যেন কী কথা মনে পড়েছে হঠাৎ। চাপা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মগর, আখেরি নতিজা 'কেয়া মিলি? বাবুজী, দেখ, দেখ তো রামজীদাসীকে। হাত রাখো নিজের বুকে। রেখে বল, কী দেখছ? কী ভাবছ? তোমার মনের মধ্যে এক ছোট্ট রঙদার চিড়িয়া পাখা ঝাপটা দিচ্ছে না? আরে, সরমাচ্ছো কেন বাবুজী? লজ্জা কী? ওই চিড়িয়া তোমার বাসনার সুন্দর মূর্তি। তোমারও নয়, সকলের। সকলের মনেই ওই বিহঙ্গ ফটফট করছে। করবে না? ওই রূপ! ওই বেশ! উর্বশীর জীবন্ত ছায়া। রামজীদাসী নামে, বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি, ধুকু ধুকু। নিজের মন চেনে ক'জনা? গৃহী বাদ। সন্ন্যাসী? মন চেনে ক'জনা? বাসনা মরেছে ক'জনার? রামজীদাসী নয়, আগুনের পিছু ছুটছে সব। প্রকৃতি একটা শোধ নিচ্ছে ওই রহস্যময়ীকে দিয়ে। ভগবানের মুখে চুনকালি মাখাতে চাইছে। শুনলে লোকে হাসবে, রাগ করবে। লোকে শুধু ওইটুকুই জানে। থাক, থাক ওসব কথা।'

সন্ন্যাসী চুপ করল। দাঁড়িয়েছিল একটা বাঁশ ধরে। সেটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল এবার। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল কানে, বলিষ্ঠ হাতে বালা রুদ্রাক্ষের। কপালে অস্পষ্ট পুণ্ড্রেখা।

সন্ন্যাসী থামল। কিন্তু আমার মন থামে নি। সে তার সবটুকু অনুভূতি দিয়ে কান খাড়া করে রইল। দেখছি, রামজীদাসী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ দেখতে পাচ্ছি নে।, পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি, রুপালী পাড়ের বেষ্টনী ঘিরে রয়েছে তীব্র রেখাঙ্কিত দেহ। তাকে দুভাগ করে নেমে এসেছে সুদীর্ঘ কালো বেনী। আর কীর্তন মণ্ডলেশ্বরের-গীতকারেরা সকলে মিলে ধরেছে গান।

রামজীদাসী আর মনিয়াবাঈ। মনিয়াবাঈ আর রঘুনন্দন। সব মিলিয়ে একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র রহস্যের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি উৎকর্ণ হয়ে। অতীত ভারতের এক রহস্যদ্বারের সামনে যেন দাঁড়িয়েছি আমি। যেন বিচিত্র

রহস্যে ছেয়ে গিয়েছে সারা কুম্ভমেলা। মনিয়াবাঈ আর সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কাহিনী শোনবার জন্য আকুল মন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সন্ন্যাসীজী, তারপর ?'

বুকের খুলে-যাওয়া আবরণ ঢাকা দিল সন্ন্যাসী। হঠাৎ যাওয়ার উদ্যোগ করল। বলল, 'পুরনো কথা বাবুজী। এ হল সন্ন্যাসীদের গুপ্ত-কথা। আপনাদের শুনতে নেই। ভালও লাগবে না।'

বলে সে সত্যি পা বাড়াল। বললাম, 'যদি বাধা না থাকে, তবে শুনতে চাই।'

সন্ন্যাসী তাকাল আমার দিকে। মন-সন্ধানের তীক্ষ্ণতা তার চোখে। বলল, 'আপনার আশ্রমের কোতোয়ালের কাছ থেকে শুনে নেবেন বাবুজী। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কারুর অজানা নেই এই কথা।'

বলতে বলতে চলে যেতে চায়। মনে হল অনিচ্ছার ছল-হাসি তার মুখে। হয়তো শুনতে পাবো না কিছুই রামানন্দর কাছে। সন্ন্যাসীর কাছ ঘেঁসে এলাম, জানি নে সাধু-সন্ন্যাসীর মেজাজ। কখন কোন্ ভাবে বিভোর। বেশী বললে যদি আবার গণ্ডগোল ঘটে। তবু বললাম, ভয়ে ভয়ে, 'অসুবিধে না হলে আপনিই বলুন।'

সন্ন্যাসী বাঁকা হেসে বললে, 'কেন শুনতে চান ? এ এক সন্ন্যাসীর প্রেম-কাহিনী। আপনার গৃহী মন বিরূপ হবে।'

হয়তো হবে। তবে গৃহী বলে নয়। অমানুষিক কাহিনী বলে মানুষ দুঃখ পাবে বৈ কি। তবুও মনে বড় কৌতূহল। সন্ন্যাসীর আবার প্রেম। সে কি কথা ?

বললাম, 'শুনতে বড় সাধ। সন্ন্যাসীর প্রেম-কথা, এযুগে কখনো শুনি নি।'

সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। হেসে চলতে আরম্ভ করল আশ্রমের গেটের দিকে। বুঝলাম, নীরবে আহ্বান করছে সে আমাকে। আর-একবার দেখলাম রামজীদাসীকে। সত্যি, আগুনই বটে! সভাস্থ নরনারী সকলে অপলক বিস্মিত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকেই।

গেটের কাছে এখনো ভিড়। ভিড় ঠেলে বাইরে এলাম। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য! যেদিকে তাকাই সেদিকেই লোক। তবে গায়ে গায়ে নয়। সীমাহীন বালুপ্রান্তরের আলোকিত মেলায় ছড়ানো মানুষ।

সন্ন্যাসী চলল পুব-দক্ষিণ কোণ বরাবর। সঙ্গমের এক কোণে। যেখানে সরস্বতী আছে আত্মগোপন করে। ওদিকটায় আলো নেই। কিন্তু আকাশে

চাঁদ রয়েছে। প্রবল শীত। তবু উত্তর প্রদেশের আকাশে এখনো যেন শরতের সমারোহ। সমারোহ শুধু মেঘেরই আনাগোনায়। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে দেখা যায় না শরতের ঘোর নীলিমা। ঝুসির উঁচু বুকে অড়হরের ক্ষেত ঘন মেঘের মত লেপ্‌টে রয়েছে অস্পষ্ট আলোকিত আকাশে। এদিকটায় বৈদ্যুতিক আলো নেই। কিন্তু মানুষের আনাগোনা কম নয়। অস্পষ্ট ছায়া-মিছিল চলেছে চারিদিকে।

যত এগুচ্ছি, বালি তত গভীর মনে হচ্ছে, পা ডুবে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী আমার দিকে ফিরে বলল, 'সন্ন্যাসীর প্রেম-কথা কখনো শোনেন নি?'

তার কণ্ঠস্বরে অবাক হলাম। এক বিচিত্রভাবে ও সুধায় কথা তার গম্ভীর ও তরল। খুশী ও আনন্দে ভরপুর। বলল, 'সন্ন্যাসীর প্রেম তার ধ্যানে ও ধর্মে। ধর্মে আর কর্মে। তার প্রেম বলে, ওগো দেব, প্রাণেশ্বরী, প্রেয়সী, সন্ন্যাসীনাং সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে! তবে গোপনে। গৃহী-জগতের বাইরে। প্রেম থাকবে না কেন? তবে, এই প্রেমে অনেক আড়ম্বর, অনেক আয়োজন। লোকচক্ষে বড় ভয়ের বিষয়! বসুন বাবুজী, আপনাকে সন্ন্যাসীদের একটি গুপ্ত ক্রিয়ার কথা বলি।'

বলে সে শিশিরসিক্ত বালির উপরেই বসে পড়ল। আমিও সেখানে বসলাম। আধুনিক শহুরে মনে সাধুসন্ন্যাসীদের সবই উদ্ভট বলে জানি। তবু কৌতূহল ছাড়তে পারি নে।

সে বলল, 'বাবুজী, সন্ন্যাসীর আছে কুলাচার। কুলাচার কী? আপনি বাঙালী। আপনাদের দেশে কুলাচারী বড় বেশী ছিল। আপনাদের ভক্ত চণ্ডীদাস, কবি-সাধক। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা গেয়েছেন। তিনিও কিন্তু কুলাচারী। কুল তাঁর রজকী। রামী ধোপানী। ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী, নটী, ডোমী আর রজকী—এ হল বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের নির্বাচন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রমতে নয়টি কুল। ওই পাঁচ, আর চারটি বেশ্যা, কাপালী, নাপিতানী, গোপিনী। কোন কোন তন্ত্রমতে চৌষট্টি কুল আছে। যবনীও বাদ যায় না তাতে। এসব সাধনমার্গের গুহ্য পদ্ধতি। তবে, এ সবই তন্ত্রমতে। কিন্তু সন্ন্যাসীর তো তন্ত্র নেই। অনেক কুলাচার-পদ্ধতিতে সাধন করে থাকে। আপনাকে সন্ন্যাসীদের কথাই বলি।' বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল। বোধহয়, আমি কী ভাবছি, সেটুকু দেখবার জন্য। কিন্তু ঐসব বিত্তান্ত কম-বেশী শুনেছি। এতে আমার বিস্ময়ের কিছু ছিল না। আমি শুনতে চাইছিলাম, রঘুনন্দন ও

রামজীদাসীর কাহিনী।

সে বলল, 'সন্ন্যাসী আর অবধূতে বড় একটা তফাত নেই। এরা অনেকে জ্যোত্‌মার্গের সাধন করে। অনেক তার ক্রিয়াকাণ্ড। মূলে বালাসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব হল তার কামনা। ঘৃত-কর্পূরের একটি প্রদীপকে তারা পূজা করে। প্রদীপের চারপাশে সাক্ষী থাকেন কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হনুমান আর ভৈরব। এ পূজার উপাচার হল প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, মতি ও চক্রী। বুঝতে পারলেন না? মদ, মাংস, মাছ, অন্ন আর পুরি। এ হল গুপ্ত শব্দ। এ ছাড়া সপ্তমী, ষষ্ঠী। গাঁজা আর তামাকু। এ হল জ্যোত্‌মার্গে প্রবেশের পন্থা। যে প্রবেশ করে, তাকে আর-একটি ব্রত করতে হয়। তাকে বলে চৈত্র মাসে নবরাত্র ব্রত। এই ব্রতের দিন সন্ন্যাসী চক্র করে আর গুপ্তস্থানে মিলিত হয় আওরতের সঙ্গে। এই মিলন হল সন্ন্যাসীর গুপ্ত সাধনের সিঁড়ি। একে ছাড়া চলবে না। এর মধ্যে আছে অনেক যুক্তি, কূট বিষয়। আপনি সব বুঝবেন না বাবুজী।'

সন্ন্যাসীর জ্যোত্‌মার্গে প্রবেশ জানি নে। কিন্তু তন্ত্রের নানান্ কথা অনেকবার শুনেছি। শুনেছি, আর বারবারই মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে একটি প্রশ্ন, 'এসব কেন, কেন?' যত জিজ্ঞেস করছি, জবাবগুলি ততই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে অনুভূতিতে। বুদ্ধিও অনুভূতির অগম্য। নানান্ জনের নানান্ মত। সাধকেব সিদ্ধিলাভের বিচিত্র লীলা! নিতান্ত সামাজিক জীব আমরা। আমাদের বলে, তোমরা বুঝবে না। আর আমরা ভাবি, তবে বুঝব না। শেষ পর্যন্ত যা পাই, সে তো মানুষের আর সাধকের আত্মার তৃপ্তি। এখানেই এত ঘোর-প্যাঁচ। কিন্তু কই, বিকলাঙ্গ বলরামকে, তার কথাকে তো এত জটিল মনে হয় নি। সে যেন পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর মানুষ। তার সঙ্গিনী লক্ষ্মীদাসীও তেমনি সুন্দর।

প্রতিবাদ করলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'রঘুনন্দনের কী হল?'

সন্ন্যাসী বলল, 'রঘুনন্দন আর রুক্মিণীর কথা বলব বলেই এত কথা বললাম। এমনি বললাম বুঝি তোমাকে এসব? তবে, এ বিশ্বসংসারের কিছুই গোপন নেই। তাই বললাম। বাবুজী, রামজীদাসীর রূপ দেখে মানুষের চোখ ভুলে যায়। পুরুষের চোখ কিনা! কিন্তু পুরুষের রূপ দেখেও যে মানুষের চোখ ভোলে, তার প্রমাণ ছিল রঘুনন্দন। এই এলাহাবাদেই এক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে। মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ। শুধু রূপে নয়, গুণেও। সে চোখ তুলে তাকালে, গায়ে হাত দিলে, সারা দেহ কাঁটা দিয়ে

উঠত মানুষের। মন্ত্র-তন্ত্র নয়, তার হৃদয়টি ছিল অমনি। তার চরিত্রের গুণে তার কাছে আসত মানুষ। তোমার ঐ নিরঞ্জনী আখড়ার সাধুরা রঘুকে বিদ্রূপ করত, ঠাট্টা করত। বলত, সন্ন্যাসী-জীবন তোমার নয়। গোঁফদাড়ি কামিয়ে শাড়ি পরে নবদ্বীপে চলে যাও। তা বললে কি হয়? মহাজ্ঞানী রঘুনন্দন। তর্কে হার মেনে রগচটা সন্ন্যাসীরা খালি ত্রিশূল দিয়ে মাটি খোঁচাত।…এই রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্মিণীর দেখা হয়েছিল হরিদ্বারে। রঘু তখন জ্যোত্‌মার্গ সাধন করে নবরাত্র ব্রত উদযাপনের আয়োজন করছে।'

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কোন এক অতীত যুগের কথা শুনছি। যে ভারতবর্ষকে দেখছি, এ যেন সে ভারতের কাহিনী নয়। কোনও এক হিন্দু-যুগের। সন্ন্যাসীকে বাধা না দিয়ে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব কত বছর আগের কথা?'

সন্ন্যাসী বলল, 'তা আজ প্রায় পনর-ষোল বছর আগের কথা।'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে রামজীদাসীর বয়স কত?'

হেসে বলল সে, 'কত অনুমান করছেন বাবুজী?'

অনুমান? অনুমান করে নারীর বয়স বলার সাধ্য আমার ছিল না। তবু বললাম, 'বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ।'

সন্ন্যাসী তেমনি হেসে বলল, 'আরও কম বললে দোষ হত না। কিন্তু বাবুজী, আরও আট-দশ বছর বাড়িয়ে দিন।'

আরও আট দশ বছর! চকিতে সেই রূপশিখা মূর্তি ধরে দাঁড়াল আলোর সামনে। আশ্চর্য!

শুধু দেহ নয়। মুখখানিতে কোথাও বয়সের দাগ পড়ে নি। কম বললে সত্যি ক্ষতি ছিল না।

সন্ন্যাসী বলল, 'মনে আছে, সে যেদিন এল, আমাদের আশ্রমের শূন্য বাগানে যেন ফুল ফুটে উঠল। সন্ন্যাসী হলে তো তার চোখ বন্ধ হয়ে যায় না। হৃদয় মরে যায় না। সে এল। সঙ্গে তার স্বামী। ঝোলা-কাঁধে নিতান্ত গেঁয়ো মানুষ। চৈত্র মাস। হরিদ্বারে তখন এমনিতেই ভিড়। কেদারবদরির যাত্রীরা আসতে আরম্ভ করেছে। বরফ-গলা জলের ঢল নেমেছে এদিকে-ওদিকে। রুক্মিণীর স্বামী মোহান্তর অনুমতি নিয়ে খানা পাকাবার আয়োজন করল আশ্রমে। তারা এসেছে আরও উত্তর থেকে। যাবে বদরি-নারায়ণ দর্শনে। আশ্রমের পেছনেই আশ্রমের একটি গুপ্তাবাস ছিল। একটি মস্ত গুহামুখ। সেইখানে নবরাত্র ব্রতের ভিড়। আশ্রমের অনেকে সেইখানেই ব্যস্ত। তা ছাড়া

ভক্তও এসেছে অনেক। কয়েকজন এসেছে সস্ত্রীক। নবরাত্র ব্রত বড় গোপন বিষয়। তার আয়োজনও চলছিল গোপনে।'

বলে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল সন্ন্যাসী। বলল, 'বড় অদ্ভুত মানুষ ছিল রঘুনন্দন। গুপ্তাবাস থেকে বার বার বেরিয়ে আসে, আর মোহান্তর কাছে এসে খালি বসে। আমার সঙ্গে যতবার চোখাচোখি হয়েছে, ততবারই হেসেছে। অস্বীকার করব না, সে হাসি সন্ন্যাসীর শোভা পায় না। সে হাসি গৃহী জোয়ান ছেলের। গোপন প্রেমের। তবে. রঘুনন্দনের মুখে একটা চিন্তাও ছিল বাবুজী। মাঝে মাঝে কালো দেখাচ্ছিল তার আঙ্কেরী মুখ। আমি ছিলাম কোতোয়াল। নবরাত্র ব্রতে নিমন্ত্রণ করতে যাব অন্যান্য আশ্রমের সহধর্মীদের। হঠাৎ রঘুনন্দন এসে বলল, 'কোতোয়ালী, আমি চক্রে থাকতে পারব না রাত্রে।' আমি তাজ্জব। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। নিত্য-মন্ত্র পাঠ করে, নতুন বেশে সেজেছে সে। নেংটির চেয়ে হাঁটু অবধি গেরুয়া ধারণ তার পছন্দ ছিল। গলায় ধুতরার মালা। রুদ্রাক্ষের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাল-গাথা হার। হাতে বদরিকা-কঙ্কণ। আর প্রবালের মালা দিয়ে জড়ানো জটা। আগুনের মত তার গায়ের রঙ ভস্ম মাখা। বুকে, গলায় আর কপালে রক্তচন্দন। যেন সাক্ষাত শিব-স্বরূপ। মহাজ্ঞানী রঘুনন্দন। তার ঢিলেঢালা হাসি-খুশি চরিত্রের জন্য সে মোহান্ত হতে পারেনি। সন্ন্যাসীর আখড়া আছে। আবার মঠও আছে। সেখানে মোহান্ত কেউ কাউকে করে দিয়ে যায় না। সন্ন্যাসীরা সবাই মিলে যাকে মোহান্ত করে, সে ই হতে পারে। কিন্তু মোহান্তর নিজের খুশিতে কাজ চলে না। সন্ন্যাসীদের সকলের মত নিয়ে তাকে কাজ চালাতে হয়। রঘুনন্দনের পক্ষে এসব সম্ভব ছিল না। কিন্তু ধর্মের ইতিহাস ও জ্ঞান পেয়েছিলাম আমরা তার কাছ থেকে। সে জানত আর বুঝত সকলের চেয়ে বেশী। তার মুখে ওই কথা শুনে আমি ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। শুধু বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'আমি কোন উৎসাহ পাচ্ছি না!'

আমি বললাম, 'চক্রে বসলে উৎসাহ পাবে।'

সে বলল, 'তা হয় না কোতোয়ালজী। হৃদয়ের আগল বন্ধ। ভগবান আমার সেবায় খুশি হবেন না। এমন সময়ে রুক্মিণী এসে দাঁড়াল সামনে। আমাকে নয়, রঘুনন্দনকে নমস্কার করল। রঘুনন্দন বলল, 'নারায়ণো, বেঁচে থাকো।' বলেছিলাম বাবুজী, রুক্মিণী এলে যেন আশ্রমে ফুল ফুটে উঠত।

তার রূপ, তার কথা ও নির্মল হাসি, সকলেরই বড় চোখে লেগেছিল। সে একটু চঞ্চল। ঝরণার মত ছলছল তালে চলে। অল্পসময়ের মধ্যেই সকলের স্নেহ পেয়েছিল সে। রঘুনন্দনকে দেখে রুক্মিণী নির্বাক নিথর। চোখে তার আলোর শিখা। তার লজ্জা হল না, জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইল সে। শুধু বাতাসে উড়ছে তার খোলা চুল। বাবুজী, রঘুনন্দনের চোখেও দেখলাম তেমনি আলো। সন্ন্যাসীর মুগ্ধতা! সে তো ভাল কথা নয়, কিন্তু দুজনেই কী সুন্দর! আমি জ্ঞানী নই, সাধনা নেই আমার। তবু আমার মনে হল, আমার সামনে স্বয়ং হরগৌরী রয়েছে দাঁড়িয়ে। আমার সময় চলে যায়। যেতে হবে অনেক দূরের আশ্রমে। আমি চলে গেলাম। আজ নবরাত্রের শেষ রাত্রি। জ্যোত মার্গে যান যেসব সন্নাসীরা, তাঁদের অনেককেই সংবাদ দিতে হবে।

ফিরে যখন এলাম তখন সাঁঝ উতরে গেছে। আশ্রম নিঝুম। কিন্তু কাজকর্ম চলছে ঠিক। তখনো সন্ধ্যাপূজা শেষ হয় নি। মন্দিরে ছিল পাথরের শিবমূর্তি। কিন্তু আখড়া চলে বড় নিয়মে। এ সময়ে সন্ন্যাসীর কর্তব্য হল মানসী পূজা। চোখ বুজে ভাবতে হয় গুরুর মূর্তি। কল্পনায় বসাতে হয় মন্দিরের বেদীতে। নিত্য গুরুদর্শনের ওই পন্থা। গুরুর পা ধোয়াবে. আস্নান করাবে, ধ্যানকল্পে লেপে দেবে তার সর্বাঙ্গে বিভূতি। পুজো করবে ফুল-চন্দন দিয়ে। কী বললে বাবুজী? সন্ন্যাসীর গুরু থাকবে না? সন্ন্যাসীর কি একজন গুরু? তার যে গুরু অগণন। মূল গুরু, শিক্ষা গুরু, বিভূতি গুরু। সন্ন্যাসীর সাত গুরু। কেউ তাকে দেয় ডোরকৌপীন, কেউ দেয় বিভূতি। কেউ তার শিখা-মুক্তিদাতা গুরু। ষট্‌কর্মের দীক্ষাগুরু হল আচার্য।

এসে দেখলাম, মোহান্ত স্বয়ং মানসীধ্যানে লিপ্ত। আমাকে বসতে হবে। দেরী হয়ে গেছে। এদিকে হাত-পা-মুখ ভরে গেছে ধুলোয়। আখড়ার কিছু সন্ন্যাসীর চোখে-মুখে একটি চাপা আনন্দ ও ব্যস্ততা। নবরাত্রে অংশগ্রহণে খুব উৎসুক তারা। কলিকাল কি-না! সন্ন্যাসী হয়েও সুখের মুখ দেখতে চায় সবাই। আসল সাধক আছে ক-জনা?

ভাবলাম, একবার রঘুনন্দনকে দেখে আসি। মন্দিরের পেছনে গিয়ে দেখলাম মহা-আয়োজন। জনা-পাঁচেক আওরতকে দেখলাম, তারা সকলেই গেরুয়া ধারণ করেছে। জনা-বারো গৃহী সাধক এসেছে। তারাও পরেছে গেরুয়া কাপড়। সন্ন্যাসীর বেশে সেজেছে সবাই। সকলেই আমাকে নমস্কার করল। আমি জবাব দিতে পারলাম না। এদের এসব আসর-অনুষ্ঠান আমার

কোনদিনই ভাল লাগে নি। আমাদের গুহ্য ষট্‌কর্মে কোন দিনও কোন বাইরের লোক ঢুকতে পায় না। কিন্তু জ্যোত্‌মার্গে বাইরের লোককে ঢোকাবার অধিকার দিয়ে গেছে আগের সিদ্ধপুরুষেরা। কবে থেকে জানি নে কিন্তু আমার জীবনে চিরকালই এই নিয়ম চলতে দেখেছি।

যে পাথরের নীচের গুহাঘরে ছিল রঘুনন্দন সেখানটি একেবারে জনহীন। দূর থেকে দেখলাম, অন্ধকার। কাছে এসে ঘরে ঢোকবার মুখে থমকে দাঁড়ালাম। দুটি মূর্তি কালো পাথরের গায়ে রয়েছে লেপ্‌টে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, রুক্‌মিণীর গায়ে গেরুয়া বসন। বাবুজী, রুক্‌মিণী যে এত সুন্দরী, আঁধার যে জ্যোতিতে ভরে ওঠে রূপে, সন্ন্যাসিনী বেশে তাকে দেখে তা বুঝলাম। আমার চোখের পলক পড়ল না কয়েক মুহূর্ত। রুক্‌মিণীর হাসিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কী চাও ?'

রুক্‌মিণী জবাব দিল, 'আমরা পূজা করব।' আর বলবার দরকার ছিল না। বুঝে নিলাম. রুক্‌মিণীর সঙ্গে মুখে হোক, মনে মনে হোক, কোন বোঝা-পড়া হয়েছে রঘুনন্দনের।

রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা করবার অবসর মিলল না। দেখলাম, দীপ জ্বলে উঠেছে ঘরের দুধারে দুটি। একটি মহাদেবের। অপরটি মহাদেবী কালীর। অন্যান্য সন্ন্যাসী-সাধকেরা এসে পড়ল। সেই সঙ্গে ভৈরবীরূপী আওরতেরা। আরম্ভ হল শিবশক্তি ভৈরবের উপাসনা, তারপরে প্রসাদ খাওয়া। সে-প্রসাদ শুধু জ্যোত্‌মার্গের কুলাচারীরাই সন্ন্যাসী হয়েও গ্রহণ করতে পারে।

রুক্‌মিণী গিয়ে দাঁড়াল রঘুনন্দনের কাছে। রঘুনন্দন তাকে প্রসাদ দিল। তারপর চক্রমধ্যে যা থাকে তন্ত্রমতে সে সবই আরম্ভ হল।

পরে দুদিন আর আমার সঙ্গে রঘুনন্দনের দেখা হয় নি। এমন কি রুক্‌মিণীকেও দেখতে পাই নি। রুক্‌মিণীর স্বামীকেও নয়। বাইরে থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু এ ব্যাপারের পর আশ্রমে কিছু কিছু অনিয়ম দেখা দেয়। ক্রিয়াকাণ্ডে গণ্ডগোল হয়।

তৃতীয় দিনে দেখলাম, রঘুনন্দন গঙ্গা থেকে চান করে আসছে। কিন্তু এ সেই আগের রঘুনন্দন নয়। সেই মহাজ্ঞানী হাসিমুখ সন্ন্যাসী নয়। তার সারা মুখে এক অদ্ভুত পাগলামি। চোখ আধবোজা, সামনাসামনি হলে বললাম, 'ওঁ নমো নারায়ণ!' সন্ন্যাসীর মত জবাব না দিয়ে রঘুনন্দন আমার হাত ধরে বলল, 'মহাবীর ভাই'। কথাটা বড় কানে ঠেকল। সাধারণ মানুষের মত এমন গদগদভাবে কথা বলছে কেন রঘুনন্দন। বললাম, 'কী বলছ ?'

সে বলল, 'ভাই, নতুন জ্ঞান লাভ করেছি।' অমনি আমারও বুকের মধ্যে আনন্দে ভরে উঠল। জ্যোত্‌মার্গচক্রে নিশ্চয়ই কিছু দর্শন ঘটেছে রঘুর। তাকে হাত ধরে আড়ালে নিয়ে গেলাম। যেমন করে ছোট ছেলে খাবার লুকিয়ে নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী জ্ঞান লাভ করলে?'

রঘুনন্দন বলল, 'তা তো জানি নে।' বলতে বলতে বাবুজী, দেখলাম, তার চোখভরা জল। আর জলভরা মুখে হাসি। চোখের নজর সামনে নেই, পেছনে নেই। উদাসীন স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'শুনেছ?'

বললাম, 'কী?'

বলল, 'শুনতে পাচ্ছ না?'

কান পাতলাম। কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না।

রঘুনন্দন বলল, 'শুনতা নহি চিড়িয়া পুকারতি মিঠে বুলি?'

'হ্যাঁ, চারিদিকে গাছে গাছে অনেক পাখি ডাকছে। সে তো সব সময় শুনি।'

সে বলল, 'ওই তো সেই আনন্দ, মহানন্দ। তুমি শোন সব সময়? কই, আমি তো এতদিন শুনতে পাই নি? দেখতে পাই নি ওই আসমান। এমনি পাগল বাতাস তো লাগেনি আমার গায়ে। সহজ করে দেখিনি কোনদিন কিছু। যা সহজ তাই তো সুন্দর। কিছু দেখলাম না, কিছু শুনলাম না, শুধু ছাই মেখে আখড়া নিয়ে পড়ে আছি। জ্ঞান নিয়ে বড়াই করেছি। জ্ঞান কাকে বলে? বুদ্ধিকে? না, ভুল মহাবীর ভাই। বুকের রস না হলে মাথার ফুল ফোটে না। মাথার সেই ফুলের নাম হল জ্ঞান। শিকড় তার হৃদয়ে। সে হৃদয় আমার অন্ধ ছিল। সে অন্ধ চোখ মেলেছে। যখন প্রাণ মানে না, তখন পূজা আপনি করতে হয়। কিন্তু নিয়মের দাস হয়েছি আমরা। এ আর চলে না। মন্ত্র কি? মন্ত্র কি কেউ শেখায়। সে তো প্রাণ থেকে আপনি উঠে আসে। যে সুরদাস পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায়, ওই গানই তো তার মন্ত্র। অমনি সেবা না হলে সব মিথ্যে। আর অমনি সেবা কেমন করে হয়? যখন সহজ চোখে পড়ে বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপ তুমি, ভাই মহাবীর।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'এসব কী বলছ রঘুনন্দন?'

সে বলল, 'মিথ্যে বলি নি তো। তুমি, এই মাটি, এই বাতাস, জল, ওই গান-পাগল পাখি, ওই আকাশ। এর মধ্যেই সেই রূপ ফুটে রয়েছে, দেখতে পাইনি এতদিন।'

বললাম, 'শিখাসূত্রত্যাগী সন্ন্যাসী তুমি, ষট্কর্ম শেষ করে পূর্ণ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত, সগুরুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কলিকালের আখড়াশ্রয়ী অবধূত, এসব কী বলছ ?'

রঘুনন্দন বলল, 'ঠিকই বলেছি ভাই। সগুরু কেন ? গুরু আমার তুমি, এই প্রকৃতি, গুরু আমার রুক্মিণী, এই সংসার, সংসারের সব আদিম আর আওরত যা অপরূপ, তাই গুরুর রূপ। এর শুরু কোথায় জানি নে। জানি নে বন্ধু, এর শেষ কোথায়।' বলে, সে নিজে নিজে গান গেয়ে উঠল। গানে গানে সে বলল, 'ওই যে গঙ্গা বয়ে চলেছে, কত রূপরাশি তার চোখে, সেই রূপ দেখে তুই নাচতে নাচতে চললি গঙ্গা। কিন্তু যেখানে তোর শেষ, সেখানে তোর শুরু। যার বুকে ঝাঁপ দিলি তুই সে যে অসীম কূলকিনারাহীন। আমিও তেমনি ঘাটে ঘাটে ভেসে যাব, মন ভরাব রূপের হাটে হাটে।' বাবুজী, রঘুনন্দনের এই রূপ যেন বাওরা সন্তের হাসি-কান্নাভরা বিচিত্র ও অপরূপ। ওই গান সে নিজের মন থেকে বানিয়ে গাইলে। আমার মনে হল, যেন ঠিকই বলছে রঘুনন্দন। মনে হল, ঝুটা আমার এই বিভূতি মাখা, জটা রাখা আর আখড়ায় থাকা। মনে হল, এসব আমার চারপাশের নিগড়। ছুটে ভেঙে বেরিয়ে পড়ি। জানতাম, নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী বলতে যা বোঝায়, রঘুনন্দন ঠিক তা ছিল না কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে তার এই বিচিত্র পরিবর্তন কী করে হল।

সে আবার বলল, 'সব দেখবে তার আগে নিজেকে দেখতে হবে না ? মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। এ কথা তোমাদের বলেছি মহাবীর ভাই, তাকিয়ে দেখি মনের আঁধার যে বড় ভারী। সে তিমিরে কিছুই চোখে পড়ে না। নমোমাহত্যং। কিন্তু কোন্ সাহসে নমস্কার করব নিজেকে। খুঁজি, দেখি। এতদিন হরিদ্বারে আছি, তার গাছপাথরটুকুও দেখি নি কোনদিন নিরালায় বসে। মানুষকে মনে করেছি সব ব্যাটা টাকাখোর আর কামুক। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। যে নিজেকে চেনে না, সে পরকে দেখবে কেমন করে।'

সন্ন্যাসীর কথা,' অর্থাৎ মহাবীরের কথা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক সে কি! সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কথা তো দেখেছি বাউলের গান হয়ে উঠেছে। এ যে সহজিয়া বাউলের কথা। যেন উঁকি দিচ্ছে বলরাম। রঘুনন্দনের এ সহজ কথা, সহজ ভাব আমার মনকেও নাড়া দিয়ে দিল। হৃদয়ের রস দিয়ে সে জ্ঞানের ফুল ফোটাতে চায় মস্তিষ্কে, রূপে পাগল হওয়া ছাড়া তার গতি কি ?

চাঁদ উঠে এসেছে আরো খানিকটা। মাঝে মাঝে মেঘ উড়ে চলেছে চাঁদের

মুখ চাপা দিয়ে। হিমালয় থেকে সমুদ্রে, উত্তর থেকে দক্ষিণে তার গতি। মেঘের ছায়া পড়েছে বালুচরে। আলো-ঝিকিমিকি বালু-হাসি চাপা পাড়ে যাচ্ছে, যেন আচমকা কপট অভিমানে। কিন্তু কী শীত! আর এখনো কত ভীড়। কত কোলাহল।

মহাবীর আবার বলল, 'বাবুজী, রঘুনন্দন চোখের আড়াল হল। মনে এল আমার কুসন্দেহ। ভুলে গেলাম তার প্রাণ ভোলানো কথা। মনে করলাম, রঘুচরিত্রে দুর্বলতা ঢুকেছে। কেন? না, তার কথাগুলি যত মনে আসতে লাগল, সবই যেন ওই রূপবতী রুক্মিণীর কথা মনে করিয়ে দিল। ও তো কথা নয়, বুঝি কথা দিয়ে রুক্মিণীর রূপের আরতি। কপনি-আঁটা সন্ন্যাসী আওরতের সর্বনাশী মায়াজালে ধরা পড়ে মাথার ঠিক রাখতে পারছে না।

আশ্রমে এসে দেখি, রুক্মিণী। গায়ে তার গেরুয়া নেই। পরেছে নিজের শাড়ী। তার রূপের ছটা আখড়ার ঘরে-মন্দিরে। শুধু দেখতে পেলাম না তার স্বামীকে।

মোহান্ত ডেকে বলল, 'বদরিনাথ দর্শনে যাবে না তুমি?'

রুক্মিণী হাসল। সে কী হাসি! সারা দেহ ভরে তার এক বিচিত্র আনন্দ যেন ঝরে পড়ছে। রূপ তার দ্বিগুণ আলোয় উঠেছে ভরে। বলল, 'না বাবা! এখানে থেকেই তাকে সেবা করে যাব। তোমরা আমাকে আশ্রমে থাকতে দাও। আমি ভগবানের সেবা করব।'

এরকম অনেক ছিল বাবুজী। ঘর ছেড়ে আসা অভাগিনী চিরজীবন আশ্রমের সেবা করে কাটিয়ে দিয়েছে। আশপাশের গাঁয়ের অনেক বউ ঝি সারাদিন কাজ করে আশ্রমে। সন্ধ্যা হলে ফিরে যায় ঘরে। কিন্তু এই আগুন কোথায় রাখা হবে, সন্ন্যাসীর আখড়ায়? মোহান্ত জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

বলল, 'তাকে দেখতে পাচ্ছি নে বাবা।'

সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ বললে, 'থাকুক।' আপত্তি ছিল কারুরও কারুর। কিন্তু ব্যাপারটার কোন ফয়সালাই হল না। সে থেকে গেল আশ্রমে।

মুখে কেউ কিছু বলল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সকলেই কৌতূহলিত। সন্দেহে ঘনীভূত হল। সকলেই চোখে চোখে রাখে রঘুনন্দনকে। আমিও। সবাই ওত পেতে আছি। কবে একদিন ধরে ফেলব রঘুনন্দনের অপকীর্তি।

কিন্তু বাবুজী, রঘুনন্দন সে ধার দিয়েও গেল না। না, সে জটা মুড়োয়নি,

ছাড়ে নি বিভূতি-লেপন। কিন্তু সে মানুষটি আর নেই। সকাল-সন্ধ্যায় পূজা-অর্চনায় মন নেই। তার পদে পদে গাফিলতি। সেজন্য কোন অনুশোচনা নেই। বাওরা সন্তের মত দিবানিশি শুধু গান, আত্মভোলা হাসি। ঘোরে এখানে সেখানে। সে ঘোরে বাইরে বাইরে। রুক্‌মিণী ঝাঁট দেয় আখড়ার উঠোন, লেপা-পোঁছা করে, জল তোলে, প্রসাদ পায়। কতদিন গেছি রঘুর পেছনে পেছনে। সে যেত নিরালায়। গান গাইত আপন মনে: 'আমার পাখায় যেদিন হাওয়া লাগবে, সেদিন ছুটে যাব তোমার খোঁজে। কখনো বসব তোমার গিরিশৃঙ্গে, ভাসা মেঘে ঠোঁট ঢুকিয়ে মেটাব আমার পিয়াস। তোমার এই ভুবনে কানে কানে শোনাব তোমারই রূপগাথা।' গান শোনার জন্য ভিড় করত লোক তার পিছে। তার মত জ্ঞানী পুরুষের এই রূপ দেখে অবাক হল অনেকে!

আমি খালি ভাবতাম, ওই গানের মালা কে পরিয়ে দিল তার গলায়। কে খুলে দিল এই গীত-নির্ঝরের উৎস-মুখ। সন্ধ্যাবেলা মানসীপূজায় বসে, গুরুমূর্তি কল্পনা করতে গিয়ে, বার বার দেখি রঘুনন্দনকে। কানে শুধু তারই কথা,—

ব্রহ্ম নামে একটি ফুল ফুটেছে।
তার গন্ধ পাগল করেছে আমাকে।
সে ফুলের রূপে আগুন আছে।
তবু আমার চোখে জ্বলে নি!
শুধু আমার অন্ধ হৃদয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে বাতি ॥

বাবুজী রুক্‌মিণীর সঙ্গে যখন দেখা হত রঘুনন্দনের, তখন তারা নমস্কার করত পরস্পরকে। কিন্তু রুক্‌মিণী চঞ্চল হয়ে উঠত। বুঝতে পারতাম, রঘুনন্দনের সঙ্গ-কামনায় পাগলিনী হয়েছে সে। লোক-লজ্জার ভয় ভুলে কোন কোন সময় ছুটে যেত রঘুর পেছনে। রঘু হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরে আসতে বললেই ফিরে আসত সে।

বাবুজী, রঘুর প্রতি বিদ্বেষ আসত না কারুর। লজ্জার কথা, যাদের আসত, তারা সকলেই রুক্‌মিণীর প্রতি আসক্ত ছিল। গৃহী শিষ্যকুল আসত ঘন ঘন। নজর শুধু ওইদিকে। আখড়ারও অস্বাভাবিক অবস্থা।

হঠাৎ একদিন আখড়ার সকলেই শুনল, রঘু গাইছে, 'হে ব্রহ্ম ও জ্ঞান, তোমার নাম রুক্‌মিণী। হে পৃথিবী, তোমার নাম রুক্‌মিণী। এই হিমাচল ও গঙ্গা, এই বিহঙ্গ ও গাছ, এই আকাশ ও মাঠ সকলেই রুক্‌মিণী নামে ও

রূপে সুন্দরী। হে অবধূত-হংস, তুমি আসলে দেহস্থিত একটি নারী। তোমারও নাম রুক্মিণী। এবার আমি যাব তোমার সন্ধানে। সময় হয়ে গেছে আমার। ডাক পড়েছে।'

বাবুজী, আরও তাজ্জব. নির্ভয়ে রুক্মিণী এসে ফুল, জল, চন্দন দিল রঘুর পায়ে। সকলে স্তম্ভিত। অনেকে রেগে উঠল। মোহান্ত বলল, অন্যান্য আখড়ায় খবর দিতে হয়। আমাদের আছে অনেক আশ্রম, নির্বাণী, নিরঞ্জনী, অটল, জুনা, আনন্দ। সকলের মতামত প্রয়োজন।

কিন্তু দরকার হল না। সেই রাত্রি থেকে রঘু নিরুদ্দেশ। রুক্মিণী রয়েছে। চকিতা হরিণীর মত কেবলি খুঁজছে। সে যাকে খুঁজছে, আমরা, বিশেষ আমি, খুঁজছি তন্ন তন্ন করে। সারা হরিদ্বারে পাত্তা মেলে নি তার। তাকে কে পাগল করল বুঝলাম না, কিন্তু সে আমাকে পাগল করে কাঁদিয়ে চলে গেল।

দুমাস ধরে এই ব্যাপার চলছিল। সকলের মনে যে অস্বস্তিটুকু ছিল রুক্মিণীর জন্য, দুমাস পরে তার স্বামী এসে সেটুকু দূর করল। তার স্বামী এল। একলা নয়। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক। ছি ছি ছি, আখড়ার বদনাম। সন্ন্যাসীরা জোর করে রেখে দিয়েছে নাকি তার বউকে। তাই সে কেড়ে নিতে এসেছে। যাদের নিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে দুজন তলোয়ারধারী শিখও ছিল। লোকগুলি যে নিষ্ঠুর প্রকৃতির, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

কে রেখেছে? নিয়ে যাক্‌ রুক্মিণীকে। আমরাও তাই চাই। কিন্তু বেঁকে বসল রুক্মিণী। সে যাবে না। তা বললে তো হয় না। এ ব্যাপারের পর আখড়া তাকে এমনিতেই সরিয়ে দেবে। বদনাম যা হওয়ার, তা তো হয়েছেই।

শেষে ওরা জোর করে নিয়ে গেল রুক্মিণীকে। বাবুজী, মিথ্যে বলব না, আমার বুকে বেজেছিল। কেন বেজেছিল? তাহলে বলি, কে অস্বীকার করবে, সে ছিল আমাদের প্রিয়তম রঘুনন্দনের সাধন-প্রেয়সী? রঘু-রুক্মিণী যে একাকার হয়েছিল। বাবুজী, কুলাচারে নারীর সঙ্গ-মধ্যে হৃদয় ও প্রেমের মধ্যে কিছু আছে কি না জানি নে। থাকলেও বিশ্বাস করতে মন চায় না। ও শুধু সাধনমার্গের যান্ত্রিক ক্রিয়া।

কিন্তু রঘু আর রুক্মিণী। কুলাচারের চেয়েও প্রেম বড় হয়ে উঠেছে সেখানে। বাবুজী, হৃদয়ের রসহীন যে চারাগাছ উঠেছিল রঘুর মাথায়, রুক্মিণী তাতে ফুল ফুটিয়েছিল। রঘুর জ্ঞান ও হৃদয়ের মাঝামাঝি বন্ধ দরজার চাবি

হয়ে এসেছিল রুক্‌মিণী। এর পরে রঘুকে কে কী দিয়ে রাখবে বেঁধে।'

বলে মহাবীর উঠে দাঁড়াল। কথা যে এইখানেই শেষ করবে, একেবারে বুঝতে পারি নি। বললাম, 'তারপর?'

'তারপর কী বাবুজী?'

'রুক্‌মিণীর কী হল?'

মহাবীর জবাব দিল, 'কী হল, তা ঠিক বলতে পারি নে বাবুজী। তবে বছর না ঘুরতে দেখলাম, রুক্‌মিণী মনিয়াবাঈ হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে?'

সে বলল, 'তাও ঠিক জানিনে। যতদূর শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে, রুক্‌মিণীর স্বামীর সঙ্গে যে লোকগুলো এসেছিল তাকে উদ্ধার করতে, তাদেরই কীর্তি এটি। রুক্‌মিণীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি তার স্বামী। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নিয়ে তুলেছিল একটা ডেরায়। শুনেছি, সেখানে ছিঁড়ে খাওয়া হয়েছিল তাকে। আর তার কাপুরুষ স্বামী পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে।

'বাবুজী, রুক্‌মিণীকে উদ্ধার করার কিছুই ছিল না। রঘুনন্দন তো আগেই চলে গিয়েছিল। তবু, বদনাম রটে গিয়েছিল আমাদের আশ্রমের নামেই। এমন কি, আমাদের বিভিন্ন আখড়ার দু-একজন রঘুকে খুঁজে ধরে নিকেশ করে দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। সেটা যত না আখড়ার দুর্নামের জন্য তার চেয়েও বেশী বিরুদ্ধ ধর্মাচরণের জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তা হলে ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে পড়ত। আর রুক্‌মিণী! তার তো অপরাধের সীমা ছিল না! আখড়া থেকে তবু-বা তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে-ছিল। কিন্তু অতগুলো লোকের দ্বারা যে দিনের পর দিন ধর্ষিতা হয়েছে, তাকে কি কখনো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়! সে পালিয়ে বেঁচেছিল। তবে, এর জন্য সে আর ডাকে নি লোক-লস্কর, যায় নি পুলিসের কাছে। জানি নে, কে তাকে প্রতিষ্ঠা করে দিল লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজী মহলে। কিন্তু নামে তার সারা শহর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।'

একটু থামল মহাবীর। দাঁড়িয়ে ছিলাম দুজনেই। সে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখেছিলাম একদিন। খুবই কৌতূহল ছিল। সেবার লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। তখন দুনিয়াজোড়া যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। শহরের বাতিগুলো সব বোরখা পরেছিল। অন্ধকার। কানের পাশ দিয়ে একটা কথা শুনলাম, 'মনিয়াবাঈ দাঁড়িয়ে আছে।' চমকে উঠল বুকের মধ্যে। কোথায়? ফিরে

দেখলাম, সামনে রাজ-ইমারত। দোতলা কুঠি। উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রুক্মিণী। রুক্মিণী নয়, মনিয়াবাঈ। একটু আলো এসে পড়েছে ঘরের থেকে। দেখলাম, আঁধারে বিদ্যুৎশিখা, স্থির। বাড়ির সামনে কয়েকটি মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দোতলার বারান্দায় ছায়ার মত ঘুরছে কয়েকজন লোক। ব্যাপারটা কী হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, ছায়াজগতে এক মূর্তিমতী রূপসী উর্বশী। সেখানে বা অন্য কোথাও বাজছিল সরোদের চাপা বাজনা। পুরুষ গলায় চাপা হাসি। কিন্তু মনে হল, বাঈজী যেন অন্য জগতে রয়েছে। কিসের ঘোরে সে আচ্ছন্ন, কিন্তু সে শুধু তার বাঈজীসুলভ অভিনয়। তার রূপ-পাগলদের একটু নাচানো। সরে এলাম তাড়াতাড়ি। রঘুনন্দনের কথা মনে পড়ছিল। আমার রঘুনন্দন।'

থেমে আবার বলল, 'তারপর রামজীদাসীকে দেখছি আজ কয়েক বছর। জানিনে, এর কী দরকার ছিল। এতে করে ধর্ম কতখানি এগুল, জানি নে। কেন সে ওই জীবন ছেড়ে এল চলে। বাবুজী, মানুষের মন। রামজীদাসী আজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক রহস্যময়ী নারী। তার ধর্মপ্রচারে কতখানি কাজ হবে, আমি বুঝিনে। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, সাধু-সন্ন্যাসী মহলে তাকে নিয়ে রীতিমত আলোচনা হয়। নিজের চোখে দেখে এলাম। সে যে আগুন। আগুনের শিখা। কোন্‌দিন আবার কি প্রলয় উপস্থিত হবে, কে জানে! আমার সেই ভয়।

'তবে যতদুর শুনি, সে এখন নাকি সব সময়েই নামের ঘোরে থাকে। অষ্ট-প্রহর নামকীর্তনই তার কাজ। লোকে বলে, রঘুনন্দনের সঙ্গে নাকি তার দেখা হয়েছিল। সেই থেকে সে এ পথে এসেছে। আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। এখনো করি না। রঘুনন্দন আর রামজীদাসী আকাশ-পাতাল তফাত। তাছাড়া আর-একটি কথা শুনেছি…'

মহাবীর থামল। বললাম, 'কী?' মহাবীর বলল, 'গুজব বলেই মনে হয়। ওই যে দেখলেন সরোদ বাজাচ্ছেন একটি লোক। ছিল লোকটি একজন সরকারী কেরানী। ভালো সরোদের হাত। ওটি ওর সাধনার জিনিস। ভারী ওস্তাদ বাজিয়ে। কোন বাঈজী ওকে পেলে বর্তে যেত। লোকটি নাকি নিজের ইচ্ছেয় মনিয়াবাঈয়ের ওখানে যন্ত্র বাজাতে যেত। সে-ই নাকি মনিয়াকে এ পথে নিয়ে এসেছে। সকলেই তো কেটে পড়েছে আজ। শুধু ওই লোকটি ছায়ার মত, ওই মিঠে যন্ত্রটি কাঁধে নিয়ে ছায়ার মত ফিরছে রামজীদাসীর সঙ্গে সঙ্গে। শুনতে পাই, লোকটি নাকি খুব ভাল। একরকম

মৌনব্রত বলা যায়। কথা বলে না কারুর সঙ্গে। এমন কি, রামজীদাসীর সঙ্গেও নাকি তাকে কেউ বড় একটা কথা বলতে দেখে না। এই সরোদের সুরই তার কথা। ওটি না বাজলে, রামজীদাসীর রাম-ভজনের নাচ আসে না, পা ওঠে না।'

বলে, মহাবীর একটু হাসল। বলল, 'বাবুজী, অনেকেই জানে ওসব কথা তাই বললাম। এবার আমি চলি।'

বললাম, 'আপনার রঘুনন্দনের…'

আবার হাসল সে। সে হাসির অনেক অর্থ। বলল, 'আমার রঘুনন্দন। ঝুটা বলেন নি। তবে আমার একলার নয়। আমাদের আখড়ার সুখের সংসারে সে ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বদনামের নয়, একটা নতুন ভাবের ঘোর এনে দিয়েছিল সে।' বলতে বলতে দেখলাম, মহাবীরের মুখে একটি চাপা বেদনার হালকা অন্ধকার চেপে বসল। চাপা গলায় বলল, 'সে যে আমাকে পাখির গান শুনিয়ে গেল, সে যে আমাকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে গেল, সে যে আমাকে এক পাগল প্রেমের পথ দেখিয়ে গেল, সেই হল আমার কাল। বাবুজী, আমি আর সন্ন্যাসী নই। ঘরে ফিরে যাওয়া মনস্থ করেছিলাম, পারি নি। সেই সহজ আর অসীমকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভাবি, সহজ আর অসীম, সে যে বুকের রসে মাথার ফুল ফোটানোর সাধনা। সে যে বড় যন্ত্রণার, বড় ব্যথার, মহা সুখের, মহা আনন্দের-কোনটাই যে খুঁজে পাই নে।

'বাবুজী, কুলাচারীর চক্রসাধনে হৃদয়ের স্থান কতটুকু আছে, জানি নে। কিন্তু এ জৈব-সাধনাই ধর্মান্তরিত করে গেল সন্ন্যাসীকে। ভেঙ্গে দিয়ে গেল তার আচার-বিচার। তন্ত্রসাধনায় অভ্যস্ত হয় নি সে। তার জ্ঞানের সুধা হৃদয়ের রসে মিশে ভেসে গেল। যেমন হিমালয় থেকে নেমে ওই গঙ্গা চলেছে দুকূল ভাসিয়ে। প্রেম ও সহজের ওই তো পথ। রুক্মিণীর সঙ্গে রঘুনন্দনের প্রেম ছাড়া আর কি ছিল? কিছু না। নইলে আচারের নিগড় ভাঙত কী করে? তবু ভাবি, একদিনের তো দেখা রুক্মিণীর সঙ্গে। এত আলোড়ন আনল কী করে?

'কী জানি। প্রেমের কাজই নাকি অমনি। কখন কোন্‌দিকে চলে, কে জানে! গতি তার নিমেষে সব ওলট-পালট করে দিয়ে যায়।'

বলে হেসে উঠল আবার। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্তে বাবুজী।'

বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে পুবদিকে চলে গেল। অদূরেই নয়নজুলির মত একটি অল্পগভীর খাদ গিয়েছে উত্তর দক্ষিণে। আশেপাশে

তখনো চলাচল করছে অনেক লোক। সেই বালি-খাদের আড়ালে, লোকারণ্যে হারিয়ে গেল মহাবীর।

সুদীর্ঘ কাহিনী। যেন কোন অতীত যুগের কাহিনী শুনলাম। সব কথার সঠিক অর্থ অনুমান করতে পারি নি। কী করে পারব। আমার নেই কোন আধ্যাত্মবাদের অনুভূতি। নিতান্ত বিজ্ঞানাশ্রিত মানুষ। জীবনে আছে অনেক বিড়ম্বনা। তার মাঝে ফাঁকতাঁলে এসেছি ছুটে জনসমুদ্রের মহাসঙ্গমে।

তার মাঝে এই কাহিনী, যেন কোন অতীত অধ্যায়ের পাতা মেলে দিল আমার সামনে। যে রক্তমাংসের উচ্চ-নীচ মানুষ দিয়ে আমাদের কারবার, এ কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা সে আওতার বাইরে। বেদাশ্রিত সন্ন্যাসীর প্রেম—সে-ই তো বিচিত্র। অথচ চোখে দেখে এসেছি রামজীদাসীকে। আধ্যাত্মবাদ না বুঝি, রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্মিণীর প্রেম অনুমান করতে পারি। যে প্রেম তাকে ঘর ছাড়া করেছিল। ঘর-ই তো। আখড়া, আচার, নিয়ম, পূজা আর খাওয়া, এই মিলে যে অভ্যাসের ঘর তৈরী হয়েছিল, সেই ঘর ভেঙে গিয়েছিল তার।

রঘু-রুক্মিণীর প্রেম আমাদের প্রেম নয়। তবু পুলক-শিহরণে কত বিচিত্র দর্শন তো আমাদেরও ঘটে থাকে। প্রেমে কত নতুন অনুভূতির বীজ অঙ্কুরিত হয় মনে। কত সময়, বেলাশেষের রক্তিম আকাশ দেখে চোখ ভুলে যায়। হাওয়া-দোলা শস্যের হরিৎ সাগরে নিজের প্রাণে লাগে ঢেউ। দূর গ্রামের কোন্ এক অনামী স্টেশনে, ডাগর চোখো কিষাণী কলাবউটিকে দেখে মনে আমাদের ছোঁয়া লাগে অপরূপের। ষ্টিয়ারিং হুইল চেপে-ধরা যন্ত্রী, আর উদয়াস্ত কলমপেষা মানুষের দল আমরা আচমকা এক সময়ে গুনগুনিয়ে উঠি,

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না।
মন উড়েছে উড়ুক না রে,
মেলে দিয়ে গানের পাখনা॥ *

জানি, দিন যাবে না অমনি করে। জানি, মনের রঙিন পাখা মেলে থাকবে না দিবানিশি। তবু, জীবনযুদ্ধের মাঝে, অমনি করেই আমরা হৃদয়ের একটি দিক আঁকড়ে ধরে রয়েছি। হাজার দুঃখ যন্ত্রণা বেদনার মধ্যেও ওই বস্তুটি ছাড়তে রাজী নই।

রুক্মিণীর প্রতি রঘুর প্রেমে, আমাদের চোখে কিছু রহস্যময় রহস্যে ঘেরা।

মনো ব্রহ্মতি ব্যাঞ্জনাৎ। কথাটি আমাদের মনে সৃষ্টি করে রহস্যবাদের।

কিন্তু সৌন্দর্য পিপাসুর চোখে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল। যে দিক তার চোখে বুলিয়ে দিয়েছিল শিল্পীর অঞ্জন। যে চোখ গাছগাছালি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। যে প্রাণ ভুলেছিল বিহঙ্গকুলের গানে। এ তো রক্তমাংসেরই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। রঘুর সেই সহজ সুন্দরের উপাসনা, সে তো আছে সকলের মনে মনে। আছে অন্যরকমে। আছে সকলের বুকে বুকে। রঙের হেরফের করে আছে।

নইলে ভুলি কেন বাউলের গানে। বাউল তো আমাদের কাছে সাধক নয়। সে শিল্পী। মনের মানুষের খোঁজে সে ফিরছে। ফেরার আনন্দ-ই তার কাছে বড়। সেই আনন্দে গান গেয়ে উঠছে, তার মনেরই মানুষ, 'আমি কী গান গা'ব যে ভেবে না পাই।' সে কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়ে আমরাও 'ওঠি যে ফুকারি ফুকারি।'

বুঝলাম, বেদাশ্রিত সন্ন্যাসী রঘু বাউল হয়েছিল। রুক্‌মিণী, রামজীদাসীর অপূর্ব রূপের মাঝে রয়েছে কোন্ রহস্যময়ী, তা কে জানে! বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে এ যেন কোন অতীত যুগের নায়িকা এসেছে এ যুগে মানুষের সামনে। কে জানে তার হৃদয়তলে কোন্ রহস্যের আধার! তার রক্তিম ঠোঁটের কোণে বঙ্কিম রেখায় কোন্ গূঢ়তত্ত্বের উঁকিঝুঁকি!

কিন্তু সরোদ হাতে সেই মানুষটি হঠাৎ বড় হয়ে উঠল চোখের সামনে। সেই সরকারী কেরানী। যে সব ছেড়ে, সারাদের বুকে সুর সাজিয়ে ফিরছে রামজীদাসীর সঙ্গে সঙ্গে। যার সরোদের ঝঙ্কার বিনা রামজীদাসীর সুঠাম পদযুগলে আসে না নাচের জোয়ার।

বহুরূপী ভারতের এও এক রূপ। এই কাহিনী। যা শুনলাম তাতে সারা বালুচর যেন এক বিচিত্র ঝাপসা চেহারায় ভেসে উঠল চোখের সামনে।

যাই, ফিরে গিয়ে দেখি আর-একবার সেই সারোদবাদককে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে হয়তো আসর।

এখনো চারিদিকে অনেক মানুষ। প্রচণ্ড শীত। হালকা কুয়াশায় ছায়ার মত চলেছে সব আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। বোঝা যায়, তাঁবু-কোটরের দিকেই সকলের গতি। আর দেরী সইছে না কারুর। সারাদিনের পুণ্য সঞ্চয় এবার শীতের কামড়ে কাত করে দিয়েছে।

আকাশে চাঁদ এসেছে প্রায় মাঝামাঝি। মেঘ ভেসে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আকাশের কোন সীমানায় গর্জন করছে অদৃশ্য উড়োজাহাজ।

সপাং করে চাবুকের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বালুচরে ঢুকেছে টাঙ্গা, চাকা বসে যাচ্ছে। ঘোড়া দৌড়ুতে পারছে না। যাত্রী ও যাত্রীনীরা সকলেই ঘুমে ঢুলুঢুলু। তাকিয়ে দেখি, চাবুক কোমরে গুঁজে টাঙ্গাওয়ালা ঝাঁপিয়ে পড়েছে চাকার উপর। বুঝলাম, একটু বেশী বালির গভীরে ডুবে গিয়েছে চাকা। চাকাটির প্রতি কটূক্তি করে নিজে হাতে চাকা টেনে টাঙ্গা এগিয়ে নিয়ে চলল সে। শুনলাম, জড়ানো যাত্রীকণ্ঠ, 'ক্যায়া, বিমারীবালা ঘোড়া লে আয়া? ভাড়া ঠিক নহি মিলেগী।'

টাঙ্গাওয়ালা যা বলল, তার মানে, 'হ্যাঁ, কুম্ভমেলায় ভগবান খালি তোমাদেরই ঘাড়ে চেপে রয়েছে! আর আমি শালা খালি হাতে ঘরে ফিরে যাব।'

কোন জবাব শুনতে পেলাম না। টাঙ্গাওয়ালার কথা শুনে হাসতে যাচ্ছিলাম। হাসতে পারলাম না। সত্যি, পুণ্যসঞ্চয় তো নয়, যেন সওদাগর এসেছে স্বর্ণরেণুর সন্ধানে।

ফিরতে যাব। কে একজন সামনে এসে দাঁড়াল। আমার কাছেই এসেছে বুঝলাম। কেন-না লোকটি তার বড় বড় দাঁত বের করে গোল গোল চোখে তাকাল আমার দিকে। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, খানিকটা চাপা উল্লসিত গলায়, 'কিছু পাওয়া গেল?'

অবাক হলাম। লোকটির আপাদমস্তক দামী শাল দিয়ে ঢাকা। বয়স অনুমান করা মুশকিল। কুহকী চাঁদের আলোয় যেন এক ষড়যন্ত্রীর মুখ ভেসে উঠেছে সামনে! নিশ্চয়ই লোক ভুল করেছে।

বললাম, 'আমাকে বলছেন?'

লোকটি বিগলিত গলায়, ঘাড় নেড়ে বলল, 'আরে মহারাজ, তবে আর কাকে বলব?'

আরও বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী বলছেন?'

লোকটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে তেমনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মিলল?'

কি মিলবে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। বরং খানিকটা ঘাবড়েই গেলাম। বললাম, 'কিসের কি মিলবে, বুঝতে পারছি না তো।'

লোকটি এক মহা-বুদ্ধিমানের মত ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'কেন গোপন করছেন মহারাজ। আমি যে সেই অনেকক্ষণ থেকে দেখছি। হুঁ হুঁ, ফাঁকি

দেবেন কী করে ? আমাকে তো আর দেবেন না। ওকি আর কেউ কাউকে দেয় ? কিন্তু কিছু পেলেন কিনা সেইটিই জিজ্ঞেস করছি।'

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কী যা-তা বলছেন। কার কাছ থেকে কী পাব ?'

লোকটি বলল, 'কেন, এই যে দু-ঘণ্টা ধরে সাধুজীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ফিসফিস করে কী বলছিলেন সাধুজী। হুঁ হুঁ, বাবুজী, সব দেখেছি। আপনার কপাল ভাল। তাই ওরকম পেয়েছিলেন। কিন্তু, মহারাজ, একটু বলে যান, কী পেলেন। থোড়া বহুত।'

আশ্চর্য ! হাসব কি কাঁদব, বুঝতে পারলাম না। কী বিচিত্র এই লক্ষ মানুষের মেলা !

মনের মাঝে ভিন্ন তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে চলে ছিলাম ভেসে। ঠেকে গেলাম। মন পাগল হয়েছিল সরোদবাদককে দেখব বলে। যে সরোদ বাজিয়ে ফিরছে রামজীদাসীর পিছে পিছে। বাজিয়ে দেখব, তেমন দুঃসাহস ছিল না। আপনি বেজে উঠেছে আপন মনের তার। তারের টান বড় চড়া। তার মাঝে এ লোকটি যেন ভিন্ন সুরে ঘ্যাং ঘ্যাং করে উঠল। কে জানত, মহাবীরের সঙ্গে কথার ফাঁকে হয়ে পড়েছি তার নজরবন্দী।

আবার বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কী পাব বলুন তো ?'

লোকটি ঘাড় কাত করে হেসে বলল, 'আরে বাপরে, সে যদি আমিই জানব, তবে আর ভাবনা ছিল কী ?'

কিন্তু কী যে পাব, তা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। তাকে যদি বলি, কিছুই পাইনি তত সে চেপে ধরে।

সে বলল, 'ওই দেখে দেখে আমার চুল পেকে গেল ভাইয়া। আমাকে তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না।'

অতএব আমার কালোচুলের কথায় সে মানবে কেন ? মনে মনে বললাম শুধু, 'কী বিপদ !'

সে বলে চলল ঘাড় নেড়ে নেড়ে, 'মেলায় ঢোকবার মুখে, বাঁধের ওপারে দেখেছেন মস্তবড় পাথরের দোকান ?'

বললাম, 'না তো ?'

ভ্রূ নাচিয়ে দুর্বোধ্য হাসি হাসল সে। বলল, 'তবে আর কী দেখেছেন ? ওই একটি লোক মশাই। লাখপতি। কে চিনত ওকে ? ও তো লক্ষ্ণৌয়ের রাস্তায় ভিখ মেগে বেড়াত।' গলা নামিয়ে বলল, ফিসফিস করে, 'তারপরে

একদিন দেখি, ব্যাটা এক সাধুর পেছনে ঘুরছে। কী ব্যাপার? না দুদিন বাদে দেখি, শহরে এক ছোট্ট খুপরি ঘর নিয়ে দোকান করেছে। পাথরের ছোট ছোট কটা শিবলিঙ্গ, মহাদেব, বিষ্ণু, এইসব। আরে বাপরে, ক'বছরের মধ্যে দেখি, একেবারে একচেটিয়া কারবার করে ফেলেছে! বুঝেছেন? সেই সাধু-সঙ্গ। হুঁ হুঁ, আপনি ভেবেছেন, আমি ব্যাটা কিছু বুঝি নে?'

হাঁ করে রইলাম। গূঢ় বস্তু-সন্ধানীই বটে। একেবারে পরমার্থ। সিঁড়ি খুঁজছে মোক্ষলাভের। কি ভাগ্যি, রঘুনন্দনের উপাখ্যান পেড়ে বসি নি তার কাছে। সে পরমার্থ যে এখানে অনর্থ ঘটাত।

জানি নে, কী সে অলৌকিক বস্তু। মনের অগোচরে দেখি হয়তো লাখ-পতি হওয়ার স্বপ্ন! কিন্তু কুম্ভমেলায়? এই বালুচরে? সাধুর পেছনে পেছনে? কই, সেরকম কোন পন্থার কথা তো মনে আসে নি। পাথর কেন? নিজের রক্ত বিক্রি করে লাখপতি হওয়ার কল্পনা করতে পারি নে।

বললাম, 'কই, তেমন কিছু পাই নি তো?'

আকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কী পেলেন?'

মনে মনে বললাম, যা পেয়েছি তা যে বলার নয়। সে তো একটি সুর। ধরাছোঁয়ার বাইরে। ট্যাঁকে গোঁজা যায় না। পোরা যায় না পকেটে। শুধু কানে শোনা যায়। হেসে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'কিছুই পাইনি।'

বুঝলাম, বিশ্বাস করতে পারল না আমাকে। চোখে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুখের হাসিরেখা হয়েছে উধাও। ক্লান্ত জীবের মত বেরিয়ে পড়েছে জিভ। শাল ঢাকা সত্ত্বেও গায়ে তার মৃদু কাঁপুনি। এ কি রাগ, না হতাশা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এমন সময়, ঝনঝন শব্দে ফিরে তাকালাম দুজনেই। অদূরেই এক বিশাল-মূর্তি চলেছে পূর্বদিকে। একেবারেই উলঙ্গ মূর্তি। মাথার জটা ঠেলে উঠেছে আকাশে। গলায় একরাশ মালা। হাতে একটি সুদীর্ঘ ত্রিশূল। তার গলায় কিংবা ত্রিশূলেই বাঁধা আছে হয়তো কিছু। তারই চাপা ঝনঝন শব্দ বাজছে।

আশেপাশের চলমান নরনারী সকলেই একবার থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ কেউ হাত ঠেকাচ্ছে কপালে। চলে-যাওয়া পদ-চিহ্নের ভেজা বালু নিয়ে দিচ্ছে মাথায়।

আমার সামনের লোকটির গলা দিয়ে একটি বিচিত্র শব্দ উঠল। তা ভয়ের কি পুলকের, বুঝতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখি, সারা মুখে তার হাসির দীপ্তি। হতাশা উধাও। চোখে রোশনাই হাজার আলোর। চকিতে শাল

খুলে বাঁধল কোমরে। চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'পেয়েছি পেয়েছি।'

তারপর আমার দিকে তার দীপ্ত চোখের একটি খোঁচা দিয়ে সরে গেল। পা টিপে টিপে অনুসরণ করল ওই দিগম্বর মূর্তিকে। ছায়ার মত চলল তার পিছে পিছে। যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, শিকারী চলেছে শিকারের কাছে।

হাসতে গেলাম। হাসতে পারলাম না। বালুচরে তাকিয়ে দেখি লক্ষ লক্ষ পদচিহ্ন। বর্ষার ভেজা মাঠে গোরুর পালের মত লক্ষ মানুষের পায়ের ছাপ সারা চরে। লক্ষ মনে লক্ষ কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তি। সকলেই পাগলের মত ছুটে চলেছে ইপ্সিত বস্তুর পেছনে।

আর ওই লোকটি। এই সংসারের বেড়াজাল তাকে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিয়েছে। ও-ই তার সাধনা ধ্যান-ধারণা। তার ভগবান, তার পুণ্য। মিথ্যা সন্দেহে আমার কাছে হতাশ হয়েছে সে। কিন্তু আশা তার মরে নি। মুখে চোখে তার যে হাসি ও দীপ্তি দেখলাম, সে তো শয়তানের মত নয়। শয়তান তাকে পেয়েছে কি-না জানি নে। কিন্তু চোখে মুখে তার শিশুর সারল্য। লোভ? তা আছে। সংসার তাকে ওই পথ দেখিয়েছে। বয়স হয়েছে তার। এতখানি জীবন সে কাটিয়ে এসেছে ওই স্বপ্ন দেখে। হয়তো অবশিষ্ট আয়ুটুকু নিঃশেষ হবে ওই লাখ টাকার পেছনে। সংসারের এমনি নিয়ম। সারা সংসার দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে এতদিন। কেউ ফিরিয়ে আনে নি। আজ সময় হয়ে গিয়েছে। স্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন নয়, স্বপ্নসাধনা। সাধন পাগল।

জানি নে তার ঘর ও ঘরের মানুষের কথা। জীবনভোর হয়তো সে এমনি 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে উল্লাসে বুক বেঁধে ছুটে চলেছে। ছুটবেও ওই ভয়ঙ্করী সুন্দর মরিচিকার পেছনে। তারপর একদিন আসবে। হয়তো শেষ দিন। তার পলকহীন চোখে ফুটে থাকবে অভাবিত বিস্ময়, তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি। দু-ফোঁটা জল।

সেদিন সে-সময় তার চোখে ভাসবে কি এ রাতের দৃশ্য? মনে পড়বে কি আমাকে—যে তার কুম্ভমেলায় সব পেয়েও একদিন মিথ্যাচার করেছিল?

হাসতে পারলাম না। বিদ্রূপে বেঁকে উঠল না ঠোঁট। সে হলেই ভাল হত। নিষ্কৃতি পেতাম মনের কাছে। হেসে চলে যেতে পারতাম পাগল দেখে!

কিন্তু এই মানুষ! ফিরে দেখি, উধাও হয়ে গিয়েছে। মিশে গিয়েছে পায়ের দাগে দাগে। ঝাপসা জ্যোৎস্নালোকিত বালুচরে পাগলা সংসারের প্রেত হয়ে ফিরছে সে। হা হা করে ছুটছে, পেয়েছি পেয়েছি। ভাবি, কোনও এক

পাওনা কি একদিন জুটবে না তার কপালে? ঘুচবে না ফাঁকির পাওনা? যেদিন বুক ভরে উঠবে দুঃসহ আনন্দ ও বেদনায়। নিঃশব্দে তার মন গেয়ে উঠবে, পেয়েছি, পেয়েছি।

শীত লাগছে। হিম-ঝাপটা লাগছে পুরু জামা ভেদ করে। কোলাহল ঝিমিয়ে আসছে। দ্রুত পায়ে ফিরে গেলাম আশ্রমের দিকে।

ভাঙা আসর, তবু আসর আছে। রামজীদাসী নেই, সরোদবাদক চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে কীর্তন মণ্ডলেশ্বরের দল। মাইকের সামনে বসে দুটি লোক আধা সুর করে ছড়া কাটছে হিন্দীতে। আসরে কিছু নরনারী, কেউ শুনছে, কেউ ঢুলছে ঘুমঘোরে।

সে ভিড় নেই। গেটের কাছে নেই হাড্‌সন অষ্টিন। বাদককে ভাল করে দেখব বলে এসেছিলাম। দেখা হল না।

সেও ঘুরছে একজনের পেছনে। খুঁজছে কি-না কিছু কে জানে? অমনি কোন লাখ টাকার মরীচিকার মত?

ঘুম থেকে উঠে দেখি, কেউ নেই তাঁবুতে। গুলতানি শুনতে পাচ্ছি পেছনে। জামাকাপড় পরে মুখ ধুতে গেলাম। পেছনটাই দেখছি আসল স্থান। সাংসারিক ব্যস্ততা। হাঁড়ি-কুড়ি উনুন। জলের কলে লাইন। যে রকম ভিড় দেখছি কলে, মুখ ধুতে পাব কি-না কে জানে।

রোদ উঠেছে। রোদ তো নয়, যেন কাঁচা সোনা। শীতে আড়ষ্ট শরীরটি যেন কার দুই উষ্ণ বাহুতে ধরা পড়ল। সরে গিয়ে দাঁড়ালাম বেড়ার সামনে একলা একলা, খানিকটা রোদ ভোগের জন্য। সরু সরু তল্‌তা বাঁশের বেড়া। বেশ খানিকটা ফাঁক ফাঁক।

রাতে মেলা, দিনে মেলা। মেলা দেখছি অষ্টপ্রহর জেগেই আছে। এর মধ্যেই ভেসে আসতে আরম্ভ করেছে মাইক-নিনাদ। মানুষের ভিড় দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে। ভিড় যেন একটু বেশী বেশী লাগছে। এর মধ্যেই টাঙ্গা-ওয়ালার চীৎকার, গাধার ভেঁপু। লরী আর প্রাইভেট কারও দু-চারটে ছুটতে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রাস্তায়। বালুচরে রাস্তা তৈরী হয়েছে। বালুর বুকে সাজিয়ে দিয়েছে বিচুলির মত একরকম ঘাস। তার উপরে মাটি। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যায় ভাবলে, ওই রাস্তার উপরেও ঝাড়ু হাতে কেন ঝাড়ুদারনীদের উৎপাত। ধুলো ওড়া তো আছেই। মাটিটুকুও যে বালিতেই মিশে যাবে।

ঘোমটা খলা একদল মেয়ে চলেছে বেড়ার পাশ দিয়ে। কেউ কেউ গান করছে গলা ছেড়ে, কেউ হাসছে খিলখিল করে। মস্ত মস্ত গাই-গোরু নিয়ে চলেছে গোয়ালা। হাঁকছে, দোধ, দোধ চাহি। আর গরম গরম দোধ হাঁকছে, বড় বড় হাঁড়িকাঁধে দুধ-ওয়ালারা। মুখে গুঁজেছি টুথব্রাশ। এ সময়ে একটু চায়ের হাঁক শুনতে পাইনে?

'বাবু! মেরী বাবু!'

চমকে উঠলাম নারীকণ্ঠে! একেবারে কাছে। ব্যাকুল আর ব্যস্ত কণ্ঠ। চকিত, ত্রস্ত।

'বাবু, মেহেরবানি বাবু।'

বলতে না বলতেই গায়ে এসে ঠেকাল হাত। বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ময়লা হাত, কিন্তু ফরসা, কিছুটা তামাটে। নখে ময়লা। কিন্তু সরু সরু পুষ্ট আঙুল। মণিবন্ধে কয়েকটা রঙিন কাচের চুড়ি।

তাকিয়ে দেখি, একটি মেয়ে। এলো চুল ঘাড়ের পাশে ছড়ানো। পাশ দিয়ে উঠেছে ছোট্ট ঘোমটা। চোখের অস্থির তারা দুটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে হাসি। সরু নাকে ময়লা পেতলের নাকছাবি। সকালের রৌদ্রদীপ্ত মুখে পড়েছে বাঁশের বেড়ার ছায়া। ছায়ার ঝিলিমিলি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাও?'

আঙুল দিয়ে টিপুনি দিল গায়ে। আর এক হাত স্পর্শ করল কপালে। ঠোঁটে যেন একটু নতুন রোশনাই। একটি বঙ্কিম ঝিলিক চকিতে দিল দেখা। ওই হাসিকে কী নাম দেওয়া যায়, জানি নে।

হাসি মুখে বলল করুণ স্বরে, 'দুঠো পাইসা, মেরী বাবু!'

পয়সা! অর্থাৎ ভিক্ষে। তাই ভাল। ভেবেছিলুম, না জানি কী ঘটতে চলেছে। ভিক্ষে চাওয়ার এ কী রীতি? ঠোঁটে হাসি, চোখে আলো। গায়ে হাত। ভিক্ষের কারুণ্য কোথায়? গলায়? সেটুকু আব্দার বললেই বা ক্ষতি কি?

পকেটে হাত দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম তার আপাদমস্তক। শাড়িখানি মিলের, কিন্তু পাতলা। পালতোলা নৌকা চলেছে কালো পাড়ের ঢেউ তুলে। পরেছে কুঁচিয়ে, ডানদিকে আঁচল এলিয়ে। গায়ে লাল টুকটুকে সস্তা কাপড়ের জামা। একহারা গড়ন। পুষ্ট দেহ। একটু-বা বন্য।

ভিখারিনী বটে। পকেটে হাত দিয়ে পয়সা-না-তুলতেই কানে এল আর্ত চীৎকার, 'ওগো সামলাও। সেই সর্বনাশী এসেছে গো, সেই হারামজাদী।'

পরমুহূর্তেই নারীকণ্ঠে কলকণ্ঠের কোরাস! ঘটনাটা কলের কাছেই। ফিরে তাকাবার আগে হাতে উঠে এল দুয়ানি একটি। সেটি ভিখারিনীকে দিয়ে ফিরে তাকাতেই সামনে দেখি নারীবাহিনী। আমি ব্যূহমধ্যে বন্দী। আর বেড়ার বাইরে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের হাসি, যেন সমস্ত কোলাহলকে থান থান করে হারিয়ে গেল বালুচরে।

প্রথমেই, সে বিপুলকায়া খনপিসী ঠেলে এল সামনে। বলল, 'ভিক্ষে দিয়েছ বেটিকে?'

সমস্ত ঘটনাটি ঘটল এত চকিতে যে, ঠাহর করতে পারলাম না কিছু। খনপিসীর ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। চারিদিকে ক্ষুব্ধ সন্দেহান্বিত কৌতূহলী রকমারী মুখ। কোতোয়ালজীও ছুটে এসেছে।

খনপিসী মুখখানা আরও ভয়ঙ্কর করে জিজ্ঞেস করল, 'দিয়েছ কি-না?'

ভিক্ষে চেয়েছে। মন চেয়েছে দিতে। দেব না কেন? খানিকটা ঝিমুনো স্বরেই বললাম, 'হ্যাঁ দিয়েছি।'

'কত?'

'দু-আনা।'

'দু-আ—না!' খনপিসী চোখ কপালে তুলে খালি বলল, 'মুখ দেখে দিয়েছ বুঝি?' রীতিমত ভর্ৎসনার স্বর তার গলায়।

'মুখ দেখে নয়। আপাদমস্তক দেখেই দিয়েছি। কিন্তু অপরাধ?'

একটি নারীকণ্ঠের চাপাধ্বনি, 'মা গো! কী বলে দিলে?'

সামনে দেখি ব্রজবালা। দিদিমা। সকলের চোখেই অবাক দৃষ্টি।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

খনপিসী ঝামটা দিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে? ও হারামজাদী যে নষ্ট মেয়েমানুষ, চোর, সর্বনাশী, তা জানো না?'

সর্বনাশী? ও। সে-ই, শুধু চোর নয়, ছেলে-চোর মেয়ে! সর্বনাশ! তা জানব কী করে? ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই তো, ভিখারিনীর চোখে-মুখে যে অনেক সর্বনাশের দ্যুতি ছিল।

তাকিয়ে দেখি, ছি ছি! সকলের চোখে ছিঃ ছিঃ-কারের তীক্ষ্ণ খোঁচা। তবু, দেখে ভোলবার অবসর পাই নি। কোন রকমে ভিক্ষে দিয়েছি মাত্র। কিন্তু মূঢ় বিস্ময়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কী বা উপায় আছে আমার।

জীবনে এমন বিব্রতবোধ আর কখনো করেছি কি-না, মনে পড়ে না। তাও ভিক্ষে দিয়ে। আগে জানলে পয়সা দিয়ে কে ওই মহৎ কাজটুকু করতে

যেত। মহত্ত্বের অমৃতে যে এত বিষ ছিল, তা জানতাম না। জানতাম না, আমার মধ্যে গোপন ছিল এত কলঙ্ক। কালিমা তার ফুটে বেরুবে এতগুলি মহিলার তীক্ষ্ণ চোখের ধিক্কারে।

মুখ থেকে ব্রাশ নামিয়ে, একটা কিছু বলে ব্যাপারটার ইতি টেনে দিতে গেলাম। হল না। ততক্ষণে গুঞ্জনের গতি পরিবর্তিত হয়েছে। বলব কাকে, শুনবে কে। আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে, কার চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল এ দুর্ঘটনা। যে যা-ই বলুক, খনপিসীর চোখেই যে প্রথম ধরা পড়েছিল, সেটা প্রমাণ করে দিল তার বিপুল দেহ ও সর্বোচ্চ কণ্ঠ!—'ওমা! জল ভরব কী? তাকিয়ে দেখি ছুঁড়ি ফিকফিক করে হাসছে আর কী বলছে।'

যত বলে, ততই সকলের ধিক্কৃত নজর যেন একরাশ তীরের মত এসে বেঁধে আমার সর্বাঙ্গে। যেন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, সর্বনাশের দাগ আছে আমারও গায়ে। আমার চোখে-মুখে। আমার সর্বাঙ্গে। কারুর খ্যাতি অকলঙ্ক বলে। কেউ কু-খ্যাত হয় কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে। এ দুদিনের মধ্যে বড় একটা চোখে পড়ে নি কারুর। আর সকালের এ সামান্য ঘটনা আশ্রমের সকলের সামনে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমাকে। বিশেষ করে বাঙালী মহলে। তার চেয়েও বেশী নারীমহলে। এমন জাদুকরী ক্ষমতা শুধু কলঙ্কেরই আছে। তাই তো। দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করতে সময় লাগে।. লেবুর ফোঁটায় ছানা কাটে চকিতে।

ফিসফিস হল, খিলখিল হল। সাড়া পড়ে গেল। কে আমি। কোথাকার ছেলে। কার সঙ্গে এসেছি। থাকি কার কাছে। কেন-বা এসেছি এ ভরা বয়সে।

জটিল প্রশ্ন, কূট তর্ক, সন্দেহ নেই। অথচ আশ্চর্য! ভিক্ষেই দিয়েছি। সর্বনাশীর মুখখানা তো মনে পড়ে না। কানে ভাসছে শুধু তার নির্ভীক তীক্ষ্ণ হাসি।

বলরামের হাসিতে ছিল এক বিচিত্র আনন্দ। শ্যামার হাসিতে চাপা বেদনার ছটফটানি। আর এ হাসি! যেন দুস্তর তেপান্তরের সেয়ানা পাখির ডাক। ডাকে তার আচমকা অট্টহাসি কে হো কে হো করে ওঠে। একলা পথিক চমকে তাকায় ফিরে। নিরালা ধু ধু মাঠের অদৃশ্যচারিণী ভয়ঙ্করী খেলায় মাতে পথিক নিয়ে।

ভাবি, যদি সে মেয়ে না হয়ে পুরুষ হত। চোর হোক, না হয় যদি হত মেয়ে-চোর-ই। হত যদি তেমনি এক সর্বনেশে! তবে কি এমনি করে সবাই

মিলে খাউ-খাউ করে আসত আমাকে ?

ইস্ ! তাকানো যায় না ব্রজবালার চোখের দিকে। তার কিশোরী চোখের ভাষা পরিষ্কার, ছি ছি, তোমার মনে এই ছিল ! আর ডেকো না আমাকে বৌঠান বলে।

যাওয়ার আগে বলে গেল তার দিদিমা, 'ভিক্ষে দেওয়ার আর লোক পেলে না ?'

কোতোয়ালজী হাসল একটু বাঁকা মিঠে হাসি। একটু সমবেদনার আভাস। বলল, 'সাংঘাতিক মেয়ে মশাই। চিতা-বাঘিনীর মত। চলে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। দৈনিক এমনি মেয়ে পুরুষ কত ধরা পড়েছে জানেন ? পঞ্চাশ ষাট তো বটেই। একশ' জনও হয়। সারা মেলায় সব ওত পেতে আছে। একটু অসাবধান হয়েছেন তো, গেল।'

তারপর একেবারে অ-সন্ন্যাসীজনোচিত হেসে বলল, 'ভাল লোককেই পাকড়েছিল।' বলে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চলে গেল। কি ভাগ্যি, প্রহ্লাদ কিংবা পাঁচুগোপাল নেই। তাহলে সমালোচনার ভাষা আর একটু সরস হত নিঃসন্দেহে।

ধন্য সর্বনাশী। ঝুসির সর্বনাশী। তাড়াতাড়ি ফিরতে গেলাম তাঁবুর দিকে। কলের দিকে যাওয়ার দুঃসাহস আর হল না। ফিরতে গিয়ে থামলাম।

সামনে শুধু দুটি অতিকায় মুগ্ধ চোখ। পথরোধ করেছে একটি মহিলা। ঘাড় হেলিয়ে রয়েছে মুখের দিকে। চোখে নজর কম। তাই, নজর চড়াতে গিয়ে ঠোঁট দুটি বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে। চোখে মোটা লেন্সের আড়ালে চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠেছে। বলিরেখাবহুল ফরসা মুখ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। পাকা অংশই বেশী। পরণে থান। ফিরতে গেলাম। বলল, 'দাঁড়াও বাবা।'

ঘরপোড়া গোরুর চোখে সিঁদুরে মেঘ। দাঁড়ালাম। কী বলবে আবার ! বললাম, 'কী বলছেন ?' জবাব পেলাম না। দেখল খানিকক্ষণ অমনি করে। তারপর কোমল গলায় বলল, 'বেশ করেছ। এখানে এসে দেবে না তো, কোথায় দেবে ? আর দিয়ে আনন্দ ভোগ করে কজনা ?'

অবাক হলাম। চকিতে মনটিও উঠল ভরে নতুন আবেশে। চারিদিকে এত সন্দেহ ও ভর্ৎসনা, নিজের দুঃখ ও বিদ্রূপ হাসির মধ্যে গুটিয়ে ছিল মনের পাপড়ি। সে যেন নতুন রসে হাওয়া ও রৌদ্রে মেলে দিল দল। কলঙ্কে লাগল গৌরবের স্পর্শ। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না কিছু।

সে আবার বলল, 'যে দিতে পারে না, তার চেয়ে দুঃখী এ সংসারে কে আছে বল তো বাবা ?'

বলে সে তাকালে, লেন্সের আড়ালে তার সেই বিশাল দুটি চোখ মেলে। একটি লেন্স আবার কাটা। দেখলাম, তার সেই চোখ দুটি যেন জলভারে টলমল করছে। অথচ সপ্রশ্ন দৃষ্টি। সামান্য কথা, কিন্তু কী যে জবাব দেব, ভেবে পেলাম না।

বোধ হয় পানদোক্তা খায়। ঠোঁট দুটিতে লাল ছোপ। গায়ের রঙটি বেশ ফরসা। আবার হেসে বলল, 'যে দেয়, সে-ই তো নেয়। সংসারে সবাই আসে দিতে। দিতে আর নিতে। আগে দেও পরে নেও, না-কি বল বাবা, অ্যাঁ ? মা ছেলেকে দেয়। আবার ছেলের কাছ থেকে মা হাত পেতে নেয়। বসুমতীকে তুমি দেও, মা বসুমতী তোমাকে দেবে ঘর ভরে। বিদ্বানে তো বিদ্যা দেয়। দেওয়ার চেয়ে সুখ কী আছে ?'

মন ভরে উঠল সঙ্কোচে, আত্মধিক্কারে। ভিখারিনীকে দু-আনা ভিক্ষে দিয়েছি। কিন্তু এত বড় দেওয়া, এত মস্ত দেওয়া তো দিই নি জীবনে কোনদিন। সংসারকে কিছু দেওয়া, সে তো আসল দেওয়া। সে দেওয়ার কানাকড়িটি আছে কি-না নিজের কাছে তা-ই জানি নে। দেব কি ! যার আছে থলি ভরতি, সে দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ফিরছি শূন্য থলি নিয়ে। ভরব বলে। পাব বলে। পেলেও দিতে পারে কজন ? পাওয়ার গুমোরে মন যে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকে।

কী কথার থেকে কী ! কোন্ দেওয়ার থেকে কোন্ দেওয়ার কথা। একেবারে মাটি থেকে আকাশে। সীমা থেকে অসীমে। আপনি খাটো হয়ে এল। নুইয়ে এলো মাথা।

সে আবার বলল, 'দেওয়ার সুখ আছে, বড় ঘেন্নাও আছে বাবা। দিয়ে যার মাটিতে পা পড়ে না। দিয়েছি তো মাথা কিনেছি। দ্যাখো, ক-ত্তো দিয়েছি। ওই হল ঘেন্না। আবার যার আছে, সে দিতে জানে না। দেওয়ার রীতি জানে না। সে বড় অভাগা। আমি তো এই বুঝি। তুমি কী বল বাবা, অ্যাঁ ?'

কী বলব ! চোখে তার সেই মুগ্ধ সপ্রশ্ন দৃষ্টি। একটু যেন আত্মভোলা। কণ্ঠে সেই কোমলতা। সকলের আড়ালে কোথায় দাঁড়িয়েছিল সে আমার দু-আনার দানকে গৌরবান্বিত করবে বলে। তার নাম জানি নে, ধাম জানি নে। থুত্থুড়ে বুড়ি হলে মনে আসে ঠাকুমা দিদিমার কথা। সে তা নয়।

যেন খানিকটা মায়ের মত। কথা তার মায়ের চেয়েও বড়। তার গৌরবে ও সম্মানে যে আমি বাক্যহারা। কী বলব ?

বললাম, 'যা বলেছেন।' এর বাড়া আর-কী বলব ?

সে তাড়াতাড়ি অসঙ্কোচে আমার হাত ধরে বলল, 'না না, অমন কথা বোলো না বাবা। এখেনে এয়েছেন কত বামুন-কায়েতের মা-বোনেরা। আমার কথার বাড়া সংসারের বড় কথা। ছোট কথাটিও। আমি গয়লার বেটি, গয়লার বেধবা। ছেলে আমাকে যা-ই বলুক, আমি গয়লার মা। লোকে আমাকে হিদে গয়লার মা বলে জানে।'

মনে মনে বললাম, জানুক। যে হিদে গয়লার-ই মা হোক সে, 'হিদয়ে' যার সবকিছু সঁপে দেওয়ার অমন ব্যাকুলতা, তার চেয়ে হৃদয়বতী কে আছে। ভাবি, জানি নে হিদের মা কী দিয়ে কত দিয়েছে। কিন্তু যে অমনি করে বলতে পারে, সে দিতেও পারে। তার কথার বাড়া আর-কি কথা আছে।

হাত-ধরা হয়ে রইলাম হিদের মা'র। নড়তে পারলাম না। ওদিকে বুঝতে পারছি, থন-পিসীবাহিনী দেখছে এ আদিখ্যেতা। তাদের মধ্যে ঘোরতর আলোচনা চলছে এ নিয়ে।

তারপর হিদের মা বলল, 'তোমাকে বড় ভাল লাগছে বাবা। দিও বাবা, মন চাইলে, থাকলে অমনি দিও যত খুশি।'

বলে আবার জিজ্ঞেস করল, নামধাম পরিচয়। জিজ্ঞেস করল, 'বাপ-মা আছে ?'

বললাম, 'বাবা নেই।'

সে বলল, 'আহা, আসলটি নেই। লোকে বলে, মায়ের চেয়ে বড় কিছু নেই। কিন্তু আমি বলি, না। না বাবা ? বাপ থাকলে ছেলের মাথায় ছাদ থাকে। কিন্তু মা যে কেউ নয়, কেউ নয়।'

বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাকে বড ভাল লাগছে বাবা। তুটো মনের কথা বলি। বসবে ?'

বসব ? তাই তো, কেমন যেন লজ্জা করছে। থন-পিসীবাহিনী না জানি কি ভাবছে। কিন্তু হিদের মাকে নিরাশ করতে মন চাইল না। বসলাম বালুর উপরে। বললাম, 'বলুন ?'

সে বসল। বলল, 'বাবা, ঘরে জ্বালা তাই বাইরে আসি। বাইরে এসে দেখি আরও জ্বালা। অমনি ঘরে ছুটি। কোথা গেলে যে তু-দণ্ড শান্তি পাই। ঘর বার আমার সমান হয়ে গেছে। বাবা, লোকে আমাকে বলে

হিদের মা। কিন্তু হিদে আমাকে মা বলে ডাকে না।'

বলতে বলতে হাসি ও কান্নায় বিচিত্রভাবে থরথর করে কেঁপে উঠল তার ঠোঁট। পুরু লেন্সের আড়ালে ভেসে উঠল বিশাল চোখদুটি।

প্রস্তুত ছিলাম না এমন কথা শোনবার জন্য। বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠল মনটা। বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'আমি যে মায়ের মত মা নই। আমি যে বউকাটকী, আমি যে ছেলে-ভোলানী, আমি যে ঝগড়ুটে, হিংসুটে, লাগানী, ভাঙানী।'

জানি, এর মধ্যে আমার কোনো কথা নেই। তবু না বলে পারলাম না, 'কে বলে এসব কথা?'

সে বলল, 'যে বলার। যাদের বলার। নিজেও বলি। বলি, নইলে যে-হিদে আমার হাতে ছাড়া খেত না, সে একবার ডেকে কথা বলে না। তবু আমি মুখপুড়ি এখনো এ হাত পুড়িয়ে খাই। হিদে আমার লেখাপড়া শিখেছে। কলকাতার আপিসে চাকরি করে। কিন্তু ঝি বলে দুটো পয়সা দেয় না। কেন? আমি যে তার মা নই।'

কিছু বলতে পারলাম না। জানি নে হিদের কথা। জানি নে তাদের ঘরকন্না, কেন বা পুত্রস্নেহ থেকে বঞ্চিত হিদের মা! সব মিলিয়ে সেখানে কোন্ পরিবেশ, কতখানি অবিচার, কে জানে! তবু, হিদের মার জন্য মনটা ভার হয়ে উঠল।

নিজের মনেই অভিমান করে উঠল সে, 'না-ই বা ডাকল, না-ই বা দিল। নিজে দুধ বেচি, খাই। আমার আছ তোমরা, আমার ভাবনা কি? এই তো চলে এসেছি। কে রাখছে তার খবর, কে দেখছে? ওকে হাতে করে না খাওয়ালে কি হয়েছে আমার?'

চোখের থেকে চশমা খুলে জল মুছল সে আঁচল দিয়ে। বলল, 'দিন রাত-ই বলি, মনে মনে বলি। তোমাকেও বললুম, বড় ভাল লাগল তোমাকে। আমাকে দু-চার আনা পয়সা দেবে বাবা?'

পয়সা? নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার কাছে। পয়সা চাইছে হিদের মা? বললাম, 'কী বলছেন?'

তেমনি বিশাল মুগ্ধ চোখ দুটি তুলে বলল, 'আমাকে দু-চার আনা পয়সা দেবে?'

আচমকা আক্রান্ত শামুকের শুঁড়ের মত মন গুটিয়ে গেল হঠাৎ। এত বলে শেষে পয়সা? জিজ্ঞেস করতে গেলাম, 'কেন?' কিন্তু পারলাম না। সেই

উন্মুক্ত মুখ, সেই চোখ, তেমনি ঘাড়-কাত-করা সরল অভিব্যক্তি। ভাবান্তরের লক্ষণ নেই কোথাও। তবু সন্দেহে বিরক্তিতে সিঁটনো মন খাটো হয়ে গেল বড়। আমাদের ভদ্রতায়, শিক্ষায়, আলাপনে, ভাবনায়, চিন্তায়, আত্মসন্তুষ্টির যে বেড়াখানি দিয়েছি বেড় দিয়ে জীবনের চারপাশে, তার বাইরে গেলেই আমরা পেছিয়ে আসি! দল-মেলা মন আসে গুটিয়ে। গণ্ডিতে আমরা উদার। বাইরে অস্বাভাবিক।

অবকাশ নেই মন যাচাইয়ের। চিরাভ্যস্ত মন-চোখ আমার দেখল, হিদের মার এই সারল্যের পেছনে যেন একটি বাঁকা হাসি রয়েছে উঁকি মেরে। এত যে দানের কথা, মিষ্টি কথা, তার পেছনে কি শুধু ওই দু-চার আনার অধ্যবসায়! ভাবলে নিজেকেই যেন খাটো লাগে। কলঙ্কে লাগল আমার দ্বিগুণ অপমানের স্পর্শ। হয়তো এখুনি না চেয়ে, দু-দিন বাদে চাইলে এতখানি মনে লাগত না। দু-দিন কেন, ওবেলা হলেও এতখানি মনে হত না বোধ হয়।

মনের ভাব গোপন করে বললাম, 'দোব। তাতে কী হয়েছে। দিচ্ছি, এখুনি দিচ্ছি।' বলে পকেটে হাত দিতে গেলাম। হিদের মা তাড়াতাড়ি হাত ধরে বলল, 'দিও'খনি। তাড়া কিসের? পালিয়ে তো যাচ্ছ না।'

তা যাচ্ছি না। কিন্তু তাড়া আছে বৈ কি। হিদের মার কাছ থেকে চলে যাওয়ার তাড়া। সে আবার বলল, 'তোমার পকেটে ওটি কী বাবা? কলম? কী যে বলে ওটাকে? যাতে আপনি আপনি লেখা যায়?'

কলমে তার আবার কী প্রয়োজন? বললাম, 'হ্যাঁ, ফাউণ্টেনপেন।'

একটু বা অপ্রতিভ হেসে বলল সে, 'হ্যাঁ, ফাউণ্টেন পেন। হিদে লেখে ওই দিয়ে। তা বাবা, আমাকে একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে। দেবে তো?'

মন বিমুখ হয়ে উঠেছিল। তবু বললাম, 'দেব।'

হিদের মা তাড়াতাড়ি কোমরে-গোঁজা আঁচল খুলে বার করল একটি কাগজ। ভাঁজ-করা, দলা-মোচড়া।

খুলতে দেখলাম, একটি দু-আনা পোস্টেজের খাম। আঁচলে তার হাল এমনি হয়েছে যেন কুড়িয়ে এনেছে কোথা থেকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম চলে যাওয়ার জন্য। কৌতূহল হল ভেবে কাকে চিঠি দেবে হিদের মা। বললাম, 'কাকে লিখবেন?'

সে বলল, 'হিদেকে! একটু জানিয়ে দিই, কেমন করে আমার হাড় জুড়োচ্ছে এখানে এসে। নইলে আমার মনে শান্তি পাব না।'

তা বটে। যাকে যত বেশী দুঃখ দিতে প্রাণ চায়, তাকেই তো দিতে হয়

সুখের সংবাদ। তবে হিদের মার চোখ দুটি অমন ভেসে উঠেছে কেন!

তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলাম। খন-পিসীবাহিনী তাকিয়ে দেখছে কটকট করে। ওই দৃষ্টিতে দাহিকা শক্তি থাকলে পুড়ে মরতাম নিঃসন্দেহে। ভাবছি, যখন তারা জানবে হিদের মাকে পয়সা দিয়েছি, তখন যদি মুখের সামনে এসে তারা হাসে, তবে আর মুখ লুকোবার জায়গা পাব না।

হঠাৎ নজরে পড়ল ব্রজবালাকে। চোখে মুখে তার ক্রোধ ও শঙ্কা। এত লোকের মাঝে তাকাতে পারছে না। কিন্তু ভ্রূ-জোড়া উঠেছে কপালে।

পেছনে আমার হিদের মা। তাঁবুতে এসে ব্যাগ খুলে কাগজ বার করছি। পেছন থেকে ব্রজবালা এক ঘটি জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। মুখ ধোয়ার জল।

জলের ঘটি নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই শঙ্কিত গলায় ফিসফিস করে বললে ব্রজবালা, 'সেই কিপটে বুড়ি। খবোদ্দার, একটি পয়সাও দিও না।'

বলে, ঘটি হস্তান্তরিত করে চলে গেল। হাসি, বিস্ময়, দুঃখে আমার মনের এক বিচিত্র ভাব। সত্যি, ব্রজবালাই দেখছি আমার প্রকৃত সখী। এই কিপটে বুড়ির কথা, ওই সর্বনাশীর কথা, গতকাল তো সে আমাকে বলেছিল। আমারই মনে ছিল না।

মুখ ধুয়ে বসলাম কাগজ নিয়ে। বললাম, 'বলুন, কী লিখতে হবে?'

হিদের মা খামখানি দিয়ে বলল, 'আগে ঠিকানা লেখো। লেখো, ছিরি হিদয়রাম ঘোষ।'

অর্থাৎ হৃদয়রাম ঘোষ। ঠিকানা লেখা হল। আবার বলল, 'এই আশ্রমের ঠিকানাটা চিঠিতে দেও।'

তাই দিলুম। তারপর বলল, 'লেখো, বাবাজীবন, হিদু বাবা—'

বলে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। বুঝলাম, পাতা-ভরতি ইতিহাস লিখতে হবে। এখনো একটু চা জোটেনি এই দারুণ শীতের সকালে। মন ছটফট করছে বেরুবার জন্য। আটকা পড়ে গেলাম। না, নতুন আশ্রমের সন্ধান করতে হবে দেখছি।

হিদের মা বলল হঠাৎ, 'লিখছে? এবার লেখো তোর পায়ে পড়ি বাবা হিদে, নেদো, গোপাল পারুল, সকলে মিলে কেমন আছিস, ধর্মত জানাস। ইতি তোর শত্তুর—মা।'

ব্যাস? একেবারে ইতি? সে কি? যার মুখের 'পরে জানিয়ে দিতে হবে সুখের কথা, শেষে তারই একটু সংবাদের জন্য এত ব্যাকুলতা? বললাম, 'আর কিছু না?'

সে বলল, 'আর কী আছে বাবা? আমার কথা? পথে পথে, ঘাটে ঘাটে, ঠাকুরের দোরে বলেছি। না বললেও যে শুনতে পায় সে যখন শোনে নি, তখন চিঠিতে লিখে কি ফল পাব? লেখা অনেক হয়েছে, আর থাক। ওই লিখে দেও।'

তাই দিলাম। লিখে দিলাম। কেবল কানের মধ্যে বেজে রইল হিদের মার ক্লান্ত ব্যথিত স্বর। সংসারে আছে কত সুখ দুঃখ। কত রূপে তা কত করুণ ও বিচিত্র। ঘরে বাইরে, মনের গঠনে, সংসারের কাঠামোতে রয়েছে তার জড়। কখনো তার সমূল শেষ দেখি কান্নাতে, কখনো হাসিতে। গতিবিধি তার মানুষের হৃদয় ও মনোজগতে। এর বিজ্ঞান আছে, কিন্তু সীমা নেই।

হিদের মা ঠাকুরের দোরে দোরে বলেছে। তাঁর কানে না পৌঁছুক, সে বলা যদি হিদের কানেও পৌঁছুত, হিদের মার ঘরে থাকত অমৃতকুম্ভ। হাহাকার করে ছুটে আসত না এখানে। কিন্তু ওইখানে যে সব গণ্ডগোল। সোজা পথ তো সোজা নয়। কখন সে বাঁক নিয়ে নতুন দিকে মোড় ফিরেছে, অচিন পথিক তার কি জানে।

চিঠি লিখে দিয়ে পকেটে হাত দিলাম। বিমুখ মন খানিকটা ভিজে উঠেছিল। পকেটে দু-আনা আছে, চার আনাও আছে। পথের কড়ি, হাত দিলেই হিসেব করতে মন যায়। জানি নে, ভিক্ষে করা হিদের মার অভ্যাস কি-না। তবু, একটি টাকা তুলে দিলাম তার হাতে। অস্বীকার করব না, মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ করুণা ও অনুগ্রহের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু না দিলে মন তৃপ্ত হত না।

হিদের মা চোখ তুলে বলল, 'পুরো একটি টাকা দিলে বাবা?'

বললাম, 'হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে।'

হিদের মা আঁচলে বেঁধে বলল, 'বেশ! সকলের কাছে তো চাই নে। যার কাছে মন চায়। বড় অল্প পুঁজি আমার। বড় ভয় করে, তাই আগে থেকেই সামলে চলি।'

আশ্চর্য! এত সামলাসামলি হিদের মায়ের। তবু দেওয়ার কথায় পঞ্চমুখ সে।

কিন্তু আর দেরি নয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে আসতেই, ব্রজবালা মুখভার করে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। মাথায় অর্ধেক ঘোমটা। ও! হিদের মাকে টাকা দিয়েছি বলে রাগ হয়েছে তার। হতেই পারে। সে যে আমার সত্যি সখী। পেছনে আমার হিদের মা। দৃপ্ত ক্রুদ্ধ চোখে

তার দিকে তাকাল ব্রজবালা। আমি হাসি গোপন করে চলতে উদ্যত হলাম।

ব্রজবালা বলল, 'দি'মা তোমাকে খেয়ে বেরুতে বলেছে।'

'এখুনি ?'

'হ্যাঁ। আমরা আজ বেরুব।'

খুবই রাগ করেছে ব্রজ! বললাম, 'ফিরে আসি, তারপর খাব।'

সে বলল, 'আমরা এক্ষুনি বেরিয়ে যাব। দেরি হলে, তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে তাঁবুতে।'

হেসে বললাম, 'তথাস্তু।' মনে মনে বুঝলাম, ব্রজর রাগ বাগ মানল না তাতে।

এমন সময় হিদের মা চেঁচিয়ে উঠল, 'বউমা। অ বউমা।'

বলতে বলতে ছুটে গেল গেটের দিকে। অমনি ব্রজ আমার কাছে ছুটে এসে বলল, 'ওই যে সে-ই।'

'সে-ই ? সেই কে ?'

কোথায় ব্রজর রাগ। বয়স যাবে কোথায়। সে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'সেই যে গো, সেই বউটা। সোয়ামী যার সাধু হয়ে বেরিয়ে গেছে। সেই বউ! সঙ্গে ওই লোকটা ওর দেওর।'

ও! মনে পড়েছে। স্বামী-সন্ধানী বউ। তাকিয়ে দেখলাম। দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা। ফরসা রং। বেশভূষায় আধুনিকা। নীল শাড়ির উপরে হালকা গোলাপী রঙের লেডিজ কোট। ঘোমটা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। তাকিয়েছে এইদিকে। সকালের সূর্যালোকে ঝকঝক করছে কপালের ও সিঁথির সিঁদুর। পাশে একটি ভদ্রলোক, যুবক। স্বাস্থ্যবান। গায়ে অলস্টার, চোখে আঁটা ফ্রেমের চশমা। মুখে হাসি। হেসে যেন কী বলছে মহিলাটিকে। দাঁড়িয়েছিল হিদের মার জন্য। তারপর তিনজনে মিশে গেল জনারণ্যে।

ব্রজ বলল, 'ওদের দুটিকে বেশ দেখায়, না ?'

সত্যি দেখায়। ঠিক কথাটি দেখছি বয়স মানে না! কেন বলল ব্রজ, কে জানে। মনে মনে ভাবলাম, দেখায় হয়তো, মানায় কি না কে জানে। মানানো যে আলাদা। কিন্তু, হিদের মা দেখছি ভারি ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

বেরিয়ে এলাম। মেলা তো মেলা। আজ যেন বড় বেশী জাঁকজমক। লোকের আনাগোনাও বেশী। খানিকটা উত্তরে এসে একটি সাইনবোর্ডে

চোখ পড়তে থামলাম। বড় তাঁবুর গায়ে সাইনবোর্ড। নর্থ ওয়েস্টার্ন রেস্টুরেণ্ট। ব্র্যাকেটে, ভেজিটেরিয়ান। চারপাশে তার কাগজের ফুল আর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। ঝকঝকে পোশাকে রয়েছে দাঁড়িয়ে বয়।

উঁকি মেরে দেখলাম, লোক নেই। ভেতরটা যেন অন্ধকার, ফাঁকা। ঢুকে তো পড়ি। চা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ঢুকে দেখি, টেবিল-চেয়ার পাতা আছে ঠিক। সবই বালির উপরে। কোথাও কোথাও পাতা রয়েছে কাঠের পাটাতন।

বয় এসে দাঁড়াল ছাপানো মেনু নিয়ে। আবার কি! বালুচরে শহুরে স্বর্গ রচনা হয়েছে।

মেনুর প্রয়োজন ছিল না। বললাম, 'চা আর টোস্ট।'

পরমুহূর্তেই নজরে পড়ল, কোণের চেয়ারে একটি লোক বসে রয়েছে। সামনে টেবিল। টেবিলের উপর ফুলদানি, কাগজ কলম দোয়াতদান। ভদ্রলোক তাকিয়েছিলেন আমার দিকেই। চোখ পড়তেই উপযাচক হয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন। আন্দাজে অনুমান করলাম, তিনি উত্তর-পশ্চিম রেস্তোঁরার প্রোপ্রাইটার হবেন হয়তো! কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রতি-উত্তর দিলাম। দিতেই উঠে এলেন ভদ্রলোক। ইংরেজীতে বললেন, 'অর্ডার দিয়েছেন?'

বললাম, 'দিয়েছি।'

অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে যারা তুরন্ত, গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হয় না তাদের। তাছাড়া, অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে যারা আগ্রহান্বিত, আচমকা কোন প্রশ্ন করতেও তাদের বাধে না। একটু হেসে বললেন ভদ্রলোক, 'বাংলা দেশ থেকে আসছেন নিশ্চয়ই?' কথাটা ইংরেজীতেই বললেন। জবাব দিলাম, 'কী করে বুঝলেন?'

পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বয়কে যে ভাষায় হুকুম করেছিলেন, তাতেই বুঝলুম আপনি বাঙালী। আমাদের বাঙালী ভায়ারা ওরকম হিন্দী-ই বলেন কিনা!' বলে একটু হাসলেন।—'আপনাকে সেজন্যে দোষ দিচ্ছি নে। শতকরা সব বাঙালীই তাই বলেন। শুনেই বুঝলুম আপনি বাঙালী।'

বুঝেও না বোঝার মত করেই অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হল, 'আপনিও নিশ্চয়ই বাঙালী?'

ভদ্রলোক একটু হেসে, বসে পড়লেন আমার পাশের চেয়ারে। ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে দিয়ে ইংরেজীতে বললেন, 'কী মনে হয়?'

পাল্টা প্রশ্ন শুনে বিব্রতভাবে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। রীতিমত চ্যালেঞ্জের হাসি তাঁর স্থূল ঠোঁট দুটিতে। বোধ হয় সে অধিকারও ছিল তাঁর। কারুর মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলা শুনে যদি তাকে বাঙালী বলা যায়, তাহলে ইনিও বাঙালী নিঃসন্দেহে। কিন্তু চেহারার কোথাও সে ছাপ নেই।

লম্বায় প্রায় ছ-ফুট লোকটি। কপালটি রীতিমত চওড়া। কপালের ঠিক মাঝখান থেকে, তীরের মত ওলটানো ও কোঁকড়ানো চুলের অগ্রভাগ ঘাড়ের কাছে বাবরি পাকিয়ে উঠেছে। রংটি ফর্সা, কিন্তু পোড়া তামাটে খানিকটা। সবচেয়ে দ্রষ্টব্য হল তাঁর কপালে ও গালে গভীর রেখা। হাসিতে অমায়িক, রাগলে ওই মুখ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। পোশাকে, যাকে বলে ফোতো সাহেব। ময়লা জামা, তেলচিটে টাই আর লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পোকা-খাওয়া ছিদ্র-জর্জরিত কোট। সব মিলিয়ে বাঙালী বলা মুশকিল।

বলতে গেলাম, অবাঙালী। কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম। ঠোঁটের হাসিটুকু ছিল না চোখে। ছোট গম্ভীর সেই চোখ জোড়াতে উঁকি দিয়ে রয়েছে যেন আর একটি মানুষ। এক ঘরছাড়া, দিকহারা, ঝোড়ো দিনের এক বাউণ্ডুলে পথিক। বলে ফেললাম, 'আপনি বাঙালী ?'

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে, 'রাইট ইউ আর মাই ব্রাদার। হাত দিন, হাত দিন। অবাঙলীরা আমাকে বাঙালী বলে চিনতে ভুল করে না। কিন্তু দেশী লোককে জিজ্ঞেস করলেই আমাকে অবাঙালী বলে বসে।' বলে হাত বাড়াবার অপেক্ষা না করেই ওঁর মস্ত থাবাটি দিয়ে টেনে নিলেন আমার একটি হাত। তারপর চীৎকার করে উঠলেন, 'হোই রামাইয়া ?'

নামের শেষে একটু বিসর্গজড়িত দ্রুত আকস্মিক ছেদ। অর্থাৎ রামাইয়াঃ। হাঁও নয়, হুঁও নয়, অদ্ভুত শব্দের জবাব এল তাঁবুর ভেতর থেকে। ভদ্রলোক দ্রুত দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে উঠলেন। তেমনি ভাষায় জবাব এল ভেতর থেকে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ভদ্রলোকের দিকে।

সন্দেহ হল। সত্যিই বাঙালী তো লোকটি! না কি স্রেফ ভেল্‌কি ? এ আবার কী ভাষা বলছেন ভদ্রলোক ?

বাহাদুরির ভঙ্গি নেই। চাপা উল্লসিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাষা বললুম, বলতে পারেন ?'

বললাম, 'না।'

'তেলেগু ভাষা। আপনার চা দিতে দেরি হচ্ছে কেন, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। ও বললে, আপনার রুটি সেঁকছে।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই চা এসে পড়ল। ট্রের উপরে সাজানো সবই আলাদা আলাদা। এমন কি মাখনটুকুও। ভুলেই গিয়েছিলাম, ঢুকেছি এক সভ্যতাদুরস্ত রেস্তোঁরায়। টি-পটের ঢাকনা খুলে দেখি, কাপ-তিনেক চা আছে। বয়কে বললাম, 'আর একটি কাপ দাও।'

প্রোপ্রাইটার বললেন, 'কেন ?'

বললাম, 'চা খান।'

'না না না।'

অভদ্রতা প্রকাশ পেল কি না জানি নে। তবু বললাম, 'না কেন ? এত চা কে খাবে ? দুজনের মতই রয়েছে।'

ঠোঁট উল্‌টে বললেন উনি, 'ও মশাই বাঙালীদের পক্ষে। নইলে ওটুকু চা আবার একজন কি খাবে। বেশ, আপনাকে আমি সিঙ্গল কাপ দিতে বলছি।'

আমি ওঁর মত বলে উঠলাম, 'না না না। আমি আপনাকে আমার টেবিল-সঙ্গী হতে বলছি। আসুন না, চা খেতে খেতে গল্প করা যাক্‌।'

'ও! আমাকে খাইয়ে-ই পয়সা উশুল করবেন।'

বলে হা হা করে হাসি। দরাজ গলায় হাসি। চকিতে ইশারা করলেন বয়কে। বয় কাপ এনে দিল। বললেন, 'তাহলে আমি চা-টা পরিবেশন করি আর আপনি ততক্ষণ রুটি খেতে থাকুন।'

তাই হল। চা তৈরী করতে করতেই বকবক করে চললেন উনি, 'মশাই খাবার বিষয়ে কখনো খুঁতখুত করবেন না। ভারি খারাপ জিনিস। আগে আমার ওরকম ছিল। একবার কি হল জানেন ? তখন ছিলুম করাচীতে। পাকিস্তান হওয়ার আগে। শহর খুব ফিটফাট। রাজপথে একটি ভিখিরী দেখতে পাবেন না, এমনি কড়া আইন। ভিতরে যান, বারাকপুরের বস্তি অঞ্চলকে হার মানিয়ে দেবে, এত নোংরা। বিশেষ হাবসী পাড়ায়। যেমন নোংরা, তেমনি দুর্দান্ত। মারামারি তাদের কথায় কথায়। বন্দরের এক হাবসী কুলি-সর্দার ইয়াকুব ছিল আমার বন্ধু। সে একবার নেমন্তন্ন করে বসল তার ঘরে। খেতে গেলুম। আরে রাম, রাম, রাম। মশাই দিনের বাসি হাতরুটি, সাদা সাদা পোকা দেখা যাচ্ছে। তেমনি দুর্গন্ধ। তার উপরে, মাংস বলে যা এল, সে আর চেয়ে দেখা যায় না। কালো রং, বোধহয় কোন শাক-সবজী ছিল, আর কতগুলো নাড়ি-ভুঁড়ি। তার ওই নোংরা পাজামা দিয়ে

রুটি ঘষে তুলে দিল আমার হাতে। কী করি। দ্বিরুক্তি করছি দেখে সে বিদ্রূপ করে বলল, 'বাঙালী শুনেছি, কলাগাছের ছাল খেতে ভালবাসে। মাংস রুটি পেয়ার করে না তারা।' কথাটা বড় লাগল। বাঙালীকে খোঁচা? তাও এই অমৃত-সমান মাংস রুটি দিয়ে? ভাবলুম, মরার বাড়া ভয় কি? খেয়ে ফেললুম। পেট ভরেই খেলুম। রাস্তায় এসে তুলে ফেললুম সব গলায় আঙুল দিয়ে। তারপর একদিন নেমন্তন্ন করলুম তাকে। ব্যবস্থাও করেছিলুম তেমনি। দু-দিনের পচা পান্তাভাত আর ঝোলা গুড়। খা, কত খাবি।'

বলে ভদ্রলোক ঘাড় কাত করে তাকালেন আমার দিকে। গভীর বিস্ময়ে স্থানচ্যুত হল তাঁর মুখের রেখা। বললেন, 'মশাই, বেমালুম খেয়ে ফেললে? তারপর দিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। মাইরি, কী বলব আপনাকে, লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলুম। আবার যাওয়ার সময় কী বলে গেল জানেন? বললে, 'বহুত বঢ়িয়া চীজ খিলায়া দোস্ত।' বুঝুন ব্যাপারটা। তাই বলছি, বাইরে যখন বেরুবেন বাইরের মতন হয়ে বেরুবেন। অবিশ্যি চা আপনি কম খান তাতে কিছু নয়। কিন্তু বাঙালী বলে সব জায়গায় নিজের রীতিনীতির খুঁটি আঁকড়ে থাকব, তা করতে গেলে ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন। তা হলেই গলায় আঙুল দিতে হবে। আরে মশাই, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়। এ তো বাঙালীই বলে।'

পেটরোগা খুঁতখুঁতে বলে দুর্নাম আছে বাঙালীর। আমি তার বাইরে নই। তিন কাপ চা একলা খেলে আমাকেও যে গলায় আঙুল দিতে হত। বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ। তবু, আপাত মূল্য আছে এঁর কথার। প্রতিবাদ করতে পারলাম না। বিশেষ, এঁর বাঙালী-জেদ, আর হাবসীর পান্তা-প্রীতির কথা শুনে। যে বাঙালীকে তিনি বিদ্রূপ করতে চান, সেই বাঙালী নামের জন্য সামান্য এক হাবসী কুলির পচা রুটি মাংস খেতেও পেছপা হননি।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলে উঠলেন আবার, 'বিদেশে কোন বিষয়ে পেছিয়েছেন তো, আপনি গেলেন। অমনি সবাই যো পেয়ে যাবে। ডেঁটে থাকতে হবে। যখন যেমন, তখন তেমন! লে আও তোমার কি খানা আছে। অত পটপট কিসের? সত্যি, অনেক অখাদ্য খেয়েছি। কিন্তু বমি কোনদিন করিনি আর। থাকগে যাক, ভায়ার নামটি কি, শুনি?'

গায়েপড়া অন্তরঙ্গতার হাসি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখে-মুখে। সুর ছড়াল চায়ের টেবিলে। টাইপ আসর-জমানো লোকের মত 'ভায়া' শব্দটি তাঁর মুখে একটুও বিচিত্র ঠেকল না। নাম বললাম।

'বেশ বেশ। তা এলাহাবাদে কি কোন আত্মীয়স্বজন আছে?'

'না।'

'কোথায় উঠেছেন?'

আশ্রমের নাম বললাম।

আশ্রমের কথা শুনে আবার তাঁর মুখে একটু চাপা হাসির লক্ষণ দেখা গেল। যেন কতদিনের পরিচয় এমনি অন্তরঙ্গ সুরে, একটু রহস্য করে বললেন, 'তা ভায়া, এ বয়সে এত বৈরাগ্য কেন?'

বললাম, 'বৈরাগ্য নয়। মন টানল, তাই চলে এলাম। দেখব আর ঘুরব বলে বেরিয়ে পড়লাম।'

চা খেতে খেতে বললেন, 'কোথায় ঘুরবেন, আর কী দেখবেন? মুখে তাঁর কৌতুহল ও বিস্ময়। যেন ঘোরবার দেখবার কিছুই নেই।

বললাম, 'যা দেখি নি, যেখানে বেড়াই নি, সেই সবই দেখব, সেখানেই বেড়াব।'

ভদ্রলোক তাঁবুর আধা অন্ধকার কোল থেকে কয়েক মুহূর্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন বহুদূরে কী দেখছেন। চোখে তাঁর সেই আলোছায়ার খেলা। তারপর হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, আমি সত্যি মুখ্যু মানুষ। কী বলতে কী বলে ফেলব। অনেকদিন আগে একটা জাপানী কবিতার বাংলা অনুবাদ পড়েছিলুম।

'কি করি কোথা যাই,
কোথা গেলে শান্তি পাই?
ভাবিলাম বনে গিয়া,
জুড়াব তাপিত হিয়া।
শুনি সেথা অর্ধরাত্রে,
কাঁদে মৃগী কম্প্র গাত্রে॥'

বলে তিনি চুপ করে গেলেন। মনে হচ্ছিল, একটা চাপা গভীর অথচ তীব্র আর্তনাদ শুনছি কাছে। তার মধ্যে অনুরণিত এক ঘোর অস্থিরতা। কিন্তু শান্ত। তারপর আচমকা চুপ করে গেলেন। যেন নিঃশব্দ রাত্রে এক পোড়ো বাড়ির দেউড়ি একবার ককিয়ে উঠে থেমে গেল। তারপর অসহ্য নিঝুমতা, অন্ধ নিঃশব্দ রাত্রির আড়ষ্টতা।

বাইরে কোলাহল। তাঁবুর আশেপাশে গণ্ডগোল চীৎকার। সে কোলাহল ধ্বনি যেন ঝিঁঝিঁর ঝিল্লিরব। বাইরে রৌদ্রালোকিত রূপালী বালুচর। আর

কালো রঙের তাঁবুটার মধ্যে এখনো অন্ধকার লেপটে রয়েছে কোণে কোণে।

তাকিয়ে দেখি সামনে আমার নতুন মানুষ! তার বিশাল তামাটে মুখটা উঁচুনীচু। যেন কোন্ দূর পাহাড়ের গড়িয়ে-পড়া এক লাল পাথর। গভীর ফাটলের মত মুখের রেখাগুলি তার গভীরতর। চোখ দুটো পাথরের মূর্তির চোখের মত নিষ্পলক, উদ্দীপ্ত অথচ অন্ধকার। যেন এই শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে বহু যুগ-যুগান্তরের রোদ বৃষ্টি ঝড় বয়ে গিয়েছে। পোড়া, ধোয়া, জ্বলা।

কী বলব ভেবে পেলাম না। উনি এমনভাবে চুপ করলেন, সেটি যেন আর-একজনকে চুপ করিয়ে দেওয়ার মত। আমার ঘরছাড়া অবারিত মন, আকুল আগ্রহে মেলে রয়েছে দু-চোখ। ডানা মেলে রয়েছে মুক্ত বিহঙ্গের মত। উৎকর্ণ কান, মনের মাঝে উত্তুঙ্গ-মর্ম। মনোবীণার তারে অজানা সুরের ডাক। তাকে যেন দু-হাত মুঠি করে চেপে ধরলেন ভদ্রলোক। আড়াল করে দাঁড়ালেন আমার দিগ্‌বিদিক-ছোটা পথের সামনে। কী বলব!

এত লোক, এত নারী আর পুরুষ, শিশু আর বৃদ্ধ এসেছে সারা দেশ থেকে। আমিও এসেছি। কে ডাক দিল জানি নে। কী বলে ডাকল, কী সুরে বাজল সেই ডাকের সুর, তাও বুঝি নি। এ যেন সেই রাধার উক্তির মতই—খেতে সাধ নেই, শুতে আনন্দ নেই। কোন্ অতৃপ্তি রেখেছিল চারপাশ থেকে ঘিরে, তাও খুঁজে দেখি নি। মন বলল, রইতে নারি, আর রইতে নারি ঘরে। মন ব্যাকুল হয়েছিল। তার ঝঙ্কার দিল আগ্রহের অঙ্গুলি। তাই বেরিয়ে পড়েছি। দেখব, ঘুরব, আশা মেটাব। কিন্তু বিচিত্র বেশে এ কোন্ হরিণী সজাগ চোখে দাঁড়াল আমার সামনে। নিজের মাঝে ছিল অতৃপ্তির কত গভীর উৎস, ভেবে দেখিনি। কিন্তু এ যে অতৃপ্তির সমুদ্র। বুকে যার তীব্র গোঙানি, স্বাদ যার কটু ও লবণাক্ত।

কবিতা চীনে কি জাপানী জানি নে। হৃদয়ে যে ভাষা জোগায়, সে কাব্যের কোন জাত নেই। সে কাব্য সকল মানুষের। মনে পড়ল, কবে একদিন পাড়ার মুদীখানায় বসে শুনেছিলাম এক পথচারী গায়কের গান,

"কত ঘাটে ঘাটে বাঁধলাম নৌকা,
তোমার দেখা পেলাম না,
যারে শুধাই, এক জবাব পাই
'কার কথা কও, কোন্ জনা?'
শুধায় সবে, শুধাই আমি
শুধাই বনে বনে,

(হায়রে) বনও কাঁদে, কয় আমারে
'তার দেখা পেলাম না' ॥"

সেই একই হাহাকার। তবু কে বসে থাকবে নিশ্চেষ্ট হয়ে? ঠাঁই নেই, তবু বুকে হাত রেখে বসে থাকব কোন্ সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে? এক তারার পাশে আর-এক তারা, তারপরে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, অসংখ্য! চোখ মানে না। মন বাধা মানে না। বলরামের কথা মনে পড়ে গেল। আর আমার এই ঘরছাড়া চোখ দেখেছে শ্যামাকে। হাসিতে তার সেই মধ্যরাত্রির বিরহিনী হরিণীর কান্নাও বুঝি ছিল। শুনব বলে আসি নি। না এলে যে শুনতেও পেতাম না। কথা বলতে গেলাম। উনি বলে উঠলেন, 'যেখানে যাবেন, এটি তো সঙ্গে যাবেই।' বলে, তাঁর বুকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপর বললেন, 'এ কি কখনও ভরে?'

বললাম, 'ভরে না বলেই তো!'

অতবড় মানুষটা। হাসিতে কী করুণ ও নিরীহ। বললেন, 'তবুও ভরতে হবে। কিন্তু ভায়া, ও তো কখনো ভরে না! এ সংসারে কার আছে ভরা ভাত, জানি নে। নিজেরটা তো দেখি, ফুটো পাত্র। যত ভরি, সে তত ঝরে। হিন্দীতে একটা গান আছে জানেন? যমুনা থেকে গাগরি ভরে ভরে বারবার জল নিয়ে এলি তুই ছোকরি, কিন্তু তাজ্জব! ছল্‌কে ছল্‌কে বারবার তোর সব জল পড়ে যায়। তুই আবার ছুটিস যমুনার পানে। বলি, এ কী তোর ভরানো ঝরানো খেলা? যমুনার কালো জল কি দুরন্ত ছেলের মত এতই দুষ্টু যে, সে কিছুতেই তোর কলসীতে থির হতে চায় না?' বলে হেসে উঠলেন। একটা তীব্র কনকনে হাওয়া ঢুকল তাঁবু দুলিয়ে। চকিত ফণার মত দুলে উঠল তাঁর তেলচিটে টাইয়ের অগ্রভাগ। বললেন, 'জন্মে যা ভরে নি, মরণে কি সে ভরবে? তবু—'

বলে এক মুহূর্ত থেমে নিজেই বললেন আবার, 'তবু মন মানে না, কি বলেন? আগে বোঝাপড়া ওর সঙ্গে, তার পরে তো সব? আপনাদের সেই খ্রীষ্টান কবির কথা মনে আছে তো?'

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?"

আমাদের খৃষ্টান কবি বটে। কিন্তু মুখস্থ দেখছি ওঁরই আছে বেশী।

আচমকা একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বড় খারাপ নেশা ভাই। এই পথের নেশার চেয়ে খারাপ নেশা আর কিছু নেই। এ ডেকে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয়, আর ডাকে না, পেছনে ফিরতেও দেয় না।'

বলে এক চুমুকে ঠাণ্ডা চায়ের কাপটি শূন্য করে দিলেন। আমার চায়ের পাট ফুরিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু আটকা পড়েছি আপনা আপনি। যেচে আলাপ করতে এলেন উনি। কিন্তু ওঁর রূপ কী গুন্ করল আমাকে, যেচে বিদায়ের কথা পারলাম না বলতে। শুধু তাই নয়। ওঁর চোখের ওই দূরভিসারী দৃষ্টি, মুখময় ঝড়ের দাগ আর অসহায় হাসি মনের মধ্যে যুগপৎ অকারণ একটু ব্যথা ও কৌতুহল জাগিয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার দেশ কোথায় ?'

জিজ্ঞেস করতে আবার হেসে উঠলেন। এবার অট্টহাসি বলা চলে। বললেন, 'চায়ের আসরটা তা হলে জমেছে ভালো, কী বলেন ? দেশ তো ভাই আমার নেই। ঘরকে পর করেছি, পরকে ঘর। এখন সবই দেশ বলে মনে হয়। তবে জন্মেছিলুম বাঙলার এক গাঁয়ে। আঠারো বছর বয়সে সে গ্রাম ছেড়ে এসেছি। তারপর দেশ থেকে দেশান্তর, যাকে বলে দেশান্তরী।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বাবা মা আত্মীয়স্বজন, তাঁরা কোথায় ?'

'বাবাকে ভাই কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মাকেও হারিয়েছি অল্প বয়সেই। আঠারো বছর পর্যন্ত পেলেছিল এক মাসী। মাসী মারা গেল। তার ছিল কিছু জমি-জমা। দেখলুম, আমার মত অনেক বোনপো-ভাইপো রয়েছে মাসীর। তারা এসে দাবি করল ঘর-বাড়ি, জমি, গোরু-বাছুর। বিশ্বাস করবেন কি না জানি নে। বেঁচে গেলুম। ভেবেছিলাম, কাকে দেব ? ভাগীদারের সংখ্যা দেখে চিন্তা ঘুচল। আর আঠারো বছর বয়স। সে যে অথৈ সমুদ্র। তার কুলকিনারা নেই।'

বলতে বলতে তাঁর সমস্ত মুখখানিতে স্বপ্ন নেমে এল। জানি নে, এ শুধু তাঁর আসর-জমানো কথা কি-না। কিন্তু তাঁকে যে কোন নিশি পেয়েছে, সে চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখের গম্ভীর রেখায় রেখায়। বললেন, 'ছোটকালে বাঁশঝাড় দেখিয়ে মা বলত, খবরদার, ওদিকে যাস নি। কিন্তু বড় বড় চোখে সারাদিন তাকিয়ে থাকতুম বাঁশবনের ঝুপসি ঝাড়ে। আপনি বাংলাদেশের ছেলে। জানেন নিশ্চয়ই বাঁশঝাড়ের হাওয়ায় কি এক 'আয় আয়' ডাক শোনা যায় অষ্টপ্রহর। লোকে শুনলে হাসবে, আমার মুখে কাব্যি ? কাব্যি নয়, এখনো কানে লেগে রয়েছে সেই ডাক। বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে দেখতুম ধু ধু

মাঠ। কে যেন আমাকে ডাকত ওই মাঠ থেকে। বিশ্বাস করুন। আমাকে ডাকত। লেখাপড়া করতে পারি নি। যেমনি পাখা গজাল, মানে একটু বয়স হল, অমনি পালিয়ে গেলুম মাঠের উপর দিয়ে। আস্তে আস্তে ভয় ভেঙে গেল। মাসী কাঁদত, মাসী আমাকে বেঁধে রেখেছিল। তারপর যেদিন মাসী ছেড়ে দিয়ে গেল সেইদিন, সেইদিন কে-ই বা তৈমুরলঙ্গ আর কেই-বা চেঙ্গিস খাঁ। বেরিয়ে পড়লুম দিগ্বিজয়ে। শুধু একজনের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম গিয়ে। সে ছিল আমার সোনার বাঁধন। মাসী ছিল রক্তের। জানেন তো, মানুষের ব্যাপার! রক্তের চেয়ে দামী সোনা। তাকে ছাড়তে পারলে যেন সব ছাড়া পেল। সে কোন কথাই বলে নি। শুনল, তাকাল, তারপর ঘাড় কাত করে জানাল, যাও। চলে গেলুম। কেন যাচ্ছি, কিসের দিগ্বিজয়, কিছুই জানতুম না। তবু বেরিয়ে পড়লুম। সেইদিনটি ছিল আমার বড় আনন্দের দিন, আর আজ ভাবি, কী ভয়ঙ্কর, কী সর্বনাশের দিন ছিল সেটি।'

আমি নিতান্ত বোকার মত জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

জিজ্ঞেস করতে করতেই তাকিয়ে অবাক হলাম। একি, এত অজস্র রেখা তাঁর মুখ-ভরতি!

যেন একরাশ শুকনো দগ্ধ বর্ণের তৃণকুটার মুখ একটি। চোখে ব্যক্ত অব্যক্ত যন্ত্রণা। বললেন, 'কেন? কেন নয়? কোন্ নিশি ডেকে নিয়ে এল আমাকে, এখন মাথা খুঁড়ে মরছি। ফেরবার জায়গা নেই, এগুবার জায়গা নেই, কোথায় ঘুরে মরছি! কেন এসেছিলুম, কোথায় এসেছিলুম, সব ভুলে গেছি। ঘুরছি শুধু গোলকধাঁধায়। শুনেছি অনেকে বেড়ায়, বেড়িয়ে লেখে ভ্রমণকাহিনী। আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে ওই বইগুলোকে। দু-চক্ষে নয়। ভ্রমণকাহিনী, সে আবার কি? দু-দিন বেড়ানো। তাহলে আমি কি? আমার এ কোন্ সর্বনেশে ভ্রমণ! শুকনো ঝরা পাতা উড়ছে পথে পথে। উঠছি পড়ছি, তারপর একদিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাব কার পায়ের চাপে। কী যে চাইলুম, আর কী যে পেলুম! বড় ভয়ঙ্কর নেশা ভাই, ভয়াবহ নেশা। ও-ই নিয়ে আবার লোকে বই লেখে?'

চুপ করলেন। মনে হল একটা তীব্র যন্ত্রণার সুর ঢেউ দিয়ে ফিরছে কানের কাছে। ভুলে গেলাম কুম্ভমেলার কথা। ভুলে গেলাম, কোথায় এসেছি। এ যে মাতালের ধিক্কারের কান্না। একদিন যা আকণ্ঠ পানে মাতাল করেছে, আজ তার-ই বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কিন্তু পথ কি মন্দ? ঘরছাড়া মানুষের সে যে তৃষ্ণার জল। যতক্ষণ সে

জীবনস্বরূপ, ততক্ষণ সে আনন্দ অশ্রুভরা। সে ব্যথার ব্যথী। অগতির গতি। নিঃস্বের সঞ্চয়। পথ না হলে চলব কোথায় ?

কিন্তু জানি নে, বুঝি নে, পথ কখন এমনি প্রতিশোধ নেয়! আর কী ভয়ঙ্কর তার প্রতিশোধ। সেই প্রতিশোধেরই এক-প্রতিমূর্তি যেন আমার সামনে।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নামটি কিন্তু জানা হয়নি।'

বলতেই আবার হাসি। উচ্চহাসি হেসে বললেন, 'নামটা ভাই বড় খারাপ আমার। এই বাউণ্ডুলে জীবনে সেটাও একটা ঠাট্টা। তাহলে আর একটু চা খেতে হয়।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।' বলে বয়কে ডাকবার আগেই উনি নিজেই সেই দক্ষিণী ভাষায় হুকুম করলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কখনো দেশে যান নি ?'

বললেন, 'বাংলাদেশে ? অনেকবার। তবে গাঁয়ে গেছি একবার।'

'মাত্র ?'

'হ্যাঁ। যুদ্ধের পর গেছলুম, সারাটি দিন ঘুরলুম, কেউ চিনতেও পারল না। গাঁয়ের হরে মুদী তেমনি বসেছিল দোকানে। শুধু গায়ের চামড়া তার ঝুলে পড়েছিল থলের মত। কী বলব ভাই, আমাকে দেখে বললে, 'কি মাংতা সাহেব ?' মনে মনে হাসলুম। বললুম, 'পোয়া ভর চিঁড়ে দাও, দো পয়সা কী গুড়।' সাহেবকে চিঁড়ে গুড় খাইয়ে তার ভারি আনন্দ। বললে, 'কার বাড়ি আসা হায় ?' বললুম, 'সোনার বাঁধান কি বাড়ি।' সে বললে, 'ও সোনারবেনে ? পশ্চিমপাড়ায় আছে বটে দু-ঘর। নাক কি বরাবর চলে যাইয়ে।' হাসিও পেল। দুঃখও হল। সত্যিই, সোনার বাঁধনের বাড়ি নাক বরাবরই বটে। গেলুম। গিয়ে দেখলুম, ভাঙা বাড়ি আর ঘন জঙ্গল। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা ভূতুড়ে বাড়ি। বুঝলুম, কেউ নেই। হয়তো আমার সোনার বাঁধন অন্য কোন দেশে আর কাউকে বেঁধেছে। তার চোখের দিকে তাকালে না বাঁধা পড়ে উপায় ছিল না। ফিরে গেলুম।'

আবার চুপচাপ। চা এল। এবার দুটি সিঙ্গল কাপ। বুঝলাম সে-ই যে গেলেন, সেই যাওয়া আজও শেষ হয় নি।

বললেন, 'যদ্দিন আছেন, আসবেন একটু-আধটু। একটু বকব প্রাণভরে, সে মানুষও পাই নে।'

বললাম, 'নামটা ?'

হেসে বললেন, 'ভোলেন নি দেখছি। হাসবেন না যেন। নাম আমার রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়!' বলে কী হাসি। হাসি আর থামতে চায় না। বললেন, 'কী আশ্চর্য বলুন তো, টো টো মোহন কিংবা বাউণ্ডেলে মোহন নাম রাখলেই ঠিক হত।'

স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, চা খেতে ঢুকে এমনি এক রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হবে। তাঁবুটার অন্ধকার তখনো কাটে নি ভাল করে। বাইরে বালুচরের আকাশ রুপোর পাতের মত ঝকঝক করছে। আর বসে থাকতে পারি নে। পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলুম।

রমণীমোহন গল্পের নায়কের মত বাধা দিলেন। বললেন, 'পয়সাটা ভাই পাওনা থাক, কাল দিয়ে যাবেন।'

বুঝলাম, আসবার জন্যই এই কথা। বললাম, 'যদি না আসি?'

'তা হলে একলা বসে বসে হাসব।'

অদ্ভুত কথা। দুজনেই হেসে উঠলাম। বললাম, 'কিন্তু ব্যবসা করতে বসেছেন। পয়সা না নিলে আসব কি করে?'

'ওটাই তো ফন্দী।' হেসে আবার বললেন, 'দোকানটি আমার এক মাদ্রাজী বন্ধুর। আড়াই হাজার টাকা দিয়ে দোকান নিয়েছি। বুঝতেই পারছেন অবস্থা। সকাল থেকে আপনি একমাত্র খদ্দের। তবে সে সম্মান আপনাকে দেব না। আমার আত্মীয়তাটুকুই মেনে নিতে হবে আপনাকে। কী ভাগ্যি আপনি এসেছিলেন। প্রাণে একটু হাওয়া লাগল। আসবেন, আসবেন। রোজ পয়সা নেব, আজকের দিনটি পারব না ভাই।'

বলতে বলতে উনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন আবার। আমার মুখের হাসিটি আড়ষ্ট হয়ে রইল। এই বিরাট সুপুরুষ চেহারার মানুষটির ভেতরের সেই ক্লান্ত অসহায় প্রাণটি কখন যে মন দিয়ে মন কেড়েছে টের পাইনি। যাবার সময় ওঁর এই গাম্ভীর্য খচ করে উঠল বুকের মধ্যে।

একসঙ্গে বাইরে এলাম। রমণীমোহন বলে উঠলেন, 'আঃ!'

দেখলাম, বুকটা ওঁর ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে। মাথাটি উঁচু করে তুলে ধরেছেন দূরের আকাশের দিকে। দু-চোখে মুগ্ধতা। বুঝলাম, নেশা লাগছে। বিষ এখনো মাঝে মাঝে অমৃত হয়ে ওঠে। খোলা আকাশ দেখলেই মন ছুটে যেতে চায়। বোধহয় ওইটুকুই এখনো প্রাণবায়ু হয়ে আছে।

বললাম, 'চলি।'

সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, 'মানুষের ভিড় একটু বেড়েছে দেখছি।

কাল পুর্ণিমা কি-না। স্নান রয়েছে।'

পথের মানুষ। বাইরের কথা ভুলতে পারেন না কিছুতেই। বললাম আবার, 'চলি।'

হাত ধরে বললেন, 'আসুন।'

খানিকটা গিয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। হাসি পেল, লজ্জাও হল। তবু বললাম, 'একটা কথা বলব?'

'একটা কেন, একশোটা বলুন।'

বললাম, 'কেন এসেছি বলছিলেন, না এলে আপনাকে দেখা হত না তো?'

বলতেই ওঁর ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠেই চকিতে ফেটে পড়লেন হাসিতে। হাসিটা তাকিয়ে দেখতে পারলাম না। ফিরে চললাম। শুনতে পেলাম, চীৎকার করে বলছেন, 'তাহলে এ যাত্রা আপনার নিস্ফল তীর্থযাত্রা। কুম্ভ আপনার শূণ্যই থেকে যাবে। হা হা হা…।'

উত্তরে হাওয়ায় ভেসে এল ওঁর হাসি। শূণ্য কুম্ভ আমার ভরবে কিনা জানিনে। কিন্তু হৃদিকুম্ভ যে ভরে গিয়েছে মানুষরসের স্বাদে। যে মানুষ দেখে দেখে স্বাদ মেটে না, সেই অতৃপ্তি উনি বাড়িয়ে দিলেন হাজার গুণ। এ বৈচিত্র্যের শেষ নেই, রূপের সীমা নেই। এ নামেরও মৃত্যু নেই।

হঠাৎ বুকে আমার আনন্দের সীমা রইল না। চারিদিকে মানুষ। বিচিত্র রংবাহার। কোলাহল, ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা, উর্ধ্বশ্বাস মানুষ। সকলে চলেছে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে। মনের মধ্যে বেজে উঠল সহস্র রাগিণী এক-ই তারের ঝঙ্কারে।

দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম পূর্বদিকে। বালি শুকিয়ে ঝুরঝুর করছে। তেতে উঠেছে এরমধ্যেই। শীতে বড় আরাম লাগছে তাতে। পূর্বদিকের সমুদ্রগুপ্তের টিলার দিকে চললাম।

একলা চলছি নে। শত শত লক্ষ লক্ষ চলেছে। যেন আমারই সঙ্গে চলেছে সবাই। যেন চলেছে আমারই পায়ে পায়ে, আমারই হৃদস্পন্দনের তালে তালে, ছায়া ফেলে আমারই হৃদয়-সরসী-নীরে। যেন সবারই ডাক পড়েছে আজ পূর্বদিগন্তে।

সত্যি, জনবন্যার ঢেউ বেড়ে উঠেছে অনেকখানি। একটি রাত্রের মধ্যেই সেই বন্যার গতি যেন চারিদিক থেকে পাক খেয়ে খেয়ে আবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয়। কোন্ দিক থেকে আসছে মানুষ, যাচ্ছে কোন্ দিকে, কিছুই ঠাহর করা যায় না।

সামনে উঁচু-নীচু বালুচর। এদিকে তাঁবুর সংখ্যা ক্রমে কমে এসেছে। কমে আসতে আসতে শেষ হয়ে গিয়েছে একেবারে। শুধু সাদা বালু। তার উপর দিয়ে মানুষের বন্যা এ সকালের বেলায় যেন ঘন অরণ্যের সারি হয়ে উঠেছে। টাঙ্গা ছুটে চলেছে। ছুটে নয়, ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এরই উপর দিয়ে, মানুষের ভিড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে প্রাইভেট মোটরকার। হাওয়ায় উড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বালি।

দেহ শীতার্ত। অথচ আকাশে আশ্চর্য মেঘ ও রোদের সমারোহ। সাদা মেঘের দল চলেছে নীল আকাশের আঙিনা জুড়ে। ছোট ছোট মেঘের টুকরো রোদের ছোঁয়া লেগে, তার ধারে ধারে খেলছে রূপালী ঝিলিমিলি।

ঝুসির গ্রাম থেকে নেমে আসছে উটবাহিনী। পিঠে তাদের কাঠের বোঝা। দূর থেকে দেখা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দুলতে দুলতে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আসছে গাধাবাহিনী। তাদের পিঠে শুধু কাঠ নয়। কাঠ, তরিতরকারি, ফল।

মানুষ পশু ও প্রকৃতির বিচিত্র সমারোহ। হাসি ও কলকোলাহল। অন্ধ সুরদাস চলেছে গান গাইতে গাইতে। তার ভাষা বুঝি নে। দরাজ গলায় তার ভৈরবী সুরের মধ্যে শুধু ঘর ছাড়ার আহ্বান। শুধু ডাক। এই ভিড়, কোলাহলের মধ্যেও সে সুরে কী বিচিত্র প্রসন্নতা। মুক্তি ও আনন্দের স্বাদে ভরপুর।

তাকিয়ে দেখি, শীত নেই অন্ধ সুরদাসের। খালি গা। ছিন্ন ময়লা উত্তরীয় বেঁধেছে কোমরে। রুক্ষ চুলের জটা উড়ছে বাতাসে। হাতের লাঠি-খানি ঘুরে ফিরে চারিদিক দেখে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে থামছে গান। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, সুরদাস হাসছে থেকে থেকে। ডাইনে বাঁয়ে দেখছে, দেখছে আকাশের দিকে! যেন সে সত্যি দেখতে পাচ্ছে। হাসছে, আর তার মাতৃভাষায়, গেঁয়ো টানে থেকে থেকে জিজ্ঞেস করছে, 'ওগো, শুনছো, ঠিক যাচ্ছি? পথ আমার ঠিক আছে তো?'

কেউ জবাব দেয়, কেউ দেয় না। কেউ বলে, অন্ধ কেন এ পথে? সে হাসে। হেসে হেসে আবার গলা ছেড়ে গেয়ে উঠছে গান।

আমি ভাবি আমারই পায়ে পায়ে চলেছে মানুষ। অন্ধ সুরদাসের উল্লাস দেখে মনে হল, সারা মেলা চলেছে ওরই পায়ে পায়ে। চলেছি যেন ওরই গানের সুরে সুরে।

চলেছি মনের বেগে, দেহের বেগে। তবু, আশ্চর্য! এ মনপবনের নায়ে

কোন এক নেয়ে যেন ক্লান্ত সুরে গান গেয়ে চলেছে আমারই পাশে পাশে। সে যেন গুন গুন করছে,

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে···

ও! মনের দিকে তাকিয়ে দেখি, রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় চলেছেন আমার সঙ্গে সঙ্গে। রেখে এসেছি, ছেড়ে আসতে পারি নি দেখছি। পারা কি যায়? সেই শৈশবের কেষ্টযাত্রার নিমাইয়ের সন্ন্যাসযাত্রার কান্না মনে পড়ছে। স্বামীসোহাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যাচ্ছে। নিমাইয়ের অঞ্চল তাঁর ঘুমন্ত শিথিল মুঠিতে চাপা রয়েছে। নিমাই সাশ্রুনয়নে ধরেছে গান,

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়?
যাই যাই মনে করি, যাইতে না পারি
মহামায়া আমার পিছনে ধায়॥

কে জানে, কাল যেতে পারব কি-না রমণীমোহনের কাছে। কে জানে, কোনদিন যেতে পারব কি-না! ঋণ? নিয়েছি, ভোগ করেছি মনোকষ্ট। কিন্তু সে ঋণে তো বাঁধেনি আমাকে সে! সে যে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বাঁধলে, সে যে ধরে রাখলে আমাকে মুক্তি দিয়ে।

তার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী, সংক্ষিপ্ততর তার সোনার বাঁধনের কথা। যে কাহিনীর তরী ভাসছে রক্ত আর অশ্রুর নদীতে! জানি, এ চলার পথে হারিয়ে যাবেন উনি। হারিয়ে যাবেন হয়তো সূর্যাস্তের আগে। তবু বুঝলাম, মন-সৈকতে আঁকা রইল যে রেখা, সে অদৃশ্যে ফিরবে আমার চলার পথে ক্লান্ত মেয়ের মত। তাকে তো আটকাতে পারব না!

ঝড় এল বালুচরে। একরাশ ভিখারী। যেন চৈত্র-ঘূর্ণির ঝরাপাতা, ফুটোফাটা। কোথা দিয়ে এল, কেউ জানে না, কেউ জানে না, এ ঘূর্ণি যাবে ঘুরতে ঘুরতে কোন পথের উপর দিয়ে, কাদের দলে মাড়িয়ে।

হঠাৎ আমরা একরাশ নরনারী পাগলা ঘূর্ণির আবর্তে যেন পথরুদ্ধ, বিব্রত অসহায় হয়ে পড়লাম। হে পুণ্যবান, দাও দাও। হে তীর্থযাত্রী, দাও দাও। হে দয়ালু, হে রাজা রানী, দাও দাও, দাও দাও, দাও দাও।

কিন্তু প্রতিবাদ নেই, ক্রুদ্ধ গর্জন নেই, হা হা করে বিতাড়ন নেই। সকলেই

বিব্রত তবু হাসিমুখর। দিই দিই, দেব দেব যা-আছে, তাই দেব। গতিক খারাপ। পকেটে হাত দিলাম। কোনরকমে একজনের হাতে তুলে দিলাম পয়সা।

দেবার পরমুহূর্তেই সেই হাসি। নিঃশব্দ, নিরালা, দুস্তর তেপান্তরের সেই একাকী পথিকের বুকে আতঙ্ক-ধরানো পাখির বিচিত্র তীব্র হো হো ডাক। সেই লাল জামা, আর পালতোলা ময়ূরপঙ্খী পাড়। তেপান্তরের সেই বন্য বিহঙ্গিনী।

সচকিত চোখে তাকিয়ে দেখি, একলা নয়। অনেক, একরাশ। ভিখারী নয়। ভিখারিনীবাহিনী। বেশভূষায় প্রায় সকলেই একরকম। তার মধ্যেই, ময়লা ছিন্ন শাড়ি ও জামার ভাগ-ই বেশী। রুক্ষ চুল, ধূলিধূসরিত মুখ আর লজ্জাহীন ছিন্ন পোশাক! সবচেয়ে আশ্চর্য! তার মধ্যেও সিঁদুরের প্রসাধন, জটায় শুকনো ফুলের সজ্জা। কারুর বুকজোড়া সন্তান।

তারই মাঝে ওই লাল জামা। দলের মধ্যে রয়েছে মিশে। তবু যেন কেমন করে আলাদা হয়ে উঠলো চোখের সামনে। বোধহয় চোখেরই দোষ। বুঝি দোষ মনের-ই। কে জানত, আবার পকেট থেকে পয়সা তুলে দিয়েছি তাকে। ছি ছি, কী কলঙ্ক। কী ভাগ্যি, নেই খনপিসী, পিসীর বাহিনী।

চোখ পড়তে দেখি, তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আবার ঠকেছি, বুঝি তাই। আবার ঠকিয়েছে, বুঝি তাই। দেখি, ঠোঁটের কোণে তার জয়ের হাসি। জয়ের মধ্যেই তো থাকে স্পর্ধা ও বিদ্রূপের ছোঁয়া। ঠোঁটের তীব্র বঙ্কিম রেখায় তার সেই দুর্জয় ছলনার হাসি। চাউনি দেখে চমকে উঠলাম। হেলানো ঘাড়, বাঁকা চোখে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আমাকে।

স্খলিত আঁচল পড়েছে লুটিয়ে বালুচরে। বাতাস থরথর কাঁপছে তার লাল জামায়, তার রুক্ষ চুলে, তার মেটে সিঁদুরের অস্পষ্ট এলোমেলো সিঁথিরেখায়, তার সর্বাঙ্গে। সব মিলিয়ে এই উন্মাদিনী বালুচরের আর-এক বেশ যেন দেখা দিয়েছে এই সর্বনাশী যাযাবরীর মধ্যে।

একে রূপ বলব কি-না জানি নে। কী রূপ বলব, বুঝি নে। একে রূপ বলতে বাধে। অরূপ বলতে সায় পাই নে মনে। এ রূপের খাদ নয়। অথচ মন ভরে উঠছে না অপরূপ বলে। একি ইস্পাতের তলোয়ার, নাকি রূপালী রঙের বাঁকা কাষ্ঠখণ্ড মাত্র?

মনের তলে আমার বিস্ময়ের ঘোর। যাযাবরী ভিখারিনীর চোখে মুখে এত আয়োজনই বা কেন? এত শাণিত দীপ্তি কিসের। করুণাপ্রার্থিনীর এ

নির্লজ্জ বহ্নি ছড়ানো কেন? একি শুধু যাযাবরী রক্তপ্রবাহেরই স্বভাব? নাকি, ঘরছাড়া মেয়ের সেই চিরাচরিত অভিশপ্ত জীবন পয়োনালীর ক্লেদ। অথবা, জীবন-প্রস্তরে ঘা খেয়ে খেয়ে প্রতি মুহূর্তে সে শাণিত ও দীপ্ত।

চোখ সরিয়ে নিলাম। লজ্জা হল, সঙ্কোচ হল মনে মনে। নিজেকে আমরা ভুলতে পারি না বোধহয় ক্ষণেকের তরে। সবাই বলেছে সে সর্বনাশী। শুধু সর্বনাশী। সর্বনাশেরই আয়োজন তার চোখে মুখে বেশে।

যে সব হারিয়ে, পথে এসে দাঁড়িয়েছে হাত পেতে, সর্বনাশের আগুন তো জ্বালাবেই সে। যার কিছু নেই, সর্বনাশের খেলা তো সাজে তারই।

তাকে ভিক্ষে দিচ্ছে কেউ কেউ যেচে। কত লুব্ধ চোখের পেছনে, ভিখারিনী হয়েও রানীর মত মাথা তুলে রয়েছে দাঁড়িয়ে। মাথা নুইয়ে অগ্রসর হলাম পথে। পথিকের স্বভাবসুলভ চাউনি দিয়ে অভিনন্দিত করতে পারলাম না তার দীপ্ত হাসিকে। সে মন নেই, সে সাহসও নেই।

ঘূর্ণি ঝড় এল, আবার চলে গেল। যেন সেই রূপকথার কাহিনীর আঁউ মাউ কাঁউ শব্দের মত ভিখারিনী-বাহিনী ছুটে চলল আবার। ওই শব্দের মধ্যে ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা। এ ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, ও একে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। পরস্পারের মধ্যে হিসেব হচ্ছে, কে কত পেয়েছে। ঝগড়া হচ্ছে, হাসছে।

সমস্তটা মিলিয়ে শোনাচ্ছে একটা ব্যস্ত ত্রাস আর্তনাদের মত।

কারা নিজেদের মধ্যে কথায় কথায় বলছে, হিন্দীতে বলছে, ভিখারিনীগুলো মারাঠার আওরত। জানি নে, কোন্ দেশের আওরত। কিন্তু এদের দেখেছি চিরকাল। দেশের মেলায়, বাজারে, শহরে। কলকাতার শহরতলীতে, শনি রবিবারে দেখেছি দল বেঁধে ঘুরতে।

বিদেশে বেড়ানো নাকি কপালে লেখা থাকা চাই। লিখে দেন নাকি কোন এক বিধাতা। জানি নে, কে সেই বিধাতা, যে ঘর-ছাড়ার বৈরাগ্যের তিলক এঁকে দেন কপালে। কিন্তু আমার পোড়াকপালে তো সে তিলক কোন দিন পড়েনি জানি। তবু কয়েকবার গিয়েছি নিকট ভারতের এদিকে ওদিকে। কিন্তু ওই জাতের মেয়েদের দেখছি সর্বত্র।

সেই চিরাচরিত চেহারা। চুল বাঁধার এদের কোন ছিরি-ছাঁদ নেই। তবু কেমন একটা রকম আছে। যা শুধু মানায় ওদের রুক্ষ জটায়। কাপড় পরার বিচিত্র ধরন। আমাদের ঘরের মেয়েদের আয়াসসাধ্য দেহসজ্জার চেয়ে ওদের ময়লা কাপড়ের অনায়াস বেষ্টনী তৈরী করে একটি বিচিত্র ছন্দ। আর কেন জানি নে, ওদের ধূলিমলিন কীটসমাচ্ছন্ন দেহে দেখেছি অটুট যৌবন।

ভাবি, আমরা কত সঞ্চয় করে বেরুই তীর্থযাত্রার পথে। মন্দিরে মন্দিরে ফিরি মাথা কুটে কুটে! ওরা ফেরে শুধু আমাদের পেছনে পেছনে, দুটো পয়সার জন্য। এত যে তীর্থক্ষেত্রের আনাচে কানাচে ঘুরে ফেরে ওরা, ভগবানের এক ছিটে পুণ্যও কি বর্ষিত হয় না ওদের মাথায়?

কোলাহলমুখর জনবন্যার সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে চলছিলাম, আর ভাবছিলাম এমনি এক দার্শনিক তত্ত্ব! আচমকা কানের কাছে হাসি শুনে থমকে গেলাম। আবার সর্বনাশী! পাশ দিয়ে, আঁচল উড়িয়ে তীরবেগে ছুটে গেল সামনের দিকে। কিছু ঠাহর করবার আগেই, চকিতে তার পালতোলা নৌকা আঁচলের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে উঠল দুই খর চোখের দীপ্ত তারা। তারপর নিরালা বনের পাখির ডাকের মত আকাশে উধাও হয়ে গেল হাসি। পেছনে তাকিয়ে দেখি, তিন-চারটি প্যাণ্ট-কোট-পরা আধাবয়সী মানুষ লুব্ধ উৎসুক চোখে লক্ষ করছে তার গতিবিধি।

পাশ থেকে কে বলে উঠল, 'হাসতি হ্যায়।'

ফিরে দেখি অন্ধ সুরদাস। আপন মনেই বলছে। তার লাঠি এসে ঠেকছে আমার পায়ের কাছে। চোখের দুটি সাদা পর্দা ঠেলে এসেছে সামনের দিকে। পর্দা দুটি কাঁপছে থরথর করে। আর হাসছে। হাসতে হাসতে আপন মনেই আবার বলে উঠল, 'হাসতি হ্যায় কৌন?'

বলে আবার হেসে উঠল নিজের মনে। যেন কথোপকথন করছে কারুর সঙ্গে। হাসতে হাসতেই আবার জিজ্ঞেস করে উঠল, 'রাস্তা তো ঠিক হ্যায়?'

জানি নে, এ শুধু তার কথার কথা কি-না। জানি নে, এ শুধু তার স্বগতোক্তি কি-না। তবু, বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ, রাস্তা ঠিক আছে।'

'ঠিক হ্যায়?' বলে সে আবার হেসে উঠল। সরল ও বোকাটে মনের অভিব্যক্তির মত সে হাসি। তবু যেন, সামান্য একটু বিস্ময়ের ঘোর তার গম্ভীর কণ্ঠে। একটু বা রহস্য ছোঁয়ানো। তেমনি হেসে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী, আপ-কা-রাস্তা ঠিক হ্যায়?' বলে সে হাঁ-করা হাসিমুখে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। রোদ লেগে সাদা পর্দা দুটি রুপোর মত উঠল চকচকিয়ে। যেন আকাশের বুকে পেতেছে কান। জবাব আসবে ওখান থেকে। জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেলাম। এ আবার কেমন প্রশ্ন? আমি রীতিমত চক্ষুষ্মান মানুষ। অন্ধকে বাতলে দিচ্ছি ঠিক পথের ঠিকানা। সে উলটে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমার ঠিক ঠিকানা? তবু কথা বলতে গিয়ে আটকাল। পথের ঠিক আছে কি-না কে জানে! কিন্তু এক কথায় তার জবাব দিতে পারলাম না।

বিশেষ করে ওই মুখের দিকে তাকিয়ে। আমার জবাব দেওয়ার আগেই সে হেসে উঠল। এই ভিড় ও কোলাহলের মধ্যে অপূর্ব শান্ত উদাস তার কণ্ঠস্বর। বলল, 'কোই নহি বতা সক্‌তা কিধর গয়ী সড়ক, কহাঁ গয়া রাস্তা। হ্যায় না বাবুজী?'

মনে মনে ভাবলাম, তবে কি সে নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করছিল শুধু? রাস্তা তার ঠিক আছে কি-না, এ শুধু জিজ্ঞাস্য নিজেকে। এত লোক চমকে ফিরে তাকে বারবার জবাব দিয়েছে, আর সে শুধু এমনি হেসেছে মনে মনে। তারপর আবার নিজেকেই বলল হিন্দীতে, 'বাবুজী, আমি তো অন্ধ। জন্মান্ধ! মায়ের পেট থেকে পড়ে এক-ই বুলি শিখেছি আমি, রাস্তা ঠিক আছে তো? সারা সংসার যখন চেঁচিয়ে বলে, সব ঠিক হ্যায়, তখন আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। সব ঠিক হ্যায়? দুনিয়ার সব ঠিক আছে? তবে আমি কেন সব কিছুর ঠিক পাইনে? বাবুজী, ওহিসে পুছা কি, আপ-কা-রাস্তা ঠিক হ্যায়?'

বলে আবার সে লাঠিটি চারপাশে একবার ঘুরিয়ে বলে উঠল, 'রাস্তা ঠিক হ্যায়?'

তারপর তার কম্পিত সাদা পর্দা দুটি ঠেকে রইল আকাশে। ওই ভাবেই সে এগিয়ে চলল আমার পাশে। আর ঘুমন্ত শিশুর দেয়ালা করার মত তার হাঁ করা মুখে কখনো হাসি, কখনো গাম্ভীর্য!

কে বলে উঠল, 'কা হো সুরদাস, গানা কাহে বন্দ্‌ কর দিয়া?'

সুরদাস বোধ হয় গানই ভাঁজছিল। আবার গান ধরল।

সামনে তাকিয়ে দেখি, পথ রোধ করেছে ঝুসির উচ্চ ভূমি। সেই উঁচু জমির উপরে, নীচে থেকে উঠে গিয়েছে সিঁড়ি, হঠাৎ বাঁক নিয়েছে বাঁদিকে। হারিয়ে গিয়েছে একটি বিশাল বটের আড়ালে। তার উপরে, মনে হল প্রাচীর-বেষ্টিত কেল্লা মাথা তুলেছে আকাশে। উত্তরাংশের কার্নিসবিহীন সরল প্রাচীর নীচের দিকে নেমে এসেছে। সেই প্রাচীরের গায়ে মস্ত একটি অন্ধ গুহামুখের গহ্বর। গহ্বরমুখ থেকে আর একটি সিঁড়ি নেমে এসেছে বালুচরে। সেই গুহা-মুখ থেকে পিঁপড়ের মত পিলপিল করে নেমে আসছে নরনারী! সিঁড়ির ধাপ, এমন এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে, চলন্ত নরনারীর বাহিনীকে দেখাচ্ছে যেন দূর-থেকে-দেখা ধীরগতি ঝরণার মত।

শুনেছিলাম, এটি সমুদ্রগুপ্তের কূপ। কিন্তু কূপ কোথায়? এ যে দেখছি, চারিদিক থেকে একটি সুরক্ষিত সু-উচ্চ গড়ের মত। হঠাৎ মনে হয় যেন এক সামরিক গাম্ভীর্যে ও কৌশলে এর চারপাশে গোপন রয়েছে

সমরায়োজন।

দুদিকের দুই সিঁড়ি দেখে বুঝলাম, দক্ষিণেরটি আরোহণী। উত্তরে অবতরণিকা। আরোহণীর মধ্যপথে ঝুরি-নামা প্রাচীন বটগাছ। ছায়া ভরে রেখেছে সিঁড়িতে। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই শত শত বছরের এই অশ্বত্থের ঝুপসী ঝাড়। মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত, উচ্চভূমির কোলে কোলে, ফাটলে, গর্তে সর্বত্র ছাপ প্রাচীনতার। কেবল সরল ও খাড়া প্রাচীরের রোদচমকিত সাদা রঙ যেন নতুনের ছোঁয়ায় ঝকমক করছে।

আমার পেছন থেকে অন্ধ সুরদাস জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী, সামনে টিলাকে সিঁড়ি হ্যায় না?'

টিলা? সমুদ্রগুপ্তের কূপ নয়? লোকের মুখে মুখেও একই কথা। সমুন্দর-গুপ্তের টিলা। কিন্তু এ অন্ধ কেন জিজ্ঞেস করছে? সে কি উঠতে পারবে?

বললাম, 'হ্যাঁ সিঁড়ি। কিন্তু, তুমি তো উঠতে পারবে না সুরদাস।'

সে একটু হেসে বলল, 'নহি সকেঙ্গে?' বলে ঘাড় তুলে তাকাল উপর দিকে। মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে-পড়া জিভ নাড়তে লাগল। যেন সে দেখতে পাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে, কত উঁচু। তারপর বলল, 'বাবুজী, এ তো আমার পহলী দফা নয়। আরো তো কত্‌নি দফা উঠেছি।'

বলে হাসল। হেসে ঘাড় ফেরাল ডাইনে বাঁয়ে। দেখল পেছনে। আবার বলল, 'বাপুজী, আপ চলা গয়ে?'

বললাম, 'না।'

যেতে পারছিলাম না। সে অন্ধ। কত অন্ধ দেখি পথে পথে। পথ চলতে তাদের সঙ্গে কথা বলিনে। তাকাই নে ফিরে। জিজ্ঞেস করলে জবাব দিই। দয়া হলে অন্ধ ভিখারীকে পয়সা দিই দুটো। ওই পর্যন্তই।

কিন্তু ফিরে তাকাতে হল আজ। তাকাতে হল এই কুম্ভমেলায় এসে। সুরদাস অন্ধ। কিন্তু তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি যেন চক্ষুষ্মানের মত। তার ওই আত্মভোলা হাসির মধ্যে কোথায় যেন আত্মগোপন করে রয়েছে এক গম্ভীর সচেতন, অভিজ্ঞ, সহৃদয় মানুষ। এক উদাস কৌতুক ও রহস্যের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যেন তার ভাবে-ভোলা মুখে। আমি তাকে দেখছি। কথা শুনে মনে হয়, আমাকে সে তার চেয়ে বেশী দেখছে।

সে তেমনি হেসে বলল, 'বাবুজী, বোলি হ্যায় সব-কি, চঢ়না মুশকিল, উতারনা সরল। মগর, হম্ তো অন্ধা বাবুজী। জনম সে অন্ধা। হমকো চঢ়না সরল, উতারনা মুশকিল।'

বলে সে হাসল আবার ঘাড় কাত করে। এমন হাঁ-করা হাসি যে তার মুখগহ্বরের মধ্যে আলজিভটি পর্যন্ত নড়তে দেখা যায়।

কিন্তু অবাক হলাম তার উলটো কথা শুনে। চিরকাল তো শুনে আসছি উঠতে পারলে নামা যায়। উঠতে পারে ক'জনা, 'ওঠাই তো কঠিন সুরদাস। নামতে পারে সবাই।'

সে বলল, 'হবে হয়তো বাবুজী, আপনার আঁখ বন্ধ করে দিই। ধরিয়ে দিই রাস্তা। আপনি চড়ে যেতে পারবেন। কিন্তু নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়বেন। তাই নয়? একবার শোচিয়ে বাবু আঁখ বন্দ্ করকে।'

বলে সে দুটি ঘষা পাথরের মত চোখ নিয়ে তাকাল আমার দিকে। হাসি চিকচিক করছে তার ওই ঘষা পাথরে।

কিন্তু চোখ বুজে তো নামিনি কখনো। ভাবব কেমন করে। আমি এক শহুরে বুদ্ধি-অভিমানী মানুষ নীরবে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। এ অন্ধ আমাকে বলছে ওঠা-নামার কথা।

সে আড়-মাতলার মত হাসল মাথা নেড়ে। ডাকল যেন কোন সুদূর থেকে, 'বাবুজী।'

বললাম, 'বল।'

'ওইশা শোচ্না বড়ি মুশকিল, হ্যায় না?' বলে ঘাড় নেড়ে গুন গুন করে উঠল, আঙুল দিয়ে তাল ঠুকল নিজের লাঠিতে। কী বলল, গানের কথায় বুঝতে পারলাম না। তবে তার ঘাড় দোলানি দেখে বুঝলাম, নিজের বক্তব্যের অর্থ বোঝাচ্ছে সে কোন এক সজনীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে। তারপর বলল, 'বাবুজী চড়কে উচা যো মিলি হাতমে, উতরানে কি বখত রাখো সামালকে। নাহি তো, ও গর্ যায়েগী, চুরনা বেকার হোগী। কেঁও কি, তুম তো অন্ধা হ্যায় না?'

'অন্ধা, তুমকো রো'নে পড়েগা!'

মনে করলাম, এ বুঝি শুধু অন্ধেরই বেদনা। দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ কেমন করে তা অনুভব করবে।

বললাম, 'তাই হবে হয়তো, সুরদাস।'

সে বলল, 'সায়েদ নহে বাবুজী, সচ্চা। মহাপুরুষ লোক উজান চলে আপনা সাধনপথে। কাঁহে? পাপের দরিয়া বয়ে চলেন তিনি পুণ্যের উজানে। মগর বাবুজী, দরিয়া বয়ে কে নামে আপ্না সাধনপথে? নীচের পথকে হর্ আদমি ডরতা। পাপ ঔর মরণের মায়া তো হ্যায় ওহি রাস্তার কিনারে কিনারে।

তবে ? হুঁশিয়ার সে চড়ো, মগর উতারো জায়দা হুঁশিয়ারসে। সহজ ভেবে যদি সহজে নামো সজনী, তবে তোমার পা পিছলে কোথায় চলে যাবে, হারিয়ে যাবে কোথায়। গর্দা পড়বে তোমার সারা গায়ে, আর অন্ধ সংসার তখন হাসবে ধিক্কার দেবে তোমাকে।'

সহজ সমজ্‌কে মৎ চলিহো সজনী,
রাস্তা বহুৎ টেঢ়া হ্যায় ॥

'বাবুজী ক্যায়া হম গলত্‌ বতায়া।'

অন্ধকারের ঘূর্ণি জলরাশি যেন, আচমকা আলোর মাঝে নির্মলরূপে টলমল করে উঠল। সত্যি, পদস্খলিত মানুষ যখন নামে, মৃত্যু ওত পেতে থাকে তার জন্যে। প্রাণের জিনিস মুঠোয় নিয়ে যখন শিশু নাচে, তখন-ই তো কোন ফাঁকে সব হারিয়ে তার কান্না আসে। মানুষ উঠতে গিয়ে পড়ে না। নামতে গিয়ে পড়ে। পড়বেই তো। নামবার পথে টান যে বেশী। আনন্দে অধীর পদযুগল যে তখন শিথিল ছন্দে চলে নেচে নেচে।

চোখ থাকতে বুঝলাম না। বুঝতে হল অন্ধের কাছে থেকে। তাকিয়ে দেখি, তার সারা মুখ আলোময়। আলো তার অন্ধ চোখে, মুখে, তার পাথরের মস্ত শক্ত চওড়া বুকটিতে উজ্জ্বল বর্মের মত ঝলকিত রোদ! রূপ-অন্ধ চোখে আমি তাকিয়ে রইলাম অন্ধ জীবনসন্ধানীর দিকে।

সে বলল, 'বাবুজী, গোঁসা তো করলেন না আপনি?'

গোঁসা? রাগ করব তার উপরে? কেন? বললাম, 'রাগের কথা তো তুমি কিছু বলোনি সুরদাস?'

সে হেসে বলল, 'সচ বাবুজী? আমি মূর্খ। আমার কথায় সবাই হাসে, গোঁসা করে। বাবুজী, দুনিয়া অন্ধ, সবসে বড়া অন্ধা হাম্‌। সেই জন্যেই তো বারবার বলি, রাস্তা তো ঠিক হ্যায়। সোচ্‌ বুঝকর চলো সজনী। রাস্তা তো ঠিক হ্যায়?'

বুঝলাম, অন্ধ যা-ই বলুক, যে রাস্তার জন্য তার অত জিজ্ঞাসাবাদ, তা নিশ্চয়ই ভগবানের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাস্তাটা কিসের সুরদাস? ভগবানের?'

সুরদাস বিনয়ে হাতজোড় করে যেন ক্ষমা-চাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াল নুয়ে। বলল, 'বাবুজী, ভগবান কে, তা তো আমি জানি নে। দুনিয়া অন্ধকার। আমি আলো খুঁজে ফিরছি। বাবুজী, আপনি কী খুঁজছেন, সে তো আপনি জানেন। আর রাস্তা? হাজারো রাস্তা পড়ে আছে। কোন্‌ রাস্তা ধরবেন,

সে তো জানে আপনার মন। যব্ মন ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় রাস্তা।'

বলে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ বলল, 'বাবুজী, লকরী কা দুকান হ্যায় না এহাঁ?'

দেখলাম, সত্যি, একটি জ্বালানী কাঠের স্তূপ রয়েছে অদূরে উত্তরে। স্তূপের উপর দুটি কিশোর-কিশোরী দিব্যি গা এলিয়ে দিয়ে রয়েছে পড়ে। বোধহয় রোদ-পোহানো হচ্ছে। বললাম, 'আছে। কি করে বুঝলে?'

'হাওয়াসে লকরীকে বাস আতি হ্যায়। হম্‌কো থোড়া নিশানা দিজীয়ে বাবুজী, হম হুয়া হি বৈঠেঙ্গে।'

বললাম, 'কেন? তুমি ওপরে উঠবে না?'

সে বলল, 'নহি।'

হাত ধরে তাকে কাঠের স্তূপের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। দিয়ে বললাম, 'তুমি কেন এসেছ সুরদাস এই ভিড়ের মেলায়? তোমার তো কষ্ট হবে।'

চলতে গিয়ে দাঁড়াল সে। বলল, 'বাবুজী, ঘর ভি অন্ধার, বহার ভি অন্ধার। তখলিফ হর্ জায়গা'পর। তব্ আনন্দ কাঁহা হ্যায়।'

বলে সে লাঠি ঠুকে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ ভাবি নি। এখন তার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করলাম সতর্ক দৃষ্টিতে। যদি হোঁচট খায়। কিন্তু সে ঠুক ঠুক করে গিয়ে বসল ঠিক কাঠের গাদার নীচে উষ্ণ বালুতে। বসে ফিরল আবার এদিকে। মুখে সেই হাসি। যেন আমার দিকে ফিরে তাকাল বিদায়ের হাসি নিয়ে।

ঘরে ও বাইরে যার অন্ধকার, সর্বত্র যার নিরানন্দ, তার আনন্দ কোথায়? সে কি শুধু এই পথের পরে পথে, পথচলার মধ্যে? টিলাতে ওঠবার সিঁড়িতে পা দিয়ে থামলাম। তাই তো, একটি পয়সাও দিলাম না সুরদাসকে। কিন্তু সেও তো চায় নি। ফিরে দেখি, সে ওই কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে হাসি ও গল্পে মেতে উঠেছে। আর আশ্চর্য! কিশোর-কিশোরী দুটি দিব্যি তার দুপাশে এসে বসেছে। হাত তুলে দিয়েছে সুরদাসের ঘাড়ের উপর। আর সুরদাস যেন সদা হাস্যময় একটি আনন্দের প্রতিমূর্তি। শিশুদের সঙ্গে খেলায় মাতা, ওই কি তার আলো খোঁজা?

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম উপরে। উপরে উঠে সামনে পেলাম একটি পরিষ্কার চত্বর। বাঁয়ে কয়েকটি ছোটখাটো খুপরি। মন্দিরের গম্বুজের মত সাজানো রয়েছে সেই খুপরির মাথা। ভিতরে সিঁদুরলেপা ছোট ছোট পাথরের নুড়ি। শুধু নুড়ি নয়। ছোটখাটো পাথরের মূর্তিও আছে। কারুর হাত ভাঙা,

পা ভাঙা। মুখ ভেঙে গেছে অনেকের। বুঝলাম, বছরের পর বছর এসব খুপরির পাথরের দেবতারা থাকেন নিরালায় ঘুমন্ত, উপবাসী। মরসুম এসেছে, তাই ধোয়া পোঁছা হয়েছে। প্রতি খুপরির পাশে বসেছে পাণ্ডারূপী শিখাধারী ব্রাহ্মণ। পরিচয় পাড়ছে দেবতার। দান-ধর্মের উপরোধ চলেছে রীতিমত গলা ছেড়ে। আর তীর্থযাত্রীর পয়সা ঝুন ঝুন বেজে উঠছে খুপরি-ঘরে।

বালুচর থেকে উঠে এলাম এক ছায়াচ্ছন্ন গ্রামে। গ্রাম-ই তো। ঝুসি গ্রাম। প্রতিষ্ঠানপুর। প্রাচীন বৎস দেশ। কিন্তু এখানে কোথায় সমুদ্রগুপ্তের কূপ?

বাঁদিকে পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, গৃহস্থের বাসভূমি। ডাইনে গভীর খাদ। খাদের ভিতরে ঘন জঙ্গলে বাসা বেঁধেছে অন্ধকার। নীচে থেকে সোজা উঠে এসেছে একটি নাম-না-জানা গাছের সবুজ শির। হাত দিয়ে তার পাতা ধরা যায়। এ শীত রুক্ষ ঋতুতে এত দাক্ষিণ্যে কে ভরে দিল সারাটি গাছ! এই কি কূপ?

উঁকি দিলাম। খাদের মধ্যে মানুষের ছায়া। গুঞ্জন ও কলকাকলী। কী ব্যাপার? লক্ষ্য করে দেখলাম, খাদের গায়ে একটি সরু রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে পিল পিল করে চলেছে মানুষের স্রোত। স্রোত গিয়ে ঢুকেছে একটি অন্ধ সুড়ঙ্গে। তাহলে ওই কি কূপ? কিন্তু যাওয়ার পথ কোথায়?

মুখ তুলে তাকালাম খাদের ওপরে, দক্ষিণ দিকে। ওপারেও একটি বাড়ি। পুরনো বাড়ি, গায়ে তার মেরামতের তালি। সেদিকেও চলেছে জনস্রোত। সামনে তাকিয়ে দেখি, উঁচু টিলার মাটি গিয়ে ঠেকেছে পুবের আকাশে। ওই দিক দিয়েই ঘুরে চলেছে সবাই দক্ষিণ দিকে। পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে ভেসে গেলাম পথের স্রোতে। এমনি করেই পথ। একজন চলে গিয়েছে কবে। তারই পায়ের দাগে দাগে আর-এক জন, তারপর শত শত লক্ষ লক্ষ। পথের পরে পথে, নতুন থেকে নতুনের সন্ধানে। জানি, যাচ্ছি নে কোন্ নতুনের সন্ধানে। পথও নতুন নয়। কিন্তু পুরনো পথে আমি তো নতুন। আমার যে সবই নতুন।

পথের ধারে ধারে, দলে দলে সাধু। অপলক চক্ষু আর গম্ভীর মুখ। নজরটি তীর্থযাত্রীদের মুখের দিকে। কোথাও কাঠের আগুন আর গঞ্জিকা-সেবন চলেছে। তীর্থযাত্রী ও যাত্রিনীরা কেউ কাছে বসছে আবার বসছেও না।

হঠাৎ দাঁড়াতে হল। ভয়ঙ্কর ভিড়। সামনে সেই পুরনো ভাঙা বাড়ি। একটা নয়। কয়েকটি ঘর। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে ছড়িয়ে। সবই

ভাঙা, পুরনো, নোনা-ধরা। চোখে ভেসে উঠল, ঘোষপাড়ার দোলমেলার ছবি। কাঁচরাপাড়ার ঘোষপাড়া। তবে তফাত আছে অনেকখানি। সেখানে চলে খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তন ও নামগান। মেয়ের দল গায়। পুরুষের দল গায়। আবার ওরই মধ্যে, কোথাও ভাঙা হারমোনিয়ামের ভাঙা সুর। তার চেয়েও ভাঙা হাঁফ-ধরা রুগ্ন মেয়ের সরু গলায়, 'পীরিতের রীতি না বুঝিলেন গো সখী' গান। চোখের কাজলের চেয়ে কালো তার চোখের কোল। হারমোনিয়ামের সাদা রীডের চেয়েও সাদা তার শীর্ণ আঙুলের নখ। বাংলার দূর জেলার গ্রাম্য বাবুরা দাঁড়িয়ে বসে বাহবা দেন! পকেট থেকে গুনে গুনে পয়সা তুলে দেন তাঁরা। হাল আমলের কথাই বলছি।

সেখানেও এমনি পুরানো বাড়ি রয়েছে কয়েকটি। ভাঙা বাড়ি। কোনটিতে সতীমায়ের স্মৃতি। কোনটিতে বাবার।

কিন্তু এখানে গান নেই। হারমোনিয়ামের শব্দ নেই। নেই ভাঙা বন্দরের বারবনিতার আসর। পূর্ণিমার রাত্রে ঘটা করে ফাগ মাখানো, খাওয়ানো আর ভয়াবহ উৎসবের মাতামাতি। এখানে ব্যস্ততা, ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা। যানে দো বাবুয়া। যেতে দাও, দেখতে দাও, দর্শন করতে দাও। আর সমতল থেকে অনেক উঁচুতে, ঝরাপাতা আর পুরনো ইঁট ছড়ানো, ছায়া-ভরা ও তীর্থাঙ্গন বিষণ্ণ ও উদাসীন। একই সঙ্গে উদার ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ ও বহু কণ্ঠের আরাধনা আহ্বান ও হাসি। এ যেন অনেক বিশাল। আলোর ছড়াছড়ি চারিদিকে। আকাশ যেন হাতের কাছাকাছি। আর বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর বেশ নরনারী, তার ভাষা, তার রূপ।

বুঝলাম, কোন দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন এখানে। তাই ঠেলাঠেলি ও ভিড়। ভাবছিলাম, ভিড় ঠেলে ঢুকব কি-না। কে যেন জাপটে ধরল পেছন থেকে। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম শুধু একখানি বহুরঙে রঙিন ছাপা উড়নি। অবাক হয়ে মানুষকে দেখবার জন্ম কষ্ট করে ফিরতে হল। ক্লান্ত কম্পিত একজন মাড়োয়ারী বৃদ্ধা। পোশাক দেখে আমার মনে হল তাই। বেচারীর ঘাড়ের উপর মাথাটি পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপছে। স্তিমিত দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। শনমুড়ি সাদা চুলে সোনার টিকুলি। গলায় ভরি দশেকের একটি সোনার হার নয়, শিকল বিশেষ। চোপসানো গাল, দাঁতহীন মাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে জিভ। সর্বাঙ্গে আবিরের মত ধুলো ছড়ানো।

আমি যে মানুষ, সেটা বোধহয় খেয়াল-ই নেই। যেন পাথরের মাঝে একখানি খুঁটি ধরে বুড়ি টাল সামলাচ্ছে, বিশ্রাম করছে। সরতে গেলে পড়ে

ঝরবে। কিন্তু আর-কিছু না হোক, বৃদ্ধা যা ভারী, তাতে আমাকেই টাল সামলাতে ব্যস্ত হতে হচ্ছে। কিন্তু বলব কাকে? যাকে বলব, সে তো ফিরেও দেখছে না। দু-হাতে জাপটে রয়েছে ধরে। আর আশ্চর্য! এমন একটা ব্যাপারের প্রতি এ ভিড়ের ভ্রূক্ষেপও নেই।

কয়েক মিনিট পর বৃদ্ধা হঠাৎ মুখ তুলল। তার মাথাটি দ্বিগুণ জোরে নড়ল ঠকঠক করে। চোখ দুটি গেল বুজে, মুখটি হাঁ হয়ে বেরিয়ে পড়ল দাঁত হীন মাড়ি। এর নাম হাসি। সত্যি, যেন এক অনির্বচনীয় সুধা ঝরে পড়ল সারাটি মুখে। তারপর দু-হাত দিয়ে আমার মুখে মাথায় বুলিয়ে দিল হাত। দিয়ে আবার হাঁপাতে হাঁপাতে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

বুঝলাম আমার কাজ ফুরিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে না গিয়ে, পুবদিকে এগিয়ে গেলাম। দক্ষিণদিকে ভাঙা পাঁচিলের বেষ্টনী, পুব ও উত্তরে পাতা-ঝরা গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দিচ্ছে উঁকি। কিন্তু ওসব দিকে মানুষের বড় আনাগোনা দেখছিনে। সকলের ঠেলাঠেলি, মাথা কোটাকুটি মন্দিরের দরজায়।

দক্ষিণের ভাঙা পাঁচিলের উপরে উঁকি মেরে নীচে দেখলাম মানুষের স্রোত। কিন্তু এমনভাবে নেমে গিয়েছে টিলায় ঢালু জমি, এত তার চার পাশে ছোটখাটো সুড়ঙ্গ, যেন ভেরী বেজে উঠলে এখুনি তীরধনুক হাতে বেরিয়ে পড়বে শত শত সৈনিক। পুবদিকে গেলাম। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূর সমতলে অড়হরের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। উত্তর দিকের সমতলে এদেশীয় গ্রাম। আমাদের বাংলা চোখে কেমন যেন শ্রীহীন ঠেকে এই গ্রামগুলি। গ্রাম নয়,যেন বস্তি। খোলা-ছাওয়া চালাঘর। কোথাও বেড়া ও পাতার ছাউনি নেই। একটি হিন্দী প্রবাদ আছে,

ছাজা বাজা কেশ।
তিনো মিল্‌কে বাংলা দেশ॥
চিনি.........দহি।
বাংলামে নহি॥

কতখানি সত্য জানি নে। তবে, ঘরছাওয়া ও বাংলাদেশের ঢাকের বাজনা, এর সঙ্গে পাল্লা চলে না। আর এদেশের তুলনায়, বাঙালীনীর কেশ রচনা সেকথা বলতে হয় না রূপদর্শীকে। সেই কবরী-বন্ধনে-বাঁধা বাঙালীর মন ও হৃদয়-গাছের ফাঁকে ফাঁকে, ওই সমতলের গ্রামেও দেখছি ভিড়ু।

গ্রাম দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম। সামনেই একটি থোকা থোকা ফুলে-

ভরা সজনে গাছ। নিজের দেশের গাঁয়ের পথে এর ছড়াছড়ি। কিন্তু এখানে সজনে-সুন্দরীর এ বিচিত্র অঙ্গসজ্জা দেখে ভরে উঠল চোখ। ভেতরে আমার খুশি-বিশাদের ছায়া। মনে হল কত যুগযুগান্ত না জানি আছি দেশ ছেড়ে। সেই বিরহ আমার ঘোচাল এবং বাড়াল এই ফুল সজনে।

সাদা সাদা ফুল। বোঁটায় তার কাঞ্চনবর্ণের ছোঁয়া। সোনা-রুপোর অজস্র ঐশ্বর্যে যুবতী সজনে হাসিতে খুশিতে তুলেছে মাথা। তারি মধ্যে নবীনার লাজে ভয়ে সর্বাঙ্গ তার কিছুটা বা নম্র। হাল্কা গন্ধে ভরে উঠেছে তার চারপাশ।

চমক ছিল আরও। সজনের নরম ডাল কেঁপে উঠছে থরো থরো করে। ফুল পড়ছে তলায়। উপুড় হয়ে ফুল কুড়োচ্ছে এক রক্তাম্বরী। কুড়োচ্ছে আর ভরছে কোঁচড়ে। ব্যাকুল হাতে কুড়োচ্ছে যেন পড়ে যাওয়া অমূল্য ধন।

দেখতে দেখতে দেখলাম। চোখ ফেরাই-ফেরাই করেও দেখতে হল। রক্তাম্বরীর যে বাঁয়ে আঁচল। আঁচল বেঁধেছে কোমরে। যাকে বলে গাছ-কোমর। বাঙালিনী? এ যে বাংলা-গাঁয়ের পাড়ায় এসে পড়েছি।

মুখ তুলল রক্তাম্বরী। সর্বনাশ। এ যে সত্যি করালরূপিণী রক্তাম্বরী। কালো মেয়ে। মেয়ে নয়, কালো বউ। না বউ নয়, আর-কিছু। মাথায় তার ঘোমটা নেই। এলানো রুক্ষ চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে কোমরের নীচে। কাঁধ-হাতা দৃষ্টিকটু লালজামা। নিরলঙ্কার দেহ। গলায় মালা রুদ্রাক্ষের। অস্পষ্ট সিঁথি লেপা সিঁদুরে। বাংলা সিঁদুরে। খাটো আঁটো শক্ত দেহ। বয়স অনুমান করা কঠিন। কিন্তু চোখ দুটি প্রকৃত রক্তাম্বরীই বটে। জন্মের সময় কেউ বুঝি ফালা ফালা করে কেটে দিয়েছিল ওই চোখের ফাঁদ। নইলে অত বড় চোখ হয় কখনো? এ যে পটে-আঁকা কালীর আকর্ণবিস্তৃত চোখ।

ঘাড় ফিরিয়ে ওই বিশাল নিষ্পলক চোখে তাকাল সে আমার দিকে। অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তার কৌতূহল ও বিস্ময়। নাকি ক্রোধ ও সন্দেহ, বুঝতে পারলাম না।

ওদিকে কোলাহলের গুঞ্জন। আর এখানে, এই ঝরাপাতা-ছাওয়া, টিলার বনভূমি হঠাৎ যেন আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে রইল চোখের চাউনিতে! চকিতে মুহূর্তে চারদিক নিঃশব্দ, স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ কোন বনবিহারিণী কপালকুণ্ডলা পড়ল আমার চোখের সামনে! ঠোঁটে নেই তার বিচিত্র হাসি, ভ্রূ-লতায় নেই ব্রস্ত আহ্বান। কিন্তু এখুনি কি টিলাভূমির এ নিঃশব্দ বনাঞ্চলটুকু আচমকা বিস্ময়ে শিউরে উঠবে এ যুগের

কপালকুণ্ডলার কথায়, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

কিন্তু ঘুমন্ত বনানীর স্বপ্নভঙ্গের মত শোনা গেল না সেই বিচিত্র কণ্ঠস্বর। উত্তরপ্রদেশের টিলাভূমি উঠল না শিউরে কুম্ভমেলার এই কপালকুণ্ডলার নতুন উপাখ্যানে, তার আগেই কাপালিকের প্রবেশ।

'নমস্তে বাবুজী, নমকস্ত হই। কাঁহাসে আসতা হ্যায়?'

আসতা হ্যায়? ঘোর বাঙালী। পেছন ফিরে দেখি, রক্তাম্বরী। কালো মুখে আপ্যায়নের বিকট হাসি! লাল ধুতি, লাল চাদর। খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি ও লাল চক্ষু। তাও আধবোজা, কিন্তু উজ্জ্বল। মাথায় পাগলের মত জট-পাকানো চুল। ওজন বোধহয় মণখানেক। গলায় রুদ্রাক্ষের বোঝা।

বলতে গেলাম, 'তুমি?' মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'আপনি?'

আধবোজা লাল চোখ বিস্ফারিত করে বলল সে, 'আজ্ঞে, আপনি বাঙালী? মানে, দেশের মানুষ?'

তা বটে। আমি যে এ যুগের প্যাণ্ট-অলেস্টার-শোভিত আধুনিক নবকুমার। কাপালিকদের নিশ্চয় ওতে বিলক্ষণ ভয় আছে। আমার জবাব শোনবার আগেই সে জবাব দিল। জোড় হাতে, নত হয়ে বিনয়ে গলে পড়ল, 'আজ্ঞে আমার নাম অদ্ভুতানন্দ ভৈরব। লোকে বলে ভূতানন্দ, নয়তো আজ্ঞে, ভূত-বাবা। আমি কালী সাধক ভৈরব। নিবাস ছিল যশোরে। পাকিস্তান হয়ে গেল, ধর্ম রক্ষে হয় কি না-হয়, সেই ভয়ে আজ্ঞে এখন চব্বিশ পরগণায় বারাসতে আশ্রম করেছি। উনি, আজ্ঞে ওই মেয়েমানুষটি, আমার ভৈরবী। বড় আশা ছিল মনে প্রোয়াগে তীর্থদর্শন সাধন-ভজন করব। দিলাম আজ্ঞে পাড়ি জয় মা কালী বলে। সে যাক। আজ্ঞে আপনের নিবাস?'

যাক কথা তাহলে থামল ভূতানন্দ ভৈরবের। কথা তো নয়, যেন 'আজ্ঞে' সম্বোধনের মালা গাঁথা। কালীসাধক, কিন্তু কথায় দেখছি হায় মানে বৈষ্ণব। বোধহয় যশোহরের হরিবংশের রক্ত আছে দেহে।

ওদিকে ভৈরবী নির্বিকার। সে ব্যস্ত ফুল কুড়োতে। বোধহয় নবকুমার থেকে আশ্বস্ত হয়েছে ভৈরবের দর্শনে! জবাব দিতে গেলাম। তার আগেই ভূতানন্দ বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই, আজ্ঞে, কলকাতায় আপনার বাড়ি?'

বললাম, 'কাছাকাছি!'

হাত জোড় করেই বলল, 'তবে আসেন আজ্ঞে, আমার আশ্রমে একটু ধুলা দে যান।' তবে মানে কলকাতার কাছাকাছি বলে? তাছাড়া এখানে আবার আশ্রম কোথায়? তার উপরে ভূতানন্দের আশ্রম। ভয় অবশ্য নেই।

শত হলেও আধুনিক কাপালিক তো বটে। বলি দিতে পারবে না।

গেলাম তাদের সঙ্গে। অদূরে গাছের মাঝখানে হোগলা দিয়ে ঘেরা ঘর। সামনেটি ঝাঁটপাট দেওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চারপাশে শুকনো পাতার ডাঁই। ভূতানন্দ ভৈরবের আশ্রম। হোগলার মাথায় আবার একটি লাল কাপড়ের কালি নিশান। চালার ভিতরে একটি টিনের রঙ-ওঠা স্যুটকেশ, অ্যালুমিনিয়ামের থালা দু-একটি। কম্বল-বিছানো বিচালি শয্যা।

ভূতানন্দ তাড়াতাড়ি কম্বলের ছেঁড়া টুকরো দিল পেতে। বলল, 'বসেন আজ্ঞে, মন খুলে একটু ধর্মের কথা কই। রাতে আজ্ঞে ভল্লুকের ভয় করে, দিনের বেলা কেউ মাড়ায় না এদিকে। আর বাঙালী আসে কি না তাও জানি নে। যত পাঞ্জাবী আর মাড়োয়ারী, কি বলব আজ্ঞে আপনাকে, যথার্থ জোয়ান জোয়ান মেয়েমানুষ, মহা মহা সব সুন্দরীও বটে, আমার আশ্রমের চারপাশে সব, কী বলব, একেবারে দিনমানে, কী বলে, একেবারে ইয়ে করতে বসে। আমি সেরকম মানুষ নই আজ্ঞে, তাই। নইলে পরে আজ্ঞে, খ্যাকাড়ি দিলেও শোনে না; অথচ, আমার এখানে না হলে সাধনা চলে না। যাক্, আপনি যখন এসেছেন—'

কথা তার থামল। বুঝলাম, তখন আজ্ঞে, আসুন একটু ধর্মালোচনা করা যাক। কিন্তু আমার মুখে যে ধর্মের বুলি ফুটবে না।

এদিকে ভৈরবী একটি অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে পা ছড়িয়ে বসল অদূরে। কোঁচড় থেকে ঢালল সজনেফুলের গোছা। তারপর বিশাল চোখ দিয়ে আগে দেখল আমাকে, তারপর তার ভৈরবকে। মনে হল একটু যেন ফুলে উঠল নাকের পাটা, ওই চোখেও বা একটু অগ্নিঝলক।

ভৈরবীর চোখে মুখে, গায়ে পায়ে, বসায় নড়ায় একটা আসন্ন দুর্যোগের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে যেন। ভৈরবী যখন, তখন চোখে কিঞ্চিৎ অগ্নিঝলক থাকাই হয়তো স্বাভাবিক। পাকানো পাকানো ভাবটিও অস্বাভাবিক নয় হয়তো। কিন্তু ভাব-ভঙ্গিটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।

কিন্তু ভূতানন্দের সেদিকে খেয়াল নেই। সে দিব্যি জমিয়ে বসে বলল, 'আচ্ছা দাদাবাবু—'

দাদাবাবু? ভূতবাবা দেখছি আত্মীয়তাতেও দুরন্ত। বুঝলাম, ধর্মালোচনার ভূমিকা বিস্তার করা হচ্ছে। কিন্তু ভূতানন্দের গোল রক্ত চোখের ভাবটি যেন, আটঘাট বেঁধে পাতা হচ্ছে কোন বিশেষ ফাঁদ। একবার ধরতে পারলে আর রেহাই নেই। হঠাৎ চোখ বুজে ভ্রূ দুটি কপালে তুলে বলল, 'বলেন তো,

জগৎটি কার ?'

সর্বনাশ। এমন বিরাট প্রশ্ন! ঝুসি-টিলায় এ নির্জন স্থানে এতবড় দার্শনিক প্রশ্নও অপেক্ষা করে ছিল আমার জন্য তা জানতাম না। আর প্রশ্নের পরেই ভূতানন্দের চাপা চাপা হাসি, মৃদু মৃদু ঘাড়দোলানি। অর্থাৎ, সহজ কথা নয়। জবাব দিয়ে তবে উঠুন।

জবাব শুনে ভূতবাবা খুশী হবে কি-না জানি নে। তবু বললাম, 'দেখে শুনে তো মনে হয়, জগৎটা মানুষেরই।'

ভূতানন্দ খুশী হয়েছে বোঝা গেল। চকিতের জন্য চোখ দুটি খুলে, আবার বুজিয়ে বলল, 'বেশ বেশ, অর্ধেকখানি বলেছেন। কিন্তু কোন্ মানুষের ?'

কোন্ মানুষের ? কোন্ মানুষের আবার। আমাদের মত মানুষেরই। বললাম, 'বুঝলাম না তো'।

সে চোখ বুজেই বলল, 'বুঝলেন না ?' চোখ খুলে বলল, 'পুরুষ মানুষের না মেয়েমানুষের আজ্ঞে ?'

মানুষের এ ভাগাভাগি রীতিতে তো কখনো বিচার করে দেখি নি। কিন্তু ভূতানন্দ যে রকম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে, বোঝা গেল ওইটাই তার আসল প্রশ্ন। যদি বলি, উভয়েরই, তা হলে সঠিক জবাব হয়। কিন্তু তার মনঃপুত হবে কি ? তার চেয়ে ভূতানন্দের জবাবটাই শোনা যাক। বললাম, 'তা তো ঠিক জানিনে।'

ভূতানন্দের হাসি ও দ্রুত ঘাড় দোলানিতে বোঝা গেল, আমার এ অজ্ঞতাই সে আশা করেছিল। তারপর এক খাবলা মাটি তুলে বলল, 'এর নাম কি আঁজ্ঞে ?'

শঙ্কিত হলাম। ভূতানন্দ কোন ভৌতিক ভেলকি দেখাবে না তো ? বললাম, 'মাটি।'

'আঁজ্ঞে ঠিক। মা-টি। অর্থাৎ ?'

বলেই চকিতে ভৈরবীর দিকে ফিরে বলল, 'কানটা এদিকে খাড়া রাখিস গো চণ্ডিকে।'

চণ্ডিকে অর্থাৎ ভৈরবী, বোঝা গেল। কান খাড়া করতে হবে কেন, বুঝলাম না। কিন্তু ফিরে দেখি, অন্য রকম। ভৈরবীর বিশাল চোখজোড়া দপদপিয়ে উঠল বারকয়েক। ঠোঁটের কোণে বাঁকা ঝিলিকে তার কপট হাসি না দুরন্ত রাগ, বোঝা মুশকিল। তারপর কান খাড়া করল কি-না বুঝলাম না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, সারা দেহে তার একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। দেখা

গেল, সেই তরঙ্গের ধাক্কায় সে অন্য দিকে ফিরে বসেছে। কে জানে, ওইটিই কান খাড়া করার ভঙ্গি হয়তো!

ভূতানন্দ ফিরে দেখল না সেদিকে। সে ভ্রূ নাচিয়ে বলে চলল, 'এই মাটি অঁাজ্ঞে, আমার মা তা হইলে? আমার মা-টি! অর্থাৎ কি-না, মা ধরিত্রী। তা হইলে, জগৎমণি হইলেন মেয়্যামানুষ। কেমন কি-না দাদাবাবু?'

ধরিত্রীকে যখন মা বলেছি, তখন ভূতানন্দের ভাষায় মেয়েমানুষ বলতে আপত্তি কি। বললাম, 'তাই হবে।'

একমণী মাথাটিকে বোঁ করে আর-এক পাক ঘুরিয়ে একেবারে নিশ্চল হল ভূতানন্দ। বলল, 'তা হইলে মায়েরও মা আছেন, কেমন কি-না অঁাজ্ঞে?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিতে হল। মা থাকলে, তাঁর মা থাকবেন, এতে আর সন্দেহ কি।

ভূতানন্দ বিস্ফারিত চোখে, ভয়ঙ্কর হেসে বলল, 'তবে সেই মা কে?'

তা তো জানি নে। আমার এ অজ্ঞতা দেখে ভূতানন্দ খুশী বই দুঃখিত নয়। গলা নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল সে, 'হুঁ হুঁ, তোমার নাম জগৎমাতা জগাত্তারিণী, শক্তিরূপিণী মা কালী। উনিই অঁাজ্ঞে জন্মো দিলেন, দিয়ে আবার খেলতে লাগলেন। এর নাম মায়ের লীলে।'

বলতে বলতে আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে, গলা আরও নামিয়ে ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'কিন্তন্ একটা কথা হলপ করে কইতে পারি, প্রেয়োগে অঁাজ্ঞে মা কালী নাই।'

চমৎকৃত হলাম। এতবড় গুহ্য সংবাদ তো আমার জানা ছিল না। বললাম 'তাই নাকি?'

'তবে আর আপনারে কী বলতেছি অঁাজ্ঞে? সারা মেলাটা টহল দিয়া আসেন, একটা মুখে যদি, হুস্ হুস্…'

কথার মাঝেই ভূতানন্দ হাততালি দিয়ে উঠল। দেখলাম সামনের গাছটিতে দুটি কাক এসে ডাকছে কা কা করে। তাড়া খেয়ে কাক দুটো পালাল। ভূতানন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, 'মা নাই, মায়ের চ্যালারা সব ঠিক আছে। ওই যে দেখলেন, গায়ের রঙ কালো। ওই কালো কাউয়া আর কুকিল, সব মায়ের চ্যালা। কিন্তন্ ডাকের ভেদ দেখছেন তো? আচ্ছা, একটু বয়েন, চ্যালা যখন আসছে, শান্তিতে বসতে দিবে না। এট্টু জমিয়ে বসা যাক।'

বলে সে তড়াক করে উঠে, দিব্যি তরতর করে সামনের গাছটায় উঠতে লাগল। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, গাছটি প্রাচীন ও মস্ত বড় নিমগাছ।

আশ্চর্য ! কাক তাড়াতে ভূতানন্দ একেবারে গাছে উঠে বসল। এ যে পাঁচুগোপাল থেকে আর-এক কাঠি উপরে।

ভৈরবীও দেখলাম, ওইদিকেই তাকিয়ে আছে। থাকতে থাকতেই তার সরু ও তীব্র চাপা গলায় ঝঙ্কার শোনা গেল, 'মরণ। মুখে আগুন।'

এই তার প্রথম কথা। জানি নে, উত্তরপ্রদেশের এ টিলাভূমি তার হাজার হাজার বছরের জীবনে এমন কড়া পাকের বিচিত্র বাংলা কথা কটি আর কোনদিন শুনেছে কি-না। কিন্তু ওই শব্দেই যেন চমকে উঠল নির্জন টিলাভূমি। মড়মড়িয়ে উঠল শুকনো পাতা। আর আমার কানের মধ্যে দিয়ে এক নতুন সুর গিয়ে পশল মরমে। একথার স্বাদ মিষ্টি নয়, ঝাল। কিন্তু বড় মিষ্টি ঝাল।

একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার ?'

প্রশ্ন শুনে, ভৈরবীর রাগান্বিত কালো মুখে যেন হঠাৎ হাসির ঝিকিমিকি দেখা দিল। যাকে বলে রাগের হাসি। বলল, 'বিষ।'

বিষ ! আমার অবাক মুখ দেখে ভৈরবীর হাসি একটু দুর্জয় হল। বলল, 'আপনেগো ভৈরব কয় মা কালীর চন্নামিরতো। মুণ্ডু ! ওইতে ওনার নিশার মরণ হয়।'

নিশা অর্থ নেশা। কিন্তু নিমগাছের রসে। জানা ছিল না। আর জানতাম না সেজন্য কেউ আবার এমন আয়োজনও করতে পারে। ফিরে দেখি, এক হাতে ডাল ধরে, আর-এক হাতে একটি সের-পরিমাণ টিনের কৌটা নামিয়ে আনছে ভূতানন্দ। যেখান থেকে টিনটি খুলেছে, সেখানে তেলের গাদের মত রসের ধারা নেমে এসেছে কালো নিমডালের গা বেয়ে।

ভৈরবী আবার আমার দিকে ফিরে বলল, 'বোঝলেন গো দাদাবাবু ? ওই যে কইল না, এখানে ছাড়া ওনার সাধনা হয় না, তা এই মরণ-রসের জন্যে। এ ছেড়ে যাবে কমনে ?'

কথা কটি নীচু গলায় বলল ভৈরবী। বলে হাসতে গিয়ে একটা বিষাদের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে। হাসল। কিন্তু হাসিটি করুণ হয়ে উঠল হঠাৎ।

ভূতানন্দ খুশী মোরগের মত তড়িঘড়ি এসে বসল টিন নিয়ে। বলল, 'কই গো চণ্ডিকে, এট্টু ন্যাকড়াখানি দেও। ছেঁকে নিই।'

আমার দিকে ফিরে বলল, 'সবই আমার মায়ের লীলে আজ্ঞে। মা নেই কিন্তন্ মায়ের প্রেত্যক্ষ কিরপা আছেন সবখানে। নইলে বলেন আঁজ্ঞে দাদাবাবু, মায়ের এমন পাদোদকের ভাণ্ডটি কে আমার জন্যে এখানে রেখে দিল।

কী বলল আঁজ্ঞে, যথার্থ ভালো বস্তু, অমর্তভুল্য। আপনারা আঁজ্ঞে লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলে, নইলে, ঘাটাঘাটি ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে এমন পবিত্তর বস্তু, কী বলব।'

তার 'কী' বলবার মানে বোধহয়, আঁজ্ঞে দাদাবাবু আপনিও একবার চোখে দেখতে পারেন। বুঝলাম, কিন্তু নিমের রস নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কটু স্বাদ হবে। খাবে কী করে? জিজ্ঞেস করলাম, 'খাবে কী করে? তেতো হবে না?'

ভূতানন্দের মুখে বোধহয় রসের ধারা বইতে আরম্ভ করেছে। তাড়াতাড়ি ঝোল টেনে বলল, 'তিতা? আজ্ঞে, কথাই তো আছে, আগে তিতা পাছে মিঠা। ভোজনে বসে আগে নিমপাতা ভাজা খান না? আগে তো তিতাই লাগবে? সুখের আগে আজ্ঞে দুঃখু! নইলে সুখ হজম হইবে না। বসেন, আজকে সাক্ষাৎ কথা বলব আপনাকে।'

বলে আবার তাড়া দিল, 'কই লো চণ্ডিকে, ন্যাকড়াখানি দিবি না এমনি ঢেলে দেব?'

কিন্তু চণ্ডিকের গরজ বড় বালাই। হঠাৎ সজনে ফুল মাটিতে রেখে, এলো চুলে ঝাঁকানি দিয়ে রক্তাম্বরী ফণা তুলল। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'বড় যে কালী কালী হচ্ছে, বলি নজ্জা করে না?

দুর্বিপাক। বুঝলাম, আমার ওঠার সময় হয়েছে। ভূতানন্দ নিতান্ত বিস্মিত হতভম্ব হয়ে বলল, 'এই ছাখো, কী হইল তোর?'

চণ্ডিকে উত্তেজনাবশত দু-হাত তুলে আঁট করে বাঁধল চুল। ঠোঁট বেঁকিয়ে তেমনি তীব্র গলায় বলল, 'কী হইল, তার মরণ-ই তো দেখছি। ভদ্দরনোকের সামনে কইব সে-কথা, অ্যাঁ? বড় যে কালী কালী হচ্ছে, বলি নজ্জা করে না?'

কে বলবে, এটা এলাহাবাদ। কে বলবে, প্রয়াগের কুম্ভমেলা! কে বলবে, এ সেই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর। এখানে বসে যে বাংলাদেশের গেঁয়ো কোঁদল শুনছি। কোথা থেকে কোথায় এলাম, অমৃতের সন্ধানে। এ যে চিরকালের অমৃত বর্ষণ আরম্ভ করল চণ্ডিকে আর ভৈরব। ফেলে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু ততক্ষণে ভৈরব ভৈরবমূর্তিতে উঠেছে দাঁড়িয়ে। গায়ের রক্তবর্ণ উত্তরীয় টান মেরে কোমরে বেঁধে চীৎকার করে উঠল, 'কী!' কালীনামের নিন্দে করছিস তুই? এত বড় সাহস?'

ভৈরবী চীৎকার করে না। চিবিয়ে চিবিয়ে বিঁধিয়ে বলে, 'কালী নিন্দে করব ক্যান? তোমার গুণ গাইছি যে গো। বলি, আর কতদিন চালাইবে

এমনি করে। এত যে হাঁকাহাঁকি, ও চণ্ডিকে, সজনে ফুল তুলে নিয়ে আয়, চচ্চড়ি হইবে। তা কোন্ কালী দিয়া চচ্চড়ি হইবে ?'

ভূতানন্দ আমাকে সাক্ষী মেনে বলল, 'দেখেন, দেখেন আজ্ঞে দাদাবাবু, সাবধান করে দেন, নইলে বলি হইয়ে যাবে, এই বলে দিলাম।'

কি বিপদ। নিজের সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। তার উপর আবার ভৈরবীকে। সে ক্ষমতা আমার নেই।

ভূতানন্দই আবার বলে উঠল, 'খুন হইবি চণ্ডিকে। আর তোর বাপের কেষ্টোরই একদিন কি, আমারই একদিন। খবোরদার।'

বুঝলাম না, কে বাপের কেষ্ট। ভৈরবের মূর্তি দেখলে আতঙ্ক হয়। কিন্তু চণ্ডিকে অবলীলাক্রমে এই মূর্তির আরও সামনে গিয়ে বলল, 'আমার বাপের কেষ্টোর গুণ আছে। তোমারই কালীনামের মুরোদ নাই। ওই যে বলে না, মুরোদ বড় মান, তানার ছেঁড়া দুইখান কান। জানলেন গো দাদাবাবু…'

কী জানব, জানি নে। কিন্তু প্রমাদ বড় ভারি। তবু ফিরে তাকাতে হল ভৈরবীর দিকে। সে তার লাল আঁচলখানি আরও কষে বেঁধে বলল, 'তখন বোলে কত কথা। রেলের টিকিট ফাঁকি দিয়া আসলো, কইলাম, ওইখানে গিয়া গিলবো কি ? বললে, চল্ না, নাখ নাখ নোক আসবে, আর দেদার চাল ডাল পয়সা দিবে। খাওয়ার আবার ভাবনা ? নোকে যেচে দিবে। তা নোক এখানে কী করতে আসে, সে তো শুনলেন ওনার নিজের মুখে। দিনরাত ওই মরণ-রস পাড়তিছে আর গিলতিছে। দু-দিন ধইরা দাঁতে কুটা কাটি নাই গো দাদাবাবু, কুটা কাটি নাই। শীতে মইলাম, এক কণা আগুন নাই। এত এত সাধু হাত পেইতে বেড়াইতেছে, উনি নীচে নামতে পারেন না। অমন গোটা গোটা ফুলগুলান কি কাঁচা চিবুবো ?' বলতে বলতে গলাটা ধরে এল যেন ভৈরবীর।

কিন্তু ভূতানন্দ এতবড় অপমান আর সইতে পারল না কিছুতেই। বিশেষ আমার মত একজন অপর ভদ্রলোকের সামনে। কোথায় মৌজ করে একটু ধর্মালোচনা চলবে, তা নয়, শেষে, মুরোদ নিয়ে টানাটানি। বড় দুর্বল স্থানে ঘা দিয়েছে ভৈরবী। তাই আমার দিকে আর ফিরে তাকাতে পারছে না ভূতানন্দ। মানুষের সম্মানে আঘাত লাগলে সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সে সম্মান যদি মিথ্যে হয়, তবে তা সহ্য করা আরও মুশকিল। তখন সে আত্মরক্ষার জন্য শেষ উপায় অবলম্বন করে। ভূতানন্দের অবস্থা যেন খানিকটা তাই। সে রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে বলল, 'তোর মত মেয়েমানুষের মুখে এতবড় কথা।

বজ্জাত, নষ্ট মেয়েমানুষ কমনেকার। তুই কি আমার ঘরের মাগ যে, তোরে দু-বেলা খাওয়াব বলে কিরা কাটছি মা কালীর দোরে—অ্যাঁ?'

চণ্ডিকা মুহূর্তে মাথা তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। কী চোখ! বিশাল চোখ দুটিতে তার সত্যি আগুন ঠিকরে পড়ছে। লাল কাপড়ে ঢাকা তার বলিষ্ঠ দেহে কী অপূর্ব তেজ! দুদিনের উপোসী কালো মুখে তার কেউটের ফনার মত চমকানি। ভৈরবীর রূপ আছে কি-না, সন্ধান করে দেখি নি। কিন্তু কালো মেয়ের এমন বিচিত্র, ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ আর কখনো দেখি নি। জানি নে, এমন রূপের সামনে কোন পুরুষ কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে কি-না। কিন্তু ভূতানন্দ পারল না।

বোঝা গেল, ভূতানন্দ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই সম্মুখ সমর ছেড়ে সে আচমকা পেছন থেকে আক্রমণ করেছে চণ্ডিকাকে। কিন্তু, মানুষ একবার যখন দুর্বলতাবশত পেছনে আশ্রয় নেয়, তখন তার পরাজয় অনিবার্য। সেই পরাজয়েরই শেষ ধাপে নামল ভূতানন্দ। লাথি মেরে ফেলে দিল সে তার অতি সাধের মাতৃপাদোদক। তারপর চেঁচিয়ে বলল, রইল তোর লজ্জা আর মুরোদ! চললাম আমি। মর তুই এখানে। আর খোলকরতাল এনে তোর বাপের কেষ্টোর ভজনা কর, লোক জুটবে'খুনি।'

বলে দুপদাপ করে সোজা উত্তরদিকে গাছের আড়ালে আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাসতে হাসতে মাথা ব্যথা! কোথা থেকে কী হয়ে গেল। মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম যেন আপদবিশেষ। কোন্ এক অদৃশ্য অপরাধের খোঁচা এসে যেন লাগল আমার মনে। মনে হল অপরাধের মূল আমি। আমি না থাকলে, এমনি করে হয়তো বলত না ভৈরবী। সম্মানহানিতে অতখানি ক্ষিপ্ত হত না ভূতানন্দ।

কোথায় সমুদ্রগুপ্তের কূপ। আর কোথায় কী!

ফিরে যেতে উদ্যত হলাম। তবু যাওয়ার আগে ভৈরবীর দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। কিন্তু তাকিয়ে আর পা উঠল না। থমকে দাঁড়ালাম।

ভৈরবীর গাল বেয়ে নেমেছে জলের ধারা। কী সান্ত্বনা দেব। যাদের কোনদিন দেখি নি, জানি নে পরিচয়, তাদের হঠাৎ কলহের মাঝে কী কথা বলব। যেটুকু জানি, সেটুকু তাদের উপোসের বেদনার কথা। আর যেটুকু ইঙ্গিত দিয়ে গেছে ভূতবাবা, তাকে ভিত্তি করে সান্ত্বনা দেওয়া আমার সাজে না।

তবু এই টিলাভূমির নিরালা গাছের ছায়ায় ওই চোখের জল দেখে বিদায়

নিতে বাধল। নিতে হবে জানি। তবু এই মুহূর্তে পারলাম না।

হঠাৎ ভৈরবী আদুরে বউটির মত বলে উঠল, 'দেখলেন তো দাদাবাবু, কেমন করে কইয়া গেল। আজ দশ বছর তোমার সঙ্গে রইছি, আমি কী তোমার কেউ নয়? ওই কথা কইয়া আমারে অষ্টপোহর যাতনা দেয়। তোমার বউ না হতে পারি, বউ-এর চাইতে বড়, আমি তোমার ভৈরবী। তোমার ধম্মে আমি, কম্মে আমি। তোমার সুখে আমি, দুঃখে আমি। কি বলেন গো দাদাবাবু, অ্যাঁ? কী আর কইছি। দুইদিন খাই নাই, শরীরে তো এট্টু কষ্টও হয়। কিন্তুন্, দেখলেন তো'—বলতে বলতে তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে, বিশাল চোখে অশ্রুর বান ডাকল। আর দূরদেশের এ টিলাতে দাঁড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে ভরে উঠল চাপা বেদনা। ভৈরবীর ক্ষুধাও আত্মপ্রকাশ করেছিল, তেমনি এবার আত্মপ্রকাশ করল এক প্রেমবতী নারী।

চোখের জল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ভৈরবী আবার বলল, 'বল, আমি কি তোমার কেউ নয়? সাত পাক ঘুরি নাই ঠিক। যোল বছরের মেয়া আইজ তিরিশ হইল। দাদাবাবু, এই চইদ্দ বছরে কত লক্ষ পাক দিছি তা জানেন ভগবান। উনি তো সাক্ষী আছেন! তবে? তবে ক্যান দেও ওই খোঁটা? আমি দুঃখু পাইলে তোমার পাপ হইবে না? আমার পুণ্যি তোমার লাগবে না? মা কালীর নামে ইস্তিরি হইছি, ছামাতলায় বিয়ার চাইতে কি তা কম? ক্ষুদায়ও তুমি, ভরা পেটেও তুমি। আর কারে কইব গো, অ্যাঁ? আর কারে কইব?'

জলভরা মুখখানি কাছে এনে সে আমাকেই বলল। আমাকে জিজ্ঞেস করল। বলে সে নতমুখে, এলোচুলে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে। কোথায় রোষবহ্নি, কোথায় বা চণ্ডিকার চণ্ডালিনী মূর্তি। ক্ষুধা ও প্রেমের অপমানে দুর্ভাগ্যবতী অশ্রু-অন্ধ সেই চিরদিনের পাড়াঘরের মেয়েটি। এই বিরাট তীর্থক্ষেত্রে যখন সবাই দানে ধ্যানে ধর্মে ব্যস্ত-ত্রস্ত উন্মত্ত, যখন আপন মনে মানুষ অরণ্যের বুকে খুশী বিহঙ্গটির মত ফিরছে মনের আশ মিটিয়ে, তখন সে আমার সামনে খুলে ধরল মানুষের হৃদয় ও দেহের, বাস্তব ও বিচিত্রের এক রূপমহলের দরজা। ভাবি, এই তো বিশ্বের সবটুকু রূপ! হৃদয় ও জঠরের কামনা-বাসনা সৌন্দর্য-ই তো অপরূপ। এর শেষ নেই। এর বাড়া বৈচিত্র্য কই? এরপর বদলে দিল আবার আমার সুর। তাই তো নিয়ম। সুর তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু রূপান্তর—ভায়রোঁ থেকে গজল, গজল থেকে পূরবী, পূরবী ইমন, ইমন থেকে বেহাগের অশ্রুভরা অন্ধকার রাতে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকব

মৌন নক্ষত্রের চোখে।

তাই তো! থামবার কী আছে। কী আছে নিরানন্দের। সে তো আমার চলার পথে দিয়েছে নতুন চলার রস। সংযোজন করল নতুন সুর।

ফিরে তাকালাম। ভূতানন্দের আশ্রমে নয়, কুঁড়েঘর: সূর্য খানিক বেঁকেছে মাঝ-আকাশের কোল থেকে। নিম, তেঁতুল, সজনে, পিপুলের ছায়া ঝিলিমিলি। নতমুখী রক্তাম্বরী কালো মেয়ে। পায়ের কাছে তার অভুক্ত হাতের ছোঁয়া সজনেফুল। মধুলোভী মৌমাছি এসেছে ছুটে, গন্ধে গন্ধে।

ভাবি, নিজের চোখজোড়ায় মন ফিরিয়ে দেখি, সারা দেশে এমনি কত কুঁড়ের কত ঝি-বউয়ের পায়ের কাছে পড়ে আছে সজনেফুলের গোছা। এক ছিটে নুন, দু-ফোঁটা তেল আর এক কাঁসি ভাতের অভাবে এমনি কত সজনে-ফুলের গোছা গিয়েছে শুকিয়ে। জানি, যে শুধু করুণার জল দিয়ে ভেজাতে চায় এ বিশ্বের চিঁড়ে, সেও করুণার পাত্র। করুণা করতেও চাই নে। জানি আমারও 'মুরোদ বড় মান'। আমার মত মানুষকে দান-ধ্যান করে শুধু ছেঁড়া কান-ই দেখতে হবে। জানি, তবু সমুদ্রগুপ্তের টিলার উপর এ অভাবিত সজনেফুলের গোছাও যদি যায় শুকিয়ে, তবে নিয়ত মরুবাসের যে রসটুকু সান্ত্বনা, তাও যে হারিয়ে যাবে বিষবাষ্পে।

অনেক দ্বিধা করে হাত দিলাম পকেটে। ডাকলাম, 'ভৈরবী!'

ভৈরবী আচমকা ঘোমটা তুলে বলল, 'আমার নাম তো ভৈরবী নয় দাদাবাবু।'

বললাম, 'তবে বুঝি চণ্ডিকা?'

তার উপোসী শুকনো মুখে এখনো জলের দাগ। সেই মুখে তার অপূর্ব লজ্জিত হাসি। বলল, 'না।'

'তবে?'

'আমার নাম ময়লা।' বলতে বলতে তার কালো মুখে চিরুনির মত সাদা দাঁতের সারি ঝকমক করে উঠল। বলেও তার এত আনন্দ উপোসী মুখখানি ভরে উঠল আলোয়। চমকে ভাবলাম, রহস্য নয় তো!

বললাম, 'ময়লা? সে আবার কী?'

সে বলল, 'আমার নাম গো! বড় যে কালো। তাই ছোটকালে নাম রেখেছিল ময়লা।'

বলার সুযোগ পেলাম। যদি কাটিয়ে ওঠা যায় গ্লানিটুকু। বললাম, 'ময়লা কোথায়? দিব্যি ঝকঝকে দেখছি।'

• কাজ করল ওষুধটি। ময়না হেসে উঠল সশব্দে। তবু কী বিচিত্র! চোখের জলের দাগটুকু আছে গালে।

বললাম, 'আমি কিন্তু আলোই বলব।' বলে পকেট থেকে পয়সা নিয়ে বললাম, 'তা আলো-ভৈরবী, কিছু মনে কোরো না। দেখা হয়ে গেল পথে, এইটুকুনি লাভ। আবার কে কোথায় যাব! পয়সা কটি রাখো, সজনেফুলের চচ্চড়ি রেঁধো আজ, কেমন?'

কিন্তু গোলযোগ ঘটল। ভেবেছিলাম মেঘ কেটেছে। তবে যে হঠাৎ আবার তার চোখে জল। তাড়াতাড়ি আমার আসনখানি তার লাল আঁচল দিয়ে বৃথাই ঝেড়ে দিল। বৃথা, কেন-না ধূলো যাবার নয়। দিয়ে ধরা গলায় বলল, 'একটু বসেন।'

অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করলাম। ময়না যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তবে ভুল করেছে। পথের নিয়ম ঘরে চলে না, ঘরের নিয়ম নয় পথে। আমরা পরস্পর কৃতজ্ঞ এই পথের দেখাদেখিতে। পর-মুহূর্তেই দুশ্চিন্তা হল। বললাম, 'ভূতানন্দ ফিরে আসবে তো!'

সে বলল, 'আসবে না? যাইবে কমনে? আন, পয়সা আন।'

বলে, নিঃসঙ্কোচে হাত পাতল। দিলাম। পয়সা কটি আঁচলে বেঁধে, জল চোখে টিপে হেসে বলল, 'ওইরকম কয়। শোনা আমার কপাল দাদাবাবু। কিন্তুন্ সামনে যদি থালায় কইরা কিছু দিতে পারি, তখন কালী নামে কি হাসনের ফোয়ারা, একবার দেইখ্যা যাইয়েন। মুখ বড় বেইমান। ত্যাখন সে দুঃখুর কথা মনে থাকে না। মানুষটারে চিনি তো!' বলতে বলতে তার কালো মুখে সলজ্জ হাসি ফুটল। লজ্জিত ত্রস্ত চোখে একবার আমার দিকে চেয়ে নত করল মুখ। বড় বিচিত্র তার এ লজ্জা হাসিখানা। আমাকে মাঝে রেখে মনের কোন্ গোপন লীলাখেলায় লীলাবতী হয়ে উঠল সে। বললাম, 'কিছু বলবে?'

ভৈরবীর এত লজ্জাও ছিল! ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।' তারপর তার ডাগর চোখ মেলে দিল পুবে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূর আকাশের দিকে। বলল, 'দাদাবাবু, মানুষটার উপর রাগ করবেন না। ও-ই রকম। ছোটকাল থেইকে জানি, ও সাপুড়ে, ডাকাবুকো। আমি ঘোর বোষ্টমের মেয়া। দেখলে চোখ বুজতাম। ওই যে কইল না, তোর বাবার কেষ্টর-ই একদিন, কি আমার-ই একদিন। আমার বাপ যে কেষ্টভুক্ত বোষ্টম, তাই খোঁটা দিল। তা দাদাবাবু বোষ্টমের মেয়া, ওনার কাছ থেকে তফাতে-ই থাকতাম। ত্যাখন আমার ডাগর বয়স। তা ওই মানুষটি য্যাখন-ত্যাখন আমার আগুপিছু ফিরত, চোরের মত

আড়ে আড়ে দেখত, চখে চখে পড়লে হেইসে বলত, ময়লা, কী বাহার তোর কালো রঙখানি। শুইনে ভয় হইত, আর কী হইত আইজও জানি না। লোকে কইত্‌, কালী ময়লার যে রূপ আর ধরে না। ক্যান, কী জানি। তারপরে, একদিন তিনো সইন্ধ্যেবেলা আড়ালে আমার হাত দুইখানি ধরে কইল, 'ময়লা, তোর মধ্যে যে মা কালীর অংশ রইছে লো। তোরে আমার চাই।' চাই কইলেই চাওয়া? কী সাহস! ডরে মরি। কয় কী? তবু, মেয়েমানুষের মন তো! কইলাম, কী যেন মনে লইল, হেইসে হেইসে কইলাম, 'ওমা! ছি, আমি কালা পেঁচি, কালামুখী, মা কালীর নামটাম কইও না বাপু।' কে শোনে। কইল, 'আমি যে দেখি। মা কালীর সঙ্গে আমার কথা, খাওয়া, বসা। তিনি কইলেন, ময়লা আমার পরান। আমিও যে চখ বুজলে তাই দেখি ময়লা। তোর হাসি কথা, চখের তরাসে তুই সাক্ষাত কালী। তোরে লইলে, নিজের চিতা নিজেরে জ্বালাইতে হইবে।' শোনেন কথা।...'

বলে হেসে উঠল ময়লা। চোখের জলে, কৈশোরের স্মৃতিতে, হাসি-কান্নায় কী বিচিত্র রঙের ছোঁয়া লাগিয়ে দিলে সে আমার পথ-চলা-ব্যস্ত মনে। আমি জানি, উত্তরপ্রদেশের এ টিলার বুকেও সে লাগিয়ে দিল ওই রঙের ছোপ।

হেসে বলল, 'মনে মনে বুজলাম, ময়লা, এইবার মলি। কইলাম, 'হু', তুমি সবই দেখতে পাও। ভূত-পেরেতও নাকি দেখতে পাও। আমারে এট্টু দেখাইতে পার?' কইল, 'খুব পারি। আমি থাকব লাটাই চণ্ডীতলায় কাল সন্ধেয়, আসিস, ডরাইস্‌ না, দেখাইব।' গেছিলাম দাদাবাবু, সত্য কইরা আমায় ভূত দেখাইল।'

অবাক হয়ে বললাম, 'ভূত দেখতে পেলে?'

বলল, 'হ্যাঁ দাদাবাবু।'

হাসি পেল। চেপে গেলাম। অমন সহজ স্বীকৃতি ময়লা ভৈরবীর দ্বারাই বোধহয় সম্ভব। তবু বললাম, 'কেমন দেখলে? কী দেখলে?'

নিরাভরণ হাতখানি শূন্যে মেলে দিয়ে বলল, 'কী জানি কী দেখলাম। চখ অন্ধকার, কী দেখাইল, উনি-ই জানেন। খালি বুজলাম, সোম্‌সার ওনার বশ। দেব-দেবী যক্ষ রক্ষ, সব-ই ওনার গুণবশ। আমিও বশ হইলাম! এমন বশ হইলাম, বোষ্টমের মেয়ে হইয়া কালীভক্তের সঙ্গে সেই রাত্রেই লাটাই-চণ্ডীতলা থেইকেই সকলের মায়া কাটাইয়া ওনার সঙ্গে বার হইয়া গেলাম। সেই থেইকে ওনার-ই সঙ্গে সঙ্গে। দাদাবাবু, উনি যাইবে কম্‌নে? এমন নি কতবার গেল, কতবার আসল। যাওয়া আসা নিয়া সোম্‌সার। আর যদি

ময়লা হই তোমার জীবনে, তবে ধুইয়া সাফ কইরে যাও, নইলে ময়লা কি সজ ছাড়ে !'

হাসতে গিয়ে কাঁদল। বলল, 'তবু দাদাবাবু, আইজ আমার কী পুণ্যি গো! এখানে চাইলের বড় দাম, আলো চাইল ; পঁচিশ তিরিশ টাকা মোন। তবু, ওনার সামনে সইজনে ফোলের চচ্চড়ি দিয়া হাতপোড়া গরম ভাত তুইটে দিতে পারব, নিজেও পাইব। যা শীত! সাপের ছোবল। গতরে এট্টু যুত পাইব, কালীনামের ফোয়ারা ছোটাব। দাদাবাবু আপনারে পেন্নাম করি।'

ছি ছি ছি, একে রক্তাম্বরী, তায় ভৈরবী। উঠে দাঁড়ালাম তাড়াতাড়ি। সেই করুণা ও কৃতজ্ঞতা। কেন? বললাম, 'এবারে যাই।' তবে তারপরে আবার আবেগবশত না বলে পারলাম না, 'আলো ভৈরবী, ময়লা ধুয়ে সাফ করার কথা বললে। ময়লা মাথায় নিয়ে তুমি কিন্তু হীরে হয়ে গেছ, ও আর ধুয়ে সাফ হবে না।'

মনে মনে বললাম, তুমি গেলেই ভূতানন্দের জগৎ অন্ধকার। ময়লা হেসে উঠল। বলল, 'আসবেন তো আবার দাদাবাবু?'

ফিরে দেখে বুঝলাম, ভৈরবীর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। বললাম, 'যদি পারি, আসব।' মনে মনে বললাম, যদি না পারি, তবে এ টিলার ছবি তোমারই মূর্তি ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার চোখে। এ অস্বচ্ছন্দ জীবনের ক্ষেত্রে, বিশেষ উন্নাসিক স্বদেশ-পরিচয়-অজ্ঞ কূপমণ্ডুক শহুরে সভ্যতার কাছে সত্য অনেক সময় অসত্য ও অস্বাভাবিক। এখানে যে এমনি এক ময়লা ও ভূতানন্দের দেখা পেলাম, কিছুই নয়, তবু দেখলাম এমনি এক বিচিত্র নাটক, তা হয়তো নিজেই ভুলে যাব এই টিলা থেকে নেমে। তবু জানি মানুষের ধর্ম, প্রেম ও ক্ষুধার এ ঘটনা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জানি নে, কী শুনলাম। দুদিনে কত মানুষের সঙ্গে দেখা হল, কত কী শুনলাম। মনের অজস্র তারে বাজল কত সুর। আধ্যাত্মের উপলব্ধি নেই। সবই মানুষের মধ্যের হেরফের বলে দেখলাম। এও কি ভৈরবীর কোন গূঢ় সম্বশক্তির বন্ধন, নাকি যা শুনলাম তা শুধু মানব-মানবীর বিচিত্র প্রেমোপাখ্যান, জানি নে। তবু আমি সাধারণ। সেই সাধারণের হৃদয় তো টাবুটুবু ভরে উঠল এই হাসি-কান্নার কাহিনীতেই।

হঠাৎ কেশো গলায় হাসি শুনে চমকে দাঁড়ালাম। একটি দেবদারুর আড়ালে, কপালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ভূতবাবা! বলল, 'চললেন,

আজ্ঞে ?'

হাসি চেপে বললাম, 'সে কি, একেবারে এত কাছাকাছি, এখানে যে ?'

কিমাশ্চর্যম্! লজ্জায় ও বিনয়ে ভূতানন্দ মাটিতে মিশল যে। চোখ পিটপিট করে, গলার রুদ্রাক্ষ খুঁটে, সে এক কাণ্ড। বলল, 'আজ্ঞে দেখলেন তো, সাক্ষাৎ চণ্ডীঠাকরুন, হেঁ হেঁ।'

মানে বোধহয়, কী করে আর তবে যাব। বলল, 'ভৈরব একেবারে চণ্ডাল। মায়ের চরণামিত্তোটুকু গেল। আবার আসবেন, মা কালীর কথা বলব।'

কি ভাগ্যি, ভূত দেখাতে চায় নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কূপ কোথায় ?'

সে বলল, 'ওই যে পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি, ওর উঠোনেই দরজা পাবেন।'

'চলি তা হলে ?'

ভূতানন্দ জোড়হাতে বলল, 'আজ্ঞে।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'রাগ দেখলেন তো ? আসল ভৈরবীর ও-ই লক্ষণ আজ্ঞে, আর আমি—'

মুখখানি অন্ধকার ও করুণ হয়ে উঠল তার। ওকে আর সান্ত্বনা দিলাম না। এগিয়ে গেলাম। বুঝলাম, ওই রকম করুণ মুখে জোড় হাতে এবার তার-একজনের কাছে যাবার সময় হয়েছে।

বলতে কি ডিগবাজি-খাওয়া বিটলে পাখিটার মত, খুশীতে আমার, ডানা ঝটপট করে উঠল। একটা মস্ত নিশ্বাস ফেললাম। গুনগুনিয়ে উঠল মনটি আপনি আপনি, চল, চল, চল হে আকাশতলে আজ সব-ই খেলা। চল চল।

পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটির উঠোনে এসে দেখি, লোকের ভিড়। বেশী নয়। অনেক নারী পুরুষ বসে বসে গল্প জুড়েছে। বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছে। সামনে দেখি মন্দিরে যার পট রয়েছে, দেখে মনে হল গুরু নানক। পাশের সেবাইত ও শুভ্রবেশধারী শিখ সম্ভবত। দেখলাম, চরণামৃত বিতরণ হচ্ছে।

উঠোনের মাঝখানে, ছাদ থেকে নামার মত একটি সিঁড়ি-মুখের দরজার ভেতর দিয়ে পিলপিল করে অদৃশ্য হচ্ছে মেয়েপুরুষের দল। সামনে গিয়ে উঁকি দিলাম। কিছু দেখবার উপায় নেই! মানুষের ঠেলায় যেন ওই অন্ধ সুড়ঙ্গে গলে গলে পড়ছে। সিঁড়ি-মুখের কাছটিতে ভিড়ও হয়েছে বেশ।

একটা ব্যাপারে অবাক হলাম। একটি অবাঙালী, রীতিমত দশাসই চেহারার ভদ্রলোক সিঁড়ি-মুখের কাছে একবার এগুচ্ছেন আর পেছুচ্ছেন।

তাঁর হাত ধরে, একেবারে বিপরীত রূপ কাঠিসার মহিলাও একটি আগে-পাছে করছেন। এই সিঁড়ির মুখে ভিড়ের মধ্যে তাই নিয়ে সাড়া পড়ে গিয়েছে হাসির।

জিজ্ঞেস করলাম একজনকে, 'কী হয়েছে ভাই?'

শুনলাম, ওই বাবুজী এই সুড়ঙ্গে অবতরণে ভয় পাচ্ছেন। যদি দম আটকে মরে যান, কিংবা মাটি ধ্বসে চাপা-ই পড়েন।

ভাল। কি দরকার নামবার। কিন্তু ওই তো মুশকিল। শুনলাম ভদ্রলোক বলছেন, 'ভগবান আমার উপর বিরূপ, আমার কী উপায় হবে?' আর অতবড় মানুষটাকে 'ডরপুক' অর্থাৎ ভীতু বলে একচিলতে মহিলাটি মুখঝামটা দিচ্ছেন।

সাধ আছে, সাহস নেই। কিন্তু ভগবানের যা চরিত্র, তিনি যে নীচের অবতরণিকাকে আরোহণী করে নেবেন, তেমন সম্ভাবনা কম। সুড়ঙ্গের মুখটি যেরকম সরু ও অন্ধকার, সে যে হঠাৎ আলোয় মুখব্যাদান করে বিকৃত হয়ে উঠবে তাও বোধ হয় না। অতএব, ওই চলতে থাকুক।

নেমে গেলাম ভিড়ের মধ্যে মিশে। সিঁড়ির মধ্যপথে গিয়ে মনে হল, ভাল করি নি নেমে। মাঘ মাসের এই দারুণ শীতে ঘাম ছুটল শরীরে। নিজে চলছি নে। আমি একজনের পিঠে লেপটে আছি। আমার পিঠে আর একজন। যেন দলা-পাকানো মানুষের একটা পিণ্ড। নারী-পুরুষের বাছবিচার নেই। পেছনের চাপ আর-একটু বাড়লেই শেষ। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যদি মরিও, তবু মাটিতে পড়ব না। এমনি দাঁড়িয়ে মরে থাকব।

চাপে পড়ে দ্রুত নিঃশ্বাসে কার গলায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠেছে। কে যেন ফোঁপাচ্ছে আঁতকে-ওঠা চাপা গলায়। মনে হল, ভাল করি নি। এ যে সত্যিই কূপ! পাতালপুরী! ফিরব, সে আশা দুরাশা। লৌহ-দরজা ভাঙা যায়, এই মানুষ-পিণ্ডের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। দেখছি উপরের লোকটির আতঙ্ক অলীক নয়।

হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল গায়ে। কোত্থেকে এল? বাঁদিক থেকে একটি আলোর রেখা এসে পড়েছে ভিতরে। যেন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে এসে পড়েছে সার্চ লাইটের আলো। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি নে স্থির হয়ে। ডান দিকে তাকিয়ে মনে হল, কোন এক অন্ধ পাতালপুরী থেকে মানুষ-জলের হোস্ পাইপ খুলে দিয়েছে কেউ। কিছু দেখতে পাচ্ছি নে। দূরে শুধু একটু বুঝছি, একটা আবর্তিত বন্যা ওদিক থেকে ছুটে এসে এগিয়ে চলেছে ওই সার্চ

লাইটের দিকে। এই এক বন্যা। আমার পেছন থেকেও আসছে সিঁড়ি দিয়ে-নামা জল-প্রপাতের ধারা-বন্যা। কোন্ দিকে যাই বন্যার মধ্যে। ছিন্ন বস্ত্র, ধুলি-মলিন কম্বল, ত্রিশূল, চিমটা, মতিবাঈ থেকে জর্জেট শাড়ির খসখস, স্বর্ণালঙ্কারের ঝিকিমিকি রিনিঠিনি, রঙিন উত্তরীয়, ধুতি ও কোট-প্যাণ্টের পরিপাটি, সবই ছিল। ছিল না শুধু স্বাভাবিক রূপ। তিক্ত ওষুধ গেলার মত এক দুরূহ কাজে নেমে এসেছে সবাই। পেটে গেলেই নিরাময়। এখানকার কাজ শেষ করে একবার বেরুতে পারলেই স্বর্গের চাবিকাঠি আপনি এসে জুটবে পকেটে।

দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। যেদিকে হোক চলা ভাল। দাঁড়িয়ে থাকলেই পেষাই। এখানে কী আছে, তাই তো জানি নে। শুধু শুনছি, হনুমানজী আছেন। ডান দিকের মোড় নিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম একজনকে, 'এখানে হনুমানজী আছেন?'

সে বলল, 'জী বাবু!' কিন্তু কী আশ্চর্য, লোকটি ওর মধ্যেই আরম্ভ করল, হনুমানজীকে একবার এখানে লুকিয়ে থাকতে আর বলার দরকার ছিল না। কেন-না, রামায়ণের অনেক পরে নিশ্চয়ই সমুদ্রগুপ্তের কূপ তৈরী হয়েছিল। হনুমানের লুকিয়ে থাকার কোন ইতিহাস তাতে থাকতে পারে না, কি ভয়াবহ ভিড়ের মধ্যেও লোকটার খৈনিটেপা মুখে রামায়ণের বিচিত্র বুলি ঝাড়বার বাসনা দেখে অবাক হতে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এগুচ্ছ না কেন?'

হেসে বলল, 'মরতে?' তারপর পকেট থেকে পয়সা বার করে ডান দিকে একটি জায়গা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। দেখে বুঝলাম, ওইখানেই আছেন তিনি। ওইখানেই ঘূর্ণিজলের আবর্তের মত নর-নারীর রঙ-বেরঙ-এর মাথা পাক খেয়ে উঠছে।

এগিয়ে গেলাম। অস্বীকার করব না, পুণ্যার্থী নরনারী আমার তুলনায় ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু। এগিয়ে গিয়ে অন্ধকার দেখলাম। মনে হল, আমার ওভারকোটের বোতামগুলি পড়পড় করে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। অসহ্য চাপে, মনে হল কোটটা খুলে পড়েছে, টেনে নিচ্ছে কেউ গা থেকে। ঠোঁটের কোণে চোখের জলের মত নোনতা ঘামের নির্ঝর এসে পড়ছে।

তারপর, টিমটিমে প্রদীপ, মনে হল, তৈলসিক্ত চত্বর, সিঁদুর, ক্ষয়িষ্ণু পাথরের মূর্তি, পাণ্ডা ও পয়সা, সমস্তটা মিলিয়ে একটা বিচিত্র ছায়ার খেলা।

বেরিয়ে এলাম তন্মুহূর্তেই। কার একটা হাত এসে পড়ল গলায়। পড়ুক।

লক্ষ্য এখন সার্চ লাইট। যেন, মুমূর্ষুর জীবনে এখনো আছে জীবনের সাড়, ওই আলোকরেখা।

কার একটা হাত এসে পড়েছে কোমরের কাছে। ওভারকোটের বোতাম তবে খুলেই গিয়েছে? কিন্তু, কিন্তু একি? হাতটা যেন কাশ-ফুলের মোলায়েম সুড়সুড়ির মত পেটে বুকে হাতড়ে ফিরছে। তারপরেই আটকাপড়া বিছের মত স্পর্শটি পিছলে নেমে এল কোমরের নিচে। পরমুহূর্তে আবার বুকে। অন্ধ নাকি ভিড়ের চাপাচাপি ও ঠাসাঠাসি। একরাস রুক্ষ চুলের গোছা ঢেকে দিল আমার চোখের দৃষ্টি।

কিন্তু, বুকে হাত? আমার যে সব ওই বুকে। আমার ছুটে আসা, আমার হৃদি-কুম্ভ-সায়রে ডুব দেওয়া, আমার অমৃতকুম্ভ যে ছোট্ট একটি চামড়ার ছোট্ট ব্যাগে ভরা। এখানে মনের চেয়ে কাজ দ্রুত।

কোন বস্তু নয়, বুকের স্পর্শটি চেপে ধরলাম হাত দিয়ে। একটি হাত। নরম নয়, শক্ত কিন্তু ছোট। হ্যাঁচকা দিচ্ছে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। চকিতে চুলের গোছা সরে গেল চোখের কাছ থেকে। অস্ফুট আর্তস্বর। কালো ওভারকোটের তলায় একটি মুখ। একজোড়া চোখে চকিত আলোর মায়াদীপ্তি। সেই চোখে একই মুহূর্তে শঙ্কা ও ক্রোধ, হাসি ও ভিক্ষা।

মনে হল, ছিন্ন ময়লা কাপড় ও ধুলো-মাখা একদল মেয়ে-বাহিনীর ব্যূহ আমাকে ঘিরে ঠেলে নিয়ে চলেছে। হাত ছাড়েনি। চেঁচাব কি না ভাবছি।

দাবি ও অনুরোধের যুগপৎ চাপা আর্তস্বরে শুনলাম, 'ছোড় দো, ছোড় না?'

স্বর আমার কানের কাছে। সেই ভয়ঙ্কর টানাটানা চোখ আমার মুখের কাছে। চোখ নামিয়ে তাকালাম। পালতোলা পালের শাড়ি। লাল জামা। আর এই অসহ্য ভিড়ের মধ্যে সেই মুহূর্তেই অনুভব করলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই, এক অব্যক্ত ভাষাহীন নরম ও বিচিত্র স্পর্শ আমার বুকে।

সর্বনাশী! খনপিসীর সর্বনাশী, ঝুসির ভয়ঙ্করী, ব্রজবালার আতঙ্ক ছেলেচোর। নিরালা মাঠের সেয়ানা পাখি।

ছেলেচোর কোথায়। ও যে আসল প্রাণচোর। সর্বস্ব-চোর। আমার হৃদ্‌পিণ্ডের খোঁজ করছিল মৃত্যুর মত সর্বনাশী স্পর্শে।

চকিতে কটাক্ষ বিলোল হল। ঘন হল স্পর্শ। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে এক বিচিত্র জড়ানো ও সানুনাসিক কণ্ঠ আমার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দিল, 'ছোড় দো মেয়ী বাবু, জোড় জী।'

যে মুহূর্তে টের পেয়েছি, সে মেয়ে, সেই মুহূর্তেই শিথিল হয়েছে হাতের

মুঠো। আমি ভদ্রলোক, আমার আত্মাভিমান আছে। ভদ্রলোক এবং পুরুষ মনের কানায় কানায় আমার আছে সভ্যতার সংস্কার। আমার অর্থের প্রতি যার লোভ, তার প্রতি আছে ঘৃণা ও ক্রোধ। তবু মাঝারি ঘরে বাংলার ছেলে, স্পর্শকাতরতা আমাদের পায়ের তলা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। বয়সের তারুণ্য ও উদারতা বাস্তব মানে না নিয়ত। সেখানে বিচিত্র রঙের-রঙ-মহল। তা ছাড়া নারী। নারী নামে ধিক্কার দিচ্ছি নে। নিজের মনকে ফাঁকি দেব কোথায়।

হাত আপনি শিথিল হল। আমার ঘর্মাক্ত হাতের মুঠো। আশ্রমে আলোর ছড়াছড়ি খুব। মঞ্চটিও রীতিমত সুসজ্জিত। আঙিনায় ছোট ছোট গাছের সারি দিয়ে আঁকা হয়েছে ভারতবর্ষ।

ঢুকতে গিয়ে বাধা। জুতো রেখে যেতে হবে। কার কাছে? সে ভাবনা নেই। তার জন্য লোক আছে। জুতো দিন, নম্বরমারা কার্ড নিয়ে যান। কার্ডটি ফিরিয়ে দিলেই জুতো। সেই ভাল।

মঞ্চে গান হচ্ছে। সুরটি ভজনের অনুরূপ। যাঁরা গান করছেন তাঁরাও রীতিমত সুবেশ যুগল তরুণ। কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য। শ্রোতার চেয়ে বেশী শ্রোত্রী। যদি পাপ না হয় তবে বলি, এখানে রূপের বড় ছড়াছড়ি। রূপে ও পোশাকে দশ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আশ্রম-প্রাঙ্গণের। তার উপরে তীব্র আলোয় রূপের বাড়াবাড়িও হয়েছে। আশ্রমের সুদীর্ঘ ঘেরাওয়ের মধ্যে বহু ঘর। কল্পবাসিদের নিঃসন্দেহে। কিন্তু কল্পবাসিনীরা যেন বড় বেশী চুমকি বাহার ও হীরে-জহরতের আলোয় পথ দেখে চলেছেন।

মুখে ছিল সিগারেট। একটা বিরক্ত ও গম্ভীর কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কানের কাছে, 'বাঙালীবাবু?'

কণ্ঠস্বরে কিছু টান ও বিসর্গযুক্ত ইতি। পাঞ্জাবীদের মত খানিকটা। ফিরে দেখি, মস্ত বড় পুরুষ, গৌরমূর্তি, গৈরিক বেশ। মাথায় চুলের রাশি, নাকে কাপড়। সারা মুখে অত্যন্ত বিরক্তি।

ফিরতে বলল, 'ফিক্ দিজীয়ে সিগারেট্। মহারাজলোগ্ হরবখত যানা আনা করছেন, তাঁদের নাকে বাস লাগলে আপনার নরকবাস হবে।'

চমকে প্রথমে সিগারেট নেভালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, শিখদের আশ্রম?'

সিগারেট নেভাতে দেখে সে একটু বোধহয় খুশী হল! বলল, 'না। তবু এ আশ্রমের মহারাজ ওটা পছন্দ করেন না। তাছাড়া শিখভক্ত এখানে সব

সময় আসে। আপনায়া হরটাইম্ সিগারেট পিনেসে কৈসে চলেগা। আপলোগ কিসীকো ধরম নহি মান্‌তা।'

আপলোগ মানে কোন লোগ? বাঙালী কি? তেমনই যেন খোঁচাটি। কার ধর্মে সে বাধা দিয়েছে? জিজ্ঞেস করলাম, 'সো' কয়সে মহারাজ?'

প্রশ্ন শুনে একটু বিব্রত হল সে। হঠাৎ সে বলল, 'ওইসা শুনতা হ্যায় বাবুজী। কোলকত্তা কভি নহি দেখা। মগর, উনলোগ বড়ি জায়দা সিগ্রেট পিতেঁ হ্যায়।'

প্রতিবাদ নিরর্থক। পালটা অভিযোগ অনেক তোলা যায়। তুলব কার কাছে? যাক। দেখে যাই। সাধু নিজে ধূমবিরোধী। তাই বিরক্ত। কথার দরকার ছিল না। বললেই নিভিয়ে তার মনতুষ্টি করতে পারতাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কোন্ আশ্রম, মহারাজ?'

বলল, 'সাধুবেলা আশ্রম।' বলে নিজেই চমৎকৃত হয়ে ফিরে আবার বলল, 'হিন্দুকো সবসে বড়িয়া আশ্রম বাবুজী। পাকিস্তানের এলাকায় পড়ে এখন বেনারসে আশ্রয় নিয়েছে। লাখ লাখ টাকা আশ্রমের সম্পত্তি। শ' শ' আদমি আগে খেত সাধুবেলা আশ্রমে।'

লাখ টাকার ঔজ্জ্বল্য আছে সন্দেহ নেই। নেই মিষ্টি ও উদার হাসির স্নিগ্ধতা। জুতো নিয়ে বেরুতে গিয়ে গেটের কাছে চোখ পড়ল রিডিংরুম। মনটা প্রফুল্ল হল। টেবিলের উপর অনেক পত্র-পত্রিকা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক। রাজনীতি, সিনেমা ও সাহিত্য সবই আছে। ইংরেজী, হিন্দী, উর্দু, তামিল, মারাঠী উড়িয়া সবই আছে। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও পেলাম না বাংলা কাগজের একটি টুকরো। কেন, বুঝলাম না। যাকে নইলে চলবে না শুধু সে-ই নেই?

বেরুবার মুখে একজন বাড়িয়ে দিল খাতা ও কলম। দর্শকের স্বাক্ষর। আপত্তি কি? অনেক প্রদেশের বিচিত্র অক্ষরমালার মধ্যে বাংলায় লিখে দিলাম নিজের নামটি। নিচে লিখলাম, বাংলা দেশ।

এ আমার প্রতিবাদ নয়। নয় মনের বিরূপতা। অনেকের মাঝে এ শোভার আধার বাংলা ভাষা, এ লেখনে শুধু সেই তুষ্টি। রূপের মাঝে অপরূপকে দিলাম বসিয়ে।

বেরিয়ে এসে সোজা পাড়ি পশ্চিমোত্তর কোণে যেখানে আলোর সারি ও লোকের ভিড়। কিছুটা আসতেই এক বিরাট বাহিনী। নেতৃত্ব করছে পাঁচুগেপোল। পাঁচবস্তি। চোখ বটে তার। দেখেই হুঙ্কার দিল, 'অ্যাই য্যা!

চাঁদ, কোথায় ছিলে সারাদিন, অ্যাঁ?'

শোন এবার বাঙলা কথা। হকচকিয়ে বললাম, 'কোথায় চললেন?' সে কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলল, 'খুড়ি, এই যে তোমার ছিরিমান। হাঁকপাক করছিলে, কোথায় গেল। এবার জিজ্ঞেস কর।'

তাই তো। তাকিয়ে দেখি, আশ্রমের সমস্ত বাঙালী সবলা ও অবলা যে আজ বেরিয়ে পড়েছে আশ্রম খালি করে! কম করে জনা পনেরো তো বটেই। তার মধ্যে কি অপরূপ। পাঁচবস্তির গা ঘেঁষেই খনপিসি! শুনেছিলাম, দুই শক্তি একত্রিত হলে বিস্ফোরণ অনিবার্য। কিন্তু চাপা জ্যোৎস্নালোকে দেখলাম, শাল-জড়ানো শীতে কাঁপা খনপিসির মুখখানি বেশ প্রশান্ত। খালি বলল, 'সেই ছেলেটা না?'

আর-একজন বলল, 'হ্যাঁ!'

দিদিমা বলল, 'খেয়েছ কিছু সারাদিনে?'

মিথ্যে বলতে হল। বললাম, 'হ্যাঁ, খেয়েছি।'

পাঁচুগোপাল বলল, 'তবে খাওয়া মুখখানি অমন শুকু-শুকু দেখাচ্ছে কেন?'

বললাম, 'অনেক ঘুরেছি কি-না।'

প্রায় ভেংচে উঠল পাঁচুগোপাল, 'থাক্, আর পাক দিতে হবে না। পড়েছ বোধহয় কোন মায়াবীর পাল্লায়? খবোদ্দার, মরবে। চাঁদপানা মুখ দেখবে আর জানটি নেবে, এর নাম কুম্ভমেলা, বোয়েচ? হ্যাঁ।'

না বুঝে উপায়? তার কথার প্রতিবাদ করছি নে আর।

খনপিসি বলল, 'নেও, চল বাপু। গায়ের মধ্যে কাঁপুনি দিচ্ছে। কাল আবার পুন্নিমে! আজ-ই এত শীত, কাল না-জানি কী হবে।'

পাঁচুগোপাল বলল, 'চল চল।'

হুকুমটা আমাকেই করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ঘুরলেন?'

চাপা গলায় বলল, 'নয়কে। ঘোরার কি শালা মাথামুণ্ডু আছে?' গলা ছেড়ে বলল, 'রামকৃষ্ণ আশ্রম গেলুম, আনন্দময়ী দর্শন করলুম।'

চলতে চলতেই কানে এল দিদিমা বলছে, 'খায় নি তার আমি কী করব ঘরে-বাইরে কি আমি এই করতেই আসি যে একজনকেই না একজনকে চিরকাল ডেকে ডেকে খাওয়াতে হবে? তুই ধরে বেঁধে খাওয়ালেই পারতিস?'

পাশ ফিরতেই চোখে পড়ল ব্রজবালার মুখ। জ্যোৎস্নালোকে দেখলাম। অভিমানক্ষুব্ধ চোখ। চোখে চোখ পড়তেই ঘোমটা টেনে আড়াল করল চোখ!

কিশোরী হলেও হৃদয় যে তার রাঙা। মনে মনে বলি, সই বৌঠান আমার বোন! দিন যাচ্ছে, শেষ হয়ে আসছে দেখাদেখির পালা। ঘর থেকে এসেছে দূরে। তবু ঘরের হৃদয়, মন আর চোখ ফিরছে সঙ্গে সঙ্গে, পথে পথে। কে এক পথের মানুষ আত্মীয়তা পাতায়। তাকে ঘিরে রাগ হাসি। তার না খাওয়ার জন্ত অভিমান। নিষ্ঠুর ও তিক্ত জীবনে বুঝি এই লোকগুলিই জীইয়ে রেখেছে আমাদের মানবিকতা।

সারা রাত ঘুম হল না। শীত তো ছিলই। তার উপরে সারা রাত ধরে লোকের চলাফেরা কথাবার্তার বিরাম নেই। কাল পূর্ণিমার স্নান আছে সঙ্গমে। স্নানার্থীদের আগমন হচ্ছে। কিন্তু সে কি সারারাত ধরে? শুধু তাই নয়। জানি নে কিসের এত গান। তাঁবু-কোটরের শীতেই আমরা আধখানা। আর বাইরে স্নানার্থীদের শীত-কাঁপা মিলিত গলায় গানের শেষ নেই। বুঝতে পারছি সব দলে দলে আসছে। শুনেছি, সঙ্গমে ভিড় হবে সাংঘাতিক। তাই রাত থাকতেই সবাই ভিড় করছে এসে আশেপাশে। স্নানের সময় বাঁধা আছে পাঁজি-পুঁথিতে। ঠিক সময়টিতে ডুব দিতে না পারলেই ফসকা গেরো। বুঝতে পারছি দিদিমারও ঘুম নেই চোখে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে। ঠাকুরের নাম নিয়ে জেগে থাকার প্রয়াস শোনা যাচ্ছে ভাঙা গলায়।

শেষ রাত্রের দিকে বুজে আসছিল চোখ। পাঁচুগোপালের চেঁচামেচিতে তা-ও হল না। তার 'ওঠ গো' 'ওঠ গো' ডাকে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তাঁবুতে তাঁবুতে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির হিড়িক। তার মধ্যে শীতের কামড়ের হি-হি-হু-হু। আর দিকে দিকে ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত গলা।

'ও নন্দ, নন্দ। আমাকে ফেলে যাস নি যেন।·· ···'

'ও মাসি, তোমার গামছা কোথা গেল?······'

'ও মা, কাল যে অত করে বেলপাতা কটা পুঁটলিতে রেখেছিলুম সেগুলো তো দেখছি নে।······'

'ননীবালা, আতপচালগুলান নিতে ভুলিস নে লো।···'

'বড় বউমা, ও বড় বউমা, তুমি যে আর শীতে বাঁচচো না বাছা। সধবা মানুষ, পইপই করে রাত থাকতে বলে রেখেছি, সিঁদুরটুকু আচলে বেঁধে নিয়ে

শোও, সঙ্গমে নাইবার সময় দিতে হবে। তা আর……'

এমনি সব নানান কণ্ঠে সাড়া পড়ে গিয়েছে। এটা নাও, ওটা নাও। বুড়িরা কাঁদছে শঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায়। আমাকে নাও, হাত ধর! বুড়োরা গোঙাচ্ছে, হে ভগবান, শক্তি দাও, শক্তি দাও!

অসহ্য শীত। দুরন্ত উত্তুরে হাওয়া। শীত নয়, যেন লক্ষ লক্ষ বিষধরেরা অদৃশ্যে ছোবলাচ্ছে চেরা জিভ বার করে।

কিন্তু সময় নেই, চল চল! সঙ্গমে সঞ্চারিত হচ্ছে অমৃত। জীবন-যৌবন, ধ্যান-ধারণা, কামনা-বাসনার অমৃত ঢেউ লেগেছে, ডুব দিতে হবে, চল চল।'

'বেরজো, ওঠ। চল্ চল্। পেল্লাদ, দাদুভাই আমার, আমার সোনামানিক, চল্ চল্।'

'খনপিসি, চল চল।

'ওগো তোরা আমায় ধর, আমার পা টলছে। আমায় নিয়ে চল।' শীত। সরে যাও! মৃত্যু! দূরে যাও। দুর্বল! শক্তি ধর। অন্ধকার! আলো হও। চল্ চল্! কি পড়ল? ঘটি? থাক। কী রইল? জামা-কাপড়? থাক। সময় নেই! ক্ষণ বয়ে যায়, চল্ চল্!

বাইরে পাঁচুগোপালের তীব্র মোটা গলার ডাক ভেসে আসছে, 'বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়।'

শুনছি। শুধু ডাক, শুধু চল চল আহ্বান। তবু পড়ে রইলাম। বিস্ময়ে হতবাক, দেহ আড়ষ্ট। মন ছটফট করছে, তবু পড়ে রইলাম।

কে ডাকছে। কে ডাক দিল সবাইকে এমনি করে। কার বাঁশি বাজল। কোন্ মন্ত্র শুনল সবাই কানে কানে। কে এত ব্যাকুল হল। কেন এমন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলল সবাই। আশ্চর্য! এই ভয়ঙ্কর শীতে সঙ্গমে ডুব দিতে পাগল হল সকলে?

দিদিমা বলছে, 'পেল্লাদ ছেলেটাকে ডাক।'

প্রহ্লাদ ডাকল, 'কই দাদা, উঠুন, সব কিন্তু ফাঁক গেল নইলে। উঃ! ও হো হো হো, দি'মা, কি শীত রে!'

বেরিয়ে পড়েছে সবাই। খুলে দিল তাঁবুর ঢাকনা। তারপর কে হ্যাঁচকা দিয়ে খুলে দিল আমার কম্বল।

চেয়ে দেখি ব্রজবালা। উল্লাসে, উৎকণ্ঠায় শীতে কাঁপুনিতে অদ্ভুত তার মুখের ভাব। বলল, চাপা গলায় ফিসফিস করে, 'চল, চল তাড়াতাড়ি।'

ব্যাকুল ও করুণ আকুতি। তারপর বেরিয়ে গেল দিদিমা আর স্বামী—ছয়ের মাঝে দেহলগ্ন হয়ে। ডাক পড়েছে। ত্রিপূর্ণিতে ডুব দেবে আজ ব্রজবালা। তার জীবনে ডুব দেবে, তার যৌবনে ডুব দেবে, তার শাঁখাসিঁদুরে, মাছ-ভাতে, স্বামীর পরমায়ুতে আর ভবিষ্যতের আত্মমানিকের অমৃতমথিত ওষ্ঠ-গহ্বরে।

কে গান ধরে দিয়েছে—

চল গো তোরা ত্বরা করে।
সে যে আর রইবে না রে।
সোনার বরণ কালি হলে।
দেখবি অন্ধকার॥
তখন কাঁদবি বসে ধূলায় পড়ে,
দেবতা কাঁদবে দেখে তোরে,
দেখবি, চারদিকে তোর ভরাডুবি,
পাবিনেকো পারাপার॥
তোরা চল গো চল॥

পাঁচুগোপালের গলা শোনা গেল, 'সবাই এসেছে? চল, এবার পা চালাও, চালাও।' পাঁচুগোপাল চালাক। পুণ্যসঞ্চয়ের হাত-ধরা-খুঁটি। জানি নে, এতে পাঁচুগোপালের কতখানি আনন্দ ও লাভ। কিন্তু তার কণ্ঠে একটা চাপা উল্লাসের ধ্বনি বাজছে।

খনপিসি বলছে, 'পাঁচুদা, নাপতে ব্যাটা কোথায় গেল?'

জবাব শোনা গেল, 'আছে, আছে, চল চল। সঙ্গমের ধারে বসে মাথা মুড়োবে, ভাবনা কী?'

মনে হল ফাঁকা হয়ে গেল আশ্রমটা। সবাই চলে গেল, পড়ে থাকি কেমন করে? ডুব না দিই, একলা থাকব কেমন করে? আমি যাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে। ডুব না দিই, ডুবেই তো আছি।

বেরিয়ে এলাম ওভারকোট চাপিয়ে। সামনে দেখা কোতোয়ালজীর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল, যান নি?'

কোতোয়াল বলল, 'আমাদের আজ নয়। অমাবস্যার দিন। ওই দিন পূর্ণকুম্ভ যোগ আছে। আজকেও কম নয়। গ্রহণযোগ আছে। কিন্তু সাধু-সম্প্রদায় আজকে এ যোগে যোগ দেবেন না।'

তাড়াতাড়ি মুখ ধোয়ার জন্য গেলাম পেছনের কল-পাড়ে। গিয়ে অপ্রস্তুত

হলাম। ভেবেছিলাম, কেউ নেই আশ্রমে। কিন্তু রয়েছে।

দেখলাম, তাঁবুর একপাশে নিরুদ্দেশ-স্বামী-সন্ধানী বৌদি। খসা ঘোমটা। আঁচল এলিয়ে পড়েছে ধুলোয়। সিঁথি ও কপালে সিঁদুর। চোখে জলের ধারা। তাকিয়ে আছেন শূন্য দৃষ্টিতে। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে দেবর। গম্ভীর, ম্লান ও ব্যথিত।

কোন কথা নেই। দুজনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপচাপ। আশ্রম পেছনের এই নিরালা প্রাঙ্গণটিও যেন একান্ত হয়ে ছিল তাঁদের সঙ্গে। গতকাল, দূর থেকে পোশাকের ঔজ্জ্বল্যে তাঁদের এই রূপটি আমার চোখে পড়েনি, মনেও আসেনি। শুধু ব্রজবালার কাছে শুনেছিলাম, বউটি কথা বলে না কারুর সঙ্গে। সে নির্বাক।

ইতিমধ্যে রোদ উঠতে আরম্ভ করেছে। আজ এই সোনার মত সকালে সবাই মৃত্যুর বিনিময়ে যখন ছুটে চলেছে প্রাণের সঙ্গমে, তখন এই নিরালায় দাঁড়িয়ে তাঁরা দুজন।

তাঁদের পরিচয় জানি নে। জানি নে মন। মনে হল, এই নিঃশব্দ আসরে বেদনার ও চোখের জলের একটি আবেগময় সুর বাজছিল। এই নিরালা অবসরেই মানুষ তার ব্যথার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, ব্যথার গৌরবে পারে হাসতে কাঁদতে।

আমি অজান্তে এসে কেটে দিলাম সুর। ভেঙে দিলাম আসর। বৌদি চকিতে একবার আমাকে দেখে ঢুকে গেলেন তাঁবুতে। দেবর রইলেন দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত নতমস্তকে। তারপর ঢুকে গেলেন তিনিও।

আমার মুখ ধোয়া হল না। কলে গিয়ে জলে হাত দিয়ে চলে এলাম তাড়াতাড়ি।

বাইরে বেরিয়ে আসতে ভিন্ন রূপ। কোন কিছু ভাববার অবসর ছিল না। চোখ ও মন টেনে নিয়ে গেল আদিগন্ত বালুচরে। দিশাহারা করে দিল আমাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমুদ্র।

কোথায় যাব, কোন দিকে যাব। যে দিকে তাকাই, মানুষ। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ। এক বিরাট পাগলা বন্যার ঢল নেমেছে দক্ষিণে। দিগন্তবিস্তৃত মৌমাছিরা চাক ভেঙে যেন কোন এক সংক্ষিপ্ত সরু পথে উড়ে চলেছে। সেই সরু পথ দক্ষিণে। গঙ্গার এপার ওপারের ছুটে-চলা মানুষ যেন কোন এক নিয়মের বশবর্তী হয়ে চারদিক থেকে এসে এক জায়গায় অগ্রসর হচ্ছে।

দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া সম্ভব বোধ হল না। পুল পেরিয়ে চলে এলাম প্যারেড গ্রাউণ্ডে, বাঁধের নিচে।

সবাই ছুটে চলেছে সঙ্গমের দিকে। দল বেঁধে যাওয়া-আসার পথের নির্দেশ দিয়েছে পুলিস। দাঁড়িয়ে থেকে পরিচালনা করছে উদ্বাস্তু ভলান্টিয়ারবাহিনী। দিকে দিকে কর্ণবিদারী তাদের হুইসেলের তীক্ষ্ণ ধ্বনি। ঘন ঘন বিপদ সঙ্কেত বাজছে বাঁশি।

ধাক্কা খেয়ে সরে গেলাম অনেকখানি। দাঁড়াবার উপায় নেই। সঙ্গমের ঢালুতে বন্যা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। মাইক বাজছে, বিউগল সঙ্কেত করেছে, বয়স্কাউটবাহিনী করছে কুচকাওয়াজ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আসবেন। বাঙলা দেশের কল্যাণী কংগ্রেসের পথে দেখে যাবেন একবার।

বাঁধের উপর উঠেছে সারবন্দী হাতির দল। গায়ে তাদের রাজকীয় জরি-মখমলের ঢাকনা। সওয়ার ছাই-মাখা সাধু। সেদিকে ছুটে চলেছে একদল মেয়ে। অবাক হয়ে ভাবলাম, কেন? এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম, মেয়েরা দৌড়ুচ্ছে, আর চেঁচাচ্ছে, 'হে ভগবান, হে বাবা, থোড়া ঠয়রো, ঠয়রো।'

কিন্তু ঘণ্টা দুলিয়ে বাজিয়ে হস্তিবাহিনী উঠে চলেছে। তার মধ্যে একটি মেয়ে ছুটে গিয়ে হাতির গায়ে হাত দিল। হাসিতে আনন্দে অধৈর্য হয়ে সে হাত কপালে ছোঁয়াবার আগেই, হাতির পেছনের পায়ের লাথিতে সে ছিটকে পড়ল অনেক দূরে।

তবুও, তবুও আবার ছুটল। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে, ওরা হাতির পেছনে কেন?'

শুনলাম, হাতি স্পর্শ করে প্রণাম করবে। সে-ই হবে তার পুণ্য। ধন্যি পুণ্য। প্রাণে ভয়ও কি নেই?

অকস্মাৎ, 'হট যাও, হট যাও' শব্দে চমকিত হয়ে সরে দাঁড়াতেই দেখলাম, একদল মানুষ ছুটে আসছে। দলের সামনে ছিন্নভিন্ন ধুলো-মাখা আলখাল্লা জড়ানো একদল মানুষ। কিন্তু মানুষ বলে আর তাঁদের চেনা যায় না। ধুলি-মাখা চুল-দাড়িতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে তাদের সারা মুখ। পা-গুলি ফুলে ফেটে রক্ত ঝরছে। কাঁধে বড় বড় ঝুলি। তারা দ্রুত পায়ে চলেছে।

তাদের পেছনে পেছনে ছুটেছে মেয়ে-পুরুষের দল। আছড়ে পড়ছে তাদের পায়ের তলায়। চীৎকার করে উঠছে, 'দেয়া কর বাবা, দেয়া কর!' লুটিয়ে পড়ছে সুবেশ পুরুষ, মহামূল্য অলঙ্কার ও শাড়ি-শোভিতা নারী।

কিন্তু আলখাল্লাবাহিনী নির্দয়। তারা থামতে জানে না।

মানুষ ছুটে ছুটে খাবার ও পয়সা পুরে দিচ্ছে তাদের ঝুলিতে।

একটি অল্পবয়স্কা নবীনা ঘোমটাউলী দু-হাত আড়াল করে দাঁড়াল একজন আলখাল্লাধারীর সামনে। থামতে হল আলখাল্লাধারীকে। কিন্তু সৈনিকের লেফট-রাইটের মত ওঠাপড়া করতে লাগল তার পা। চুলে-ঢাকা চোখে তার ক্রোধ নেই। ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা, মিনতি ও প্রার্থনা।

ঘোমটাউলী সুদৃশ্য রুমাল বার করে কয়েকটা টাকার নোট পুরে দিল তার ঝুলিতে। দিয়ে হাত পাতল।

আলখাল্লাধারী তার আলখাল্লায় খামচা দিয়ে এক চিলতে ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে গুঁজে দিল তার হাতে। দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

'মিল গয়া, মিল গয়া!' বলে চেঁচিয়ে উঠল অনেকে। কিছুই বুঝলাম না। কারা এরা, কী ব্যাপার! জিজ্ঞেস করলাম একজনকে।

সে বলল, 'ওরা মহাপুরুষ। ওরা এ জীবনে কোন দিন থামবে না। ওরা ওদের সাধনার প্রথম দিন থেকে ছুটে চলেছে। জীবনভর ছুটবে। এই ওদের সাধনা।' আশ্চর্য! মানুষের জীবনধারণেই বা তা কী করে সম্ভব, কিন্তু বিতর্ক অনাবশ্যক। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নাম ওদের?'

সে বলল, 'জানি নে।'

সালঙ্কারা ঘোমটাউলী আনন্দে খুশিতে হাসতে হাসতে চলেছে তার পরিজনদের সঙ্গে। ওই চিলতে ন্যাকড়ার আনন্দ।

আবার ধাক্কা। সরে যাও, ঢল নেমেছে। হা হা করে ছুটে আসছে নরনারী। গতি সঙ্গমের দিকে। সে কি শুধু গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম? নাকি, বিচিত্র মানুষ সেখানে সঙ্গম তৈরী করেছে সহস্র স্রোতের মিলিত মোহনায়।

স্রোতের টানে ভেসে গেলাম। একদল মেয়ে হাসছে, গান করছে, ঠেলে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেখলাম, সকলেই গৈরিকবসনা। যুবতীর সংখ্যা বেশী, প্রৌঢ়া কয়েকজন। যেন দুটি দল। একদল মেয়ে, ফরসা লাল টুকটুকে, বোঁচা নাক, টেপা ঠোঁট, খুদে চোখ। খাটো গড়ন। বাকিরা সকলেই আর দশজনের মত। কটা কটা চুল এলিয়ে, হাসি-খুশি খেলায় তারা বনবালার মত উদ্দাম হয়ে চলেছে। কারুর কারুর মস্তক মুণ্ডিত। চোখাচোখি হলেই, চোখে-মুখে ঝলকে ওঠে হাসি। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করে ফেললাম একজনকে,

'আপনারা কোত্থেকে আসছেন ?'

সর্বনাশ। এ যে সেই আমাদের দলের মত কথার পৃষ্ঠে কেবলি হাসি। হেসে একজন বলল, 'আমরা হরিদ্বার থেকে আসছি। তুমি ?'

বললাম, 'বাঙলা দেশ।'

'কোলকাতা ?'

আবার হাসি। জনতাও কৌতূহলিত হয়ে তাকাল এদিকে। এক গৈরিক-বসনা বললেন, 'আমরা অবধূতানী। আমাদের আশ্রম আছে হরিদ্বারে।'

অবধূতানী! মনে পড়ল সেই গৃহাবধূতের কথা। মনে পড়ল তার অবধূতানীর হাসি-খুশি মূর্তিখানি। কিন্তু এরা কার অবধূতানী ?

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। পথের দুপাশে ভিক্ষুকের ভিড়। সুস্থ, অসুস্থ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, অন্ধ। তাদের সামনে বিছানো ময়লা কাপড়ে ডাল চাল ফুল পয়সার ছড়াছড়ি। এরই মধ্যে সাপুড়ে বসে গিয়েছে সাপ নিয়ে। ময়াল ছেড়ে দিয়ে বসেছে ওষধি লতাপাতা ছড়িয়ে। তাদের চীৎকারে কান পাতা দায়।

হটযোগীরা আরম্ভ করেছে যোগ দেখাতে। মাটির তলায় মাথা দিয়ে উর্ধ্বে তুলে দিয়েছে পা। কেউ চিত হয়ে, খালি গায়ে শুয়ে আছে কণ্টকশয্যায়।

এক জায়গায় দাঁড়াতে হল। বছর দশেকের একটি ছেলে, ছাই মেখে শুয়ে আছে কাঁটার বিছানায়। মুখ হাঁ করে রয়েছে। জিভে ফোঁড়ানো লম্বা একটি তীক্ষ্ণ সরু ত্রিশূল। তার লাল চোখ বেয়ে জল পড়ছে। কাঁপছে থর থর করে।

বিস্ময়ে ব্যথায় চমকে উঠলাম, এইটুকু ছেলেকে দিয়ে কেন এ ভয়াবহ ধর্ম-লীলা। এ মহামেলায় এমন করুণ দৃশ্যের অবতারণা কেন ?

পরমুহূর্তেই মনে হল, শুধু কি ধর্ম ? প্রাণের এ যন্ত্রণার মধ্যে কি ওর কোন সাধনা নেই ? বাঙলা দেশে কত ছেলে পথে পথে, বাজারে ট্রেনে এমনি ভয়ঙ্কর সাধনায় ব্যস্ত। সেই সাধনা তাদের পেটের। তাদের বাঁচবার সাধনা।

আমার ব্যথার দৃষ্টিদানে ওর থলি ভরবে না। এই নিদারুণ যন্ত্রণাতেও দেখছি, ওর ব্যাকুল নজর রয়েছে সামনে বিছানো কাপড়ের দিকে। ওর সাধনার ডালি ভরে উঠেছে কিনা, তাই। মেয়েরা ঘিরে রয়েছে ওর চারদিক থেকে। করুণার বিচিত্র শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের মুখে।

থাক করুণা। যা দিয়ে ও মানুষের দৃষ্টিকে খোঁচা দিয়েছে, ওর সেই প্রাপ্য মিটিয়ে এগিয়ে গেলাম।

জলের ধারে এসে সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ধারের কাছে পাঁক হয়ে উঠেছে জল। আর সেই পাঁকের মধ্যে ক্ষিপ্ত মোষের মত ঠেলাঠেলি করছে মানুষ। মেয়ে আর পুরুষ। বৃদ্ধ ও শিশু। ওদিকে সঙ্গমের বুক জুড়ে নৌকার ভিড়। দড়ির সীমারেখা দিয়েছে বেঁধে যমুনার কোলে। প্রতিমুহূর্তে সেখানে বাজছে ভলান্টিয়ারের হুইসল্, উড়ছে পতাকা। ওইটি হল ডেঞ্জর জোন। নীল জলের প্রাণ-ভোলানো হাসির ঢেউয়ের তলায় চিরমৃত্যু রয়েছে তার পাকে পাকে, চোরা বালুতে। ওই যমুনার জলে যে মরেছে, সে আর কবে উঠেছে!

ঠেলাঠেলি করছে, তবু উল্লাসের অন্ত নেই! এ ওকে চান করাচ্ছে, ও একে বুকে করে নিয়ে চলেছে জলে।

'মহারাজ, মহারাজ', বলে দু-হাত জড়িয়ে ধরল এক বুড়ো। বললাম, 'কী করব?'

সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল জলের কিনারে। তারপর আমার হাতখানি ধরেই জলে কাদায় মাখামাখি করে উঠে এল। কী হাসি! ফোকলা দাঁতে এক গাল হেসে কাদা হাতখানি ঠেকিয়ে দিল মাথায়, 'জীতা রহো বাবা। পানিমে বহুত ডর, সাঁতার নহি জানতা।'

তাই ভাল। আমাকে ধরে সে চান করে নিল। দুঃখের মধ্যে কাদা লাগল জামা-কাপড়ে।

এখানে লজ্জার অবকাশ নেই। কারুর কাপড় খুলে গিয়েছে, কেউ নিজেই রেখেছে খুলে। কেউ অন্তর্বাসটুকু পরিত্যাগ করেছে। জামাটি অদৃশ্য হয়েছে গায়ের থেকে। সবই ঠিক। তবু, পাঞ্জাবী মহিলারা এদিকে যেন বড় উদাসীন। একে তো অধিকাংশই সাঁতার জানেন না। কিন্তু নির্বিকারভাবে তাঁরা কেমন করে শালোয়ার পাঞ্জাবী খুলছেন। কেমন করে এত লোকের সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে হাসতে হাসতে জলে নেমে আসছেন, জানি নে। হয়তো ওঁদের দ্বারাই সম্ভব এমনি মরালীর মত জলখেলা।

দেখলাম, একজন মাঝি হাঁকছে, দো দো আনা আস্থন। বেশ বড় নৌকা। অনেকে উঠছে। সঙ্গমের মাঝখানের দিকে তাকিয়ে আর থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম মাঝির হাত ধরে। পাশে রয়েছে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা। ঐ নৌকার গলুই সেই বাংলা দেশের মত। অল্পতেই ডিঙা টলমল নাচে। অথচ ছোট ছোট ডিঙাতে পাতা রয়েছে গদীমোড়া বেঞ্চি। মাথায় ঢাকনা। কিন্তু এ বড় নৌকাতে ছই বেঞ্চি কিছুই নেই।

আমাদের নৌকা ভরে উঠল। তবু মাঝি ছাড়ে না। সবাই তাড়া দিল। মাঝির দায় কাঁদছে। সে তখনো হাঁকছে, 'সঙ্গমে নাইবে এসো, ছু-আনা, ছু-আনা।'

তারপর যখন নৌকা ডুবু-ডুবু হল, তখন ছাড়ল। মাঝি খেলা জুড়ল ভাল। একি ভয়াবহ নৌকাবিলাস, আমাদের মত নিতান্ত বেরসিক নরনারী নিয়ে। শুধু হাসির অন্ত নেই কয়েকটি আধুনিক গরম স্যুট-পরা পাঞ্জাবী যুবক ও যুবতীর। অথচ ভয় তাদেরই বেশী। সাঁতার জানে না। আসলে হাসিটাই ভয়ের। নৌকা যত টলমল করে, ততই তারা ভয়ের হাসি দিয়ে জাপটাজাপটি করছে নিজেদের মধ্যে। পুণ্যস্নানের সাত সকালে, চোখে মুখে মেয়েদের প্রসাধনের পলেস্তারা পড়েছে। জামাকাপড়গুলিও জলে নামার মত নয়। বাদবাকি সবাই জড়োসড়ো, উদ্ভ্রান্ত। একটি বাঙালী পরিবারও উঠেছে দেখছি। তিনটি প্রৌঢ়া আর দুই যুবক। অলেস্টারের কলারে আর মাথায় জড়ানো তোয়ালে। এদিকে আবার ঘাড়ে ক্যামেরা।

কুল্যে প্রায় জনা ত্রিশের উপর নরনারী ভিড় করেছে উন্মুক্ত পাটাতনের উপর। ঘাড়ে মাথায়, বুকে মুখে, কাঁধে কোলে পিঠে। তার মধ্যে মনে হল দুটি কিশোরী, একটি কয়েকমাসের শিশুকে নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পোশাকে চাকচিক্য নেই, কিন্তু অলঙ্কারের বাহুল্য দেখছি খুব। হাতে গলায় কানে সোনা প্রায় অপর্যাপ্ত। তা ছাড়াও একজনের হাতে দেখছি রাশখানেক বেলোয়ারী চুড়ি। কিন্তু শিশুটিকে এনেছে কেন, বুঝতে পারলাম না।

ডাঙায় জনারণ্য, জলে নৌকারণ্য। দাঁড়ে দাঁড়ে, বৈঠায় বৈঠায়, হালে ঠোকাঠুকি। গলুয়ে গলুয়ে ধাক্কাধাক্কি। মাঝিতে মাঝিতে বিবাদ। হটাও, পাশ দাও। শুধু নৌকার ভিড় নয়, জলের মধ্যে ভিড় মানুষের। কোমরজলে, বুকজলে ডুব আর দারুণ শীতের হিহিকার। তার উপরে নৌকার ধাক্কা। ডুব অবস্থায় একবার চাপলে আর রক্ষে নেই।

মাঝি বলল, 'এখানেই নেমে পড় সব।'

প্রতিবাদের প্রচণ্ড কলরব উঠল। নৌকাই যখন ভাড়া হল, এত শীঘ্র কেন? মাঝি বললে কী হবে। কেউ-ই নামে না। আরো চল, আরো চল।

চারপাশের নৌকাগুলিতে ঝড় লেগেছে। স্নানের ঝড়। কেউ নৌকা ধরে, কেউ হাত ধরে স্নান করছে। হাসিতে, কান্নায়, কলহে চীৎকারে মুখরিত সঙ্গম।

জলের উপর ভাসছে ফুল বেলপাতা। ঘোলা নীলজলে কোথাও সিঁদুরের

ভঁড়ো। কিন্তু আশ্চর্য! এই ঘোলাজলের বুকেও দেখছি দুটি রঙের ধারা চলেছে পাশাপাশি। বর্ষা নয়, গঙ্গা তার স্বভাব-গৈরিক বেশ ধারণ করে নি। তার নিরন্তর দক্ষিণাভিমুখী জলের ধারা এখন টলটলে। যত এগিয়ে চলেছি, ততই ঘোলা জল ছাড়িয়ে পরিচ্ছন্ন জলের ধারা দেখা দিচ্ছে।

পাশাপাশি চলেছে যমুনা-গঙ্গা। সাদা নীল দুই ধারা। একজন উত্তর থেকে দক্ষিণে, দৃক্‌পাতহীনা। আর-এক জন পশ্চিম থেকে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে। সে শুধু বাঁক নয়। বাঁকা তার স্বভাব। একজন রাগে অনুরাগে, যুগান্তের বিরহের বেদনার রঙে নীল। আর-একজন সব পাওয়ার আনন্দের বৈরাগ্য উদাসীন গৈরিক-বসনা। একজন হাসে খিলখিল করে, আর-এক জন খলখল হাসিতে উন্মাদিনী। তবুও দুজনে পাশাপাশি, একই প্রেমের টানে তারা দিগন্তে চলেছে ছুটে। সরস্বতী কোথায়? শুনেছি তিনি গুপ্ত আছেন।

আর নয়। নৌকা থামল। হাওয়া আরো বেশী, ঢেউয়ে দুলছে নৌকা। কিন্তু জল সেই বুক সমান। তার বাইরে চারিদিক দড়ির বেড়ার পাহারা।

নৌকার পাশে নৌকা। তারই মাঝে প্রাণ হাতে করে স্নান। দুই নৌকার মাঝখানে পেশাই হয়ে মরে গেলেও কেউ রক্ষে করার নেই।

জামাকাপড় ছাড়ার পালা শুরু হল। ছি ছি, মনে মনে বলি, হে মন! চোখ বন্ধ কর। পাঞ্জাবী মহিলাদের জামাখোলার কাহিনী আর বলব না ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে। কিন্তু তাঁরা নামবেন কি করে? মাঝি বেচারীর অবস্থা কাহিল। সবাই তাকে ধরেই ডুবে ডুবে পুণ্যিটুকু সঞ্চয় করতে চায়। যৌবন-উচ্ছল হাসি-ছলছল, অর্ধনগ্ন পাঞ্জাবী মহিলাদের পাল্লায় পড়ে, ফোগলা-দেঁতো মাঝি হাসিতে বিরক্তিতে 'হায় রাম রাম' করে অস্থির। কিন্তু জলে যদি নামা হল উঠবার নাম নেই। ধন্য! শীতও কি নেই?

সকলেই জামা কাপড় ছাড়ে, আর চায় আমার দিকে। ভাবটা, কে গো মিনসে? জামাকাপড় খোলে না কেন?

হঠাৎ চমকে উঠলাম চাপা কান্নার ফোঁপানিতে। কে কাঁদে এখানে? সেই দুইজন! যাদের মনে করেছিলাম কিশোরী। সেই তাদের একজন, কোলে যার কয়েকমাসের শিশু।

আর একজন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, হাতে যার বেলোয়ারী চুড়ি, 'রহো, মত রো।' বলছে, কিন্তু চোখে তার ব্যথার ছায়া। মেঘভারাক্রান্ত সেই চোখে জল নামবে যেন এখুনি, কিছুটা বা লজ্জা! লজ্জাটুকু লোকের জন্য। কিন্তু লোকের নজর তার দিকে ছিল না। সকলে ডুবে ডুবে পুণ্যসঞ্চয়ে মত্ত।

তারা কিশোরী নয়, তরুণী। কিশোরীর ছাপ রয়েছে তাদের মুখে। কিন্তু যখন সবাই হাসিতে, কাঁপুনিতে, স্নানে, কোলাহলে মাতিয়ে তুলেছে সঙ্গম, তখন তারা দুটিতে কেন পাশাপাশি বসে চোখের জল ফেলছে!

তারা দুজনে পুঁটলি খুলল। পুঁটলির মধ্যে জামা কাপড়। উপরের জামাকাপড়টি দেখে মনে হল, সাদা মুগার। সকালের রোদের ঝিকিমিকি লেগেছে তাতে। আরও দুটি বস্তু রয়েছে সেই কাপড়ের উপরেই। দুটি সোনার বালা।

গরম-জামা-পরানো শিশুটিকে ভেজা পাটাতনের উপরে শুইয়ে দিল। শুইয়ে দিতেই, শিশুটি শুরু করল পরিত্রাহী চীৎকার। কেন জানি নে, মন ব্যস্ত হয়ে উঠল, কুঁকড়ে রয়েছি। শিশুর এই অসহ্য পীড়ন যেন লাগল শরীরের প্রতিটি রোমকূপে।

কিন্তু সে কান্নায় কান দিল না তারা। যে কাঁদছিল, তাকে ধরে দাঁড় করাল আর-একজন। সে দাঁড়াল, কিন্তু সঙ্গিনীর বুকে মুখ রেখে ভেঙে পড়ল উচ্ছ্বসিত কান্নায়। বাতাসে খসে গিয়েছে তার ঘোমটা, উড়ছে রুক্ষ চুলের গোছা। এবার তার সঙ্গিনীও ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'কাঁদিস নে শিবপিয়ারী, বোন আমার কাঁদিস না।'

কিন্তু আশ্চর্য! তাদের সঙ্গে নেই কোন পুরুষ সঙ্গী। এ নৌকার কোন মানুষের নজর নেই সেদিকে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বুঝলাম, সবাই ভাসছে নিজ নিজ হৃদয়াবেগে। সেই তিন বাঙালী প্রৌঢ়াদের একজন কাঁদছে জলে দাঁড়িয়ে। ডুব দিয়ে উঠেছে, কাঁপছে শীতে ঠকঠক করে, তবু জলের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে আর ফিসফিস করে বলছে অনেক কথা।

এদিকে শিশুটি, কান্নার আবেগে, নিজের দুটি পা ধরেছে মুঠি করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে প্রায় নিজেরই মুখে। তারপরেই হঠাৎ কাত হয়ে, উপুড় হয়ে পড়ার মুহূর্তে হাত দিয়ে ধরে ফেললাম। ধরে তুলে নিলাম কোলের উপর।

মেয়ে দুটি অবাক হয়ে তাকাল চোখের জল নিয়ে। তারপর কৃতজ্ঞতা দেখা দিল। এমন কি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এমন করে ফেলে রেখেছ কেন ওকে?'

শিবপিয়ারীর সঙ্গিনী বলল, 'আমরা স্নান করব।'

কী স্নান! ভেজা পাটাতনের উপর শিশুকে রেখে পুণ্য করতে নামছে দুটিতে। নৌকায় ভিড়ের চাপেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বাচ্চাটাকে কেন?'

সঙ্গিনী বলল, 'ও চান করবে।'

চান? পৃথিবীতে আসতে না আসতে পুণ্যস্নান? জিজ্ঞেস করলাম, 'ওকে কেন? তোমরা করলে হত না?'

দুঃখ থাক, বেদনা থাক, এমন করে কথা আরম্ভে তারা দুজনেই কিছুটা বিব্রত, সঙ্কুচিত। একটু চুপ করে থেকে সঙ্গিনী বলল, 'ওর বাবা নেই, ওকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে, না চান করালে চলবে কেন?'

বলতে বলতেই দেখলাম, সঙ্গিনীর শিবপিয়ারী আবার ব্যাকুল হল কেঁদে। তারপর দুটিতে নৌকার ধারে গেল। সঙ্গিনী বলল, 'ওর মাকে একটু চান করিয়ে দিই। তুমি—'

বাদবাকি চাউনিতেই প্রকাশিত। 'তুমি বাচ্চাটাকে দেখো।'

ওরা নেমে গেল জলে। ডুব দিল। আর উত্তরপ্রদেশের এই দুরন্ত পিতৃহীন শিশু এক অপরিচিত বাঙালীর কোলটি কচি কচি পা দুটো আছড়ে ঠেলে, শূন্যে হাত তুলে লালা উদ্গীরণ করে মাতিয়ে তুলল। বুঝলাম, যুবতী শিবপিয়ারী বিধবা। এই শিশুর মা।

শিশু মানুষ চেনে না বুঝি এখনো। মানুষের উষ্ণ কোলটি বুঝেছে। কোলটি পেয়েছে, অমনি চারিদিকে আলো ও শব্দের মাঝে তার বিচিত্র জগতে গিয়েছে হারিয়ে।

সকলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম, পুণ্যস্নান দেখব বলে। কোথা থেকে এসে বুক জুড়ে বসল এক শিশু। তার পরিচয় জানি নে। কেমন ছিল তার বাপ, কে জানে! ওর মায়ের দেহে অলঙ্কার দেখে অনুমান করতে পারি নি, সে বিধবা। জানি নে, ওই অলঙ্কারের পেছনে কতখানি নিরাপত্তার খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে এই শিশুর জন্য। পিতৃহীনতা বোঝে না, পুণ্য বোঝে না। এই সঙ্গমের বুকে এক বিচিত্র মানুষ, ও এসেছে, ওর পরমায়ুর সন্ধানে, এই অমৃতকুম্ভের সঙ্গমে। ওর এই পরমায়ুর সন্ধান পীড়ন মাত্র। এই পীড়নের পেছনে আছে কুসংস্কার। কিন্তু ওর মায়ের সারা বুক জুড়ে রয়েছে ও। প্রাণের আকাঙ্খার মর্যাদাই এখানে বড়। কুসংস্কার তো সমাজের অভিশাপ।

ওর বাবা নেই, সেজন্য যতটুকু ব্যথা, ওর বুকজোড়া দাপাদাপি সেই পরিমাণেই উল্লাসের ধ্বনি হয়ে বাজল বুকে। এক সঙ্গীকে হারিয়েছিলাম পথে আসতে। সে আসছিল তার ব্যাধিমুক্তি ও আয়ু সন্ধানের জন্য। আমরা একজন মরি, আর একজন জন্মাই। দিবানিশি এই যাওয়া-আসার মধ্যে আমরা নতুন থেকে নতুনতর। একজনের আকাঙ্খা পুরাই আর-একজন।

একজন পথের শেষে, শুরু করি আর-একজন। সেইজন্ত আমরা মানুষ, আমরা বন্ধু!

একজন বিড়ম্বিত জীবনের গ্রাসাদ করালরোগ নিয়ে চলে গিয়েছে আর-একজনকে আলিঙ্গন করছি। ওকে পথে পেলাম, পথেই ছেড়ে দিয়ে যাব। ও বেঁচে থাক, পথের এই কামনা নিয়ে ঘরে ফিরে যাব।

শিবপিয়ারী উঠেছে, কাপড় ছেড়েছে। কথায় বুঝলাম, তারা দুই জা। বাড়ি এলাহাবাদ শহরেই।

নতুন কাপড় পরে শিবপিয়ানী পুঁটলি থেকে ফুল-বেলপাতা গোছাতে গোছাতে বার বার গুপ্ত কটাক্ষে দেখল তার শিশুকে। তার ঘোমটা তুলে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দাও।'

তুলে দিলাম। দুজনে মিলে শিশুর জামা খুলে, আবার শুইয়ে দিল পাটাতনে। দিয়ে, অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে ছিটিয়ে নাইয়ে দিল তাকে। আর-এক দফা চিলকণ্ঠের চেঁচানি ছাপিয়ে উঠল। লক্ষ লক্ষ গলার চীৎকার। জামা পরিয়ে তার হাতে পরিয়ে দিল সোনার বালা। তারপর ওকে আবার শোয়াতে গিয়ে অসঙ্কোচে তুলে দিল আমার কোলে।

দিয়ে নিজেরা ফুল বেলপাতা সিঁদুর দিল জলে। হঠাৎ কি হল জানি নে।

শিবপিয়ানীর হাত চেপে ধরল তার জা। কিন্তু শিবপিয়ানী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের হাত থেকে দুটি সোনার চুড়ি খুলে ফেলে দিল জলে।

শুধু তার জা ম্লান হেসে বলল, 'পাগলী।'

কিন্তু বাধা দিলেও আক্ষেপ নেই তার আর। এবার আমার দিকে ফিরে একটু হাসল শিবপিয়ানী। হেসে, দেখল নিজের ছেলেকে। এবার আর নিজে না বলে, সঙ্গিনী জাকে বলল, 'ওকে আমার কোলে দাও।'

বুঝে, আমি নিজেই শিশুটিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলাম।

মাঝি হাঁক দিল, 'ওঠো ওঠো! আমাকে আবার খেপ দিতে হবে।'

এখনো অনেকেই জলে। শিখ গৃহিণীদের দেখছি এখনো ওঠবার সময় নেই। স্বয়ং শিখ পুরুষেরাও নেমেছে।

হঠাৎ ওভারকোটে টান পড়তে পেছনে ফিরলাম। দেখি, আলুলায়িত সিক্ত কেশ ও শ্মশ্রু উৎফুল্ল শিখ একজন। চোখে তার রীতিমত দুষ্টামির হাসি। বল, 'আরে ভাই, তুমি জলে নামছ না কেন?'

সর্বনাশ। জলে নামব কি এইসব জামাকাপড় পরে। বললাম, 'বিমার হ্যায়।'

যতক্ষণ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, ততক্ষণে জলের ছিটায় ভিজে উঠেছে আমার ওভারকোট। একলা নয়, সঙ্গিনীসহ হাসিতে চীৎকারের ভয়াবহ জলকেলিতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। হেসে বলল, 'আরে ভাই, থোড়া তো লাগাও।'

লাগাব কি! ঠাণ্ডা জলের কয়েকটি ধারা তখন শরীরটাকে কেটে কেটে নীচে নামছে। সকলেই হেসে উঠল।

মাঝিটাও হাসতে গিয়ে যেন কেঁদে উঠল। বলল, 'নৌকা ছেড়ে দেব কিন্তু।'

আবার নৌকার ভিড় ও মানুষের মাথা ঠেলে ফিরে আসা।

পাড়ে এসে, ভিড়ের মধ্যে দেখলাম খনপিসী। প্রায় বিপুলকায় পুরুষের মূর্তি ধরেছে। মাথাটি একেবারে নিরঙ্কুশ মুণ্ডিত। কী কাণ্ড! প্রহ্লাদ, দি'মাও দেখছি ন্যাড়া মাথা।

তখনো নৌকা থেকে নামা হয় নি। প্রহ্লাদ দেখে ফেলল। বলল, 'এই যে দাদা, বেশ হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন। মাথা মুড়োবেন না?'

হেসে বললাম, 'না।'

প্রহ্লাদ বলল, 'কেন? পাপ করেন নি কোনদিন?'

জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেললাম। প্রহ্লাদ বলল, 'করেছেন নিশ্চয়ই। মুখ দেখেই মনে হচ্ছে। জানেন না।'

প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা।
মরগে' পাপী যথা তথা॥

'মুড়িয়ে নিন, তারপর আবার পাপ করবেন, কিছু হবে না, আগের পাপটা তো কাটান।'

খনপিসী খ্যাঁক করে উঠল, 'ছি ছি ছি, কি অনাচ্ছিষ্টির কথা। সঙ্গমে দাঁড়িয়েও মুখের রাখ-ঢাক নেই?'

প্রহ্লাদ অন্যদিকে ফিরে বলল, 'আর রাখ-ঢাক। শালা এখনো সকাল থেকে দু-হাত এক হল না, সঙ্গম দেখাচ্ছে।'

দু-হাত এক হওয়া মানে, দু-হাতে কলকে ধরা। ভাগ্যি কথাটা খনপিসির কানে যায় নি। ব্রজবালা জলে নেমে কাঁপছে ঠকঠক করে। চকিতে একবার আমাকে দেখল, তারপর আবার ঘোমটায় আড়াল।

আমাদের নৌকা পাড়ে ঠেকল প্রায় খনপিসিবাহিনীকে ভেদ করে।

নৌকা থেকে সবাইকে হাত ধরে ধরে নামাল মাঝি। শিবশিয়ানী আর

তার জা নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে ছিল বলতে পারি নে। ভয়াবহ ভিড়ের ঝড়ে খাড়া হয়ে ছিল কোনরকমে।

আমি নেমে আসতে শিবপিয়ানীর জা বলল, 'যাচ্ছি!'

বললাম, 'আচ্ছা।'

শিবপিয়ানী তার কোলের ছেলেকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'বল্ যাচ্ছি!'

আচমকা ঝাঁকানি খেয়ে শিশু একটু অবাক হয়ে থমকে রইল। পরমুহূর্তে হাত-পা আস্ফালন করে কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দ করে উঠল তার মাড়ি দেখিয়ে। শিবপিয়ানী ঘোমটার আড়াল দিয়ে একটি হাসিচকিত কটাক্ষে যেন বলে দিল, 'দেখলে তো, কেমন বলতে পারে?' তারপর শিশুকে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল তারা।

একটি নিঃশ্বাস ফেলে আবার ফিরে দেখতে গেলাম খনপিসিবাহিনীর দিকে। কিন্তু ও কে? খনপিসির পাশে? সর্বনাশ! সর্বনাশী স্বয়ং? আমারই বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। না জানি কী দুর্ঘটনা ঘটে যাবে চক্ষের পলকে! কিন্তু কী আশ্চর্য! এত কাছে, প্রায় গায়ে গায়ে, তবু খনপিসির চোখে একবারও পড়ছে না সর্বনাশী।

আর এ কি বিচিত্র রূপ সর্বনাশীর! এ বিচিত্র বেশ তার কাপড়ে নয়, জামায় নয়, সিঁদুরে। তার সিঁথি-ভরানো সিঁদুরে, তার কপাল-লেপা সিঁদুরে। কপাল ও সিঁথির মেটে সিঁদুরে মাখামাখি হয়েছে সারা মুখ। জলে-ভেজা জামা কাপড়। তার বক্ষলগ্ন এক পুরুষ। কালো রোগা ক্ষীণজীবি পুরুষটির গলায় একরাশ মাদুলি। বহুদিনের না-কাটানো এক মাথা ধূলিরুক্ষ জটের মত চুল। শীতে কাঁপছে থরথর করে। দু-হাতে আঁকড়ে ধরে আছে সর্বনাশীর বুক ও পিঠ। অসহায় জীবের মত তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

সর্বনাশীর চঞ্চল চোখে কোথায় সেই দুরন্ত কটাক্ষ, কণ্ঠে সেই সেয়ানা পাখির ডাক! গম্ভীর মুখে তার বিষণ্ণ স্নেহজড়িত হাসি। স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে বক্ষলগ্ন পুরুষটিকে। কী যেন বলছে তাকে আর অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে ঢেলে দিচ্ছে তার মাথায়। পুরুষটি মাথা পেতে জল নিচ্ছে আর শিশুর মত হেসে উঠছে।

হঠাৎ একটু ধাক্কা লাগল খনপিসির গায়ে। মুণ্ডিতমস্তক খনপিসি তখন কোমরজলে দাঁড়িয়ে, আহ্নিক সেরে নিচ্ছে। বিরক্ত চোখে ফিরে তাকাল। বুঝলাম, এখুনি লাগবে, পিট্টান দিই তার আগেই। কিন্তু অবাক কাণ্ড! খনপিসির বিরক্ত মুখে দেখি হাসির আলো। মুণ্ডিতমস্তক, প্রকাণ্ড মুখে সে

হাসি যে কতখানি বিচিত্র না দেখলে বুঝি বোঝা যায় না। কিন্তু কেন? খনপিসি কি সর্বনাশী মেয়েটিকে চিনতে পারল না? পরিবেশে ও কাজের গুণে মানুষের চেহারাও কি বদলে যায়?

তাই। তাই যায়। জানি নে, কেমন করে চিনতে পারলাম সর্বনাশীকে। কিন্তু খনপিসি স্থূল ঠোঁট দুটি বিস্ফারিত করে জিজ্ঞেস করল, 'কে বাছা এটি? তোমার স্বামী?'

সর্বনাশী জবাব দিল ঘাড় নেড়ে, 'হ্যাঁ।'

বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল পিসির চোখে। বলল, 'আহা, ব্যামোয় ভুগছে বুঝি অনেকদিন থেকে?'

সর্বনাশীর চোখেও ঘনিয়ে এল তেমনি ছায়া। বলল, 'হ্যাঁ, অনেকদিন।'

খনপিসি ব্যথা-কাতর চোখে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে দেখল পুরুষটিকে। ছলছলিয়ে উঠল চোখ। একটি উদ্গত নিঃশ্বাসের মধ্যে পরম আশ্বাসের সুরে বলে উঠল, 'ভাল হয়ে যাবে মা, আমি বলছি। এত কষ্ট করে সঙ্গমে নিয়ে এসেছ, কে নেবে ওর পেরমায়ু। তোমার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক, চির-আয়ুষ্মতী হও।'

বলে, আকাশের দিকে মুখ তুলে নমস্কার করল খনপিসি। জানি নে, কী বুঝল ওই বিদেশিনী এই বাংলা কথার আশীর্বাদের। সে তার বরকে বার বার সঙ্গমের জল দিয়ে সিঞ্চিত করতে লাগল। কিন্তু আমার মনে শুধু বিস্ময় ছিল না। আরো কিছু ছিল।

যা ছিল, তা আমার আনন্দমুখরিত বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও বেদনার নমস্কার। নমস্কার মানুষের জীবনের ও হৃদয়ের কোটি কোটি বৈচিত্র্যকে, অপরূপ বিচিত্রকে।

মনে করেছিলাম, ওই মেয়ে শুধু সর্বনাশের হাতধরা সঙ্গিনী। মনে করেছিলাম, সেই সর্বনাশে শুধু পাপলীলা। ধ্বংসের উন্মাদনায় মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধায় ও প্রেমহীনতায়, সে শুধু তার যৌবনের অগ্নিকণা ছিটিয়ে যায় মানুষের চোখে। অস্বীকার করব না, তার ভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কিল হাত থেকে নিজের পয়সার ব্যাগটি বাঁচিয়ে ধিক্কার এসেছিল মনে। ভেবেছিলাম, পঙ্কে ডুবে যাওয়ার জন্ম যাতে হাত পড়েছিল, তাকে বুকে মুঠি করে ধরে এ কোন্ পয়সাসর্বস্ব অসহায় মানুষ আমি?

আজ সেই পঙ্ক-সঙ্গমের অঙ্কে পঙ্ক? একেই মনের সেন্টিমেন্ট বলে কিনা জানি না। কিন্তু ওই পুরুষটি যদি ওর বর না হত, হত অন্ত কোন পথেরই

মানুষ, তাহলেও কি নত হৃদয়ের এ নমস্কারকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম ? কে পারত ? হৃদয়ের কোনও এক অংশ জুড়ে ছিল যার এই লীলাক্ষেত্র, প্রেমে ও স্নেহে যে সর্বনাশী এমন মূর্তি ধরতে পারে, যে এমনি করে অমৃতে হয় একাকার, তাকে পঙ্ক বলে ফিরে যাব, সে দুঃসাহসও আমার নেই। যেন কারুর কোনদিন না থাকে।

শুধু খনপিসি নয়, দলের কেউ-ই তাকে চিনল না। সেও চিনল কি-না কে জানে! এখন যদি একবার চোখাচোখি দেখা হয়, তবে হয়তো আমাকেও চিনতে পারবে না। পারবে না, কেন-না, আমি যে তার এ জীবনের কেউ নই। এখন সে ডুবে আছে। সেখানে তার নিজের মেলা। সেখান থেকে যখন উঠবে ভেসে, তখন এই বাইরের মেলা, তখন আমরা, তখন আমি।

ভিড় ঠেলে এলাম উপরে। আজ আর না-ই হোক দেখাদেখি। সে যে বিচিত্রের দ্বার খুলে দিয়েছে আমার চোখের সামনে, সেই দোরগোড়ায় জমা হয়ে থাক আমার বিস্ময় ও নমস্কার।

দেখি ঘোড়সওয়ার ছুটছে! নেহরু আসছেন। মানুষের দুরন্ত গতি আচমকা, দুদিকে ফিরছে। একদিকে প্রধান মন্ত্রী, অন্যদিকে সঙ্গম।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা স্পর্শে ফিরে তাকালাম। সর্বনাশ! তাকিয়েই লাফিয়ে সরে গেলুম দু-পা। একটি প্রকাণ্ড ময়াল সাপের ল্যাজ এসে ঠেকেছে গায়ে। ল্যাজটি টেনে গলায় জড়িয়ে নিয়ে, একরাশ হলদে দাঁত বের করে হাসল সাপের মালিক। ভাঙা মোটা গলায় বলল, 'কুছ ডর নহি বেটা। এ মন্ত্রপুত শিব-হার।'

একে তো ভয় পেয়েছিলাম। তার উপরে হেসে হেসে এ ভয়ংকর শিব-হারের কথা শুনে বড় রাগ হয়ে গেল। বললাম, 'খুব হয়েছে। সাপের ল্যাজ ঠেকিয়ে ছাড়া কি ডাকা যায় না ?'

কিন্তু রেয়াত করল না সে আমার রাগকে। পরণে তার ময়লা গেরুয়া আলখাল্লা বিশেষ। হিসাব করলে মিলবে শতখানেক তালি। চেহারায় খানিকটা ভূতানন্দ ভৈরবের ছাপ। চুল দাড়িও সেই রকমেরই। কিন্তু গলায় এতবড় একটা ময়াল, এই দারুণ ভিড়ের জনতাকেও দূরে সরিয়ে রেখেছিল অনেকখানি। যে দেখে, সেই ভীত চকিত চোখে তাকিয়ে কয়েক হাত তফাত দিয়ে যায়। কাঁধে তার বড়সড় ঝুলি একটি। হাতে বিচিত্র লাঠি। লাঠি নয়,

যেন একটি আঁকাবাঁকা সাপ।

আমার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে সে শিবনেত্রে চেয়ে হাসল। হেসে বলল, 'দেখ বেটা বাবুজী, এ যাকে স্পর্শ করে, তার কপাল ভাল। তোরও কপাল আমি খুব ভাল দেখছি বাবুজী।'

বলে সে সত্যি সত্যি কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করল আমার কপাল। বুঝলাম, গতিক ভাল নয়। বাপ মা আত্মীয় বন্ধুস্বজন যে কপাল কোনদিন ভাল দেখে নি, সে কপাল আজ অকস্মাৎ এই আলখাল্লাধারীর কাছে ভাল হয়ে ওঠা ভাল নয়। পেছন ফেরার উদ্যোগ করে বললাম, 'হবেও বা।'

সে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে বলল, 'শুন্ বেটা, কোথায় যাচ্ছিস। তোর ভাগ্য ভাল। কপালে তোর শিব লীলা করছে। আজ তোকে আমি মহাদেবের প্রসাদ দান করব।'

বলে সে চট করে হাত ঢুকিয়ে দিল তার ঝুলিতে। বন্ধ মুঠি বের করে বলল, 'হাত পাত্।'

বুঝলাম, বিপদ বড় দড়ো। কী দেবে সে হাতে? একবার এক সাপুড়ে এমনি হাত পাততে বলে বেমালুম হাতের উপর ছেড়ে দিয়েছিল একটা জীবন্ত কাঁকড়া বিছে। অবশ্য সে বিছের হুল ছিল না। কিন্তু শিউরুনি তো কাটে না তাতে। এও যদি তেমনি হয়?

বললাম, 'কী আছে, দেখাও।'

সে বলল, 'নারাজ ন হো বেটা। হাত পাত্ আমি দিচ্ছি।'

কী মুশকিল! এদিকে ভিড় হচ্ছে আমারই চারপাশে। যত আমি চলতে চাই, সে তত আমার পিছনে ধাওয়া করে। হাত পাততে হল। সে আমার হাতের উপর কী একটা দিল। চেয়ে হঠাৎ মনে হল, কোন ছোট জাতের পোকা, কিন্তু মৃত। বস্তুটি শক্ত, সরু ও লোমশ।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী এটা?'

সে বলল, চাপা গলায়, 'শেয়ালের শিং।'

শেয়ালের শিং? অনেক চতুষ্পদীয়ের শিং দেখেছি চোখে ও ছবিতে। কিন্তু এমন অভূতপূর্ব বস্তু তো কখনো দেখিনি, শুনিনি শেয়ালের আবার শিং গজায়! বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না হয় রইল কিন্তু শেয়ালের শিং দিয়ে কী রূপ খুলবে আমার কপালের? জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কী করব এ দিয়ে?'

সে বলল হেসে হেসে, 'তোর কিছু করতে হবে না বেটা। তুই খালি রেখে দিবি। যা করবার, স্বয়ং শিব করবেন। সব শেয়ালের শিং হয় না। যে

মহাদেবের সাক্ষাৎ পায়, তারই হয়। কখন? না, যখন মহাদেব কালিকা-দেবীর সঙ্গে মিলতে আসেন, তখন যে 'শিয়াল' তাঁর সাক্ষাৎ পায় তারই শিং গজায়। তোর কপাল ভাল, পেয়ে গেলি।'

তা হবে হয়তো। কিন্তু যে সাধনা আমি করিনি, তার ফলে কেন ভাগ বসাই। জানিনে মহাদেবের দর্শনপ্রাপ্ত কোন্ সে ভাগ্যবান শেয়াল, আর তার শিং কেটে ভাগ্যবান আজ এই সাধক। কিন্তু আমার ভাগ্যের বড় দুরূহ পথে যাত্রা। এ দিয়ে আমার কী হবে?

আমার দ্বিধান্বিত ভাব দেখে আলখাল্লাধারী তাড়াতাড়ি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ইস্ মে বশীকরণ হোতা হ্যায় বেটা। দুনিয়া তোর বশ হয়ে যাবে। মনের মানুষ তোর কাছে আসবে। তোর দিল্ ভরে দেবে।'

হেসে উঠলাম। যে মন নিয়ে বেরিয়েছিলাম পথে, সেই মনের হাসিটা যেন এই কদিন পরে গঙ্গা-যমুনার তীরে বেরিয়ে এল স্বরূপে। বশীকরণ, তাও মনের মানুষকে? মনের মানুষ খুঁজতে গিয়ে কেউ বিবাগী। কেউ পেয়ে, না পেয়েও বিবাগী। মনের মানুষ! সে কেমন জানি নে। কোথায় তার বাস, কেমন তার রূপ তাও জানি নে। নিশিদিন তো খালি এই গুনগুন করছি,—

ঘুরেছি পথে বিপথে
গহন বনে বনে।
মন-পাখি গেয়েছে শুধু
রয়েছি, তোমারি মনে মনে॥

অকারণে কেন মনের মানুষকে শেয়ালের শিং দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করা। সে যে আড়াল থেকে এই লক্ষ মুখের হাসি দিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করবে। বললাম, 'সাধুজী এ আমার দরকার নেই।'

কিন্তু সে নিরাশ হবার পাত্র নয়। গম্ভীর মুখে, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'বেটা, সব দরকার তো তোর বোঝার মধ্যে নয়। এটা তোকে নিতেই হবে। হাওয়া লাগাস নি, পবিত্রজ্ঞানে পাকিটে ফেলে রাখ। আর আমায় খুশী করে দে!'

তাকে খুশী করাটাই বোধহয় আসল। বুঝলাম, শেয়ালের শিং না গছিয়ে সে ছাড়বে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবে, বল?'

সে চোখ বুজল, আবার খুলল। বলল, 'বেশী নয়, আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দে।' অচিরাৎ তার বশীকরণ যন্ত্র বাড়িয়ে ধরলাম। আমার শহুরে মুক্তি

ধরে বলতে হল, 'এই নাও বাবা, তোমার জিনিস। পাঁচ টাকা দিয়ে এ জিনিস কিনতে পারব না।'

কিন্তু সে আমার চেয়েও অগ্রসর। বলল, 'কেনাকাটা নয় বাবা, দান। তোমারো দান, আমারো দান। আচ্ছা দুটো টাকা দে।'

আমি হাতটা আরো এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমাকে রেহাই দাও সাধুজী, দু-টাকা আমার কাছে নেই।'

'কত আছে বেটা?'

মিথ্যের আশ্রয় না নিয়ে আর পারলাম না। বললাম, 'চার আনা আছে।'

চোখে তার অবিশ্বাস দেখা দিল। অবিশ্বাসী চোখে একবার দেখল আপাদমস্তক। হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, 'তাহলে ফিরিয়েই নিতে হয়।'

বাঁচলাম। ফিরিয়েই দিতে গেলাম। সে চিন্তিতভাবে বলল, 'কিন্তু দান তো ফিরিয়ে নিতে পারি না। আচ্ছা দে, চার আনা-ই দে। তোর কপালে ছিল।'

এতখানি যখন হল, আর একটু হোক। বললাম, 'তোমাকে চার আনা দিলে আমি কী খরচ করব? দু-আনা নাও।'

এবার আর তার মুখে কথা নেই। তীর্থক্ষেত্রে আমার মত এমন বেয়াদব পুণ্যার্থী থাকতে পারে, এটা বোধহয় সে ভাবতে পারে নি। সে বড় বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কোথায় তার সেই সাধনদীপ্ত চোখ? দেখি দুর্ভাগার করুণ দুটি চোখে তার নিরাশার গ্লানি। দু-আনা দিলাম। সে তবু হাত পেতে রইল।

চলে যাই দেখে ডেকে বলল, 'বাবুজী, গরীবটাকে একটু চা খাওয়াও। আর কী বলব?'

তার মাঝে এবার আসল মানুষটি দেখা দিয়েছে। জীবনের রসদ খোঁজার এই তার পন্থা। মানুষের আসল মূর্তি দেখা দিলে কে আর তাকে অবহেলা করতে পারে। বললাম, 'চল খাওয়াচ্ছি।'

সঙ্গমের এই তাঁবু-সমুদ্রে চায়ের দোকানের অভাব নেই। দোকানে গিয়ে বললাম, 'তোমার বস্তু তুমি নাও, পয়সা তোমাকে দিতে হবে না।'

সে গরম চায়ে ফুঁ দিতে দিতে জিভ কাটল। 'আরে বাপ্‌রে, ও আমি আর ফিরিয়ে নিতে পারব না।'

ভাঙি তো মচকাই না। চায়ের গেলাসে ঘন ঘন চুমুক দিয়ে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল তার। শেয়ালের শিং দিয়ে বশীকরণ করতে পারল না। ওই চোখ দিয়ে বশীভূত করল আমাকে। চায়ের পরে আরো দু-আনা দিয়ে বললাম,

'চলি সাধুজী।'

বিস্মিত হাসিটি তার চোখে দেখা দেওয়ার আগেই ভিড়ে মিশলাম।

ভিড়ের মধ্যে হিদের মা। হাত ধরে বলল, 'বাবা যে!'

ঘুরে ঘুরে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। আশ্রমমুখী হয়েছিলাম। দেখলাম, হিদের মার সামনে একজন সাধু।

বললাম, 'কী করছেন?'

হিদের মা সাধুকে দেখিয়ে বলল, 'এই বাবাজীর কাছে বসে একটু কথা শুনছিলুম। বড় সুন্দর কথা বলে। বলে, মা, যে জন্ম-দেনদার, সে যদি মুখ ঘুরিয়ে চলে, পাওনাদার হাসে। তুই খুব হাস, হেসে হেসে বেড়া। মায়ের দেনা শোধ হয় না। তুই মরলে, তোর ছেলে মুখে আগুন দিয়ে কাঁদবে। ভাববে তখন, কেন দেনা শোধ করিনি মায়ের?'

বলে হাসল হিদের মা। মোটা আর ফাটা লেন্সের আড়ালে সেই মুগ্ধ চোখজোড়া। কিন্তু হাসিটি যেন অসম্পূর্ণ। বলল, 'তা হলে যাই বাবাজী। বাবাজী, আবার কাল আসব, আপনি আমাকে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ সাধু মিলিয়ে দেবেন। আমি তাঁরে ভোজন করাব।'

সাধু ক্ষীণদেহ। জটা প্রকাণ্ড। তবে, এই শীতেও নগ্নদেহ। শুধু কপ্‌নি আঁটা। বলল, 'বটে। বেশ তো মা, আমিও ব্রাহ্মণ। আমাকে ভোজন করিয়ে দাও।' হিদের মা এক মুহূর্ত দেখল সাধুটির দিকে, তারপর বলল, 'বেশ তো বাবা, চল, তুমিই আমাকে আশীর্বাদ করবে।'

আমি বললাম, 'তাহলে চলি আমি।'

কিন্তু হাত ছাড়ল না হিদের মা। বলল, 'যাবে কেন? চল, বাবাজীকে খাওয়াই। দেখে যেও।'

বলে, আমার আপত্তি না মেনে হাত ধরে নিয়ে চলল সে আমাকে। এতে আমার কিছুই করবার ছিল না। কৌতূহলও অনুভব করলাম না। বরং খানিক ভয়ই ছিল। হিদের মা খাওয়াবে, কিন্তু কী দিয়ে খাওয়াবে সে!

সামনেই একটি ছোট খাবারের দোকান দেখে দাঁড়াল হিদের মা। আহ্বান করল বিদেশী দোকানদার। মেলায় তেমন ভিড় নেই দোকানটিতে। পিতলের বড় বড় বাটায় করে সাজানো রয়েছে প্যাঁড়া, পাকানো খোয়া আর সন্দেশ। পুরিও ভাজা হচ্ছে।

হিদের মা দোকান থেকে জল চেয়ে নিল। নিজের হাতে জল ছিটিয়ে, আঁচল দিয়ে মাটি লেপে সাধুকে বলল, 'বোসো বাবা।'

সাধু বসে বলল, 'কত খাওয়াতে পারবি মা ?'

হিদের মা বলল, 'যত তুমি খেতে পার বাবা।' বলে দোকানদারকে বলল, 'বাবাজীবনকে খেতে দাও বাবা। পুরী সন্দেশ প্যাঁড়া, সবরকম দাও।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মুখ চুণ হয়ে উঠল। ওকি খাওয়া! এ যে থামতে চায় না! কিন্তু হিদের মা মুগ্ধচোখে, যেন প্রাণভরে সেই খাওয়া দেখছে। আমার মুখ চুণ হল, কারণ আমার যে এক ভয়। সে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে হিদের মা নিজে। এত পয়সা সে কোথা থেকে দেবে ? তবে কি, ভাবতে যতই সংকোচ হোক, তবে কি সেইজন্যেই হিদের মা হাত ধরে স্নেহভরে ডেকে নিয়ে এল আমাকে ?

এবার দোকানীরও চোখে সংশয় দেখা দিল। তার ছোট দোকান, খুবই ছোট। মাল খুবই কম। তবু একজনের পক্ষে সে যে অমানুষিক। কিন্তু তার পেতলের বাটার ভাণ্ডার ফুরিয়ে এল। যত ফুরিয়ে আসতে লাগল, তত সে সংশয়ান্বিত। একবার দেখছে হিদের মার দিকে, আর একবার আমার দিকে। আমার জামা-কাপড়ের দিকে। সে চাউনি দেখে আমার বুকে ধুকুপুকু। এ কী বিপদে এনে ফেলল আমাকে হিদের মা।

কিন্তু আশ্চর্য! সহজ ও নির্বিকার খাওয়া সাধুর। তার কি একটু কষ্টও হচ্ছে না ? দেখতে মানুষটি সে ওইটুকু, কিন্তু পাতা তার কেবলি খালি হয়ে চলেছে। এ কি সে-ই খাচ্ছে, না আর কেউ ?

দোকানী না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'আর দেব মায়ীজী ?'

হিদের মা বলল, 'দেবে না বাবা ? উনি যত খাবেন, তত দাও। খাওয়াও। খাইয়ে তোমার আমার, সকলের সুখ। কী বল বাবা, অ্যাঁ ?'

বলে সে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু এত অসহায় বোধ আর কখনো করি নি। যা-ই বলি, যা-ই বল, সংশয় পেরিয়ে সন্দেহ আমার বদ্ধমূল হতে চলল। পকেটের মধ্যে আমার পয়সার পুঁটলিটা যেন বন্দী ইঁদুরের মত লাফালাফি করছে বেরিয়ে পড়বার জন্য। ওটাকে যদি কোথাও লুকিয়েও রাখতে পারতাম! কিন্তু কে জানত, এমন বিপদে পড়ব। আমার তো কোন সন্দেহ নেই, 'দেওয়ার চেয়ে সুখ কি ?' এই কথা শুনতে হবে আমাকে। কিন্তু এতবড় দুঃখ থেকে কে আমাকে উদ্ধার করবে, হিদের মার হাত থেকে ?

যে খাচ্ছে আর খাওয়াচ্ছে, শুধু তারাই নির্বিকার, তৃপ্ত, মুগ্ধ। কেবল স্বস্তি নেই দোকানদারের। দুরন্ত শঙ্কা আমার। আমার শঙ্কিত মুখ দেখেই, সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে দোকানদারের। কে জানে, চোখের ইশারায় পাহারা

বসিয়েছে কি-না সে।

দোকানদারকে ঘোষণা করতে হল, 'আমার এ-বেলার তৈরী খাবার সব শেষ হয়েছে। টাকা মিটিয়ে তোমরা দুসরা দোকান দেখ।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, সত্যি তার সবই শেষ।

হিদের মা বলল, 'বাবা, আর খাবে ?'

মন খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এখনো তার রেশ যায় নি। কিন্তু মানুষের অতি-মানবিকতায় কিংবা পশুত্বে আমার বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধাও নেই। গল্পের মত শুনেছি, কোন এক কালে অমুকে অত খেতে পারত। পারত কি-না জানি নে। কিন্তু আজ চোখের সামনে বিরক্তি ও ভয়ে সে দৃশ্য দেখতে হচ্ছে।

জল খেয়ে মুখ মুছল সাধু। একটি উদ্গার তুলে, ক্ষুধাতৃপ্ত মুখখানি তুলে বলল, 'না, আর খাব না। আমার পেট ভরেছে।'

তবু ভাল। কিন্তু যা খেয়েছে, তাই যে অনেক। সে অনেকের কী উপায় হবে। মানসচক্ষে দেখতে পেলাম, হিদের মা ওই চোখ দুটি তুলে আমাকে বলছে, কী যে বলছে তা মাথায় আসছে না।

হিদের মা বলল সাধুকে, 'বাবা, আমাকে নিয়ে, আমার কাছে খেয়ে কেউ সুখী নয়। তুমি খুশী হয়ে থাকলে আমাকে আশীর্বাদ কর!' বলে সে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করল লুটিয়ে।

সাধু বলল, 'তোমার প্রাণে আনন্দ হোক।'

বলে সে চলে গেল। হিদের মা উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল দোকানদারকে, 'কত হয়েছে দাদা তোমার ?'

দোকানদার বলল, 'খুচরা হিসাব ধরি নি মায়ীজী। সের হিসাবে তোমার উনিশ টাকা তিন আনা হয়েছে।'

হিদের মা একবার তাকাল আমার মুখের দিকে। তারপর কোমর থেকে বার করল একটা ময়লা পুঁটলি। খুলতে দেখা গেল, দোমড়ানো নোট আর খুচরো পয়সা। সবগুলি একটি একটি করে হিসাব করল। আবার আঁচল খুলল। তাতেও কিছু পয়সা ছিল। সে পয়সাগুলি যোগ করে, কয়েক আনা পয়সা ফের বাঁধল আঁচলে। বাদ বাকি সব তুলে দিল দোকানীর হাতে। বলল, 'গুনে দেখে নাও দাদা।'

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হিদের মা'র গোনার সঙ্গেই দোকানীর গোনা হয়েছিল। সে টাকাগুলি হাতে নিয়ে, মুগ্ধ চোখে যেন দেবীদর্শন করছিল। তাড়াতাড়ি গদির উপর টাকা রেখে সন্ত্রস্ত গলায় বলল, 'হিসাব

আমার হয়েছে মাঈজী, ও আমার ভগবানের দান।'

হিদের মা ফিরে তাকাল আমার দিকে। চোখে তার জল, মুখে হাসি। তারপর আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল বাইরের জনারণ্যের দিকে। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'পাষাণভার নামল আমার বুক থেকে। আনন্দ হোক, আনন্দ হোক প্রাণে। আমার প্রাণের সব নিরানন্দ ধুয়ে মুছে যাক।'

বলতে বলতে কী এক আবেগের তোড়ে ভেসে গেল হিদের মা। আমাকে ডাকলে না, ফিরলে না। কোন একা মহা আনন্দের সব-ভোলানো হাওয়া এসে টেনে নিয়ে গেল তাকে। ডেকে নিয়ে গেল।

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার সব শঙ্কা ভয়, আমার সব অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল সে। হিদের মা'র জীবনে যা ভক্তি, যা বিশ্বাস, আমার তা নয়। হয়তো একেই বলে আত্মসম্মোহন। কিন্তু তার এই ভক্তি, বিশ্বাস দিয়েই সে আমার মনের সঙ্কীর্ণতার স্পর্ধাকে ভেঙে দিয়ে গেল। এর অবাস্তবতা, অলৌকিকতা, সব জেনেও তার সব দেওয়ার এ আনন্দের মর্যাদাকে তো অবহেলা করতে পারি নে। যে এমনি করে দিয়ে যায়, তাকে এক টাকা দিয়ে আমি করুণার আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বিদ্রূপ নয়, কথা নয়, নিজের আনন্দ ও বেদনা দিয়ে সে আমার আত্মপ্রসাদকে ধিক্কার দিয়ে গেল। সে আমাকে সাধু খাওয়ানো শেখাল না। আমার নিজের বিশ্বাসের প্রতি হৃদয়ের সব দ্বার অসঙ্কোচে উন্মোচনের শিক্ষা দিয়ে গেল। তাই সে অমনি করে দেওয়ার কথা বলেছিল। তাই কিপ্‌টে বুড়ি মিষ্টি গলায় বলেছিল, 'আমাকে দু-চার আনা পয়সা দেবে বাবা?'

ব্যাকুল হলাম, ফিরে তাকালাম। নেই, হারিয়ে গিয়েছে হিদের মা। চোখের সামনে শুধু জনারণ্য। হাসিমুখর, কোলাহল।

সকাল থেকে যেন ঝড়ের গতিতে কেটে গেল এতক্ষণ। সবাই প্রাণভরে ডুব দিল সঙ্গমে। টেরও পাই নি, জানিও নে, কী অমৃতের সঞ্চার হয়েছিল আজ সেখানে। সবাই কি নিয়ে এল বুক ভরে, কিসের নেশায় মাতাল হল মানুষ। প্রথম দিন থেকে, পরিচিত সকলের মুখগুলি ভেসে উঠল চোখের সামনে। সকলের সব কথা।

সত্য, আমি ভগবান পেতে ছুটে আসি নি। ডুব দিতে এসেছিলাম লক্ষ হৃদি-সায়রে। এখন, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমার সারা বুক বড় ভারী। সে

যে কিসের ভারে এমন পাষাণ হয়েছে জানি নে। এত লক্ষ লক্ষ লোক। আমি ডুব দিলাম, কি ডুব দেওয়ার সময় হয়েছে জানি নে। কিন্তু প্রাণভরে একটা নিঃশ্বাসও নিতে পারছি নে। কিসে ভরে উঠল মন এমনি করে। আমি কি পেলাম!

দিন শেষ হয়ে আসছে। সারাটি দিন ঘুরেছি পাগলের মত। দেখা হল অনেকের সঙ্গে। এবার সময় আসছে নিজের সঙ্গে দেখা হওয়ার। আজও এই উত্তরপ্রদেশের মাঘের আকাশে মেঘ ছিল। খুব সামান্য। তাতে শেষ রোদের ঝলক লেগেছে। শেষ হওয়ার আগে রঙ ছড়ায় বেশী।

উচিত মনে হল, আশ্রমে ফিরে যাওয়া। কিন্তু পেটের জ্বালাটি কেমন থিতিয়ে গিয়েছে। ওদিকে বড় টান বোধ করছি না। ব্রজবালার অভিমান-ক্ষুব্ধ চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি, উঁকি দিয়ে আছে তাঁবুর আড়াল থেকে। তবুও বিরল নৌকা ও স্নানার্থীহীন যমুনার দিকে পা চলল আপনি আপনি।

চলতে চলতে কিসে আটকে গেল পা। অবাক হলাম। পা কে চেপে ধরেছে। ভিক্ষুক। রাগতভাবে তাকাতে গিয়ে দেখি, একমুখ হাসি। বিকলাঙ্গ বলরাম।

বলতে যাচ্ছিলাম, 'বলরাম যে!' তার আগেই সে পাগলের মত গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল:

'তুমি কে-এ, পাগলপারা হে!
বহুদিনের চেনা বলে মনে হতেছে,
পাগলপারা হে!'

খোলা গলার এ উদাত্ত স্বর আকাশ ছুঁল গিয়ে। চকিতে মনে হল, বুকে ছিল আমার শুদ্ধ জলরাশি। সে অশ্রু কি-না জানি নে। তাতে হাওয়া লাগল, ঢেউ বইল, আর পাগলা মাঝির মত বলরাম সেই জলে চালিয়ে দিল তার পান্‌সি। পাগল তো আমি নই। পাগল যে সে। কৌতূহলী কিছু নরনারীও এ বিচিত্র দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু থামাই কী করে! বললাম, 'বলরাম শোন।'

বলরাম তবু গেয়ে উঠল,—

'বইসেছিলাম বুক পেতে,
আজ ধরা দিলে হে!
পাগলপারা হে!
য্যাতই মাখো ধূলাবালি,

নেশ য্যাতই কালো কালি,
চইলবে না আর ফাঁকিবাজি
ছাইড়ব না আর হে,
পাগলপারা হে।'

বলরামের আনন্দ দেখে, কষ্ট হতে পারি নে। তবু, কৌতূহলী নরনারীর লজ্জা যে পারি নে কাটাতে। তার হৃদয়াবেগের ধারে লজ্জার অন্ধকার হয় তো কেটে যায়। আমার যে সে উত্তরণ হয় নি। ডাকলাম, 'বলরাম!'

বলরাম হেসে গেয়ে মাতাল। বোধহয় গানের সুর এখনো নতুন করে ছুটে আসছে তার গলায়। বলল, 'বলেন।'

বললাম, 'লোক জমেছে।'

'বেশ, তবে চলেন, কোথায় চইলছিলেন। কিন্তু ঠাকুর! ছেইড়ে দেব না।'

ছি ছি ছি, বলরাম আমাকে বার বার ঠাকুর বলে আমার মানুষিক অস্তিত্বটাকে যেন বেশী করে জানিয়ে দিতে লাগল। বললাম, 'যমুনার ধারে—'

কথা শেষের আগেই সে বলে উঠল, 'সেই ভাল, সেই ভাল।'

বলে সে আমার আগে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে, দু-হাতে ভর দিয়ে চলল। আমাকে সে-ই পথ দেখিয়ে চলল নিয়ে। তার স্বাভাবিক চলার কষ্ট দেখে নিজেরই কষ্ট হয়। কিন্তু তাকে থামানো যাবে না। কেল্লার কোলের যমুনার তীরে এসে সে বসল। হেসে ঘাড় কাত করে বলল, 'বইসতে হবে কিন্তুন।'

শুষ্ক বালুসৈকত। মাথার গামছাখানি খুলে তাড়াতাড়ি পেতে দিল বলরাম। জানি, আমার অনেক আত্মাভিমান আছে, ধুলোবালির বাছবিচার আছে। তা বলে এখানেও গামছা পাতা কেন? বলরাম এত খুশী, আমি একটু বসতে পারি নে? বললাম, 'গামছা থাক।'

বলরাম জিভ কেটে মাটি দেখিয়ে গুনগুন করে উঠল,

'ভুঁয়ে নি সে বইসবেরে ধন?
বইসবে হিয়ের মাঝখানে॥'

বলে আঙুল দিয়ে দেখাল খোলা বুক! বলল, 'ওই গামছা আমার মনে হিদয় কইরে দিলাম, বইসতে হইবে।'

বসলাম। বলরামের কথার বাগানে আমি দীন।

বলরাম বলল, 'এমন কইরে আর একদিনও যমুনার পাড়ে আসি নাই। যদি আইসলাম তবে একটু গান গাই, অনুমতি দেন।'

বললাম, 'গাও।'

অমনি মিষ্টি গলায় যমুনার দিকে ফিরে গান ধরল সে :

'যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা
পোরবাহিনী।
ও যার বিশাল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীল কান্তমণি॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা সেই জলকেলি
কোথা শ্যাম রাসবিহারী বংশীধারী
বামেতে রাই বিনোদিনী॥'

যমুনার রূপ ফিরিয়ে দিল বলরাম। রঙ বদলে দিল। সন্ধ্যাকাশের রক্তরাগে কালিন্দীর এক অংশ আচমকায় লাল হয়ে উঠেছে। আর সারা ঘননীলে ব্যাকুল কালো চোখের ছলছল ঢেউ। শীত, তবু বাতাস বহে ঝিরিঝিরি।

বলরাম বলল, 'কত চোখের জলে নীল হইছ তুমি, সে আমি জানি।'

তাকিয়ে দেখলাম, বলরাম হাসছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। বলল, 'এই তো সেই জল।'

'ভাবি, এখনো কি বাঁশি বাজে ঠাকুরের। ছুটে ছুটে আসে রাইঠাকরুণ। সুরে তাল নাই। বাঁশি বাজবে, পায়ের মলের তাল বাজবে না?'

বলে তার কী হাসি। হেসে বলল, 'তা হইলে, এই যমুনার পাড়ে বইসেই কই, একবার কি মনে করতেও নেই? লক্ষ লক্ষ গলা পাইছেন, তাই বুঝি আমারে ভুলছেন।'

বললাম, 'না, তোমার আশ্রমটি তো চিনি না।'

বলল, 'ওইতো, কেল্লার কাছেই। নন্দগোপাল মাধবাচার্য বাবাজীর আশ্রম। আজ কিন্তুন যাইতে হইবে। আমি কি একলা? আরো নোক রইছে বইসে আপনার জন্য। রোজ আমারে জিজ্ঞেস করে, "তোর সে কোথায়।"'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলরাম? . লক্ষীদাসী?'

সে বলল হেসে, 'শুধু নক্ষীদাসী কেন? সে আছে, আরো আছে। নিজের চোখে গিয়া দেখতে হইবে। যাবেন তো?'

বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে আর 'না' বলতে পারলাম না।

প্রাক্-চন্দ্রোদয়-মুহূর্তে প্রদোষকালের মত হালকা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে যমুনা কালিন্দী হল। দুর্গে গাঢ় ছায়া দুলতে লাগল ঢেউয়ে

ঢেউয়ে। সঙ্গমের কোণ-ভূমিতে অস্থায়ী টাওয়ারটি যেন শহরের ওয়াটারট্যাঙ্কের মত দেখাচ্ছে। রাজকীয় অতিথিদের জন্য ওটি তৈরী হয়েছে। সাধারণের আরোহণ চার আনা দর্শনী।

টাওয়ারের পাশ দিয়ে, লোকের ভিড় ঠেলে চললাম বলরামের সঙ্গে সঙ্গে। বলরাম আমার পাশে পাশে। আমার হাঁটুতে ঠেকছে তার মাথা। কী আমার ভাগ্য! জন্মবিকলাঙ্গ এক সঙ্গী আমার। না পাই তার মুখ দেখতে। পাশ ফিরিয়ে না দেখি তাকে। সে চলেছে আমার সঙ্গে, মাটি হেঁচড়ে।

আলো জলে উঠেছে এখানে সেখানে। আজ বড় ভিড়। দোকান সম্ভারে পরিপূর্ণ স্তূপাকার বেলোয়ারি চুড়ি নিয়ে দিকে দিকে বসেছে চুড়িওয়ালী ও ওয়ালার দল। আলো পড়ে রঙের বাহার লেগেছে রামধনুর। ঘিরে বসেছে ঝি-বহুড়িরা। তাদের কলহাসি রঙ ছড়াচ্ছে আরো। এদেশের রেওয়াজ। পালা-পার্বণে, উৎসব-আনন্দে লক্ষপতির বউ থেকে দরিদ্র-গৃহিণী সকলেই পরেছে রাশি রাশি কাচের চুড়ি। শখ যাদের আরো বেশী তারা কণ্ঠে পরেছে পুঁতির হার। রঙবেরঙের পুঁতির পাহাড় বসেছে। আজমগড়ের কুমোরেরা ছড়িয়ে বসেছে বিবিধ কারুকার্যপূর্ণ মাটির জিনিস। সিগারেট-ফোঁকা বাবুদের মনভোলান ছাইদানি থেকে, আহা মরি মরি, ভাবের গাঁজার কলকেটি পর্যন্ত। ফুলদানি, টি-পটেরও অভাব নেই।

পা আর মন ওই দিকে ছুটে যায়। বলরামকে ছেড়ে যেতে পারি নে। এই রাতের ভিড়। বলরামকে কেউ মাড়িয়ে দিলেও তার কিছু করার নেই। সঙ্গে যখন রয়েছি, তাকে তো ছেড়ে যেতে পারি নে। কিন্তু আশ্চর্য। হাতে ভর দিয়ে চলেছে, কিন্তু গুনগুনানির কামাই নেই।

বলরাম ডাকল, 'ঠাকুর!'

বললাম, 'বলরাম, ওই নামটি কি বাদ দেওয়া যায় না?'

বলরাম বলল, 'মন ডাকে। আমি কি ডাকি? ওইটে আপনার নাম নয়, পরাণ ওই বলে ডাইকল আপনেরে। তাতে তো এই সোমসারে কেউ দুঃখু পাইবে না। তবে?'

তবে ওই নামেই ডাকুক বলরাম। দুঃখ পাই নে, ভয় পাই। বললাম, 'কী বলছিলে?'

বলরাম বলল, 'বলতেছিলাম, আমার ঠাকুরের মুখখানি অমন শুকু-শুকু ক্যান? এই কয়দিনে মুত্তিখানিও বড় রোগা হইছে। কষ্টে আছেন?'

যার এত কষ্টের জীবনযাত্রা, সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কষ্টে আছি কি-না! কিন্তু বলরামের মন ও প্রাণ সম্পর্কে আর সংশয়ের অবকাশ ছিল না। এ সংসারে কতকগুলি চোখ আছে, যাদের কাছে কিছুই ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাদের চোখের এক অদৃশ্য মাইক্রোস্কোপ প্রতিটি বিন্দু দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বলরাম দেখেছে ঠিক। আখড়াবাসী মূল গায়েন, সংসারের আসল কথাগুলি দেখছি জানে ঠিক।

বললাম, 'মেলার ব্যাপার। ঘুরে ঘুরে দিন কেটে যায়, তাই হয়তো।'

বলরাম হঠাৎ থেমে বলল, 'একা-একা কি-না, তাই! সঙ্গে কেউ থাইকলে চখে চখে রাইখ্‌তে পারত। ব্যামো হইলে যে বড় বিপদ হইবে ঠাকুর। সাবধানে রইয়েন।'

বলে সে বাঁক ফিরে, দু-পাশে তাঁবু-মাঝের সরু-পথে পড়ল। দুর্গপ্রাকার সামনেই। কানে এল খোল-করতালের শব্দ। বাংলা নাম-গান চলেছে ভারি উল্লসিত কণ্ঠে।

বলরাম থামল। আমিও থামলাম। একটি তাঁবুর কাছে কে দাঁড়িয়ে ছিল। অদূরে একটি হ্যাজাক লাইটের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। তাঁবুর পর্দার বাইরে সে মূর্তি মেয়েমানুষের।

বলরাম তাকে কী বলতে গেল। কিন্তু চকিত কটাক্ষের ঝিলিকে সে একবার বলরামকে দেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

বলরাম গলা বাড়িয়ে বলল, 'যাইও না, কারে ধইরে নিয়ে আসছি, একবার ছাখ।'

গলা নামিয়ে বলল আমাকে, 'গোঁসা করেছে আমার উপুর। চিনতে পারে নাই আপনারে।' বলেই বলরামের হাসি। হাসতে হাসতেই গাইল—

'মানের বশে যাইও না গো, রাখো মিনতি,
ভাবো আমার কি হইবে গতি।'

বুঝলাম, মূল গায়েনের লক্ষ্মীদাসী। আমঘাটার আখড়ার অধ্যক্ষা। রাগ করেছে খুবই। কিন্তু, মধ্যবয়সী লক্ষ্মীদাসীর চোখেও অমন অগ্নিবর্ষণ হয়? বুঝি প্রাণে আগুন আছে আরো অনেক। মধ্যমা ঋতু আশ্বিনের ঢলঢল মদালসা গাঙের বিস্তারে চকিত বাতাসের শিহরণ।

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এত রাগ কেন। তার আগেই আবার দেখা দিল লক্ষ্মীদাসী। চল্লিশ বছরের বালিকা। লজ্জায় বিস্ময়ে আনন্দে ভরে উঠল তার বালিকার মত চোখ দুটি। কিন্তু হাসতে গিয়ে শীতে ফাটাফাটা ঠোঁট

বিস্ফারিত হতে পারে না। তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, 'ঠাকুর! আসেন, আসেন! মনে পড়েছে?'

বলরাম অমনি বলে উঠল, 'মনে কি পড়ে গো। মনে পড়াইতে হয়। ধ্যান কইরে নিয়ে আসলাম।'

কিন্তু লক্ষ্মীদাসী চেয়ে দেখল না বলরামের দিকে। হাত জোড় করে বলল, 'ভিতরে আসেন, এট্টুস বসতে হইবে, এখনি ছাইড়ব না।'

বলরাম বলল, 'আসেন ঠাকুর।'

দুটি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে এসে উঠলাম একটি উঠোনে। উঠোনের উপরে সতরঞ্চি পাতা। পূর্বদিকে একটি ছোট পিতলের শিবিকা। মধ্যে রয়েছে ফুটখানেক দীর্ঘ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। সামনে নামাবলীধারী কিছু লোক বসে খোল-করতালসহযোগে ঢুলে ঢুলে দুলে দুলে নাম-গানে মত্ত। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবাবেশে হাত তুলে দুলছে। বৈদ্যুতিক আলো নেই। একটিমাত্র হ্যাজাক জ্বলছে। তাঁবু ও হোগলার ঘরগুলিতে কোন কোনটাতে জ্বলছে কেরোসিনের বাতি।

বুঝলাম, চার পাশের তাঁবু আর হোগলার ঘরের ঘেরাওয়ের মধ্যে এই উঠোনটি হল শ্রীনন্দগোপাল মাধবাচার্যের আশ্রম। সম্ভবত, এই তাঁবু ও ঘরগুলি এ আশ্রমের শিষ্যদের।

আমাকে দেখে একটু বে-তাল হল আসর। বেশভূষার মিল নেই। বোধহয় আমার চেহারাতেও বিলক্ষণ গরমিল ছিল আশ্রমের সঙ্গে। নিতান্ত নিরীহ মুখগুলি তুলে বাবাজীরা বড় বড় চোখে কৌতূহলী হয়ে দেখল। এলাহাবাদ স্টেশনে কাউকে কাউকে দেখেছি এদের লক্ষ্মীদাসীর সঙ্গে। তাদের গায়ে মুখে সর্বদাই গ্রাম্য দরিদ্র বোষ্টমের ছাপ। বুঝলাম, আমার মত মানুষ এমন আড়ম্বর-হীন আশ্রমে আসে না, আসে নি এ ক'দিনে। চোখেই পড়ে না সম্ভবত। আমারও পড়বার কথা নয়। টেনে নিয়ে এল বলরাম।

আসরের কাছ থেকে খানিকটা দূরে একটি হোগলার ঘরের মধ্যে ঢুকতে হল। লক্ষ্মী আসন পেতে দিয়ে বলল, 'বসেন।'

বললাম, 'দেরী হয়ে যাবে যে?'

বলরাম হাসি মুখখানি তুলে বলল, 'দেরীতে যে আসছেন। সাধ মিটবে না ঠাকুর, কিন্তুন যতটুকুন মিটে ততটুকুন না মিটাইয়ে ছাড়ি কেমনে?'

বলে লক্ষ্মীর দিকে ফিরে বলল, 'লক্ষীঠাকরুণ, ঠাকুরের মুখখানি বড় শুকু শুকু মনে হইতেছে। রাধামাধবের পেসাদ একটুস্—'

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'থাক না।'

বলরাম বলল, 'থাকতে নাই। কোন কিছু থেইমে থাকে না। বুকে হাত দিয়া দেখেন, সেও থেইমে নাই। থাক কইয়ে তারে থামাইয়ে রাইখতে পারেন? যেদিন থামবে সেদিন সবই থামবে। যতক্ষণ চলে, চইলতে দেন ঠাকুর।'

জানতাম, বলরামের সঙ্গে কথায় পারব না। তার তো শুধু কথা নয়। কথার সঙ্গে ছিল তার কালো মুখের নিরন্তর হাসি। ওই হাসি যেন প্রসন্ন বাতাস, উদার আকাশ। সেদিকে তাকালে মূক-মুগ্ধতায় স্তব্ধ হতে হয়। বলরাম ততক্ষণ চোখ বুজে গুনগুন করে গান ধরেছে।

'চল চল চল রে মন,
কোথায় খোঁজো মনেরি জন।
তুমি যত চল, সেও চলে,
চলে, দিবানিশি সর্বোক্ষণ।'

ফিরে দেখি লক্ষ্মীদাসী। হাতে দুটি পিতলের ঘটি। কিন্তু সে নিথর বিহ্বল। তার সেই কালো চোখ দুটি মেলে, সব ভুলে তাকিয়ে আছে বলরামের দিকে। যেন, গুনগুনানির সুরের মধ্যে ডুবে গিয়েছে, একাত্ম হয়েছে গানে। গানে শুধু নয়, রূপে অন্ধ হয়েছে। আমি একটা মানুষ, তাকে নজরে পড়ল না লক্ষ্মীদাসীর। কী দেখছে অমন করে তার মূল গায়েনের দিকে। গুনগুনানি থামিয়ে চোখ তাকাল বলরাম। তার দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল লক্ষ্মীদাসী। একটি উদ্গত নিশ্বাস চেপে ঘটি দুটি বসিয়ে দিল আমাদের দুজনের সামনে। দিয়ে পেছনে এসে ধরে দিল দুটি শালপাতা। দেখলাম, রয়েছে খানিকটা খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, বাঁধাকপির তরকারি, খানিকটা খোয়া। বলরামকেও তাই।

বলরাম বলল, 'আমাকেও দিলে? ঠাকুরের সঙ্গেই?'

বড় লাগে নিজেরই কানে। জানি নে কী দিয়ে বলরামের মন পেয়েছি। একটি সিগারেট ছাড়া তো কিছুই দিইনি। কিন্তু 'ঠাকুর ঠাকুর' করে সে এবার আমাকে ঠাকুর বলিয়ে ছাড়বে।

লক্ষ্মীদাসী বলল, 'আপনেরা খান ঠাকুর।'

বলে আমাকে লুকিয়ে লক্ষ্মী আড়চোখে দেখল বলরামকে। খেতে খেতে ভাবলাম, না, বলরামকে আমি হিংসে করব সেকথা এ বিশ্বে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যি বলি, ভাবতে পারি নি, বলরামের জীবনের চারপাশে

নিরাপত্তার একটি সুরক্ষিত পাঁচিল আছে। তার খাওয়ায় পরায় আহারে বিহারে কোন সযত্ন হাতের স্পর্শ থাকতে পারে, একথা মনে আসেনি, তাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম পথেরই ভিখারী, তারপরে আখড়ার মূল গায়েন। আজ আমারই এক পংক্তিতে সে আহারে বসেছে। আমার ঢাকা চোখের সামনে বিস্মিত মুক্ত প্রাঙ্গন কে খুলে দিলে বুঝতে পারলাম না। লক্ষ্মীদাসী, না বলরাম? হৃদয়াবেগ, ভক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় মিলেছিল বলরামের গানে ও কথায়। সে একদিক। আর-এক দিক দেখিয়ে দিল তার লক্ষ্মীদাসী।

হঠাৎ লক্ষ্মীদাসী ডাকল, 'ঠাকুর!'

তাকিয়ে দেখি, চোখে তার জল। অবাক হয়ে বললাম, 'কী বলছ?' লক্ষ্মী বলল, 'নালিশ আছে, বিচার করতে হইবে আপনারে।'

বিচার? এত বড় ভয়ানক দায়িত্ব তো আমাকে কেউ কখনো দেয় নি। তাকিয়ে দেখি, বলরামের হাসি এ-কথায় বাগ মানছে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমারো মন করতেছিল গো নক্কীদাসী, আসো, দুইজনে বিচার চাই এনার কাছে। বেশ, তবে বাদী আগে বলুক, আমি হইলেম পিতিবাদী অর্থাৎ কি-না আসামী।'

বলে বলরাম হেসে উঠল। সারাদিনের পর পেটে আহার পড়ে ঝিমনো মনটাও গা নাড়া দিয়ে উঠল খানিকটা।

লক্ষ্মীদাসী বলল, 'ওই তো দেখেন মানুষটা। আর এই মেলা। মেলা নয়, যেন শহরের সড়ক। মানুষ হাতি ঘোড়া গাড়ির কামাই নাই। কথা নাই বাত্তা নাই, যখন তখন বাহির হইয়ে যায়। কোথায় গিয়ে বইসে থাকে। এট্টা বিপদ আপদ হইলে আমি কোথায় যাইব, বলেন তো?'

বলে, চোখের জল নিয়ে তাকাল লক্ষ্মীদাসী। এতক্ষণে বুঝলাম, কেন লক্ষ্মীদাসী অভিমান করেছে। সত্যি, বিকলাঙ্গ বলরাম। বাইরের ভিড়ে তো সর্বক্ষণই তার প্রাণ-সংশয়।

বলরাম অমনি হাসি মুখখানি তুলে বলল, 'অনুমতি করেন, এইবার এই নিধম জবাব দেউক।' বলে লক্ষ্মীর দিকে একবার দেখে সে বলল, 'ঠাকুর জম্মো-লুলা আমি। এখেনে নক্কীদাসী আমারে আনতে চায় নাই। জোর কইরে আসছি। কিন্তুন এখেনে আইসে যে আমি আর থির থাকতে পারি না! আমার শরীলখানি ভাঙা, মন যে রয় না। সে যে মানে না। কে আমারে ডাকল, জানি না। যদি আসলাম, তবে এই আখড়ায় পইড়ে থাকি কেমনে।

ঠাকুর, আমি যে লুলা, এমন কইয়ে আর কোনদিন বুঝি নাই। আজই বায় বার দৌড়বার নেগে য্যাখন ছটফট করতেছি, পাখা য্যাখন মেলতে চাইতেছি, ত্যাখন দেখি, এ পাখা উড়তে পারে না। যদি আসলাম, তবে যেটুকু ঠেকতে ঠেকতে পারি—'

লক্ষীদাসী আমার দিকে ফিরেই বলল, 'যদি এট্টা বিপদ আপদ হয়?'

বলরাম বলল, 'অমঙ্গলের চিন্তা নাই। সোমসারে সবই আছে সেই ভেবে কি বইসে থাকে কেউ?'

লক্ষীদাসী বলল, 'কিন্তুন যদি কিছু হয়, তবে আমার আখড়া যে অন্ধকার হইবে। রাধামাধব তো আর কারুর গানে তুষ্ট নয়!'

রাধামাধবের অনুভূতি সম্পর্কে আমার নিতান্ত মানুষসুলভ মন চৈতন্যহীন। মনে হল, যদি বলরামের বিপদ হয়, তবে এক জায়গায় অন্ধকার নেমে আসবে। তার গান না শুনলে কোন এক হৃদয়ের রাধামাধব চিরদিনের জন্য দরজা বন্ধ করবে।

বলরাম বলল, 'নক্ষীদাসী, বাইরে কত নোক। সামনে যমুনে কেমন কলকল কইরে বইতেছে। সেখানে তিনি কান খাড়া কইরে রয়েছেন। আমি যে আসলজনারে গান শুনাতেই চাই।'

বলে সে হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল,

'তুমি যেথায় আছ, সেথায় আছি।
আমার মিছা ভাবনা নাই মনে।
তুমি ডাকলে আপনি কপাট খোলে
তোমার বাতাসে তাল দিয়া নাচি।'

আর কথা নেই লক্ষীদাসীর মুখে। দু-চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সে বলরামের দিকে। কোথায় গেল নালিশ, বিচার। এইটুকুনির জন্যই বোধহয় নালিশ, এইটুকুনি পেলে আর কিছু চাওয়ার নেই।

কিন্তু অবাক মানল মন। এই বিকলাঙ্গ মূল গায়েন যে এমনি করে একটি নারীর হৃদয় জুড়ে রয়েছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। বুঝলাম, এ সংসারে হৃদয়ের রীতি বড় বিপরীত পথে ধায়।

লক্ষীদাসীর ধ্যান ভাঙাল বলরাম। বলল, 'কই, তুমি যে ঠাকুরকে কী বলবা বলতেছিলে আমারে। ধইরে নিয়া আসলাম, বল। একবার পরখ কইরে লেও, কারে ঠাকুর কইছি।'

বলে আমাকে বলল, 'এই গানখানি সেই আতাউল বাউলের, ঠাকুর।'

লক্ষীদাসী বলল, 'ঠাকুর, আপনারে সেই কইলকেত্তায় রবি বাউলের গান একখানি শুনাইতে হইবে।'

মনটা চমকে উঠল। আবার সেই কথা! বলরামের গান শুনে এক নিঃশব্দ সুরতরঙ্গ আপনি দোল খাচ্ছিল আমার গলায়, আমার বুকে, আমার রক্তধারায়। জানি নে কে আতাউল, কিন্তু সে কথা ও সুরের রাজা, সন্দেহ নেই। তা বলে রবীন্দ্রনাথকে সেই দলে নিয়ে আসতে আমার সঙ্কীর্ণ মন বার বার বাধা পেল, তবু শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু-অঙ্কিত সেই রবি বাউলের একতারাবাজানো মূর্তিখানা বার বার ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

বললাম, 'তাঁর অনেক গান। কোন্ গান যে বাউল তা তো ঠিক জানি নে। তাছাড়া আমি তো গান গাইতে পারি নে।'

বলরাম বলল, 'তা বললে শুনব না ঠাকুর। "ছলছল চোখে, ছলো হাসি হাসো, তোমায় চিনি গো, চিনি।" ওনার একখান গান শুনান, যিনি কন "কবে তুমি আইসবে বইলে রইব না বইসে", তানার গান না শুনলে আমার আমঘাটায় ফিরা যাওয়া বেরথা ঠাকুর।'

ধন্য কথা বলরামের, ধন্য তার স্মৃতিশক্তি। একবার বলেছিলাম, ঠিক মনে রেখেছে। তবু, এই বলরাম যেন সুরের নদী। আজ আমি তার সেই সুর-দরিয়ায় ডুব দিয়েছি। মুখে যা-ই বলি, আমার সমস্ত লজ্জা ও অক্ষমতার সঙ্কোচ ধুয়ে দিয়েছে। সুর ও কথা আপনি ভেসে এল মনে। বাউল গান জানি নে। তবু ধরে দিলাম। আমার জীবন, সমাজ ও পরিবেশ ভুলে এক নতুন সংসারে মেতে উঠলাম—

'আমার মন বলে চাই চাই গো—
যারে নাহি পাই গো।
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনে বেদন বাজে—
নাই নাই নাই গো॥

*   *   *

ভোরের আলোয় জাগবে বলে
বলে সে—যাই যাই যাই গো॥'

বলরাম ঝাঁপ দিল প্রায় পায়ের কাছে, 'তবে, তবে ঠাকুর! ফাঁকি দিয়ে পলাইতে চাইছিলেন?'

লক্ষীদাসীর চোখে জল। বলল, 'আহা, সন্ধ্যাতারা যায় যে চইলে, ভোরের

তারায় আইগবে বইলে। কী কথা!'

আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। উচ্চারণে গ্রাম্য দোষ। তবু রবীন্দ্রনাথের গান যে এই গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষগুলির মনকে এমনি করে ভাসিয়ে দেবে, তা কোনদিন ভাবি নি। মনে করেছিলাম, সে শুধু আমাদের, আমাদেরই। আমাদের এই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের চাপা-গলা দুর্বল স্বরের প্যান-প্যানানি-ওয়ালাদের।

ফিরে দেখি, হোগলা ঘরের দরজার কাছে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আরও কয়েকজন। একজন বললে, 'আর-একখানা কিরপা করেন।'

ছি ছি ছি। ছিঃ, শেষটায় আমাকে গানের আসরে অনুরোধ!

কিন্তু আর তো বসতে পারি নে। বললাম, 'আর না বলরাম, এবার উঠব। অন্য দিন হবে।'

বলরাম বলল, 'আচ্ছা ঠাকুর, এখেনে আর ধইরে রাখব না।' বলে লক্ষ্মীর দিকে ফিরে বলল, 'ভাব, মূল গায়েন করবা কি-না?' বলে হাসতে হাসতে আমার সঙ্গে এল।

বললাম, 'তুমি আর এসো না, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

বলরাম বলল, 'নিজে তো যাইতে পারবেন না। আমারে নিয়া যাইতে হইবে।'

বললাম, 'কোথায় হে?'

সেকথায় জবাব না দিয়ে লক্ষ্মীদাসীর দিকে চেয়ে হাসল। লক্ষ্মীদাসীও। তারপর বলল, 'চলেন, নিয়ে যাই। আমারে রোজ জিজ্ঞেস করে, সে কোথায়? জবাব দিতে পারি না। আজ জবাব দিয়ে আসি।'

লক্ষ্মী পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ঠাকুর, রোজ একবার দেখা দিতে হবে যদ্দিন আছেন।'

বললাম, 'চেষ্টা করব।'

তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, জ্যোৎস্নালোকে ভরে গিয়েছে সারাটি মেলা। আকাশ জুড়ে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ।

বললাম, 'বলরাম, এখন আর কোন আখড়ায় যাব না।'

বলরাম বলল, 'আখড়ায় নয় ঠাকুর। কিন্তন্ একবার না গেলে যে চইলবে না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেখানে কে আছে?'

'যাইয়া দেখবেন।'

পেছন থেকে ছুটে এল লক্ষ্মীদাসী। তাড়াতাড়ি একখানি কম্বল মুড়ে দিল

বলরামের সর্বাঙ্গে। দিয়ে আবার একবার আমাকে মিনতি করে চলে গেল।

যেতে হল। বুঝলাম, না গেলে বলরামের পরাজয়! জানি নে, আবার সে কী বাধিয়ে রেখেছে কোথায়। সে কেল্লার পথের প্রাচীরের কোলের দিকে এগিয়ে চলল। সারি সারি তাঁবু, জ্যোৎস্নায় দেখলাম নানান রকম নিশান উড়ছে তাঁবুগুলির মাথায়। এদিকটায় দোকানপাট কম, সেইজন্য ভিড়ও কম।

একটি গাছতলার তাঁবুর কাছে এসে থামল বলরাম। তাঁবুর সামনে, খানিকটা জায়গা জুড়ে, মাথায় সামিয়ানার মত ঢাকনা দেওয়া। একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। সেই আলোয় দেখলাম, একটি জ্বলন্ত উনুনে রয়েছে তাওয়া। একজন রুটি ভাজছে, বেলে বেলে দিচ্ছে আর-একজন।

আমাকে আর বলরামকে দেখে তারা দুজনেই ফিরে তাকাল। তাকাতেই চমকে উঠলাম। চমকে ওঠবার মুহূর্তেই একটি চাপা খিলখিল হাসি হঠাৎ বেজে উঠে কুহক বিস্তার করল। তাওয়াটা ঠক করে নেমে এল উনুন থেকে। আগুনের আঁচে দেখলাম, হাসিতপ্ত লাল মুখ শ্যামার। ছি-ছি-ছি, এ কোথায় নিয়ে এল বলরাম। বলতে যাচ্ছিলাম তাকে সেই কথা। তার আগেই বলরাম হাত কপালে ঠেকিয়ে শ্যামার দিকে বলল, 'রোজ রোজ বলেন, লুলাসাধু তোমার সেই বাবু কোথায়? একদিন ডেইকে নিয়া আস। আজ ধইরে নিয়া আসলাম।'

মনে করলাম, তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি। জীবনে এত বড় লজ্জার সামনে আর কোনদিন পড়ি নি। কে জানত, বলরাম আমাকে এইখানে ধরে নিয়ে আসবে। লজ্জার সঙ্গে রাগ হল। বলরামদের হৃদয়াবেগ লোকলজ্জার ধার ধরে না। সংশয়, সন্দেহ ও রুষ্ট চোখের বাধা মানে না। কিন্তু আমাকেও কি সে তাই ভাবল?

নোকরানী পাতিয়া বেলে দিচ্ছে রুটি, ভাজছে শ্যামা, ছোট্ট একটি চারপায়ার উপর বসে। তার চটুল চোখে বিস্ময় ও হঠাৎ-হাসির ঝলকানি। সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার হেসে উঠল। সে হাসি শুনেছিলাম পথে পথে, এক বন্দী বিহঙ্গের পাখা ঝাপটা খাওয়া শব্দ শুনেছিলাম তখন লৌহপিঞ্জরে। আর এখন, দুর্গকোলে, এই যমুনাতীরের জ্যোৎস্নাভরা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি। এ-রাত্রি যেন বদ্ধজলার নিস্তরঙ্গ জল। তাতে যেন হাসিতে আচমকা বায়ু

শিহরণের কম্পন লাগল। এ যেন আরো রুদ্ধশ্বাস। ব্যথা ও যন্ত্রণা এক নতুন হাসির কুহকজাল ঘিরে আনন্দময়ের রূপে ফুটে উঠতে চাইছে।

আরো শুনলাম। শুনলাম, বুঝি এক তীব্র বিদ্রূপের ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে ওই হাসিতে। যেন আমাকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলছে, এসেছ তো? এসেছ?

মনে পড়ল, নিজের অভিশপ্ত জীবন ও হৃদয়ের তিক্ততায় সেদিন শ্যামা হঠাৎ বিচিত্র রূপ ধরে আমার মাথা হেঁট করে দিতে চেয়েছিল, আমি তখনো হেসেছিলাম! আজ এই হাসির সামনে যদি না হাসতে পারি, তবে এই ভীরু দুর্বল চিত্ত নিয়ে লজ্জায় মরে যাব।

ফিরে তাকালাম শ্যামার দিকে। সাজা-গোজার অন্ত নেই। সিল্ক্ শাড়ি পরে বসেছে রুটি সেঁকতে। উলেন স্কার্ফ এলিয়ে পড়েছে কাঁধের থেকে মাটিতে। তাকিয়ে দেখলাম, বাঁকা চোখে তীব্র অনুসন্ধিৎসা। ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু কেন যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে নি, বরং হঠাৎ লজ্জায় তার খরহাসির তীব্রতাকে একটু করুণ করে তুলেছে। কাঁচা সোনার অলঙ্কার ঝিক্‌মিক্ করছে তার হাতে গলায়। তার অপলক চোখের দৃষ্টিটা এমন করে বিঁধে রইল আমার সারা মুখ জুড়ে যে, মুখ ফেরাতেও পারি নে।

শ্যামা তাড়াতাড়ি নিজের ছোট্ট চারপায়াটি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বস।'

পাতিয়া যেভাবে রামনাম নিল, তাকে বাংলা করলে বোধহয় হবে 'মরণ'। বলরামও হাসল, 'বসেন ঠাকুর।'

বলরামের গলায় ব্যাকুলতা। ফিরে তাকিয়ে দেখি, তার মুখে পাগলা হাসির বান ডেকেছে। কিন্তু বসব? সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছি নে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আর সব কোথায়?'

শ্যামার হৃদয় বাঁকা! কথার আগেই ঘাড় বেঁকে যায়। যেন তাগ করছে! বলল, 'আর কারা?'

বললাম, 'তোমার সতীন, স্বামী, তারা সব কোথায়?'

ভ্রূ তুলে বলল শ্যামা, 'না থাকলে বুঝি বসা যায় না?'

এবার কথার সুরও বাঁকা হয়ে উঠল শ্যামার। চট করে কোন জবাব যোগাল না মুখে। তার মুখের দিকে চেয়ে চমকে আড়ষ্ট হয়ে উঠল মন। হাসিটি কেন যাই-যাই করে তার মুখ থেকে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বুকের ভেতরটি পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে।

বললাম, 'না, বসা যাবে না কেন? এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।'

শ্যামা বলল, 'তবে নারাজ কেন?'

নারাজ নই। নারাজ আমার মনের সামাজিকতা, ভব্যতা, লোকলজ্জা। কিন্তু, বুঝলাম ওই বোধগুলি আপাতত বিবেকের আড়াল করে বসতে হবে। মনে করেছিলাম, পথে বেরিয়েছি। লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে নয়। ওসব বালাই রাখব না মনে। কিন্তু যে আছে আমার রক্তধারায়, তাকে ছাড়ব বললে ছাড়ানো যায় না। তবু ভাবলাম, শ্যামার কথায় বসতে গিয়ে যদি কোন বেদনাদায়ক অপমান নিয়ে ফিরতে হয়, আমার চলার পথের ধুলায় তা ফেলে রেখে যাব। যদি না পারি, তবু জানি জীবন-মনের পলিতে একদিন তা ঢাকা পড়ে যাবে।

বসলাম। তবু বিস্ময়ের সঙ্গে একটা অজানা বিচিত্র অনুভূতি ঘিরে রইল মনে। অজানা, কেন-না, শ্যামার হৃদয়ের গতি অজানা। সে খিলখিল করে হাসলে, ঠাট্টা করলে, তাকে বুঝতে পারি। কিন্তু ডেকে বসতে বলে যদি এমনি করে মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে, যদি তার মনের গোপন লীলা খেলা করতে থাকে মুখের ছায়ায়, তবে বসে থাকি কেমন করে।

পাতিয়া দেহাতি ভাষায়, চাপা স্বরে বিদ্রূপ করে বলে উঠল, 'তাহলে রাতে আর রুটি বানানো হবে না তো? আজ এই পর্যন্তই?'

শ্যামা অমনি তার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দিল। টানাটা একটু বেশীই হয়েছে। টাল সামলে পাতিয়া বলল, 'উঃ বাবাগো! নিজের চুল ধরে টানো। আমার কেন?'

বলে, চকিতে একবার আমাকে দেখে, বলরামের দিকে চেয়ে হাসল। বুঝলাম, শুধু নোকরানী নয়, পাতিয়া নোকরানীর অন্তরালে খুনসুটি করার সইও বটে। কিন্তু পাতিয়ার খোঁচানিতে কাজ হল। আবার উনুনের ধারে বসল শ্যামা।

আর বাধা মানল না বলরামের গলা। সে আপনমনে চাপা স্বরে গুনগুন করে উঠল—

'কত কথা ছিল মনে
আজ মনে বাহির হইল না,
সখি, একি দায়, সময় যায়,
বুক ফাটিয়ে মুখ খুইল না॥'

ওরা না বুঝুক বলরামের গানের কথা। নিজে তো বুঝি। বুঝে লজ্জায় ও ত্রাসে চমকে উঠলাম। অবস্থাটা কাটাবার জন্য তাড়াতাড়ি কথা বলবার জন্য মুখ তুললাম। শ্যামাও মুখ তুলল। বোধহয় কিছু জিজ্ঞেস করতে

চাইছিল, থেমে রইল।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শ্যামা বলল, 'কী বলছিলে?'

বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কী কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তা নিজেই জানি না। বললাম, 'কিছু নয়। তুমি কী বলছিলে?'

শ্যামা বলল, 'বলছিলাম, কোথায় আছ? কোন্ আশ্রমে?'

জবাব দিলাম।

পাতিয়া বিদ্রূপভরে বলল শ্যামাকে, 'মেহেরবানি করে একটু সরে বস, এবার আমি বানাচ্ছি রুটি।'

শ্যামা সে বিদ্রূপ গায়ে মাখল না। সরে বসল সত্যি সত্যি। তারপর কেমন আছি, কোথায় ঘুরলাম, কোথায় খাই, সব জিজ্ঞেস করল। জিজ্ঞেস করল, জবাব নিল, আর টেরে টেরে চেয়ে হাসল নিঃশব্দে। বলল, 'তোমার লুলা সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হয় কি-না। এমন আজীব আদমি তুমি?'

এটা বোধ হয় তার ডাকাডাকির কৈফিয়ত। কিন্তু আজীব কেন? বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'কী জানি। রেলগাড়িতে সেদিন তোমাকে খুব তখলিফ দিয়েছিলাম, না?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেইজন্যই ডেকেছ বুঝি?'

সে বলল, 'হট।'

এমন করে তাকিয়ে ছিল পাতিয়া আর বলরাম, এমন নীরবে শুনছিল, যে আর বসে থাকতে পারলাম না। একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'উঠি।'

শ্যামা বলল, 'কাল আসবে তো?'

কেন, জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। পারলাম না। কিন্তু আসা-আসির কথা আদায়ের বাঁধাবাঁধি কেন।

বললাম, 'যদি পারি।'

বলে, মাথার ছাউনির বাইরে এলাম। বলরাম এল। গলায় তার গুন-গুনানি থামে নি। হ্যারিকেনের আলো কোথায় হারিয়ে গেল। মাঘ মাসে পৌষ-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল গায়ে।

শ্যামার চাপা আহ্বান শোনা গেল, 'শোন।'

ফিরে তাকালাম। চাঁপা বর্ণের খয়েরি সিল্ক শাড়িতে নীল জ্যোৎস্নার ঝরণা গড়িয়ে পড়ল। আর ঝিকমিকিয়ে উঠল রুপালী উলেন স্কার্ফ। কাছে

এসে বলল, 'সেদিন রাগ করেছিলে ?'

সেদিন মানে একদিনই। বিদায়ের মুহূর্তে চকিতে বদলে যাওয়া মুখে তার সেই তিক্ত কথা। না জেনে সেদিন তার বড় তিক্ত বেদনার বন্ধ দরজায় কড়া নেড়ে দিয়েছিলাম। রাগ করব কেন ? দোষ তো আমারই।

বললাম, 'না, রাগ করি নি তো ?'

'সত্যি ? সচ বলছ ?' সংশয়াকুল হাসি তার মুখে।

সংশয় কেন ? কেন রাগ করিনি, অত সব কথা বলতে পারব না বুঝিয়ে। রাগ যে করিনি, করতে পারিনি, সে কথা তো জানি নিজের মনে।

বললাম, 'মিছে বলব কেন ? সত্যি বলছি।'

এবার হাসির সঙ্গে চোখে তার কৃতজ্ঞতা দেখা দিল। বলল, 'কাল এস কিন্তু। এই সময়ে!'

চোখাচোখি হল আবার। হাসির সঙ্গে এই বিষণ্ন জ্যোৎস্নার মত একটা আবেশের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার চোখে। কপালের টিপটি কাঁপছে তার তৃতীয় নয়নের মত। অনুরোধে মিনতির সুর।

জবাব না দিয়ে চলে এলাম। ভুলি নি, সঙ্গে রয়েছে বলরাম। তবু কথা এল না। মন চমকাল বারে বারে। মানুষের মন। সে যেন পথের ধারে দোলানো আয়না। লক্ষ চমক তার বুকে।

শ্যামা স্বৈরিণী নয়। এক কুলীন ভূঁইহার ঘরের অশীতিপর বৃদ্ধের যুবতী বউ! হৃদয়ে তার বহু বজ্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রয়েছে চাপা। উৎসবের রাত্রে তা খোলা আকাশের বুকে বহু রঙের আলোর ঝাড়ে হাউয়ের মত জ্বলে উঠতে চায়। চোখ ও মন ভরে দিতে চায়। উৎসবের বাসর রচনা করতে চায় সর্বত্র, জীবনের বিড়ম্বনার অন্ধকারে। তাই এ সমাজের সব পরিবেশেই সে ভিন্ন ও বিচিত্র।

কিন্তু আমার পথে নেমে আসে যদি অন্ধকার! ভেজা পথে যদি বারে বারে আটকায় পা ?

বলরাম বলল, 'ঠাকুর, আমার উপর রাগ করেছেন ?'

বললাম, 'না।'

'তবে বলি এট্টা কথা ?'

'বল।'

'বলব, তার আগে এট্টুস গরম চা পেইলে হইত।'

নাঃ, বলরামই দেখছি ঠিক আছে। মুখ ফেরাতেই দেখলাম চাঁদের আলোয়,

একমুখ হাসি তার মুখে। ভিড় এখনো খুব। গাড়ি ঘোড়া ও মানুষের অবিরাম যাওয়া-আসা। জ্যোৎস্না পেয়ে সবাই যেন নতুন করে মেতে উঠেছে।

দোকানের কোন অভাব নেই। চা নিয়ে বলরাম বলল, 'ঠাকুর, গুরু ধরেছেন ?'

এ আবার কী কথা! বললাম, 'গুরু ? কেন হে ?'

বলরাম বলল, 'গুরু না হইলে কি চলে ? জন্ম থেইকে মরণ পর্যন্ত, গুরু আসে যায়, সকলে তো চিনা দেয় না।' বলে গুনগুন করে উঠল—

'গুরু বইলে ক্যারে পরনাম করিব মন।
তোর ভিতরে গুরু, বাইরে গুরু,
গুরু অগণন।'

গেয়ে বলল, তার মধ্যে এক গুরু,

সখি গো! এবার গুরু বলে রাখি মাথা
তোমার চরণে,
পেমরীতি বুঝাইলে তুমি অবোধ
জীবনে।'

বলল, 'বুঝেছেন ? এই গুরু ঠিক না থাকলে, সব বেঠিক।' বলে হেসে উঠল।

একটু বুঝি অন্যমনস্ক রইলাম। পরে বললাম, 'তুমি গুরু করেছ তো বলরাম ?'

বলল, 'করছি। কিন্তুন ঠাকুর, গুরুর সেবা কইরে আমার মনটা ভরে না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তোমার সেই গুরু ?'

বলরাম বলল, 'যে নিজে কেন্দে আমাকে কান্দায়।' বলে সে হঠাৎ চোখ মুছল। চোখে তার জল! বলল, 'ঠাকুর, কাইলকে আসবেন কিন্তুন্। নক্ষীদাসী আপনার জন্যে বইসে থাকবে।'

চলে এলাম। শেষ, বলরামের চোখের জলে আজ আমার ডুব দেওয়া সাজ হল। জলের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। অনেক, অনেক মুখ মনে পড়ছে। এই লক্ষ মানুষের মুখের মিছিল, আজ তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কত গুরু। পথে প্রান্তরে, কুটিরে বস্তিতে, ইমারতে, ঘরে—অগণিত গুরুকে আমার নমস্কার জানাই। বার বার নমস্কার জানাই।

একেবারে যাবার ইচ্ছা ছিল না বলতে পারি নে। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যাবেলায় যেতে পারলাম না। অনেক ঘোরা বাকি ছিল। এখন ঘুরে না নিলে আর হবে না। তবু ভেবেছিলাম, সন্ধ্যাবেলা ঘুরে-ফিরে তারপর যাব। সন্ধ্যাবেলায় নৌকায় করে ফিরে আসছিলাম যমুনার ওপর থেকে। হঠাৎ এই মাঘের সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর মত চকিতে মেঘে ছেয়ে ফেলল আকাশ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ঝলকে ঝলকিত যমুনা। ঢেউ উঠল তার বুকে। নৌকা দুলে উঠল। বাতাস এল, ঘোর হয়ে এল অন্ধকার। ঝুসির পাড়ে নৌকা ঠেকাবার আগেই বৃষ্টি নেমে এল, ঝোড়ো ঝাপটায়। ইচ্ছে করল গুনগুনিয়ে উঠি—

'উন্মাদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ,
দমকত বিদ্যুৎ পথতরু লুণ্ঠিত
থরথর কম্পিত দেহ।'

পাড়ে যখন উঠলাম, তখন সর্বাঙ্গ সিক্ত। একে উত্তরপ্রদেশের মাঘের শীত। তার উপরে জল। অসহ্য শীতে দাঁতে দাঁত, হাঁটুতে হাঁটু ঠেকে গেল। চারিদিকে সবাই ছুটছে। মানুষ ও জানোয়ার সমান তালে ছুটছে আশ্রয়ের সন্ধানে। দোকানপাট ঝাঁপ ফেলছে তাড়াতাড়ি। কোন রকমে আশ্রমে এসে উঠলাম।

সারারাত্রি প্রায় জল ঝরল। সকালবেলা শোনা গেল, কে একজন বৃদ্ধ সাধু শীতে বৃষ্টিতে বাইরে থেকে মারা গিয়েছে। হিমপ্রবাহের প্রথম শিকার। তারপরেই দারুণ অভিশাপের মত বালুচরে নেমে এল ভয়ঙ্কর হিমপ্রবাহ। সারা উত্তরপ্রদেশ জুড়েই এক অদৃশ্য ভল্লুক তার থাবা বসাল। ভেঙে যেতে লাগল মেলা।

খোলা আকাশের বুকে যে সব সাধুরা আস্তানা নিয়েছিল, তারা লোটা কম্বল নিয়ে ছুটল শহরের দিকে। ঝুসির উঁচু জমির কোলে গুহা কেটে আশ্রয় নিয়েছিল যারা, তারা পালাতে লাগল। যাদের ঘর, তাঁবু ধ্বসে ভেঙে পড়েছে, তারা বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে ঘরে অভিযান করল।

চারিদিকে শুধু পালাই পালাই রব। কোটরে কেবল গোঙানি ও যন্ত্রণার কোঁপানি। ভগবানের কাছে নিবেদন, আবেদন। শীতের তাণ্ডব চারদিকে ছত্রাকার করে দিল। এখন শুধু—

'আগুন আমার ভাই,
আমি তাহারি গান গাই।'

আগুন, আগুন চাই। মানুষ বেরোয় না। শুধু উটগুলি কাঁপতে কাঁপতে আসে কাঠের বোঝা নিয়ে। এলাহাবাদের বাউণ্ডুলে মেয়েপুরুষেরা কেউ বেকার রইল না। সকলেই বনে বাদাড়ে ঘুরে কাঠ এনে বিক্রি শুরু করল। আর নিয়ে আসতে-না-আসতে বিক্রি হয়ে যায়। একবেলা খাওয়া না জুটুক, আগুন না হলে চলবে না।

আগুন নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি। অর্থবান আশ্রমগুলি ভ'লো আছে। তাদের কাঠ, আগুন ও ভাল তাঁবুর অভাব নেই। সেখানে নাগারা উলঙ্গ হয়েই বেড়াচ্ছে নির্বিকারভাবে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাম থেকে নিয়ে আসছে কাঠ। এক টুকরো কাঠের জন্য তীর্থক্ষেত্রে কোলাহল ঝগড়ার অন্ত নেই।

আমাদের আশ্রমের কাছেই গোলমাল। বেরুতে পারি নে তিন দিন ধরে। ইচ্ছে করলে বেরুনো যেত। কিন্তু এই শীতে কোথায় যাব। তার মধ্যে ভেজা ওভারকোটটি কয়েক মাসের মধ্যে শুকোবে কিনা সন্দেহ। তার ওজন হয়েছে কয়েক মণ। গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে দেখি, একজন সাধুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দুজন লোক। সাধুটির হাতে কয়েক টুকরো কাঠ। কী ব্যাপার? না, সাধুটি নাকি কাঠ চুরি করেছে ওই লোক দুটির দোকান থেকে। কিন্তু সাধু কিছুতেই যাবে না। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব অভিশাপবাক্য বর্ষিত হচ্ছে তার গলা থেকে। কিছুতেই যখন যাবে না, তখন লোক দুটি আক্রমণ করল তাকে। সে পিঠ পেতে নিল সেই পীড়ন। তারপর বলল, 'বেশ করেছ, মগর লকড়ী দেব না।'

দিল না। লকড়ি না, প্রাণের টুকরো কটি নিয়ে সে ফিরে গেল হাসতে হাসতে।

একদিন শহরে গেলাম। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দেখলাম। কৌতুহল মিটল আনন্দভবন দেখে। একটু পোষ্ট-অফিসে যাওয়ার দরকার ছিল। সেখানে গিয়ে দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বন্ধু। তাঁকে আর এ কাহিনীতে টানব না। কিন্তু কদিন ধরে শুধু শহরেই যাওয়া আসা করলাম। একদিন নিমন্ত্রণ পেলাম, কেল্লার অভ্যন্তরভাগে সবকিছু দেখে নেওয়ার। সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

গোলাপীবর্ণের আকবরের দুর্গাভ্যন্তরের সৌধটি, পাঁচিলের বেড়ার মধ্যে নির্জনে দাঁড়িয়ে আছে একলা। পাঁচিলের দরজা সারাদিন বন্ধই থাকে। কারণ ওখানে বারুদের স্তূপ নাকি ঠাসা আছে। সেখানে সাধারণ কর্মচারীদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। মানুষের সঙ্গে যেন এক অতীত সৌধের অদৃশ্য মানুষেরা অবাক

চোখ মেলে রইল অলিন্দে অলিন্দে, গবাক্ষে গবাক্ষে। গবাক্ষে প্রবেশ-মুখে কোন দরজা নেই। ছিলও না কোনদিন। মখমলের ভারী পর্দা ঝুলত। সেই পর্দায় ফাঁক দিয়ে ঢুকত খোলা সঙ্গমের হাওয়া। বেলোয়াড়ী কাচের ঝাড় বাজত ঠিনিঠিনি করে। এখন খোলা গবাক্ষ দরজা দিয়ে হাওয়া ঢুকে পাক খেয়ে ভিতরেই হারিয়ে যায়। আকবরের দুর্গ, দরবার বসত একদিন এখানে। এখন পুরনো ইমারতের গন্ধে বাতাস ভারী।

বেরিয়ে এলাম। এই সৌধের পূর্বে দ্বিতীয় অট্টালিকার পেছনে জঙ্গল ও পুরনো প্রাচীর। প্রাচীরের নীচেই গঙ্গা। দেখলাম, এক জায়গায় একটি বিশাল বট। আসলের চেয়ে সুদ বেশী। বটের ঝুরি নেমে তৈরী হয়েছে আরও কতকগুলি গুঁড়ি। বটের গভীর ঝাড়ে চারিদিক হালকা অন্ধকার। তলায় গোবর দিয়ে সযত্নে লেপা-মোছা রয়েছে। লেখা আছে, অক্ষয়বট।

এই-ই প্রাচীন ও প্রকৃত অক্ষয়বট। কেল্লার অন্য অংশে পাতালপুরীতে অনেক দেবদেবীর সঙ্গেও রয়েছে একটি শাখাপত্রহীন বটের মোটা ডাল। পাণ্ডা বলল, ওটিই আসলে অক্ষয়বট। ইতিহাস তা বলে না। এই কৃত্রিম শাখাটি নিয়ে এক সময়ে কাগজে লেখালেখিও হয়েছিল। ওটি আসল অক্ষয়বট নয়, পাণ্ডাদের পয়সা রোজগারের সিদ্ধিবট হবে হয়তো। শ্রীশিবনাথ কাটজু এম. এল. এ. গবেষণা করে জানিয়েছেন, নিরালার এই ঝুরি-নামা বটটি আসল অক্ষয়বট। এর উপরে দাঁড়ালে দেখা যায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। আদিগন্ত মেলা ও তাঁবুর সমুদ্র।

একদিন, এই গাছ থেকেই সহস্র সহস্র হিন্দু ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গমে প্রাণ দিয়েছেন। তুলসীদাসের শ্রীরামচরিত মানসে আছে—

> 'সঙ্গম সিংহাসনু সুধি সোহা।
> ছত্র অক্ষয়বট মুনিমন মোহা॥
> পুজহিঁ মাধব পদ জলজাতা।
> পরসি অক্ষয়বট হরষহিঁ গাতা॥'

হিউ-এন্-সাঙ, অলবেরুনী, আকবরের আমলের ইতিহাস-লেখক আবদুল কাদের বাদায়ুনী সকলেই লিখে ও বলে গিয়েছেন।

আর ওই দূরের চর, সঙ্গমের তীরভূমি। কোথায় কোন্ স্থানটিতে মাথায় রাজমুকুট নিয়ে এসে বসতেন সম্রাট হর্ষবর্ধন। কোথায় বসত তাঁর পঞ্চবার্ষিকী মহাসভা, যেখানে যুদ্ধের উপকরণ ছাড়া সবই বিলিয়ে দেওয়া হত দানছত্র খুলে। কিন্তু আশ্চর্য! কুম্ভমেলার ইতিহাস কোথাও নেই। কেবল লক্ষ লক্ষ নরনারী

যুগযুগান্ত থেকে পাগলের মত ছুটে এসেছে, এখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সঙ্গমে। কেউ বলেন, শঙ্করাচার্য এ মেলার প্রতিষ্ঠাতা। কতখানি সত্য, তা জানি নে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, শঙ্করাচার্য তার প্রচারমঠ করেছিলেন চার জায়গায়। শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন ও বদরিকাশ্রম অঞ্চলে যোশীমঠ। প্রয়াগের উল্লেখ তো দেখি নে।

ইতিহাসই যখন এল, তখন শঙ্করাচার্যের কথা আর-একটু বলি। সে ইতিহাস একটু রাজনীতি-ঘেঁষা। এগারো শো বছর আগে আরবসাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তখন ইসলাম ধর্মপ্রচারকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারতের দক্ষিণ সৈকতে। ধর্মপ্রচারের নামে, ওটা রাজ্য দখলের ফিকির বলা যায়। আর হিন্দু নিম্নবর্ণের মানুষেরা তখন বর্ণহিন্দুদের দ্বারা এমন ভয়াবহভাবে নির্যাতিত যে, তারা দলে দলে মুসলমান হতে আরম্ভ করল। মন্দিরে প্রবেশাধিকার তো দূরের কথা, ভগবানকে ডাকবারই অধিকার নেই। ইসলামধর্ম উদার মূর্তি ধরে দিল দেখা। রাজায় প্রজায় একসঙ্গে বসে প্রর্থনা করলেও ভগবান অসন্তুষ্ট নন। তখন শঙ্করাচার্য ব্যাপার দেখে ধর্মকে ভেঙে গড়লেন। ইস্‌লাম এক ? হিন্দুর ভগবানও এক। উৎপত্তি হল শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ। নির্গুণ উপাসনা। এ ধর্মান্দোলনে তখন প্রগতিশীলতার গন্ধ ছিল। আজকে অনেকখানি মূল্যহীন। তবু আজকের ভারতকে অস্পৃশ্যতাবিরোধী অভিযান করতে হয়।

এই আমলেও হয়তো সহস্র সহস্র মানুষ এসেছে কুম্ভমেলায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছে।

আজো আসে, এখনো আসে। আমার মত কত মানুষ এসেছে, কত মানুষ দেখেছে। তবু ভাবি, সেদিনও কি এমনি বিচিত্রের মেলা বসত। এমনি সব বিচিত্র নরনারী আসত তাদের হাসি ও চোখের জল নিয়ে। হয়তো আসত, এর চেয়েও বিচিত্রতর ছিল তাদের হৃদয়লীলা।

শুনলাম, আগুন লেগেছে প্যারেড গ্রাউণ্ডে। যে আগুন এখন মানুষের প্রাণ, সেই আগুন রুদ্রমূর্তিতে দিয়েছে দেখা। ভয় হল। প্যারেড গ্রাউণ্ডে বলরাম থাকে। এর পরে একদিনও যাই নি। আগুন লাগার কথা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, না, বলরামদের তাঁবু অক্ষত আছে।

বলরাম বলল, 'জানতাম, ঠাকুর আমায় না এইসে পারবেন না। ঠাকুর কি

আর এমনি কইছি। ওইখানে থেকে উনি পিতিদিন এইসে এইসে জিজ্ঞাসা করেছেন, কই লুলাসাধুজী, তোমার বাবুজী তো আইসলেন না? মনে মনে কইছি, রয়েন গো ঠাকুরুন, সময় হইলে আপনি আইসবেন।'

বুঝলাম, শ্যামার কথা বলছে। অভদ্রতার চেয়েও বড় কথা, শ্যামার নিষ্পাপ হৃদয়লীলা দুদিনের জন্য সুর তুলতে চেয়েছিল। তার সেই বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারি নি আমার সমাজবোধের জন্য।

বলরাম বলল, 'আপনি রোজই শহরে চলে যান শুনলাম, কাইল গেছিলাম আমরা আপনার আশ্রমে। গিয়া শুনলাম, আপনি নাই। কেউ কিছু কয় নাই আপনারে?'

অবাক হলাম। তাই তো, কাল ব্রজবালা কী যেন বলছিল। প্রহ্লাদ এ ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় শয্যা নিয়েছে। ব্রজবালার মন খারাপ। তবু একবার যেন বলেছিল, তোমাকে ডাকতে এসেছিল কারা। ভেবেছিলাম, শহরের কেউ হবে। যেভাবে শহরে পরিচয়ের বাড়াবাড়ি ঘটে, কারুর আসা বিচিত্র নয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি গেছলে?'

বলরাম বলল, 'একলা নয়, ওনারা চারজন আছিলেন। ওনার সতীন, সতীনের বুইন আর ঝি। আমারে কইলেন, লুলাসাধুজী, আমার সতীন না গেলে তোমার বাবুজী আইসবেন না। চল ঘুরে আসি। আপনারে পালাম না। ওনারা অনেক জিনিসপত্র কিনলেন, তারপর আইসে পড়লেন।'

স্তব্ধ হয়ে রইলাম। বলরাম বলল, 'যাইবেন একবার?' বলরামেরও হাসিমুখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'বলরাম, যাওয়া যায় না।'

ফিরে আসবার পথে লক্ষ্মীদাসী ছুটে এল। বলল, 'ঠাকুর আপনে এট্টু বারণ কইরে যান তারে, যেন এমনি করে বাইরে না বইসে থাকে। আবার মেলায় মানুষ বাড়তেছে। কাইলকে কার পায়ের তলায় পইড়ে মাথায় চোট খাইছে। আপনে এট্টু কন, আপনার কথা শুইনবে। কিছু কইলে খালি এক কথা, নক্কীদাসী! মন যে মানে না গো! তবে আখড়া, ভোগ পূজা রেইখে তুমি আমার সঙ্গে চল। যদি কই, কোথায়? কয়, যেইখানে মন টানে, মন যায়।'

কেঁদে ভাসাল লক্ষ্মীদাসী। বলরাম বলল, 'নক্কীদাসী, তোমার কাছেই তো পাঠ নিচ্ছি—'

'আর বইসে থাকার সময় নাই গো,
বেন্দাবনে বাজছে বাঁশি আমার নাম ধইরে।'

তবু বললাম, 'কিন্তু সাবধান থেক বলরাম। এভাবে জীবন সংশয় কোরো না।'

সত্যি, আবার লোক বাড়তে আরম্ভ করেছে। মাঝে ভাঙন ধরেছিল, ফিরে যাওয়ার তাড়া পড়েছিল একটা। কিন্তু দ্বিগুণ করে ফিরে আসার তাড়া পড়েছে। ঠাণ্ডা কমেছে, হিমপ্রবাহ সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আবার রোদ হাসতে আরম্ভ করেছে। প্রত্যহ নতুন নতুন সাধুবাহিনী হাতি, ঘোড়া ও নিশানের মিছিল নিয়ে ছুটে আসছে দূর-দূরান্তর থেকে।

এই প্রথম দেখলাম, উলঙ্গ সন্ন্যাসী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ছুটে আসছে অশ্ব-সওয়ার হয়ে। বিশেষ নাগাদেরই এ রুদ্রমূর্তিতে দেখা যাচ্ছে বেশী। তাদের চেহারায়, অস্ত্রে, সর্বদাই তারা ভয়ঙ্কর। কখন থেকে এদের উৎপত্তি, জানি নে। তবে শুনেছি, নগ্নতা বহুদিনের। কৃপাণ কয়েক-শো বছর আগের। অসহায় সাধুদের রক্ষার জন্য চৌদ্দশ শকে বালানন্দজী সাধু-সংরক্ষণী সশস্ত্র সাধুসেনা-বাহিনী তৈরী করেছিলেন। এমন কি এরা অনেক সময় রাষ্ট্রের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছে।

সাধু ও মানুষের ভিড়ে মেলা আবার জমে উঠলো। সামনে অমাবস্যা। মৌনী অমাবস্যা, সেইদিন পূর্ণকুম্ভ স্নান।

একদিন রাত্রিবেলা পাঁচুগোপাল বলল, 'তুমি সব লিখবে, এখানকার সব কথা?'

বললাম, 'যদি লিখি?'

'আমার কথাও লিখবে?' চেয়ে দেখি, পাঁচুগোপালের সেই চোখে সেই পাগলামির ছায়া। বললাম, 'লিখতে পারি।'

কেউ ছিল না। তবুও চারিদিক দেখে সে বলল, চাপা গলায়, 'তবে লিখে দিও, আমি বলেছি সেইভাবে নয় কিন্তু! লিখে দিও, যদি সে একবার এসে বলে, বাবামণি, তুমি আমায় মাপ কর, তবে, তবেই আমি তাকে……'

কণ্ঠরুদ্ধ হল তার। দুপ্-দাপ্ শব্দে চলে গেল সামনে থেকে। 'সে' মানে তার মেয়ে শিউলি। যে তার বাবাকে ছেড়ে গিয়েছে। জানি নে সে কোথায় আছে। কিন্তু আমি লিখে দিলে যদি সে পাঁচুগোপালকে এসে বাবামণি বলে ডাকে, তবে লিখে দেব। নিশ্চয় লিখে দেব। লিখে দেব, 'শিউলি! কোথায় ফুটেছ, কোথা থেকে ছড়াচ্ছ এত গন্ধ! ডক্টর পাঁচুগোপাল পাগল

হয়ে ফিরছে পথে পথে। একবার বাবামণি বলে ডেকে তার কোল ভরে দিয়ে যাও।'

মেলা পাগল হয়ে উঠল। যে মানুষের বন্যা দেখে এতদিন অবাক হয়েছি, এবার তার অনেক গুণ বেশী। মনে হল, মানুষ আর ধরবে না সারা মেলায়।

অমাবস্যা নিকটবর্তী। সকালবেলা এসে হাজির বলরাম। এসে বলল, 'চলেন ঠাকুর।'

বললাম, 'কোথায় হে ?'

বলল, 'যেখানে যাওয়ার।'

আশ্রমের সবাই অবাক বলরামকে দেখে। শুনলাম, সকলেই বলাবলি করছে, ছোঁড়াটা কোন গুণ্-তুকের ওষুধের সন্ধানে আছে। নইলে, ওসব মানুষের সঙ্গে কেন ? ব্রজবালাও আমাকে পর পর ভাবতে আরম্ভ করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ? তোমাদের তাঁবুতে ?'

সে বলল, 'না, বেড়াইতে।'

বের হলাম। বলরাম সোজা দক্ষিণে নিয়ে চলল। নিয়ে চলল, যেখানে গৃহবধূদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বুঝতে দেরী হল না, কেন বলরাম টেনে নিয়ে এসেছে।

দূর থেকেই দেখলাম, জনবিরল গঙ্গার ধারে শ্যামা দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে তার জলভরা কলসী। কলসীর মুখে ভেজা জামা-কাপড়। বুঝলাম, চান করে দাঁড়িয়ে আছে। পরেছে লাল টকটকে শাড়ি। জানি, সে দেখেছে। তবু মুখ ফিরিয়ে আছে অন্যদিকে।

পা আপনি থেমে এল। বললাম, 'বলরাম, তুমি তো আনন্দ ছাড়া কিছু জান না। তবে পথের মাঝে শুধু অনাসৃস্ট করে এ নিরানন্দকে ডেকে আনছ কেন ?'

বলরাম বলল, 'ঠাকুর সত্যই তুমি অনাচ্ছিষ্টি ? তবে চোখের জল কি শুধু অনাচ্ছিষ্টি ? তবে আনন্দে চোখের জল ফেলেন কেন ?'

'এখানে সে আনন্দ কই ?'

'ওই যে। হেসে, কথা কয়ে একজন আনন্দ ছিষ্টি করতে চাইছে, তারে আমি থামাই কেমনে ? যে কেন্দে কেন্দে আনন্দ করতে চায়, তারে ফিরাই কেমনে ? এই যমুনাপারে আপনারা দেখা করেন, কেন্দে ফিরে যান। আমি

তাই দেখি। সেইখে ফিরে যাইব। সেই আমার আনন্দ। পথ চলায় ওই তো মজা। ওই আনন্দটুকুই তার লাভ।

'এই বুঝি তোমার গুরুর শিক্ষা ?'

'হ্যাঁ। কিন্তুন সে বলে ওইটুকু নাকি তার দুঃখু। যে দুঃখু মাইনসের সঙ্গ ছাড়ে না। আমরা আনন্দ-দুঃখু একসঙ্গে থাকি।'

বলে সে হাসল। এগিয়ে গেলাম। শ্যামা ফিরে তাকাল। কিন্তু এ কী! এতদিন সে অন্ত শাড়ি পরে রাঙা হাসি হেসেছে। আজ রাঙা শাড়ি পরে এসেছে, কিন্তু সারা মুখে ব্যথা-নীল যমুনার স্থির ও গম্ভীর ছায়া। ভেজা চুল এলানো। বাঁকা চোখে তার অভিমানক্ষুব্ধ তিরস্কার। তাকিয়ে প্রথমে শুধু বলল, 'মিথ্যুক!'

ওইটুকু বলতেই তার গলায় যেন অনেক জোর দিতে হল। বললাম বলল, 'ঠিক। কপট বাক্যিতে ঠাকুর বড় দড়ো দেখতেছি।'

না হেসে পারলাম না। মেনে নিতে হল শ্যামার অভিযোগ। বললাম, 'শুনলাম তোমরা একদিন আশ্রমে এসেছিলে।'

চকিতে ঠোঁট বেঁকিয়ে শ্যামা বলল, 'মগর, তুমি পালিয়েছিলে। ভীরু! কেন পালিয়েছিলে ?'

বললাম, 'পালাই নি। জানতাম না তোমরা আসবে।'

সে বলল, 'জানতে। ভয়ে পালিয়েছিলে।'

'কার ভয়ে ?'

'আমার ভয়ে।'

'তোমার ভয়ে ? কেন ?'

শ্যামা চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিল। মুখ না দেখিয়ে বলল, 'আমি খারাপ আওরত, তাই। তোমাকে তখলিফ দেব, সেই ভয়ে তুমি কথা দিয়েও যাওনি। তুমি এসেছ, চলে যাবে। আমিও চলে যাব। মানুষের সঙ্গে কি মানুষের মিতালি হয় না ?'

বলে সে ফিরল। হাস্যময়ী শ্যামার চোখে বহতা যমুনা। বলল, 'যেয়ে দেখতে তোমাকে তখলিফ দিতাম না। যত খারাপ ভাব, আমি তত খারাপ নই।'

পরাজয় ধিক্কার দিল আমাকে। শ্যামার লাল শাড়ি নীল হয়ে উঠল। ও যে ব্যথার রঙ। যমুনার কারসাজি। যমুনাতীরের বাঁশি কবে লোকলজ্জা মেনেছে। সে যে চিরদিন কলঙ্কের কোঁটা কপালে দিয়ে হাসিয়েছে কাঁদিয়েছে।

শুধু মিতালী। শ্যামা আমার মিত্রাণী। মনে মনে কোন অস্বীকৃতি ছিল না। প্রকাশ্যে লজ্জা ছিল, সে-বাঁধও ভাঙাল। তাকিয়ে দেখি, সেই দুরন্ত মেয়ে, কী অসহায়! ডাকলাম, 'শ্যামা!'

এই প্রথম তার নাম ধরে ডাকা। শ্যামা ফিরে তাকাল। বলল, 'ভীরু নই। তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি।'

শ্যামা বলল, 'তুমি আমার তথলিফ ভাবছিলে? মিথ্যুক। তবে আসো নি কেন?' বলতে বলতে তার ভেজা চোখে ও বাঁকা ঠোঁটে হাসি দেখা দিল। বলল, 'এখানে রোজ চান করতে আসব, যে কদিন আছি। আসবে তো? আসতে হবে।'

মনের কথা বলতে পারলাম না। নীরবে স্বীকৃতি দিতে হল। বলরাম বলল, 'একখানা হিন্দী গান শিখছি এইখ্যানে এইসে—

'শুন শুন রাধে, মৎ যাইহো যমুনাকে তীর
বেন্দাবনকে কুঞ্জ গলিমে কর পকড়ত মরি চৌর।'

এবার গানের সঠিক অর্থ বোঝায় কোন গণ্ডগোল হয় নি শ্যামার। একবার বলরাম, আর-একবার আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল অপাঙ্গে। হাসল নিঃশব্দে ঠোঁট বাঁকিয়ে। তারপর শ্যামা বলল, 'চল।'

'কোথায়?'

'আমাদের ওখানে।'

গেলাম। দেখলাম, মিথ্যের আশ্রয় নিতেই হল। বলতে হল, আমার সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে তাই ধরে নিয়ে এসেছে। প্রৌঢ়া প্রেমবতীয়া আমাকে দেখে হেসে উঠল। প্রৌঢ়া বলল, 'লুলা সাধুজীর সঙ্গে তোমার আশ্রমে গিয়েছিলাম। কদ্দিন আছ আর?'

কোন বিকার না দেখে অবাক হলাম। বললাম, 'অমাবস্যাটা দেখে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

তারপরেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। সর্বনাশ! বৃদ্ধ ব্যাঘ্র এক নজরে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! বুড়ো হঠাৎ ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, 'খবর ভাল?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

বুড়ো বলল, 'আমার ছোট বউ তোমার কথা খুব বলে।' তারপর হঠাৎ গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'ভগবান তোমার ভাল করুন।'

বলে বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দূর আকাশের দিকে।

চোখ তুলে দেখি শ্যামা তাকিয়ে আছে এদিকে।

তারপর দেখা হয়েছে প্রায় প্রতিদিন। শুধু ঘাটে নয়, নাগাবাসুকির মন্দিরে, দারাগঞ্জের বেণীমাধবের স্থানে, ওপারে অড়হরের ক্ষেতের ধারে। বলরাম ছিল সব সময়। প্রৌঢ়া প্রেমবতীয়াও সঙ্গে ছিল দু-একবার। কেবল পাগলের মত ঘুরেছে লক্ষীদাসী বলরামের পেছনে পেছনে।

অমাবস্যার আগের দিন যমুনার ঘাটে বললাম, 'পরশু চলে যাব।'

শ্যামা বলল, 'আমরাও।' বলে সে ফিরে তাকাল দূর যমুনার দিকে। রুদ্ধ গলায় বলল, 'মনে থাকবে?'

'কী?'

'এই মেলা?'

'থাকবে।'

শ্যামা দুর্জয় কটাক্ষ হেনে বলল, 'মিথ্যুক।'

না, মিথ্যুক নই। জানিনে কিসে ভরে রইল বুক ও মন। এই ভরা মন নিয়ে আমার চলা। ভুলব কেমন করে। বলরাম বলল, 'আমার কী পাওনা হইল?'

বললাম, 'কিসের পাওনা?'

'আপনাদের বিদায়ের?'

শ্যামা বলল, 'আমি দেব তোমাকে, কাল ভোরে, এখানে। তোমার বাবুজী এলে।'

ভোরে যেতে পারলাম না। অনেক বেলা হল। আশ্রম ফাঁকা। ভিড় দেখে আতঙ্ক হল। কিন্তু এ তো শুধু ভিড় নয়, পাগলের মত সবাই দিকবিদিক ছুটছে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে, কাপড়-জামা ছিঁড়ে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মানুষ চারিদিকে ছুটছে। খুন! মৃত্যু! মরে গেছে, হাজার হাজার মরে গেছে!

কী হল? যাকে জিজ্ঞেস করি, সে-ই ঠেলে ফেলে ছুটে যায়। দুবার মুখ থুবড়ে পড়লাম। মানুষ কি পাগল হয়েছে?

শুনলাম, মানুষে সাধুতে দলে পিষে প্যারেড গ্রাউণ্ডে হনুমানজীর মন্দিরের কাছে মৃতদেহের স্তূপ জমেছে। সাঁকো পার হতে পারলাম না। ভিড় আর পুলিশের কর্ডন চারিদিকে।

বেলা দশটায় এসে একটার সময় পার হলাম। সারা মেলা জুড়ে শুধু মৃত্যু-চীৎকার। সে কাহিনী আর বাড়াব না।

কিন্তু বলরামদের তাঁবু কোথায়? বলরাম কোথায়? সব ছিন্ন-ভিন্ন ভাঙা তছনছ চারিদিকে। কাউকে পেলাম না। লক্ষ্মীদাসী, বলরাম, শ্যামা—কাউকে না।

চারিদিকে শুধু মৃতদেহের স্তূপ। তাকে ঘিরে রয়েছে পুলিশ-বাহিনী। অপরিচিত নারী ও পুরুষ কণ্ঠলগ্ন হয়ে পিষে মরেছে। শিশু চেপটে লেপটে রয়েছে মায়ের বুকে। যে দেহ ও রূপ নিয়ে অনেক লজ্জা, তা আজ ঠাণ্ডা, স্পন্দনহীন স্তূপীকৃত। রঙিন ওড়না আর সিল্ক শাড়ি, নাগরা জুতো আর কলিদার পাঞ্জাবী, মাথায় টিকুলি আর গলায় চন্দ্রহার, তারই সঙ্গে ছন্নছাড়ার ছিন্ন বেশ, সব একাকার। কিন্তু সে স্তূপে সাধু একটিও নেই।

পুলিসের কর্ডন ভেঙে মানুষ ছুটে আসতে চাইছে। খুঁজছে। বউ-মা, বাপ-ছেলে, আত্মীয়-বন্ধু, সবাইকে খুঁজছে, ডাকছে, পায়ে পড়ছে পুলিসের।

কে একজন চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলছে, 'সব মাতাল সাধুরা এদের খুন করেছে, খুন।'

রাজপুরুষ থেকে শুরু করে সকলের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধ ফেটে পড়েছে।

চলে এলাম। দেখলাম, আশ্রমের অনেকে এসেছে হাত-পা ভেঙে। হাত-পা-ভাঙা অবস্থাতেই গোছাতে ব্যস্ত। পালাও পালাও। একদিন যেমন কারুর মুখে পা দিয়ে, কারুর গলা টিপে সবাই এসেছিল, তেমনি করে আজ সব পালাচ্ছে। একদিন পাগলের মত হন্যে হয়ে সবাই এসেছিল, আজ পাগলের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে সবাই পালাচ্ছে।

সন্ধ্যা হল। শত শত চিতার আগুন লকলকিয়ে উঠল প্রয়াগের আকাশে। আগুন লাগার ভুল করে বার বার ফায়ারব্রিগেড অ্যালার্ম বাজল। কিন্তু সে আগুন নেভাবার জন্য কোন জলধারা ছুটে এল না। কার প্রতিশোধ এমন রূপ নিল, কার প্রতিদানের এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখা দিল!

ব্রজবালা ডাকল। চমকে উঠলাম। দেখলাম, তারা লটবহর নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। কেউ বলল না, শুধু সে বলল, 'যাবে না?'

ঝোলা কাঁধে নিয়ে বললাম, 'চল।' কিন্তু প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে স্থির থাকতে পারলাম না। ব্রজবালারা চলে গেল। আবার ছুটে গেলাম সেখানে। না, কেউ নেই। শুধু অপরিচিত জনতা ও পুলিশের ভিড়। ফিরে বাঁধে উঠতে গিয়ে, একটি গাছতলায় দেখলাম লক্ষ্মীদাসী, সঙ্গে কয়েকজন ছন্নছাড়া ভীত সন্ত্রস্ত বৈষ্ণব। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম বলরামের কথা।

লক্ষ্মীদাসী আমাকে দেখে শান্ত গলায় বলল, 'কতবার, কতবার বারণ করেছি ঠাকুর। কিন্তন্ সে যে যাওনের জন্তে আসছিল, তারে আমি ফিরাইয়া নিয়া যাইব কেমনে?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে বলরামের?'

একজন বৈষ্ণব ফুঁপিয়ে বলল, 'বলরাম ওইখানেই আছে।' বলে চিতার দিকে দেখিয়ে দিল।

বলরাম নেই? নেই। বলরাম তার কথার ফুলবাগান নিয়ে এখানে এসেছিল। তার মালিনী ছিল লক্ষ্মীদাসী। এখন বাগান দগ্ধ হচ্ছে। লক্ষ্মীদাসী এইখানে বসে আছে।

শক্ত হয়ে রইলাম, নিজেকে দুহাতে চেপে ধরে রইলাম। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। পরে বললাম, 'চল, যাওয়া যাক!'

লক্ষ্মীদাসী: 'চিতা নিভুক ঠাকুর, পরে যাইবা।'

তারপরে ফিসফিস করে বলে চলল, 'তুমি যেথায় আছো সেথায় আছি, আমার মিছা ভাবনা নাই মনে। তুমি ডাকলে আপনি কপাট খোলে, তোমার বাতাসে বাতাসে তাল দিয়া নাচি।'

বলরামের-ই গান। মূলগায়েনের গান। যার গান না শুনলে লক্ষ্মীদাসীর মন্দিরের ঠাকুর হাসে না, মুখ তোলে না। সে আবার বলল, 'নিভুক ঠাকুর, তা পরে যাইব।'

সেই ভাল। গভীর রাত্রে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদের, মানে শ্যামাদের কোন খবর জান?'

লক্ষ্মীদাসী বলল, 'আপনার ওনার?'

আমার ওনার! সে বলল, 'ওনারে দেখি নাই। ওনার সতীনেরে দেখছি ঠাকুর, বুক থাপড়াইয়ে কানতেছিল। কিন্তন্ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি নাই।'

বুক চাপড়ে কান্না? হাঁটু মুড়ে বসে রইলাম। নতুন করে আর কোন ভয়ঙ্করতাই নাড়া দিতে পারল না মনকে। কেবল ভেতরটা অস্থির হয়ে রইল।

সকালেও চিতা নিভল না। তবু যাত্রা করতে হল। পলায়মানদের স্রোতে ভেসে গেলাম। আসার জন্ত মৃত্যু, এবার যাওয়ার তাড়ায় মানুষ মানুষকে পিষে মারছে।

ভিড়ের মধ্যে ট্রেনের কামরা খুঁজছিলাম। পিঠের ঝোলায় টান পড়ল।

ফিরে দেখি প্রৌঢ়া। বলল, 'উঠে এস!' উঠলাম লক্ষ্মীদাসীকে নিয়ে। লক্ষ্মীদাসী বসল এক কোণে। দেখলাম, তার পাশে প্রেমবতীয়া, তারপরে পাতিয়া, তারপরে শ্যামা। প্রৌঢ়া আর শ্যামা ছুটি সাদা ওড়নার ঘোমটা দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকেছে।

প্রৌঢ়া ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমার বুড়াটা মারা গেল ভাই।'

ফুঁপিয়ে উঠল প্রেমবতীয়া ও পাতিয়া। কেবল শ্যামার মুখ দেখতে পেলাম না। সারা কামরাই ব্যথা ও শোকের কান্নায় ভরা।

জায়গা ছিল না। মাঝখানে মালের উপর বসতে হল। শ্যামা ফিরে তাকাল। ওড়না খসে গিয়েছে। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর নেই, কপালে নেই টিপ। রাত্রিজাগরণ ও ক্লান্তির ছাপ সারা চোখেমুখে। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল। ও-ই শ্যামার বিধবার বেশ। চোখে মুখে তার ক্লান্তি ও বেদনা ছিল। আর ছিল চাপা সুখের একটি নিগূঢ় ছাপ। কিন্তু বৈধব্যের যন্ত্রণার ছাপ কোথায় যেন আড়াল পড়েছে।

অনেকক্ষণ পর চোখ বুজে আসছিল। ঘাড়ে স্পর্শ পেয়ে ফিরে দেখি শ্যামার হাত। ঠোঁট ছুটি একবার কাঁপল। বলল, 'আমরা পাটনায় নেমে অন্য গাড়ি ধরব।'

অকারণেই জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'কেন?'

ব্যথিত হেসে শ্যামা বলল, 'ঘরে যেতে হবে না?'

কোন সঙ্কোচ না করে তার দিকে ফিরে বসলাম। বললাম, 'বলরাম—'

সে বলল, 'জানি। তুমি ঘাটে এলে না। তোমার হয়ে তাকে আমি একটা জিনিস দিয়েছিলাম।'

'কী?'

'আমার একটা আংটি।'

নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। সে বিষণ্ণ হেসে বলল, 'একটা কথা বলব? আমাকে কী মনে হল?'

'এখনো, বুঝতে পারি নি।'

'আমার কিন্তু মনে হয়েছে।'

'কী?'

'তুমি নিষ্ঠুর।'

বলতে বলতে তার চোখের কোণ ছুটি চকচক করে উঠল।

কে জবাব দেবে? বলরাম নেই আজ। কথা নয়, সে যে গান গেয়ে

জবাব দিতে পারত! সে আবার বলল, 'যমুনাপারের ওই ঘাটে অনেকবার একলা গিয়ে অনেকবার ভেবেছি। তুমি যেখানে আসতে। ভেবেছি, আচ্ছা কী হল?'

বললাম, 'কিছুই না।'

সে বলল, 'অনেক কিছু। যমুনার ঘাটে আর আমার মনে রয়েছে তা। এই প্রথম আর…' চুপ করে আবার বলল, 'এই শ্যামাকে, নতুন বিধবাকে তোমার মনে থাকবে?'

'থাকবে!'

সে আবার আমাকে বলল, 'মিথ্যুক! তুমি বড় মিথ্যুক!'

বলতে বলতে তার গলা রুদ্ধ হল।

আমার মনের মধ্যে শুধু হু-হু করে উঠল একটি কথা, আজ বলরাম নেই! নেই! সে ছাড়া যে আমাকে সত্যবাদী বলার আর-কেউ ছিল না।

পাটনা এল। প্রৌঢ়া বলল, 'যাই।'

প্রেমবতীয়া, পাতিয়া প্রথম কথা বলল, 'যাচ্ছি।' শ্যামা তাকাল, ঠোঁট দুটি নড়ল। কি বলল অস্ফুটে, বুঝলাম না। তারপর সাদা ওড়নার ঘোমটা ঢেকে নেমে গেল। অনেক কথা ছটফট করে উঠল মনের মধ্যে। কিছুই বলতে পারলাম না। কেবল তাকিয়ে রইলাম! যতক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল, প্ল্যাটফরমের ওপর থেকে নতুন বিধবা শুধু অন্ধ চোখে তাকিয়ে রইল।

প্যাসেঞ্জার গাড়ি। ঠেকতে ঠেকতে পরদিন সকালে বর্ধমান পৌঁছল। প্রায় পুরো চল্লিশ ঘণ্টা। নতুন গাড়ি ধরতে হবে। লক্ষ্মীদাসীও নেমে গেল। পায়ে হাত দিয়ে বলল, 'ঠাকুর!'

তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে বললাম' 'বল।'

আশ্চর্য! সে গান গেয়ে উঠল। এমন মিষ্টি গলাটি লক্ষ্মীদাসীর। তাই তো। সে যে বলরামের গুরু। গুনগুন করে গাইল—

'মনের আগুন কেউ দেখল না।
তোমার বাঁশির সুরে বাতাস আগুন।
য্যাখন ত্যাখন আইসে ফাগুন॥
বাজাইয়ে ফিরলে বন্ধু,
আমার মন দেখল না।'

সে চোখ বুজে গাইতে লাগল। দু-চোখ দিয়ে নেমে এল জলের ধারা। মন্দিরে রাধারানী আজ মূল গায়েনের অভাবে নিজে গেয়ে কাঁদছে। তার সঙ্গীরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার গাড়ি এল। চলে গেলাম। অমৃতের সন্ধানে গিয়েছিলাম। কি নিয়ে ফিরে এলাম জানি নে। কেবল যেদিকেই ফিরি, সেদিকেই বড় ভারী। সকলের কথা, সকলের মুখগুলি একে একে মনে পড়ছে।

সেই চেনা মিছিলের মধ্য দিয়েই দ্বিপ্রহরের নিরালা গ্রামের পথে চলেছি ঘরে। বাগদিপাড়ায় ঢুকে মোড় নিতে গেলাম। কে বলল, 'ফিরে এলেন গো বাবা। একটু দাঁড়ান।'

কে? বুড়ি অবলা বাগদিনী। সে কেন দাঁড়াতে বলল? আর পথে দাঁড়াতে পারি নে।

সে কথা বলে। কিন্তু ঘোমটা থেকে মুখ দেখায় না। মস্ত একটি ঘোমটা টেনে কলসী কাঁখে ফিরে এল। বলল, 'জুতা খোলেন।'

'কেন?'

'খোলেন না।'

খুললাম। এক কলসী জল পায়ে ঢেলে দিয়ে বলল, 'তীথিক্ষেত্তর থেকে এলেন। পা ধুইয়ে দিতে হয় যে। নিয়ম কি না।'

ঠাণ্ডা স্পর্শে সমস্ত শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। আর এতক্ষণে সব ঝাপ্‌সা হয়ে এল চোখের সামনে।

যাত্রার শেষ কোথায়? ঘরের কাছে এসে অবলা বাগদিনী আমাকে নতুন অমৃত-সন্ধানের জলধারা দিল পায়ে। সন্ধানের শেষ নেই।

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু ॥

আজ মনে পড়ছে সেই ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। আজ যখন উত্তরের তরাইয়ে এসে, আকাশে উচ্চশির নীল ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, হিমালয়ের আহ্বান যেখানে শালবীথির বাতাসে বাতাসে, লতাগুল্ম-বেষ্টিত নিবিড় অরণ্যের পাখির কাকলিতে, স্টেশনের নাম পড়ছি 'সুকনা', আমরা বাঙালীরা যার উচ্চারণ করি 'শুকনা', তখন ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা বড় বেশী করে মনে পড়ছে।

অথচ দেশটা তো বাঙলাদেশই। 'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই।' আধুনিক কবিতায় পড়েছি। কবিকে ডাক দিয়েই বলি, আর একটু ওপরে চলুন যাই। নিতান্ত এই তরাইয়ের জঙ্গলেই শেষ সীমানা টানবেন না।

জানি, ভৌগোলিক সীমানার দুই বিন্দুতে, দ্বীপে ও পাহাড়ে আধুনিক রাজনীতির বিকার-দুষ্ট অনাত্মীয়তা ঘা মেরেছে। বিবাদ লাগানো হয়েছে, সমতলের সঙ্গে অসমতলের, দ্বীপের সঙ্গে মূল ভূ-খণ্ডের। এর নাম হয়তো শাসন। কিন্তু সন্দেহ আর বিদ্বেষের বিষাক্ত সাপকে মাঝখানে রেখে, মন গিয়েছে কুঁকড়ে, প্রাণ হয়েছে ছোট। শুধু বাঙলাদেশ কেন, সারা ভারতবর্ষের নানান রূপকে ঢেলে যে আমরা এক প্রাণের শপথ করেছিলাম, শাসন আমাদের সেই প্রাণকে করেছে চূর্ণ চূর্ণ। বিচিত্র বর্ণাঢ্য মহিমাময় সেই ছবির স্বপ্ন দিয়েছে ভেঙে। সেই চূর্ণ প্রাণ-ভাঙা স্বপ্নের উক্তি, বিক্ষুব্ধ ব্যথায়, একটু বা শ্লেষ বক্রতায় উঠেছে বেজে, 'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই।'

এটুকু মানতে গেলে, সারা জীবনের একটা স্বপ্ন যে ব্যর্থ হয়ে যায়। ছেলেবেলা থেকে মুখস্থ করা ভূগোলের সেই লাইন ক'টিতে যে অনেক স্বপ্ন দেখেছি। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে হিমালয়। ছেলেবেলায় পড়েছি, আর

অনেক স্বপ্ন দেখেছি, একদিন হিমালয়ে যাব। বাঙলাদেশের কোন্ ছেলেই বা সে-স্বপ্ন ছাখে নি। একদিন হিমালয়ে যাব। সেখানে দেবতা আছেন কিনা, সেদিনও জানতাম না। এখানে জানি নে। সেখানে আত্মাকে আবিষ্কার করা যায় কিনা, আগেও জানতাম না, আজও জানি নে। সমতলের ছেলে, হিমালয় আমাদের কাছে চিরবিস্ময়ের।

আজ এসে দাঁড়িয়েছি সেই চিরবিস্ময়ের দরজায়। সেই দরজার প্রহরায় তরাইয়ের শাল দেবদারু আসন অর্জুন, বিশাল মহীরুহরা আকাশ-চুম্বী ছায়া নিবিড়তায় দুলছে। সমতলের শেষ সীমানায়, পাখিরা গাইছে অসমতলের শুরুর প্রস্তাবনা। দু'চোখ মেলে, রুদ্ধবাক্ তৃষ্ণায় চেয়ে আছি সামনের উর্ধ্বগামী পথের দূর বাঁকে। ওখানে হিমালয়, হিমালয়! আর ছেলেবেলার কথা বারে বারে মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। ছেলেবেলায়, সেই পাহাড় দেখার একটু সাধ। পাহাড়ে ওঠবার কী ব্যাকুল পিপাসা।

মনে পড়ছে, সেই সাধ এবং পিপাসাতেই, মাস্টারমশাইকে মিছে কথা বলে পাঠশালা থেকে একেবারে বাড়ি। খবর ছিল আগেই, বাবা মা যাবেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে, তীর্থদর্শনে। যদি পাহাড় কথাটা কানে না যেত, তবে হয়তো অমন পাগলামি মাথায় চাপতো না। পাহাড় যে! শোনা পর্যন্ত প্রাণের কী অস্থিরতা। গিরিশ-মাস্টারের সেই খোঁচা গোঁফ, চোকো মুখ, সাপ লিকলিকে বেত, কিছুই সেদিন পড়ায় মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। বুকের মধ্যে কেবলই ব্যথা ও বিক্ষোভ বাজছিল, চন্দ্রনাথ পাহাড়! পাহাড়!...বঞ্চিত প্রাণের কী শোক! কারণ, যাবার কথা শুনেই লাফিয়ে উঠেছিলাম, 'আমি যাব।'

জবাব পাওয়া গিয়েছিল, 'না। ছোটরা তীর্থক্ষেত্রে যায় না।'

ভগবান, ছোটদের কোনো মর্যাদাই তুমি দাও নি। তখন মনে হয়েছিল, অত বড় শোক সামলে ওঠা দায়। সত্যি প্রতিবাদের কিছু ছিল না। আশে-পাশের যারা তীর্থক্ষেত্রে যায়, তাদের সঙ্গে ছোটরা যায় না। কিন্তু কান্না বাধা মানে নি। বৌদির হাতে খেয়ে, দিদির হাতে জামা পরে, বই শেলেট বগলে পাঠশালায় গিয়েছিলাম। বাবার সঙ্গে কথা বলি নি। মায়ের চোখের দিকে তাকাই নি। দিদি বলেছিল, ইস্কুল থেকে ফেরবার পর ও বুড়িগঙ্গার ঘাটে বেড়াতে নিয়ে যাবে। বৌদি বলেছিল, চীনেবাদাম কিনে খাওয়াবে। আর

সব শেষের সান্ত্বনাটুকু ছিল মায়ের মুখ থেকে, 'দিদি আর বৌদির কাছে লক্ষীটি হয়ে থাকিস্। চন্দ্রনাথের লাঠি আর ঢোলক কিনে আনব।'

একটি চকিত মুহূর্তের জন্যে হয়তো ন'বছরের আত্মায় চন্দ্রনাথের লাঠি ও ঢোলকের খুশির ঝিলিক হেনে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই পাহাড়ের কল্পনা, হতাশা ও বঞ্চনার দুঃখ কাঁদিয়ে ফেলেছিল। মাথা নাড়তে নাড়তে পা দাপিয়ে ছুটতে ছুটতে বলেছিলাম, 'চাই না, চাই না,। লাঠি চাই না, ঢোলক চাই না।'

কিন্তু পাঠশালার মেঝেয়, মাদুরে বসে শ্রুতিলিপি লেখা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। চোখের সামনে ফুটে উঠছিল, বাড়ির সকলের হাতে বিছানাপত্রের ব্যস্ত বাঁধন-ছাঁদন। খাওয়া-দাওয়ার পাট হয়তো চুকলো। ঘোড়ার গাড়ি বুঝি এসে দাঁড়ালো বাড়ির দরজায়। লাল চকচকে গাড়ি, লাল রঙের জোড়া ঘোড়া। মালপত্র তোলা হল, গাড়ি হয়তো দৌড়লো বাদামতলার ঘাটে। সেখান থেকে স্টীমার, স্টীমার থেকে নেমে রেলগাড়িতে করে চন্দ্রনাথ। ছবির সেই পাহাড়। ভূগোলের বর্ণনা, প্রাকৃতিক আকাশস্পর্শী উচ্চ শিলাভূমি কোথাও অরণ্য-আবৃত কোথাও প্রস্তরগাত্র মাত্র, এবং উঁহার নানান স্থানে প্রস্রবণ বহিয়া যায়।—আর বসে থাকতে পারি নি, একবার শেষ চেষ্টা দেখতে হবে, বাবা-মায়ের পাষাণ প্রাণ গলানো যায় কি না। মনে হতেই, বই শেলেট বগলে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। জিভ ভারী তবু অকাম্পিত গলায় মিথ্যে বলেছিলাম, 'স্যার, বাবা বাড়ি যেতে বলেছেন।'

'কেন?'

'বাবা-মা আজ চলে যাবেন তো তাই আগে আগে বাড়ি যেতে বলেছেন।'

'কোথায় যাবেন?'

'চন্দ্রনাথ।' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে বুকটা টনটনিয়ে উঠেছিল। গলা রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। চোখ উঠেছিল ছলছলিয়ে। আর শহরে, লক্ষ্মীবাজারের গিরিশমাস্টারের মুখ যে ভাখে নি, সে জানে না, তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে, মিছে কথা বলা যায় কত দুঃসাহস থাকলে।

মাস্টারমশাই মুখের দিকে তাকিয়ে, নাকের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে, লোম ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছিলেন, শব্দ করেছিলেন, 'হুম।'

বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তা চিঠিপত্তর কিছু আনিস নি তো?'

জয় মা ঢাকেশ্বরী! হে বাঙলাবাজারের মা কালী! মূর্ছিত স্বরে কোনোরকমে বলতে পেরেছিলাম, 'দেন নি।'

কেন? কারণ কি? তারপরে এ সব জিজ্ঞাসায় সম্ভাবনাই পুরোপুরি ছিল।

কিন্তু আমার ঢাকেশ্বরী এবং বাঙলাবাজারের কালী মাস্টারমশাইকে নিশ্চয় পরিপূর্ণরূপে ভর করেছিল। কারণ একমুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে বলেছিলেন, 'যা।'

রাস্তা দিয়ে কী বেগে যে ছুটেছিলাম! কিন্তু বাড়ি ঢুকে মনে হয়েছিল, বাড়িটা যেন খাঁখাঁ করছে। উঠোনে গুটিকয় পায়রা কী খাচ্ছিল খুঁটে খুঁটে। একপাশে নীল লাল জবার গাছ, গুটিকয় কলাগাছ। ছুটে গিয়েছিলাম বাবার ঘরের দিকে।.

দিদি আর বৌদি পাশাপাশি শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। আর একটা ঘরে ছুটে গিয়েছিলাম। ছোট কাকিমা সে ঘরে নিদ্রায় অচৈতন্য। বুঝতে আর দেরি হয় নি, যাঁদের আশায় ছুটে আসা, তাঁরা আমার আগে ছুটেছেন।

বই শেলেট উঠোনের ওপর ফেলে মড়াকান্নার সুরে এমন চীৎকার করে উঠেছিলাম, গোটা বাড়িটার ঘুম ভাঙতে একমুহূর্ত দেরি হয় নি। তবু হায়, পাহাড়ে যাওয়া হয় নি।

কিন্তু সাধ মেটাবার চেষ্টা কখনো থেমে থাকে নি। পাহাড় একটি আবিষ্কার হয়েছিল। আশ্চর্য আবিষ্কার আজ যখন হিমালয়ের পাদদেশে, তরাইয়ের অরণ্যে এসে দাঁড়িয়েছি, দূরে আকাশের গায়ে কৃষ্ণনীল উচ্চশির ঢেউয়ের মালা দেখতে পাচ্ছি, তখনো কিন্তু সেই ছেলেবেলার পাহাড়ের মর্যাদা আমার কাছে একটুও ছোট হচ্ছে না।

পাহাড়ের তৃষ্ণাই পাহাড় আবিষ্কার করেছিল। সেই আবিষ্কারের কাহিনী বলি।

পাশের বাড়িতে থাকতো বলু, ভাল নাম বলাই। সমবয়েসী, দু'জনেই গিরিশমাস্টারের পাঠশালার ছাত্র। এ কথা মানতে হবে, আমার থেকে বলুর কল্পনা-রাজ্য ছিল আরো অনেক বড়। বড় হয়ে অনেক মাস্টার স্টোরি টেলারদের মুখে গল্প শুনেছি। কিন্তু বলুর কাছে তারা কেউ নয়।

কালো কুচকুচে বলুর খোঁচা খোঁচা চুল। পিলেটি ছিল বেশ ডাগর-ডোগর। সেই পিলের ওপরে, কালো ছাতার কাপড়ের ইলাষ্টিক দেওয়া হাফপ্যাণ্ট ও চিরকাল হাত দিয়ে ধরে রাখতো। নইলে খুলে পড়ে যেত। আসলে ইলাষ্টিক কোনোদিনই ও রাখতে পারতো না। কোনো না কোনোভাবে

ছিঁড়তোই। তারপরে তাতে দড়ি বাঁধাটা ওর কাছে ছিল প্রায় টাবুর মতো নিষিদ্ধ। বাড়ি থেকে দড়ি যদি বা আবার বেঁধে দেওয়া হত, এমন ভাগ্য, সেটা ঠিক আপনি ঢিলে হয়ে যেত। যে-কে-সেই, বলু কোমরের কাছে প্যান্ট ধরে চলেছে। কিন্তু বলুর চোখ দুটি ছিল বড় বড়, টানা। নাকটি ছিল টিকলো। ও যখন সেই চোখ পাকিয়ে ভূতের গল্প বলতো, তখন গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতো। ওর গলার স্বরটি ছিল আশ্চর্য। তাতে ভূতের চন্দ্রবিন্দু এবং অনুস্বার-যুক্ত শব্দে, যেমন সত্যি সত্যি এক অলৌকিক ভয়াল গা ছমছমে পরিবেশ ফুটে উঠতো, আবার তেমনি রাজপুত্রের বীরত্বে রীতিমতো গমগমিয়ে উঠতো। ঘুড়ি যখন আকাশে ওঠে, তখন যে সেই ঘুড়ির ঘাড়ে পাড়ার প্রকাণ্ড শিমুল গাছের স্থায়ী ভূতটা চাপে, এ তত্ত্ব বলু না বললে কোনদিন জানতে পারতাম না। পাড়ার হোঁতকা কালো হুলো বেড়াল নয়, খালপারের গাব গাছের ভূতটাই ওরকম বেশ ধরে ঘুরে বেড়ায়, এটা বলুরই একমাত্র প্রত্যক্ষ জানা ছিল। কারণ, ও একদিন দেখেছিল, বেড়ালটা হঠাৎ গরুর রূপ ধরে ওর আগে আগে চলতে আরম্ভ করেছে। সেই থেকে বেড়ালটাকে দেখলেই রাম রাম জপ করেছি। লাল চোখে তাকালে তো কথাই নেই। বুকে থুঃ থুঃ করে থুতু ছিটিয়ে নিয়েছি। ভূতের নজর তো শত হলেও!

বলু রাতকে দিন করতে পারতো, দিনকে রাত। ব্যক্ত করতে হলে, হিমালয়ের যাত্রা এখানেই ইতি করতে হয়। সে কাহিনী এখন তোলা রইলো। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের শোকটা যখন বলু জানতে পারলো, ওরও খুব দুঃখ হয়েছিল। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ ছিল না, বড়রা অধিকাংশই নিষ্ঠুর, মায়া মমতাহীন। সব বিষয়েই ছোটরা বঞ্চিত, বড়রা নিজেদের খুশি অনুযায়ী সব কিছু করে।

তারপর হঠাৎ বলু বলে উঠেছিল, 'পাহাড় একটা দেখেছি এক জায়গায়, যাবি একদিন?'

ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কোথায় নিয়ে যেতে চায় বলু? জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় পাহাড়?'

বলু বলেছিল, 'ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে।'

ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড়? সেই প্রাকৃতিক আকাশস্পর্শী উচ্চ শিলাভূমি, কোথাও প্রস্তরগাত্র মাত্র, এবং উহার নানাস্থানে প্রস্রবণ বহিয়া যায়?' এমন পাহাড় ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে? অনেকবার না হোক, অন্তত দু-একবার তো বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছি।

আর যেতে হলে শহর পেরিয়ে ধানমণ্ডাইয়ের মাঠের পাশ দিয়েই যেতে হয়। কখনো সেই আদিগন্ত মাঠের বুকে পাহাড় তো চোখে পড়ে নি।

অবাক্ হয়ে বলেছিলাম, 'ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে?'

হঁ্যা রে, ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে, বেশ বড় পাহাড়। রমনায় মেসোমশাইয়ের বাড়ি যেতে, আমি একদিন দেখেছিলাম। খুব উঁচু, তাতে জঙ্গল আর গাছ আছে।'

আমার সারাটা শরীর রোমাঞ্চে শিউরে শিউরে উঠেছিল সেই বর্ণনা শুনে। সে যে সত্যি পাহাড়েরই বর্ণনা দিচ্ছিল বলু! নির্ঘাত পাহাড়। 'খুব উঁচু, তাতে জঙ্গল আর গাছ আছে।' ঠিক মিলে যাচ্ছিল।

আমি প্রায় চুপিচুপি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'প্রস্তরগাত্র আর প্রস্রবণও তাতে আছে?'

একটু থতিয়ে গিয়েছিল বলু। প্রস্তরগাত্র আর প্রস্রবণ? পরমুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল, 'তা কী করে জানব, আমি অনেক দূর থেকে দেখেছি। গায়ে পাথর আছে, না কি জল আছে, তা কি দেখা যায়? কাছে গেলে তো দেখা যাবে। যাবি? চল, পাহাড় দেখে আসি।'

বুকের মধ্যে কী ভীষণ ধক্‌ধক্ করছিল। পাহাড়, তাও ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে! চন্দ্রনাথে যেতে হবে না, বাঙলাদেশের উত্তর সীমান্ত হিমালয় যেতে হবে না। এক্রামপুর থেকে মাত্র ধানমণ্ডাইয়ের মাঠ। অবিশ্যি সেটাও অনেক-খানি বুকের পাটা দরকার। প্রায় দু মাইল আড়াই মাইল দূরে, ফুলবাড়িয়া ইষ্টিশনের রেললাইন পেরিয়ে। জানতে পারলে, হাড় একজায়গায়, মাস একজায়গায় হবে, সন্দেহ নেই। নয় তো দিদির ভাষায় 'মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলব।' ভয়াবহ!

কিন্তু একবার যখন জানা গেছে, আর তো উপায় ছিল না। খেলাধূলা খাওয়া পড়াশুনা সব মাথায় উঠে গিয়েছিল। পাহাড়! ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড়। বলু যখন বলেছে। এবং যা বলেছিল, তাতে সন্দেহ হয় এমন অবকাশ একটুও ছিল না, ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড় আছে। কিন্তু ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে, শুধু আমি আর বলু যাব, শুনলেই তো সর্বনাশ! ইস্কুলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে। তারপর দিদির হাতে মুণ্ডুটা হয়তো সত্যি ছিঁড়ে যাবে। বৌদির যা হোক একটু মায়া-মমতা আছে। কিন্তু ধান-মণ্ডাইয়ের মাঠে, কুচো দেবরের অভিযানের ইচ্ছের সংবাদ শুনলে নিশ্চয় মায়ার প্রাণ নীরস কঠিন হয়ে উঠবে। পাশে শুতে দেওয়া তো বহুত দূর। ছোট

কাকিমার তো কথাই নেই। তাঁর সব থেকে বড় শাস্তি ছিল, ঘরে শিকল আটকে রেখে দেওয়া এবং খাওয়া বন্ধ। মায়ের শাস্তি ছিল অন্যরকম। মা খালি নির্দেশ দিতেন, 'খুকি, ওকে আজ মেরে পাট পাট কর।' 'বউমা, ওকে হাত দিয়ে ছুঁয়ো না।' মায়ের সব থেকে মোক্ষম কথাটি ছিল, 'তার পর উনি আজ আসুন, তখন কী করা যায়, দেখা যাবে।' কী মারাত্মক! 'উনি' হলেন বাবা। আর বাবাকে তো গায়ে হাত তুলতে হয় না। চোখের দিকে তাকিয়ে একবার হাঁক দিলেই দেহের ভিতরে বাইরের অবস্থা খারাপ।

কিন্তু বাবা-মা ছিলেন না। বাকী তিনজন তো ছিলেন। বাড়ির কর্তা তখন ছোটকাকা। যদিচ অতি ভাল মানুষ। সারাদিন ছবি আঁকাই তাঁর কাজ ছিল। মানুষটিও ছবির মতোই প্রায় অনড়, নিশ্চল। খুব হাঁক-ডাক করলে, একবার মুখ তুলে তাকাতে পারেন। যদিও বুঝতে পারেন না কিছুই। শুধু এক মুখ বিস্ময়, একটি জিজ্ঞাসা, 'কী আশ্চর্য। হল কী।...'

অতএব, একটা দিন পুরো বিচার-বিবেচনার পর, এমন কি রাত্রে পাশাপাশি ছাদে দাঁড়িয়ে গূঢ় সলা-পরামর্শের পর, একমাত্র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, না বলেই যাওয়া! অর্থাৎ পলায়ন। আর সেটা খেয়ে-দেয়ে বই-শেলেট হাতে নিয়ে বেরুনো ছাড়া উপায় ছিল না। ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড়! এ কথা শোনার পর, ইস্কুল পালানো ছাড়া নতুন কোনো পথ জানা ছিল না।

মাথায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়! খেতে বসে ভাল করে খেতে পর্যন্ত পারি না। বৌদি একবার বলেছিল, 'আস্তে, হাত পুড়বে।'

দিদির কথায় তো বুকের ভিতরটা চমকে, হাত-পা প্রায় অবশ হয়ে এসেছিল। 'কী হয়েছে তোর, ভাত ছিটুচ্ছিস, তাড়াহুড়ো করছিস, খাচ্ছিস না? কোথায় যেতে হবে?'

হে ভগবান! দিদির চোখের দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। কোনো রকমে বলেছিলাম, কোথায় আবার, ইস্কুলে তো যাচ্ছি।'

'সে তো জানি। সময় ঢের আছে, আস্তে আস্তে খা।'

দিদিকে বড় ভয় ছিল। ওর চোখ মুখ চাহনি সে কী ভয়ংকর, মনে হত, ভিতরটা সব দেখতে পাচ্ছে। আমাদের, ছোটদের রাজ্যে দিদি ছিল গোয়েন্দার মতো ধূর্ত, রাগী দারোগার মতো শাসক। আঃ! ভগবান যদি ওর চোখ দুটি আর একটু ছোট, আর একটু কম ঝকঝকে করে গড়তো, তা হলে বাঁচা যেত। আমাদের, ছোটদের সব মতলব যেন, ও চোখ তুললেই ধরা পড়ে যেত। ছেলেবেলায় অনেকদিন মা কালীকে বলেছি, 'দিদিটার বিয়ে দিয়ে দাও মা,

ও শ্বশুরবাড়ি চলে যাক।'…

যাই হোক, খেয়ে-দেয়ে বই-শেলেট নিয়ে বেরিয়ে গলির মোড়েই দেখেছিলাম বলু দাঁড়িয়ে আছে। ডান বগলে বই, বাঁহাতে প্যান্ট চেপে ধরা। কিন্তু খোঁচা খোঁচা চুল প্রায় খাড়া খাড়া। ও গভীর চিন্তামগ্ন। মনটা কেঁপে উঠেছিল। কেঁসে গেল নাকি?

বলু বলেছিল, 'কোন্ রাস্তা দিয়ে যাব? ইস্কুলের সামনে দিয়ে গেলে তো ধরে ফেলবে।'

সর্বনাশ! সে কথাটা তো ভাবাই হয় নি। লক্ষীবাজারের রাস্তা দিয়েই তো যাবার কথা। মনে হয়েছিল, ব্যর্থতার কষ্টে, রাস্তার ওপরেই বসে পড়ব। বলু বলে উঠেছিল: 'কদমতলার পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়া যায়। আর নয় তো নারিন্দার পুল পেরিয়ে।'

রাস্তাঘাটের ব্যাপারে বলু আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞ। ওর চরিত্রের মধ্যেই ওটা ছিল, প্রায়ই বই বগলে নিয়ে শহরের পথে পথে ঘোরা। সে দুঃসাহসের জন্যে ওর পিঠে যে কী পরিমাণ লাঠি ভাঙতো, ভাবলে এ পরিণত বয়সেও পিঠটা সুড়সুড়িয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃসাহস তো নয়। বলু যেন খানিকটা অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতো। যেন নিশির ডাক ওকে ছুটিয়ে নিয়ে যেত।

এখন হয়তো, বলুদের সাংসারিক জীবন বিচার করে, ওর সম্মোহিত যাযাবর বৃত্তির একটা ব্যাখ্যা করতে পারি। ছেলেবেলায় কিছুই বুঝতাম না। একমাত্র এই কারণেই বলুর সঙ্গে মেলামেশা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। আমাদের বাড়িতেও ওর প্রবেশ নিষেধ ছিল।

শেষ পর্যন্ত নারিন্দার পুল দিয়েই গিয়েছিলাম। যতটা সম্ভব চেনাশোনা অঞ্চল এড়িয়ে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ভিক্টোরিয়া গোলপার্কের সাত মাথার মোড়কে একদম বিশ্বাস ছিল না। নবাবপুরের রাস্তাকেও নয়। কারণ, মেডিকেল কলেজ এবং জজকোর্ট নিকটেই। কার সঙ্গে যে দেখা হয়ে যাবে, এবং সেখান থেকেই ' চ্যাংদোলা করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে! তার পরের কথা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

কিন্তু বলুর নানান অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনতে শুনতে, নিরাপদেই টিকাটুলির রেললাইন পেরিয়ে গিয়েছিলাম। তখন মাত্র একটি ফাঁড়া টিকাটুলির গ্লাস ফ্যাক্টরী। আমাদের ওখান থেকে অনেকে সেখানে কাজ করতে যেত। কিন্তু ধানমণ্ডাইয়ের পাহাড়ের কল্যাণে সে ফাঁড়াও কেটে গিয়েছিল। তারপরেই

কয়েকটা রাস্তা ঘুরে ফিরে, ধানমণ্ডাইয়ের মাঠ দেখতে পেয়েছিলাম।

ধানমণ্ডাইয়ের মাঠ, আদিগন্ত বিস্তৃত। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের জটলায়, এক এক জায়গায় প্রায় ছোটখাটো অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। গোটা মাঠ চোর-কাঁটায় ছাওয়া। একটা বিশেষ ভয়ও ছিল। ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে গোরাদের ব্যারাক আছে যেন কোথায়। সেখানে আচমকা গিয়ে পড়লে, মৃত্যু যে নিশ্চিত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কারণ, দিদি বৌদিদের মুখে অনেকবার শুনেছি, 'মাগো, গোরাগুলো যেন গিলে খাবার মতন হাঁ করে থাকে।'

কিন্তু পাহাড় ? পাহাড় কোথায় ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে ? উৎকণ্ঠিত অসহায় চোখে বলুর দিকে বার বার তাকিয়েছিলাম। বলু চারিদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পাহাড়টা কোথায়, মনে নেই ?'

বলু কোনো জবাব দেয় নি। ক্রমাগত এগিয়েই চলেছিল।

আমি আবার বলেছিলাম, 'পাহাড়টা হারিয়ে ফেলেছিস ?'

বলু তারও কোনো জবাব দেয় নি, এগিয়েই চলেছিল। আমার তখন প্রায় কান্না পাবার মতো অবস্থা। সময়টা শীতকাল ছিল বটে। কিন্তু সোয়েটারের তলায় তখন গোটা গা কুটকুট করতে আরম্ভ করেছিল। কতটা পথ হেঁটেছিলাম, তার হিসেব জানা ছিল না। কিন্তু ফিতে বাঁধা জুতোর ভিতরে, ক্রমেই যেন পা দুটো বড় হয়ে উঠছিল। জুতো জোড়া ছোট হয়ে আসছিল। লোক নেই, জন নেই, কেবল মাঠ। চোরকাঁটা ঘাস ভরতি মাঠ আর মাঠ। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ সেই গাছের জটলা। এখন বুঝতে পারি, গাছগুলো ছিল শাল আর দেবদারু। এবং মাঠের বুকে হঠাৎ হঠাৎ সেই গাছের জটলার ছায়া-ঘন অন্ধকারকে ভয় লাগছিল। দুপুরের মাঠে, ঝিঁঝি ডাকছিল চীৎকার করে। বলু সেই একইভাবে বই বগলে, প্যান্ট ধরে চলছিল। কিন্তু ধান-মণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড় কোথায় ?

'ওই যে পাহাড়, দেখেছিস ? ওই ছাখ পাহাড় !'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সত্যি পাহাড় ! সামনেই কতগুলো আসশ্যাওড়ার ছোট গাছ। তারপরেই মাঠের বুক থেকে মাটি মাটি রং পাহাড় উঁচুতে উঠে গেছে। আশেপাশে দু-একটা শাল দেবদারু গাছ যা ছিল, পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় তাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। এবং পাহাড়ের গাছের গায়ে অনেকগুলো ছোট গাছ। একেই কি অরণ্য আবৃত বলে ? রোমাঞ্চিত উত্তেজনায়, কয়েক মুহূর্ত আমার মুখ থেকে কথা সরে নি। তারপর দুপুরের

নির্জন মাঠের বুকে, আমি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিলাম, 'পাহাড়ে উঠবি না বলু?'

বলু তখন বই মাটিতে রেখে, কোমরের প্যাণ্টটা কষছিল। বলেছিল, 'হ্যাঁ উঠব তো! রমনার রাস্তাটা কোথায়, তাই ভাবছি। আমি ঘোড়ার গাড়ি থেকে পাহাড়টা দেখেছিলাম যে?'

আমার তখন সে কথা ভাববার অবসর ছিল না। তখন কোথায় আমার গা কুটকুটোনি, কোথায় বা পায়ের ব্যথা। অশান্ত দুরন্ত ঘোড়ার মতো আমার অবস্থা। ছুটে লাফিয়ে পাহাড়ে ওঠবার জন্ম ছটফট করছিলাম। পাহাড়। এই রকম একটা পাহাড়েই কি বাবা মা তীর্থ করতে গেছেন?

আসশ্যাওড়ার বন পেরিয়ে দুজনে ছুটে গিয়েছিলাম। উঁচুতে উঠতে উঠতে পাহাড়ের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। কিন্তু পাথর কোথাও চোখে পড়েনি। প্রস্রবণ, অর্থাৎ ঝরণাও দেখতে পাই নি। গোটা পাহাড়টা কেবল সাঁই বাবলার জঙ্গলে ভরতি। তাতে প্রচুর কাঁটা। সারা গায়ে ফুটছিল। দু-এক জায়গায় জামাও ছিঁড়েছিল। উৎসাহের প্রাবল্যে তখন সে সব খেয়াল ছিল না। ভয় ভয় বিস্ময়ে দেখছিলাম, পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে ফাটল, অন্ধকার গর্ত হাঁ করে রয়েছে। একেবারে উঁচুতে উঠে, আমাদের শহরটাকে অনেকখানি দেখতে পেয়েছিলাম। রেললাইনের ওপর দিয়ে গাড়ি যেতে দেখেছিলাম। এমন কি নবাবপুরের রাস্তার লোক চলাচলও দেখতে পাচ্ছিলাম।

আঃ! সত্যি পাহাড়! ধানমণ্ডাইয়ের মাঠের উপর। না-ই-বা থাকলো পাথর বা প্রস্রবণ। হয়তো এ পাহাড়টা ছোট। কিন্তু পাহাড় তো! স্পষ্টই তা দেখেছিলাম, লম্বা দেবদারু গাছের মাথাটা প্রায় আমাদের সমান সমান। পাহাড়ের পিছন দিকের জঙ্গল একটু বেশী। দূরে কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। এবং গুটিকয় গরু জঙ্গলে ঘুরছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বলু, চন্দ্রনাথের পাহাড় কি এর থেকে বড়?'

বলু খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'না, এরকমই হবে। তোর কাছে লোহা আছে?'

'লোহা? না, কেন?'

'তবে আমাকে ছুঁয়ে থাক। আমার কোমরের সুতোয় একটা চাবি বাঁধা আছে।'

ব্যাপারটা তখনো বুঝতে পারছিলাম না। বলুর তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন? কী হয়েছে?'

বলু চুপি চুপি গলায় বলেছিল, 'লোহা থাকলে ওরা কিছু করতে পারে না!'

ওরা? ভাবতেই বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। আর বেশী কিছু বলবার দরকার ছিল না। লোহা থাকলে যে কারা কিছু করতে পারে না, জানা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল 'পাহাড়ী ভূত' বইটার কথা। বলুকে প্রায় ছু'হাতে জাপটে ধরেছিলাম।

বলু বলেছিল, 'ভয় পাস নে, লোহা আছে বললাম তো। আমাদের কিছু করতে পারবে না।'

লোহা যখন ছিল, তারা কিছু করতে পারবে না জানতাম। তবু ভয় যখন ঢুকেছে, আর রেহাই ছিল না। পাহাড় দেখার হরিষে বিষাদ নেমে এসেছিল।

আঃ, পৃথিবীর কোথাও কি অখণ্ড আনন্দ নির্ভয় শান্তি নেই? আর বেশীক্ষণ থাকতে পারি নি। দুজনেই নেমে এসেছিলাম। নেমে, অনেকখানি চলে আসার পর, ভয়টা কেটেছিল। বলেছিলাম, 'বলু, আবার একদিন আসব।'

বলু বলেছিল, 'আরো কয়েকজনকে নিয়ে আসব। নিতাই, অজিত, নরেশ, ওদেরো বলব আঁ?'

আবার কবে আসা হবে, কে কে আসবে, এবং পাহাড়ী ভূত ও জলার পেত্নী, কাদের কী ভাবে ঘাড় মটকে রক্ত শুষে খায়, ইত্যাদি গল্প করতে করতে ফিরেছিলাম। মনটা খুশিতে ভোর হয়েছিল।

কিন্তু সেই খুশির মধ্যে কখন যে ছায়া ঘনিয়ে আসছিল, টের পাই নি। বাড়ির কাছে এসে আটাকলের ঘড়িতে যখন দেখেছিলাম, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, বুকটা দুরুদুরু করে উঠেছিল। তিনটেয় ইস্কুল ছুটি। বাড়ি ফিরতে বড় জোর দশ মিনিট। গলির মোড়ে এসে মনে হয়েছিল, পা দুটো অবশ হয়ে আসছে। একটা অশুভ চিন্তা ও ভয় ক্রমেই গ্রাস করছিল। তখন নজরে পড়েছিল, জামার হাতা ছেঁড়া।

দিদির মুখটাই বার বার মনে পড়েছিল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বড় বড় ঝকঝকে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা এবং কানের দুলের লাল পাথর দুটোর সেই দোলানি। ভাবতেই, বুকটা শুকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু অসম্ভব খিদে পাচ্ছিল। জামার ছেঁড়া জায়গাটায় বই চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকেছিলাম। আর প্রথমেই দিদি।

উঠোনের ওপর চাতালে বসে দিদি চুল বাঁধছিল। ফিতের একটা দিক কামড়ে ধরা ছিল ওর দাঁতে। বৌদি পাশে বসে পায়ে আলতা পরছিল। দুজনেই

একসঙ্গে তাকিয়েছিল আমার দিকে। দিদির হাত থেমে গিয়েছিল। অবাক হয়েছিল। তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, ক্লিতেটা মুখ থেকে ছেড়ে দিয়ে বলে উঠেছিল, 'একি, তোর গালে কাটা কিসের? মারামারি করে এলি?'

'কই?' আমি তাড়াতাড়ি গালে হাত দিয়েছিলাম। বই সরে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বৌদি বলে উঠেছিল, 'ঠাকুরঝি, দেখুন জামা ছিঁড়ে এসেছে।'

আমি আবার 'কই' বলে তাড়াতাড়ি ঢাকতে যাচ্ছিলাম। দিদি ততক্ষণে আধ-বাঁধা বেণী ঝাপটা দিয়ে পিঠের দিকে সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বৌদি আবার বলে উঠেছিল, ঠাকুরঝি চোহারাটা দেখেছেন, পোড়া মূর্তি করে এসেছে? আর প্যাণ্টটা দেখুন, চোরকাঁটায় ছেয়ে আছে।'

কাকিমাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আস্তে আস্তে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। দিদি খপ্ করে আমার হাত টেনে ধরেছিল, 'যাচ্ছিস কোথায়? দাঁড়া তোকে দেখি।'

আমি হাত টেনে নেবার চেষ্টা করেছিলাম, 'দেখতে বাকী আছে কী। আমি বই রাখব না?'

দিদি ধমকে উঠেছিল, 'খবরদার, মুণ্ডু ফেলে দেব যদি নড়বি। দেখুন তো কাকিমা, ও কি ইস্কুলে গেছল বলে মনে হয়?'

কাকিমা তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছিলেন, 'কখনো না।'

মিথ্যের সমস্ত শক্তি তখন প্রায় নিভে এসেছিল। তিনটি মহিলা নয়, তিনটি বাঘিনী। প্রায় সমবয়সী, দিদি কয়েক বছরের ছোট।

বৌদি বলেছিল, 'দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে ইস্কুল থেকে আসছে না। সাহস কতখানি বেড়েছে তা হলে, ভাবো।'

দিদি ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, 'কোথায় গেছিলি?'

একবার শেষ চেষ্টায় প্রায় ফুঁসে ওঠবার মতো করেই বলেছিলাম, 'ইস্কুলেই গেছলাম তো।'

'ফের মিছে কথা?'

দিদি আর একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল। কাকিমা বলেছিলেন, 'ইস্কুল তো কাছেই। জিজ্ঞেস করে এলেই হয় মাস্টারের কাছে।'

মনে হয়েছিল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। জিভ শুকিয়ে কাঠ। বৌদি বলেছিল, 'ছি! ছিছি, ইস্কুল পালাতেও শিখেছে?'

কাকিমা বলেছিলেন, 'আহা! কী ছিরিই হয়েছে। যেন গরু চোর।'

দিদি চীৎকার করে উঠেছিল, 'শীগ্‌গির বল্ কোথায় গেছলি। নইলে

চ্যালা কাঠ তোর পিঠে ভাঙব।'

দেহে আর একবিন্দু রক্ত ছিল বলে মনে হয় নি। চোখে জল এসে পড়েছিল। প্রায়, পিটপিটও করছিল। বলেছিলাম, 'ধানমণ্ডাই।'

তিনটি গলায় যুগপৎ অস্ফুট আর্তনাদ উঠেছিল, 'ধানমণ্ডাই!'

তিনজনের অস্ফুট আর্তনাদ ও রুদ্ধবাক্ বিস্ময়ে, অপরাধের গুরুত্বটা যেন আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। যেন এমন ভয়াবহ কথা আর কেউ কখনো শোনে নি। কোথাও চুরি-ডাকাতি খুনটুন হলে সবাই যেরকম চোখ কপালে তুলে ডুকরে ওঠে, তিনজনেই সে রকম করে উঠেছিল।

দিদির চোখ দুটো মনে হয়েছিল বঁটির চেয়ে ধারালো। বলেছিল, 'কেন গেছিলি?'

'পাহাড় দেখতে।'

'অ্যাঁ।'

বৌদি হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিল, 'ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড়?'

বৌদির হাসি শুনে, একটু যেন স্বস্তিঃফিরে আসবে মনে হচ্ছিল। তার আগেই দিদি ঝেঁজে উঠেছিল, 'হেসো না বৌদি। সাহসটা একবার ভাবো!'

ইতিমধ্যে কাকাও কখন রং-তুলি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। নিরীহ স্বরে বলেছিলেন, 'ধানমণ্ডাইয়ে পাহাড়? তুই একটা গাধা একেবারে গর্দভ যাকে বলে। ওখানে পাহাড় কোথায়?'

আমি বলেছিলাম, 'দেখেছি।'

'দূর গাধা। কী একটা দেখে এসে বলছিস্ পাহাড়।'

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ধানমণ্ডাইয়ের পাহাড়ের খবর এঁরা জানেন না। কাকা আবার বলেছিলেন, 'যা, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নি গে যা।'

দিদি বলে উঠেছিল, 'খাওয়াচ্ছি। ওকি করেছে জানেন? ইস্কুল পালিয়ে মাঠ-বাদাড় করে ফিরেছে।

তারপরই আমার দিকে ফিরে বলেছিল, 'কার সঙ্গে গেছলি? কে ছিল সঙ্গে, বল?'

'বলু।'

পুরো নামটা উচ্চারণ করবার আগেই, ঠাস ঠাস করে দিদির চড় পড়েছিল গালে পিঠে।—'বলু বলু, আমি জানি বলুর সঙ্গে ছাড়া এসব হয় না। পাজী, ফিচেল ধূর্ত, মিথ্যুক, ইস্কুলপালানে! বলু ছাড়া তোমার বন্ধু নেই, না? ওই শয়তানটার সঙ্গে মিশে মিশে এত সাহস বেড়েছে।'

আমি জানতুম ইস্কুল পালিয়ে ধানমণ্ডাইয়ের পাহাড় দেখতে যাওয়ার অপরাধ যতখানি, বলুর সঙ্গে যাবার জন্তে অপরাধের মাত্রা আরো ততখানি। সত্যি, ভগবান ছোটদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এটা যদি বুড়োদের বিষয় হত, তাহলে কিছুই বলবার ছিল না। যাই হোক, বৌদি আর কাকিমা দিদির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাকা বলেছিলেন, 'যাক্‌, ছেড়ে দে, আর কখনো করবে না।'

বৌদি নিজেই হাত-মুখ ধুইয়ে খেতে দিয়েছিল। দিদি বলেছিল, 'এখন তোলা রইল। বাবা-মা আসুক, তোর কত বড় বুকের পাটা হয়েছে, তখন দেখব।'

কিন্তু আশ্চর্য! খেয়ে ওঠার একটু পরেই দিদি বৌদি কাকিমা, তিনজনেই আমার কাছে পাহাড়ের গল্প শুনতে চেয়েছিল। আমি প্রায় বৌদির কোলের কাছে বসেছিলাম। দিদি আমার শার্টটা সেলাই করছিল। আমি বলতে বলতে রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। তিনজনেই অবাক্‌ হয়ে আমার কথা শুনছিল।

ঠিক সে সময়েই, সম্পর্কে আমার দাদা হন, মনতোষদা এসেছিলেন। ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড়ের অবস্থিতির কথা শুনে, ভ্রূ-কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড়! স্টুপিড! কোথায় সে পাহাড়?

আশ্চর্য! কেউ কি জানতেন না? অথচ আমি তো সত্ত পাহাড় দেখে ফিরেছিলাম। তার একটা বর্ণনা দিতেই, মনতোষদা যেন হেসেই বাঁচেন নি। বলে উঠেছিলেন, 'রাসকেল। ওটা পাহাড় তোকে কে বলেছে। রমনায় যাবার পথ থেকে দেখা যায় পুরনো চাঁদমারির ঢিপি। পল্টনের বন্দুক নিশানা শেখবার জায়গা। এখন আর একটা চাঁদমারি হয়েছে, ওটা ছেড়ে দিয়েছে, তাই জঙ্গল গজিয়ে গেছে। ননসেন্স একটা।'

সবাই হাহা করে হেসে উঠেছিল। এবং মনতোষদার সঙ্গে অন্য গল্পে মেতে গিয়েছিল।

কিন্তু আমার বিশ্বাস একটুও টলে নি? চাঁদমারি? সেটা আবার কী? বন্দুক নিশানার চাঁদমারি ওটা? বিশ্বাস টলে নি, তবু মনের মধ্যে একটি সংশয়ের ছায়া বোধহয় পড়েছিল। বিমর্ষ হয়ে উঠেছিলাম।

ধানমণ্ডাইয়ের সেই পাহাড়ের ছবি, একলা বসে বসে কল্পনা করেছিলাম। আর মনে মনে বলেছিলাম, 'মনতোষদা জানেন না, এটা পাহাড়, নিশ্চয় পাহাড়। শুধু আমাকে নাকাল করার জন্তেই…'

কিন্তু বুকটা কেন টনটন করছিল ?

তার কয়েকদিন পরেই, বলু নিউমোনিয়া হয়ে মারা গিয়েছিল। আর কখনো ধানমণ্ডাইয়ের মাঠের পাহাড়ে যাওয়া হয় নি। বড় হয়েও নয়। অনেকদিন, অন্ধকার ছাদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বড় শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়ে যেন বলুকে দেখতে পেতাম। তখনও সে রকম বিশ্বাসই ছিল, মানুষ মরলে, ছায়াহীন অদৃশ্য শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বলুও তাই বিশ্বাস করতো। তাই অন্ধকার হলেই বিশেষ বিশেষ জায়গায়, বলুকে যেন দেখতে পেতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ধানমণ্ডাইয়ের মাঠের পাহাড়ের কথাই আগে মনে পড়তো। ভাবতাম, বলু হয়তো ইচ্ছেমতো এখন সেখানে উঁচুতে গিয়ে বসে থাকে। ওকেও তখন বাড়িতে খুব মেরেছিল।

বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, মনতোষদার কথাই ঠিক। ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে, ওটা নিতান্তই একটি পরিত্যক্ত চাঁদমারির ঢিবি। কিন্তু এ কথাও ঠিক, ছেলেবেলার অনেকদিন পর্যন্ত তবু একটা সান্ত্বনা ছিল মনে, আমি পাহাড় দেখেছি।

আজ যখন সত্যি হিমালয়ে আরোহন করছি, গভীর অরণ্য ভেদ করে, আশ্চর্য স্বপ্নের দেশের মতো অবিশ্বাস্য ছোট্ট গাড়ি, পাহাড়ে ঝুকঝুক শব্দে প্রতিধ্বনি তুলে ভূগোল বইয়ের সেই বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়া পাহাড়ে উঠছিল, তখন ছেলেবেলার সেই ধানমণ্ডাইয়ের মাঠে পাহাড়ের কথা বেশী মনে পড়ছে। সমতলের ছেলে আমরা। পাহাড়ের কী অদম্য তৃষ্ণা! বলু যদি বেঁচে থাকতো!

কত দিনের সাধ, পাহাড়ে উঠবো। একবার হিমালয়ে যাব। তাই বোধহয় ভারতবর্ষের নানান প্রান্তে ঘুরিয়ে, হিমালয়ের তৃষ্ণাকে আকণ্ঠ করে, আমার পথ চলার নিয়তি আজ এখানে টেনে নিয়ে এল। এর আগে বিন্ধ্যাচল পাহাড় দেখেছি। আরাবল্লীর রেঞ্জ দেখেছি। কিন্তু পর্বতের পরিপূর্ণতার এই অনুভূতি ছিল না। আর আমার মনের সঙ্গে তাল দিয়ে যেন, পাহাড়ের গা বেয়ে এই বিচিত্র রেলগাড়ির চলমান স্রোতের মধ্যে, বিস্মিত আনন্দের কলকল ধ্বনি বাজছে। অপরূপ! দূরে নীল আকাশের গায়ে কৃষ্ণনীল পাহাড়ের সীমা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে, মেঘ সরে গিয়ে, নতুন নতুন নীল পাহাড়ের চূড়া ভেসে উঠছে! কী বিশাল! যাত্রীদের কলগুঞ্জন ক্রমে আমার

কাছ থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছিল। অরণ্যের নিবিড়তা, অথচ মুক্ত আকাশ ও স্তব্ধ পাহাড় এবং চলমান সাদা মেঘের খেলায় আমি আস্তে আস্তে যেন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম।

হিমালয়ের কত ছবি দেখেছি, কত বই পড়েছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপস্থিত এ অনুভূতি কখনো বোধ করি নি। এই গাম্ভীর্য, অথচ প্রসন্নতা অসীম বিশালতাকে যেন আমি ছুঁতে পারি নি। আমার স্তব্ধবাক্ নিবিড় বিস্ময়, গভীর এই আনন্দের অনুভূতির জন্যে, এই মুহূর্তে, কার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কার কাছে?

আর, এমন আশ্চর্য আরণ্যক, এমন শিলাস্তৃত পার্বত্য, সীমাহীন সমতল, এবং সমুদ্রবেষ্টিত, এই ভারতের যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই মুগ্ধ বিস্মিত আনন্দের আবেগের মধ্যে, কেন জানি নে, আমার বুকে দুলে উঠে একটি জলধারার জোয়ার দু-চোখ ভাসিয়ে এসেছে। মনে হয়েছে, সীমাহীন আকাশের তল, এই সীমাহীন ঐশ্বর্যের দুয়ারে দাঁড়িয়েও, প্রাত্যহিকতার কোন্ ছোট একখানি হাটের কাঙাল হয়ে জীবন কাটাচ্ছি! কেন আমি জানি নে সেই মন্ত্র। কেন আমার হয় না সে-সাধন, আমি ডুবে যাব নীরবে নিঃশব্দে, আমার সকল বিস্ময় আনন্দ অশ্রু নিয়ে। এই মহাপ্রকৃতির মধ্যে।

এ কি বৈরাগ্যের বিলাস? জানি নে। কিন্তু বিষণ্ণতা কোথাও নেই। মনে হয়, এ মহাবৈভবের মধ্যে কোথাও যেন একটি ঘর ছাড়া প্রসন্ন বৈরাগ্যের সুর বাজে। এ বৈরাগ্য কি ভারতেরই মৃত্তিকার দান? কে জানে! সংসারের নিবিড়তায়, সদাই কর্তব্যের আহ্বানও তো এ মৃত্তিকায় সদাজাগ্রত।

এই রূপ অরূপের মাঝখানটায় সদাই দোলা খাই। তাই ছুটে ছুটে বেরিয়ে পড়ি। পথের ধূলার ডাক শুনি। দূর দূরান্তের নয়, সে ডাক নিতান্ত দৃশ্যান্তরের, নতুনের বৈচিত্র্যের। শহর থেকে রেলে চেপে একটা স্টেশন পেরিয়ে গেলেই সাধ মিটতে পারে। একটু বা শরতের সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে কিংবা শত শত মাইল দূরেও ক্ষতি নেই। এ পথের আহ্বান শুধু বিচিত্রের বৈভব লুটে নেবার হাতছানি।

তাই লিখতে বসে সঙ্কোচ হল, পাছে একে কেউ ভ্রমণকাহিনীর অহঙ্কার বলে বোঝে। একে কি বলব, তার সংজ্ঞা আমার জানা নেই। প্রাণের মাঝখানে আছে যেন এক রূপ-রসিকের বাস। বলতে হয়, এ শুধু রূপের ক্ষুধা মেটাবার এক অতৃপ্ত অনুভূতির প্রকাশ। বিচিত্রের স্বাদ পাবার সাধ! ঘর ছাড়া, পথ চলা, করতালির শব্দ। আনন্দের একটু কাঁদন। ব্যথার একটু

হাসি। এইটুকুই মাত্র।

অরণ্য গভীর। ছেলেবেলা বইয়ে পড়া সেই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফুটে উঠছে চোখের সামনে। অরণ্য আবৃত, প্রস্তরগাত্র। কিন্তু সেই প্রস্তর যে এমন বিরাট বিচিত্র আকৃতির, আগে তা জানি নি। আগে জানি নি, সেই অরণ্য এমন নিবিড়, এমন ছায়াঘন আঁধার আঁধার, শতাব্দীর প্রবীণ বনস্পতিদের লতাগুল্মের জটার বাঁধনে, সবুজের কী 'বিচিত্র বর্ণের সমারোহ!' প্রস্রবণের দেখা এখনো পাই নি। পাবো, সে খবর আমি পাচ্ছি, ওই দূরে, বাঁয়ে মহানদীর দিকে তাকিয়ে। আমি যে চলেছি, সকল মহানদীর জন্মভূমিতে। সকল মহানদীর স্রষ্টা হিমালয়ের, সোনার শিখরে বেষ্টিত এক বর্ণাঢ্য অঙ্গনে? নদীরা সেখানে প্রস্রবণ হয়ে নেমে চলেছে, হিমালয়ের আপন ঘরোয়ানার নাচের ছন্দে, গানের সুরে।

এ গাড়ির শব্দ বড় বিচিত্র। মনে হয়, অরণ্য-পর্বতের দিগন্ত থেকে দিগন্তের ঘুম ভাঙানোর একটা জেদ আছে তার শব্দে। আবার কথনো কথনো, সে শব্দ সহসা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। কেন বুঝতে পারিনে। তখন ঝিঁঝির ডাক তীব্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝিল্লীমুখরিত বনপরিপূরিত পর্বত বাহুর এই বিচিত্র যানে বসে মনে হয়, আমার সমতলের চিরচেনা রাজ্য থেকে কোন্ এক অবাস্তব লোকে এসে পড়েছি। দু'পাশের গভীর বনের দিকে একটু নিবিষ্ট হয়ে তাকালেই, বোঝা যায়, এ অরণ্য শ্বাপদসঙ্কুল। আমরা এখনো পাদদেশ তরাইয়ের অরণ্যের গভীরে। কিন্তু চলেছি কত নিঃশঙ্ক চিত্তে।

জানিনে, বিদেশীরা শুধু বাণিজ্যের লোভের লুটের আশায় এই সরীসৃপতুল্য হাওয়া গাড়ি আর রাস্তা তৈরি করেছিল কি না। কিন্তু শতসহস্রের সহজ শৈলবিহারের আনন্দের পুণ্যি কি তাদের একটুও স্পর্শ করবে না? শুনেছি, একদা সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন ছিল। সেখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে গরুর গাড়ি নয় তো পালকিতে করে সুদীর্ঘ দুশো মাইল রাস্তা পার হতে হত। রাস্তার নাম ছিল, গ্যাঞ্জেস্ হিমালয়ান রোড। পূর্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ, তিতালিয়া আর শিলিগুড়ি পার হয়ে দার্জিলিং-এর শিখরে। যারা ঘোড়ায় চাপতে পারতো, তারা ঘোড়ায় যেত। তারপর শিলিগুড়ি পর্যন্ত রেল হয়েছিল। শিলিগুড়ি থেকে টাঙ্গায় দার্জিলিং। তারও অনেক পরে, ইস্টার্নবেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার ফ্রাঙ্কলিন প্রিস্টজ-এর পরিকল্পনায় এই দার্জিলিং হিমালয়ান রেললাইন তৈরি হয়েছিল। সেটা আঠারো শো উনাশি। আঠারো শো আশিতে তিনধরিয়া, একাশিতে দার্জিলিং পর্যন্ত লাইন পাতা হয়েছিল।

কিন্তু তখন বাঙলাদেশ, শুধু বঙ্গদেশ ছিল। হয়তো তার পূর্ব পশ্চিমের জীবনধারণের রীতিনীতির ফারাক ছিল কিছু। কথার সুর, উচ্চারণ, আর সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রণের বিভিন্নতায় কিছু গরমিল ছিল। কিন্তু দুই রাষ্ট্র ছিল না। রাজনীতি কি বিচিত্র, বহুমুখী সাপের মতো তার প্রতিটি কুণ্ডলিত বাঁকে বাঁকে বিষাক্ত দাঁত উদ্যত। বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে সে চিরকাল নারাজ। তার নিজের বিশ্বাসই বিশ্বাস। তাই বাঙলাকে পাকিস্থান আর হিন্দুস্থান দুই রাষ্ট্রে ভাগ হতে হয়।

তাই আমরা সে পথ দেখতে পেলাম না, যে-পথ গৌড় বরেন্দ্রের ভিতর দিয়ে এসেছে হিমালয়ে। যে-পথ সান্তাহার পার্বতীপুর জংশন দিয়ে, এককালের দার্জিলিং মেলকে বেগে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন বিহার প্রদেশের এক অংশ ঘুরে আসতে হয়। গায়ে এখনো সকরিগলিঘাট আর মনিহারিঘাটের বালি খসে নি। চা খাবারের সঙ্গে কিছু-কিঞ্চিৎ বালি যে পেটেও না আছে, এমন নয়। দার্জিলিং আসার দুর্দৈব যদি দেখতে হয়, তবে দুই ঘাটের এপারে ওপারে দেখতে হবে। গ্রীষ্মকালের বালির ঝড় নাকি একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কী ভয়াবহ! মনে হয়েছিল, বালির তপ্ত খোলায়, চাল পড়ার মতো মানুষ পড়ছিল গঙ্গার দিগন্তবিস্তৃত চরের ঝড়ে। তপ্ত বালি, স্ফুলিঙ্গের মতো গায়ে এসে পড়ছিল। মুহূর্তে সর্বাঙ্গ সাদা হয়ে গিয়েছিল বালিতে। ঘন কুয়াশার মতো বালি সব অন্ধকার করে দিয়েছিল। প্রবল চীৎকার, কলরব, আর্তনাদ, আতঙ্ক। কোথায় কার মাল নিয়ে কোন্ কুলি চলে গেছে। কার হাত ধরে কে এগিয়ে চলে গেছে, দিশা ছিল না। কার মনিব্যাগ হারিয়ে গেছে, কার কানের দুল খসে গেছে, কিছু ঠিক করা যায় নি। মনে হয়েছিল, বীভৎস, দুর্বিসহ।

আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এক বৃদ্ধ। কলকাতা থেকেই যিনি বৈশাখের দাবদাহের শ্রাদ্ধ করেছেন অনেকবার। রেল-কোম্পানির পিণ্ডি চটকেছেন সহস্রবার, কারণ ওঁর মতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাখা নাকি অত্যন্ত কম ছিল। কেন আরো বেশী দেওয়া হয় নি, এ নিয়ে আশেপাশের যাত্রীকে, এবং আমাকে বারে বারে বোঝাতে চেয়েছেন, 'নষ্টামো, বুঝলে হে, এ সব খালি নষ্টামো! আরে বাবা, পয়সার বিচারই কী সব হল, আঁ? কী বল হে?'

বলে এমনভাবে ভ্রুকুটি চোখে, গুটিকয় নড়বড়ে দাঁতে হাঁ করে তাকাচ্ছিলেন, যে চুপ করে থাকাই দায়। অন্তত ঘাড় নেড়ে বলতে হয়েছে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ তা তো বটেই।'

কিন্তু তাতেই রেহাই ছিল না। তর্জনী তুলে হাঁক দিচ্ছিলেন, 'তা তো বটেই কী হে? জবাব তো একটা চাই, না কী? পয়সার বিচারই কি সব হল? ফার্স্ট ক্লাসের বিঘতখানেক জায়গায় অতগুলো পাখা দিতে পার, সেকেণ্ড ক্লাসে আর দুটো বেশী দিলে কি তোমার কোম্পানী ডকে উঠে যেত, অাঁ, কী বল হে?'

আমাকে সেই একই জবাব দিতে হয়েছিল, 'তা তো বটেই।'

'তা তো বটেই!' একবার প্রায় ভেংচেই উঠেছিলেন আমাকে, 'তা তো বটেই! ও কথাটার মানে কী? ওসব বলে কিছু হবে না, বুঝলে? দাবি করতে হবে, দাবি। পাখা তোমাকে আরো দিতে হবেই।'

এমন আর জায়গা ছিল না যে বৃদ্ধের কাছ থেকে দূরে সরে বসি। উনি আমাকে একাধারে রেল-কোম্পানি আর নিরীহ যাত্রীর প্রতিনিধি করে নিয়েছিলেন। সায় দিলে বিপদ। ঘাঁটানো আরো বিপদ। অতএব, সারাটা পথ প্রায় ওঁর ছোটখাটো ফাই-ফরমায়েস এবং সংসার, সরকার, নরনারী, যুবক-যুবতী ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আসতে হয়েছে। ফাই-ফরমায়েসের মধ্যে, হাত পাখাটা উনি বারে বারেই হারিয়ে ফেলছিলেন। খুবই স্বাভাবিক। এত অকারণ ব্যস্তবাগীশ বক্তা যে, পাখা এই রাখছিলেন ডাইনে, আবার এই বাঁয়ে। এই সামনে, এই পিছনে। আর মাঝে মাঝে, কুঁজো থেকে একটু জলটা ঢেলে দাওতো বাবা। রাগ করো না যেন, আজকালকার ছেলে তো।' ভদ্রলোক আমার মতোই, একলা যাত্রী। সব থেকে মারাত্মক, গন্তব্য দার্জিলিং! তার মানে সারাটা পথই সঙ্গী যাত্রী হিসেবে থাকবেন।

একমাত্র আশা ছিল, মনিহারিঘাটে নিশ্চয় বিচ্ছিন্ন হতে পারব। কিন্তু স্টিমার থেকে নেমেই, মনে হয়েছিল, দুটো সাঁড়াশি এসে দু দিক চেপে ধরেছে। অক্টোপাসের আলিঙ্গন কি এমনি? কে জানে। কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। একে বালির ঝড়ের দুর্যোগ। মালপত্র নিয়ে কুলি যে কোথায় চলেছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তার ওপরে এই খিটখিটে বুড়ো, বিশ্বসংসারের সব কিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ, প্রত্যেকটি লোকের সমালোচক।

শরীরটা শক্ত করে, ভ্রূকুটি করে তাকিয়েছিলাম ভদ্রলোকের দিকে। রুক্ষস্বরে বলতে যাচ্ছিলাম, 'আঃ কী করছেন, ছাড়ুন।' কিন্তু বলতে পারি নি। দেখেছিলাম, খিটখিটে সেই বৃদ্ধ লোকটির মাথা প্রায় শিশুর মতো আমার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। বালি ঢোকা চোখ দুটি জলে ঝাপসা। বলেছিলেন, 'দোহাই বাবা, ছেড়ে যেও না, বে-ঘোরে মারা যাব। কী করব বল।'

মুহূর্তে একটি মুখ মনে পড়ে গিয়েছিল। সে মুখটিও এমনি এক বৃদ্ধেরই, যাঁকে মাত্র কয়েক বছর আগে কাঁধে করে শ্মশানে মুখাগ্নি করে এসেছিলাম। এক মুখাগ্নিতেই কী জীবনের একটা দিকের সব শেষ হয়? বলেছিলাম, 'না, ছেড়ে যাব কেন বলুন, কিন্তু আপনার মালপত্র?'

'জানি না। কুলিকে তো বলেছি, সেকেণ্ড ক্লাসে তুলে দিতে।'

বৃদ্ধকে নিয়ে চলতে চলতে তখনো গাড়ির দরজায় পৌঁছুই নি। সহসা কানের কাছেই বেজে উঠেছিল মেয়ে গলা, 'এই যে আপনারা যাচ্ছেন দেখছি। ধরুন তো একে একটু, কুলিকে দিয়ে মালপত্র একটু তুলিয়ে নিই।'

প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তৎক্ষণে সরু সোনার বালা পরা দুটি ছোট ছোট হাত আমার দিকে এগিয়ে এসেছে। আপনা থেকেই আমার দু হাত এগিয়ে গিয়েছিল। বছর তিনেকের একটি শিশু। বেচারী! বালিতে দু চোখ বোজা। কোলে নিতে না নিতেই, গলা জড়িয়ে ধরে, মুখটা গুঁজে দিয়েছিল ঘাড়ের মধ্যে। অথচ সারাটা পথ, ট্রেনের কামরায়, আমার উল্টো দিকের বেঞ্চে মানুষের ভিড়ের মধ্যে একটু ভিন্ন জগতের স্পর্শ ছিল ওরই কচি দাঁতের হাসিতে। ওর আশ্চর্য কথার কাকলিতে।

বালির ঝড়ের অস্পষ্টতায়, আমার কোলে দিয়েই, ওর মায়ের লাল শাড়ির আঁচল কোথায় অদৃশ্য হয়েছিল, বুঝতে পারি নি।

বছর চব্বিশ-ছাব্বিশ-বয়সের মহিলা, প্রায় দোহারা, ফর্সা, মহিলাকে সারাপথ প্রায় নীরবই দেখেছি। স্বামী সঙ্গে আসেন নি, অনুমান করা গিয়েছিল। বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে মহিলা, অন্তত শালীনতার নিয়ম রক্ষায় তাই, নইলে 'মেয়েটি' একলা যাত্রী এই রকম বলাই উচিত। বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন থেকে সে কথা জানতে পেরেছিলেন, মেয়েটি দার্জিলিং-এ যাচ্ছে শুধু শিশুটিকে নিয়ে তখনই ঠারে ঠোরে কয়েক কথা শুনিয়েছিলেন। মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম। পার্শ্ববর্তী যাত্রী হিসেবে, লজ্জাটা যেন আমাকেই বিঁধছিল কিন্তু মহিলাটির সঙ্গে একটি কথাও হয় নি। শিশুটির সঙ্গে হয়েছিল। হয়েছিল, শিশুর খেয়ালেই এক সময় মায়ের কাছ থেকে নেমে, আমার ছবিওয়ালা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করেছিল। কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি নি, একটু হেসেছিলাম মাত্র। ও কিন্তু ছবি দেখতে দেখতে, বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। সে-চাউনি দেখে অবাক্ হয়েছিলাম, হাসিও পেয়েছিল। মনে করেছিলাম, নিজেকে একদিকে ব্যস্ত রেখে, আর একদিকে আড়চোখে তাকানোটা, একটা বয়সে সব মেয়েরই সহজাত। সেটা এক

অর্থে নয়, বহু অর্থে। ওদের সামনে পিছনে চোখ না থাকলে চলে না। প্রকৃতি যখন ছুটো বাড়তি চোখ পিছন দিকে দেন নি, তখন কাজ মেটাবার দায়গুলো অন্যভাবে আয়ত্ত করে নিতে হয়েছে। সংসারের সকল দিকে চোখ না রাখলে যে ওদের চলে না।

কিন্তু বয়েসটা দেখছিলাম গৌণ। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন দায়। মেয়ে যে! ওদের সব দিকে নজর রাখার, বয়সের কোনো সীমা-সহরদ্দ নেই। দেখেছিলাম, ম্যাগাজিনের পাতা উল্‌টিয়ে ছবি দেখতে দেখতে মেয়েটি আমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। কখনো ঠোঁট ওল্টাচ্ছিল, মুখের ভিতর জিভ ঠেলে ঠেলে, গাল ফোলাচ্ছিল, এবং খুব মন্থরে, আরো কাছে ঘনিয়ে আসছিল।

ওর সঙ্গে আমাকেও সেই খেলায় তাল দিতে হচ্ছিল। যেন কিছুই দেখছিনে, কিছুই বুঝছি নে, এমনি একটা ভাব করে, উদাসীন চোখে তাকিয়েছিলাম অন্যদিকে। কামরার কেউ-ই বোধহয় সে খেলাটা লক্ষ্য করে নি, ওর মা ছাড়া। ওর মা একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকেছিল। হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল। প্রায় মেয়ের মতো করেই, মা-ও চকিতে একবার আমার দিকে দেখে, বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিছু বলে নি।

এক সময় ছোট্ট একটি হাত হাঁটুর কাছে, আমার কোলের ওপর এসে পড়েছিল। আমার মনটা হঠাৎ খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। খুশির হাসিটুকু ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে লুকিয়েছিলাম। কে জানে, আমার সঙ্গে ভাব করার ইচ্ছে কখন ওর মনে জেগেছিল। ওর সেই ইচ্ছাটাতে একটু যেন কৃতজ্ঞও হয়ে উঠেছিলাম। এবং আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে, ওর সরু সোনার বালা-পরা, আঙুলে নেলপালিশ লাগানো ছোট্ট নরম হাতটি চেপে ধরেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে যেন ইলেকট্রিকের শক্‌ লেগেছিল ওর। যেন সেটা ওর খুবই অনিচ্ছা, তাই টেনে হাত সরিয়ে নিয়েছিল। একবার চোখের কোণ দিয়ে দেখে, আবার ছবি দেখতে আরম্ভ করেছিল।…

প্রবল একটা হাসির বেগ ঘুলিয়ে উঠেছিল আমার মধ্যে।

হাসলে সব মাটি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অতএব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

কিন্তু চোখ না ফিরিয়ে ওর দিকেই তাকিয়েছিলাম। আর ওর কাজল-পরা চোখ ছুটির সে কি পিটপিটোনি। একেবারে ম্যাগাজিনের পাতায় মুখ গুঁজে দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলেছিল, 'এত্তা তোমাল?'

সরু মিষ্টি গলায়, দুজনে দীর্ঘ সময়ের নিঃশব্দ খেলার পর, দুটি শব্দ যেন প্রায় অরণ্যের স্তব্ধতায় বেজে উঠেছিল, পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ ? আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।'

একটু নীরব এবং দু'বার আড়চোখে তাকানো। তার পরের প্রশ্নই ছিল বৃদ্ধ ভদ্রলোককে চোখ দিয়ে দেখিয়ে, 'ও তোমাল্ বাবা ?'

আমাকে একমুহূর্ত ঠোঁটে ঠোঁট টিপে উদ্‌গত হাসি চাপতে হয়েছিল। ভাগ্যিস ভদ্রলোকের তখন এদিকে নজর দেবার সময় ছিল না। উনি তখন ক্রুদ্ধ চোখে কামরার গুটিকয় ফচকের (ওঁর ভাষায়) বাঁদরামি (এটাও ওঁরই ভাষা) দেখছিলেন, আর আপন মনেই, খালি গায়ে পাখা টানতে টানতে বিড়বিড় করছিলেন।

আমি খুব নিরীহভাবেই বলছিলাম, 'না তো !'

একটু বোধহয় সংশয় ও অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল শিশুর চোখে। তারপরের প্রশ্ন ছিল, 'তবে ও তোমাকে বকথিলো কেন ?'

তাও তো বটে ! আমার বোঝা উচিত ছিল, বৃদ্ধের কথাগুলোর ভাব-ভঙ্গি প্রায় ধমকানোর মতোই যে। আমি গলার স্বর নামিয়ে চোখ বড় বড় করে বলেছিলাম, 'ভীষণ রাগী !'

শুনে, কাজল-টানা বড় বড় চোখে গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সে বৃদ্ধের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল। তারপর আমারই গলার অনুকরণ করে ঘাড় বাঁকিয়ে বলেছিল. 'মারবে না ?'

বলেছিলাম, 'না, মারবে না।'

সে আশ্বাসে ও যেন ভারী আশ্বস্ত হয়েছিল। ফিক করে একটু হেসে, আবার আমার কোলের ওপর একটি হাত তুলে দিয়েছিল। আবার সেই ধরা অ-ধরার খেলা কিনা বুঝতে পারছিলাম না। তাই সরু সোনার বালা-পরা নেলপালিশ লাগানো ছোট হাত দুটি স্পর্শের দুরন্ত ক্ষুধা সত্ত্বেও, নির্বিকার ও নিশ্চল ছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমার নাম কি ?'

তাতে মুখের ভিতর জিভটি রীতিমতো আন্দোলিত হচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। কারণ দু'পাশের গালই সুপুরির মতো ফুলে উঠছিল। দু একবার জিভ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়েও পড়েছিল। লজ্জা নাকি ?

আবার বলেছিলাম, 'নামটা বলবে না ?'

জবাবের পরিবর্তে সুড়ুৎ করে একটি গোটা আঙুলই মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এবং ঘাড় কাত করে মায়ের দিকে একবার আড়চোখে লক্ষ্য

করেছিল। মায়ের চোখে অবিশ্যি কিছুই বাদ যাচ্ছিল না। মায়ের যে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল, নিশ্চয় হচ্ছিল, তাও বুঝতে পারছিলাম। হয়তো মেয়ের সেই গায়ে পড়ে আলাপ করাটা মা'কে সঙ্কুচিত করেছিল। অন্তত আমার কথা ভেবে একটু দ্বিধা তো নিশ্চয় হচ্ছিল। সে হিসেবে মায়ের অবস্থাও মেয়ের মতোই। চোখ একদিকে কিন্তু কান ও দৃষ্টি আর একদিকে।

ও কিন্তু মায়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে, মুখে আঙুল রেখেই উচ্চারণ করেছিল 'কাকুলী।'

কাকুলী, অর্থাৎ কাকলী। বলেছিলাম, 'বাঃ, তোমার নামটি তো বেশ।'

কাকলীর মা সেই মুহূর্তেই বলে উঠেছিল, 'আঃ! খুকু, মুখে আঙুল দিচ্ছ কেন?'

কাকলী চট করে লালা ভেজানো আঙুলটা বের করে নীল ফ্রকের গায়ে ঘষে দিয়েছিল।

মা আবার বলেছিল, 'নেমে গেছ কেন? জায়গায় এসে বসো না।'

কাকলী তখন দুটি হাতই আমার কোলের ওপর তুলে দিয়েছিল, আমারও একটু আশা হয়েছিল। একটু নির্ভয় হয়েছিলাম। এবং মায়ের তাড়া দেখে, পাছে কাকলী সত্যি সরে যায়, তাই তাড়াতাড়ি ওর একটি হাত ধরেছিলাম। কাকলী তখন এক পা পেছিয়েছে। কিন্তু ওর মায়ের চোখ আবার সেই বইয়ের দিকে। কাকলী তা লক্ষ্য করে হঠাৎ অনেকখানি আমার বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার নাম কী?'

মুশকিল! কিন্তু উপায় কী? নাম জিজ্ঞেস করতে পারি, বলতে পারি নে? নামটা বলেছিলাম। কাকলীর পক্ষে অসুবিধে হলেও আমার নামটা ও আবার উচ্চারণ করেছিল। ওর মা একবার চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। বোধহয় আমার নামটা ছোট মেয়ের মুখে উচ্চারণে আপত্তি ছিল মায়ের। কিন্তু কাকলীর, কাকলী তখন বাধা মানতে রাজী ছিল না। মায়ের দিকে লক্ষ্য ছিল না ওর। জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি কলো?'

উপায় ছিল না জবাব না দিয়ে। আমি যদি নাম জিজ্ঞেস করতে পারি, ভাব করবার ইচ্ছে রাখি, তা হলে, ভদ্রলোকের নিয়ম রক্ষার দায় মানতেই হয়। বলেছিলাম, 'বেড়াই।'

ঈষৎ সন্দেহ ও বিস্ময়ে কাকলীর ভুরু কুঁচকেছিল, 'পলা কলো না?' সর্বনাশ! তারপরে তো সে প্রশ্নটাই স্বাভাবিক! তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, 'তাও করি।'

কাকলীর মায়ের চোখের কোণ থেকে ঘন ঘন মেয়ের দিকেই দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কিন্তু তারপরেই কাকলীর প্রশ্ন ছিল, 'তোমার গোঁফ নেই কেন?'

একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ যাকে বলে। পড়ার কথার পরেই যে গোঁফ প্রসঙ্গ উঠতে পারে, এতখানি গভীর বোধশক্তি আমার ছিল না। রীতিমতো সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম। এবং মেয়ের এবংবিধ প্রশ্নে মায়ের মুখখানি ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠেছিল।

আমি জবাব দেবার আগেই কাকলীর পরের কথা ছিল, 'আমাল বাবাল গোঁফ আতে, দানো?'

তা অবশ্যি জানা ছিল না। কিন্তু বাবার গুম্ফ গরবিনী কাকলী আর কিছু বলবার আগেই মায়ের ডাক শোনা গিয়েছিল, 'খুকু, এদিকে এসে বসো।'

মায়ের মুখ রক্তাভ, কিন্তু গলায় গাম্ভীর্য ছিল না। খুকুর পক্ষে এবার মায়ের আদেশ অমান্য করার সাহস ছিল না। আস্তে আস্তে আমার হাত থেকে হাত খুলে নিয়ে, বুক চেপে মায়ের পাশে বেঞ্চে গিয়ে উঠেছিল। যদিও মায়ের দিকে ফেরে নি, বাইরের দিকেও তাকায় নি। চোখ বড় বড় করে আমার দিকেই তাকিয়েছিল। আমি নিঃশব্দে হাসছিলাম ওর দিকে তাকিয়ে।

আস্তে আস্তে কাকলীর মুখেও হাসি ফুটেছিল। এবং সে হাসিটা যে দুজনের মধ্যে রীতিমতো একটা নীরব নিভৃত ভাবের বিনিময়, আমরা দুজনেই তা বুঝতে পারছিলাম। সংসারে এমন সহজ নিবিড় প্রেম কজনেই বা চেয়ে ছাখে। আমি চোখ ইশারায়, ঘাড় নেড়ে, কাছে ডেকেছিলাম। কাকলী একবার মায়ের দিকে আড়চোখে দেখেছিল। কিন্তু অনড় হয়ে বসেছিল।

আমি চোখ ইশারা করে ডেকেছিলাম। কাকলী আবার মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। এবং হঠাৎ মায়ের কোলের ওপর হাত রেখে, আঙুল ঘষতে আরম্ভ করেছিল। মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছে?'

কাকলী বেশ গম্ভীর মুখে, আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'আবাল্ আমাকে দাকৃতে।'

আমি থ! হে ভগবান্, একেই কি বলে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্? লজ্জায় প্রায় কুঁকড়েই গিয়েছিলাম। এ যে একেবারে পাকা রমণী মনের ছলনা!

ছলনাই, কিন্তু ছলনার গতি-প্রকৃতি আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। সেটাও আর এক রমণী বুঝিয়ে দিয়েছিল। কাকলীর মা বলেছিল, 'ডাকছেন, তো যাও। কিন্তু বাজে কথা একদম বলো না।'

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই কাকলী প্রায় লাফ দিয়ে নেমে কোলের

ওপর দু'হাত তুলে দিয়েছিল। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল গোল বোঁচা বোঁচা মিষ্টি মুখখানি। দেখেছিলাম, কাকলীর মায়ের মুখ বাইরের দিকে, কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসিরই আভাস ছিল বোধহয়।

অতএব কাকলীর মায়ের কোনো অধিকার না থাক, মনিহারী ঘাটের দুর্দৈবের মধ্যে, কাকলীর অধিকার ছিল আমার কাঁধে এসে ওঠবার। বরং সঙ্কুচিত হয়েছিলাম বৃদ্ধের কথা ভেবে। বৃদ্ধ নিশ্চয় রুষ্ট হবেন। কিন্তু মানব চরিত্রের কতটুকুই বা আমার জানা ছিল! দেখেছিলাম সব চেয়ে দুঃসময়েই বৃদ্ধের মেজাজের আর একটি রূপ ফুটে উঠেছিল। নিজের দুরবস্থার মধ্যেও একটি হাত বাড়িয়ে, কাকলীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আহা বেচারী!'

বোঝা মনে করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এক বৃদ্ধ আর একটি শিশু। দুজনের কাউকেই আমার বোঝা মনে হয়নি। প্ল্যাটফরমবিহীন মনিহারীঘাট স্টেশন। গাড়ির নাগাল পেয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে আগে তুলে দিয়েছিলাম কাকলীকে। তারপর বৃদ্ধকে। বৃদ্ধ উঠেই গোলমাল লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মালপত্র সব উঠেছে, বসবার জায়গা পান নি। কিন্তু কাকলীর মা কোথায়? কয়েকটি সেকেণ্ড ক্লাসের কোথাও সে ছিল না! এ দিকে, আমার দু চোখও তখন বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে। অন্ধ হয়ে উঠেছিলাম। সর্বাঙ্গ বালিতে ও গঙ্গা মাটিতে সাদা হয়ে গিয়েছিল। সান্ত্বনা একটাই ছিল, মালপত্রগুলো উঠেছে।

বৃদ্ধ ইতিমধ্যে বসবার চেয়েও একটু বেশী জায়গাই করে নিয়েছিলেন। আমি দরজার কাছ থেকেই উঁকি মেরে বলেছিলাম, 'আপনি একটু কাকলীর দিকে লক্ষ্য রাখবেন? ওর মাকে আর একটু খুঁজে দেখি।'

বৃদ্ধ প্রায় আঁতকে উঠে বলেছিলেন, 'সে কি, এখনো খুঁজে পাও নি?'

'না।'

'সর্বনাশ!'

বলতে বলতে বৃদ্ধ মুখের ভাঁজে ভাঁজে, ছাইমাখা সাধুর মতো বালি আর অড়বড়ে দাঁত কটি দেখিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'সেকেণ্ড ক্লাসের সব দেখেছ?'

'দেখেছি।'

কিন্তু সর্বনাশ বলছিলেন কেন? একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। একলা মহিলার কোনো বিপদ-আপদ ইংগিত করেছিলেন নাকি!

কিন্তু বৃদ্ধ অন্য রাস্তায় ভাবছিলেন। বলেছিলেন, 'হবেই হয়েছে। এখন বোঝ।'

অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'কী হয়েছে ?'

বৃদ্ধ প্রায় ভেংচে উঠেছিলেন, 'কী হয়েছে আবার কী হে! দেখ এখন, না বিইয়ে কানাইয়ের মা হয়ে বসলে কি না!'

সেটা আবার কী ? না বুঝে বৃদ্ধের মুখের দিকেই হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। বৃদ্ধ বোধহয় আমার মতো একটি আহাম্মক আগে আর দেখেন নি। বলেছিলেন, 'দেখ আর আসে কি না। দিনকাল কিছুই তো বোঝ না। হয়তো অমনি করেই গছিয়ে গেল।'

বলেন কী বৃদ্ধ! ছি ছি! আমি তাড়াতাড়ি কাকলীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু কাকলী সে সব কথার কিছুই বুঝতে পারে নি। ও বাইরের দিকে তাকিয়ে, বালির ঝড়ের অস্পষ্ট আলো আর ছায়া ছায়া ভিড়ের ছবি দেখছিল। ওর বালির ঝাপটায় ভেজা চোখের অন্যমনস্কতায় একটি অসংায়তা হয়তো ছিল। হাত দুটি জড়ো করা ছিল বুকের কাছে। তাতে ওকে করুণ লাগছিল।

মনটা যে হঠাৎ কেন ব্যথায় ও উদ্বেগে চকিত হয়ে উঠেছিল, জানি নে। বৃদ্ধকেই বলেছিলাম, 'একটু দেখুন, আসছি এখুনি দেখে।'

সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাগুলোতে আবার উঠে উঠে উঁকি মেরে দেখছিলাম। কোথায় কাকলীর মা ? মহিলাদের সেকেণ্ড ক্লাসেও ছিল না। ভিড়ের চাপ দেখে কি থার্ডক্লাসেই উঠে পড়লো ? সে অবস্থায় তা অসম্ভব ছিল না। যেখানেই হোক, রাত্রের মতো একটু জায়গা পাওয়া নিয়ে কথা। সমস্ত গাড়িটাই প্রায় ঘুরে দেখেছিলাম। না পেয়ে একটা ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠা নিয়ে আমার কামরার কাছে ফিরে এসেছিলাম। এবং আসবার আগেই একটু দূর থেকে, বালি-ঝড়ের আবছায় লাল শাড়ি পরা মূর্তি দেখতে পেয়েছিলাম। কাকলী চীৎকার করে উঠেছিল, 'ওই যে কাকু, কাকু।'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়েছিল। দেখেছিলাম, কাকলী ওর মায়ের কোলে। ওর মা আঁচল দিয়ে ঘোমটার মতো করে, নিজের আর মেয়ের মাথা ঢাকা দিয়েছিল। দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছেই নিচে। বৃদ্ধ গাড়ির ওপর দরজায়।

মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেও প্রকাশ করা অসম্ভব। কাকলীর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'খুবই দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে নাহক হয়রান হতে হয়েছে। অবস্থা দেখে, আমি ফার্স্ট ক্লাসে একটা ব্যবস্থা

করে নিতে পেরেছি। সে জন্যেই দেরি হল।'

আশ্চর্য, যেন ঠিক খুশি হতে পারি নি। নিতান্ত শুকনো গলাতেই বলেছিলাম, 'ও! না না, হয়রান আর কিসের।'

'তা বটে, একে কি হয়রান হওয়া বলে? মনিহারীঘাটের রমণীয় ভ্রমণ বলে একে! এখন উঠে এস।'

বৃদ্ধ খেঁকিয়ে উঠেছিলেন প্রায়। তাতে কাকলীর মা বিব্রত হয়ে উঠেছিল। আমিও লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধের কথায় আমার কোনো দায় ছিল না। বরং যেটুকু বা বিরক্ত হয়েছিলাম সেটুকু আর থাকে নি।

জানি নে, কাকলীর মা সে কথা বুঝতে পেরেছিল কি না। সে বিব্রত ভাব চেপে কাকলীকে বলেছিল, 'খুকু কাকুকে বলে দাও, আমরা যাচ্ছি, আবার কাল সকালে শিলিগুড়িতে দেখা হবে।'

কাকলী বলেছিল, 'কেন? কাকুর কাছে থাকবে না?'

ওর মা বলেছিল, 'এখানে জায়গা নেই যে।'

কাকলী ওর বালি লাগা, জলে ভেজা, কাজল-ঘষা করুণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'কাকলী, তোমার সঙ্গে আবার কাল সকালে দেখা হবে। এখন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

কাকলী ঠোঁট ফুলিয়ে চুপ করেছিল। কাকলীর মা হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, 'আশ্চর্য! মেয়ের দেখছি আপনার ওপর সত্যি টান পড়ে গেছে। আচ্ছা যাচ্ছি, আর দেরি করা যায় না।'

আমি তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি এগিয়ে দিয়ে আসব আপনাকে?'

কাকলীর মা যেন প্রায় ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল, 'না না, আপনাকে আর আসতে হবে না।'

বলে চকিতে একবার দরজায় দাঁড়ানো বৃদ্ধকে দেখে নিয়েছিল। আমার হাসি পেয়েছিল। কিন্তু কাকলী আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি হাত নেড়েছিলাম। কাকলীর মুখে তাতে হাসি ফোটে নি।

বৃদ্ধ ডেকে বলেছিলেন, 'নাও হে, উঠে এস। গাড়ি তো আর তোমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। একটু খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও দেখতে হবে। কেন নিতে যাও ওসব ঝক্কি-ঝামেলা। যতসব পথের ইয়ে।'

বৃদ্ধের কথা আপত্তিকর বোধ হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদ নিরর্থক জানতাম। বলেছিলাম, 'একলা মহিলা—।'

কথা শেষ করতে পারি নি। বৃদ্ধ যেন হকচকিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'একলা? মহিলা? হুঃ!'

যেন রাগের চোটে আর কথাই বলতে পারেন নি। সরে গিয়েছিলেন। পরে, অনেক রাত্রে, গাড়ি চলা-কালীন প্রচণ্ড গরমে, অসম্ভব ভিড়ে আধশোয়া অবস্থায় বৃদ্ধ খানিকটা ঘুম জড়ানো গলায় বলেছিলেন, 'তোমার ওই কাকলী না মাকলী বেচারীরা এখানে থাকলে আর ঘুমোতে পেত না একটু, কী বল।'

'হ্যাঁ।'

'তবে এখানে থাকলে একটা ব্যবস্থা করে দিতামই, না কী বল হে?'

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। মনে মনে না হেসে পারি নি। শেষের কথাটাই বোধহয় আসল কথা ছিল। ওদের চলে যাওয়ার দুঃখটাই বৃদ্ধকে ক্ষুব্ধ করেছিল।

এখন এই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের, পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা বৃহৎ কেন্নোর মতো গাড়িতেও আমরা আগের মতোই প্রায় পাশাপাশি বসে চলেছি সবাই।

রং টং। আশ্চর্য নাম স্টেশনের, রং টং? এই পাহাড়ের মানুষের ভাষায় হয়তো এই শব্দের কোনো মানে আছে। আমরা সমতলের লোকেরা তা জানি নে। না জানলেও, নামের মধ্যে একটা ধ্বনি আছে, ঝংকার আছে। যে ঝংকারের মধ্যে বাজছে এক অচেনা সুর। অচিন দেশের দূরত্ব আনন্দ যেন বেজে উঠলো সেই সুরে। নিজের ভাষায় বলতে হয়, রং তো বটেই। যদি রেগে টং হয়ে আছে না বলে, রং-এ টং হয়ে আছে বলা যেত, তবে বোধহয় ঠিক হত। এই রৌদ্রোজ্জ্বল হিমালয় যেন সমতল ও আকাশের সব রস পান করে, প্রমত্ত হয়ে উঠেছে।

ভেবেছিলাম এক, দেখছি আর এক। যেদিকে তাকাই, বর্ণবহুল সবুজের বন্যা বইছে চারিদিকে। সমগ্র হিমালয় কি এমনি অরণ্যে ঢাকা! আর এত ফুল! লাল নীল হলুদ সাদা, চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি। না জানি গাছের নাম, না জানি ফুলের। তবু বাংলাদেশের সমতলের ছেলে। বনগাঁদা চিনতে ভুল হয় না। বন জুঁই, কুরচি আর দেবকাঞ্চন চিনতে ভুল হয় না। আর বড় বড় শাদা অজস্র ওই ফুলগুলো, কী ফুল? ধুতুরা? যদি তাই, তবে সবুজ রঙের সেই গোল কাঁটা ফল দেখতে পাই নে কেন?

যতই উঠছি, ততই, পাহাড়ের গা বেয়ে চা বাগান উঠছে সঙ্গে সঙ্গে।

দূর পাহাড়ের ঢালু গা দেখলে, হঠাৎ মনে হয়, মোয়িং মেশিনে ছেঁটে দেওয়া সবুজ লন দেখছি। মোয়িং মেশিনে না হোক, চা বাগিচার ঝাড়েও ছাঁটাই যন্ত্র পড়ে। তাই দূর থেকে সমান আর মসৃণ মনে হয়। আসলে সবই চা বাগান। প্রতি পদে পদে ফার্নএর ছড়াছড়ি। আর অরণ্যের ঘাস এবং ফুল ছাড়াও পাথরের এক আশ্চর্য গন্ধ। হিমালয়ের গন্ধ ফুসফুসে ঢুকছে, রোম কূপে কূপে, রক্তের শিরায় শিরায়। হিমালয়ের নেশা লাগছে। মাতাল হচ্ছি। কথা ভুলে যাচ্ছি। অনুভূতির মধ্যে এক আনন্দদায়ক স্তব্ধতা নেমে আসছে। অথচ উদ্বেল হয়ে উঠছি। সে উদ্বেলতা বুকের মধ্যে যেন এক পূর্ণ জলাধারে টলটল করছে। ছলছলিয়ে উঠছে।

সিঙ্গলীলার এক বাহু বেয়ে চলেছি। এক একটা লুপ বেয়ে, চক্রাকারে ঘুরছি আর উঠছি। কেন, এ গাড়ির কি বাকার বলে কিছু নেই? এ কি সত্যি সরীসৃপ, লুপ-এর চক্রে যেন গাড়ির ল্যাজা মাথা এক হয়ে যাচ্ছে। চক্রাকারে উঠছি, রিভার্স-এ উজান বেয়ে উঠছি। সিঙ্গলীলা পর্বতের বাহু ক্রমে ওপরে উঠছে। এই সিঙ্গলীলা নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে গিয়ে মিশেছে। সীমানা ভাগ করে দিয়েছে নেপাল আর সিকিমের। সিকিম এবং দার্জিলিং-এর। আর সামনে, এই কি সেলিম পাহাড়? যার চূড়ায় এখন সকল দিগন্ত ঢাকা পড়ে গেছে।

বাঁয়ের সেই দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের ফাঁকের জানালা কখন ঢাকা পড়ে গেছে। মহানন্দীকে আর দেখতে পাচ্ছিনে। ডাইনে, মাঝে মাঝে, বহুদূর নিচে একটি ঝাপসা আয়না যেন চিকচিকিয়ে উঠছে। তিস্তা চলেছে সমতলে।

কিন্তু তরাই কি শেষ হল না? অরণ্য যে এখনো নিবিড়, নিবিড়তর। স্তব্ধ মহীরুহ, ঋজু গম্ভীর। পার্বত্য পাইনের অরণ্য। প্রস্তর-গাত্র আছে, প্রস্রবণও দেখলাম, তবু, গভীর অরণ্যই যেন সুমহান গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে।

গাড়ির কামরার মধ্যে যাত্রীদের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম ঠিকই। সহসা সেই গুঞ্জন ভেদ করে, অরণ্য পর্বতের স্তব্ধতা ভেঙে, ট্রেনের ঝুকঝুক শব্দ ছাপিয়ে, সমবেত গলায় গান বেজে উঠলো,—

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণদল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।

আর তার সঙ্গেই ড্যাম্প দিয়ে, একটা মাউথ অর্গান প্রায় গর্জে উঠলো যেন।

এই আরণ্যক পার্বত্য মৌনতায় হঠাৎ কাদের আকাশে মাদল বেজে উঠলো, ধরণী উতলা হল। টুকরো-টাকরা গানের কলি মাঝে মধ্যে একটু শুনতে পাচ্ছিলাম। সেটাও সমবেত ছেলে গলায়, কিন্তু চাপা সরু সুরে। এখন যেন হঠাৎ প্রবল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো। এবং তার সঙ্গে জুতোর গোড়ালির তাল্।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, আর যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। সেই তিন শ্রীমান। কলকাতা থেকেই যারা আমাদের সঙ্গী। বৃদ্ধের ভাষায় সেই ফচকে বা বাঁদর, যাই বলা যাক। যাদের সঙ্গে বৃদ্ধের অর্থাৎ পরমেশবাবুর (ওঁর পরমেশ ঘোষাল নামটা রাত্রেই গাড়িতে জানতে পেরেছিলাম) দক্ষিণেশ্বর না পেরোতেই কথা কাটাকাটি লেগে গিয়েছিল। মালপত্র তোলা বা জায়গা দখলের চেয়েও, ওদের ছুটোছুটি ব্যস্ততা যেন বেশী ছিল। আসলে সেটা ছিল ওদের ঘর ছাড়ার আনন্দেরই অভিব্যক্তি। ওরা যে শুধু নিজেদের মাল-পত্র তুলেছিল আর জায়গা বেছে নিয়েছিল, সেটা সত্যের অপলাপ। পরের জন্যে ব্যস্ততাই যেন বেশী ছিল ওদের। এমনকি পরমেশবাবুকেও ওরা সাহায্য করেছিল। সব চেয়ে বেশী সাহায্য যাদের করেছিল, তারাও দার্জিলিংযাত্রী, এবং এ কামরাতেই রয়েছে। সে দলে প্রৌঢ় দম্পতি, তিনটি মেয়ে আর একটি বছর বারোর ছেলে। অনুমান করেছি, একটি সম্পূর্ণ পরিবার। মেয়ে তিনটি বোধহয় পিঠোপিঠি তিন বোন, ছেলেটি তাদের ভাই, প্রৌঢ় দম্পতি বাবা মা। লক্ষ্য করেছিলাম, তিন শ্রীমানের সাহায্যের ঠেলায় হুলুস্থুলটা লেগেছিল ভালো। তিন বোন প্রথমে সঙ্কুচিত, তারপরে আরক্ত, তারও পরে সমবেত গলায় খিলখিল হাসিটা চাপা থাকে নি।

কেন জানি নে, দেখে শুনে আমার ভিতরেও একটা খুশির হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তিন শ্রীমানেরই বয়স বোধহয় বাইশ-চব্বিশের মধ্যে। সুঠাম স্বাস্থ্য আর পোশাকে মধ্যবিত্ত ঘরের ছাপও পরিস্ফুটই ছিল। যদিও গায়ে জামা রাখা ওদের সম্ভব হয় নি। এমনকি তিনটি মেয়ে, যাদের জায়গার জন্যে ওরা ব্যস্ত হয়েছিল বেশী, তাদের সামনে সঙ্কোচেও, জামা রাখতে পারে নি গায়ে। বৈশাখের দাবদাহ ওদের লজ্জা কেড়ে নিয়েছিল। প্যাণ্ট-এর তলায় ঢোকানো স্যাণ্ডো গেঞ্জিটা কোনোরকমে রেখেছিল। আর ভগবান জানে, আর একটু বেশী বেপরোয়া হলে বোধহয় ওরা শুধু আণ্ডারওয়ার পরেই থাকতো। ততটা অবশ্য ওরা এগোয় নি।

তিন বোনের ছয় বেণীর মায়াবিনী ফাঁদে যে ওরা দর্শনমাত্রেই ধরা পড়েছিল, তাদের আবির্ভাব যে ওদের তিনটি প্রাণে প্রায় অলৌকিক মুগ্ধ বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল, সন্দেহ নেই। কাজল কালো দুটি চোখও যে ওদের প্রায় সরাসরি বিদ্ধ করেছিল, তার সাক্ষী দিতে পারি আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে। একটা হৈ-চৈ হুলুস্থুল না করে ওদের উপায় ছিল না। কেউ জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। কেউ মালপত্র সাজাতে সাহায্য করেছিল। প্রৌঢ় দম্পতি যে তাতে খুবই আপ্যায়িত এবং স্বস্তি বোধ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। বরং শ্রীমানদের আতিশয্য দেখে, কামরার অনেকে মুখ টিপে হেসেছে। বিরক্ত হয়েছে বেশী সংখ্যক। বিদ্রূপ হেনেছে কেউ কেউ।

কিন্তু কাদের? হায়! ওরা কি নিজেরা তখনো জানতো, ওদের কী অবস্থা? সারা পৃথিবীতে তখন মাত্র কয়েকটি বস্তু ও জীবেরই অস্তিত্ব ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসের একটি কামরা, তিনটি মেয়ে আর ওরা তিনজন। আর সব শূন্য। অপ্রয়োজনীয়। হাসবে তুমি? হাসো, ওরা চেয়েও দেখবে না। বিদ্রূপ? তোমারই নাক ঠোঁট কুঁচকে কুঁচকে ব্যথা ধরে যাবে। ওরা ফিরেও চাইবে না। আর ব্যবহারে ভারসাম্য এবং শালীনতা? বন্যার উচ্ছ্বাস আবার কবে ভারসাম্য মেনেছে? ঝোড়ো হাওয়ার বেগে শালীনতা? তুমি খুঁটি ধরে কাঁদো, তীরে বসে ভ্রূকুটি কর। ঝড়-প্লাবন মানে না। ওদের প্রাণে তখন সেই প্লাবনের ঢল। ঝড়ের বেগ। প্রাণের মধ্যে ফুটছে টগবগিয়ে, ছুটেছে রক্তের পক্ষীরাজ। তার চেয়েও বলি, সে যেন অপ্রতিরোধ্য বন্য ফুল ফোটার মতো। তাকে তুমি নির্লজ্জ বলতে পার, সে তবু ফুটবেই। তার শিরায় শিরায় আগুনের রস, রঙে আর বর্ণে, গন্ধে আর রূপে সে চমকে দেবেই। প্রকৃতির সেই যে ধর্ম!

সত্যি কথা বলতে কি, আমার মন ছিল ওদের সঙ্গে। দেহ ছিল ভিন্ন। সংসারের আর দশটা সং-এর সঙ্গে সং সেজে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে গম্ভীর মুখে বসে দেখছিলাম খেলাটা। তারপরে, সারাটা পথই দেখেছি। আর প্রাণের অন্তঃসলিলে খুশির ঝোরা বেজেছে কলকলিয়ে।

জানি, নীতিবাদীর ভ্রূকুটি কুটিল জিজ্ঞাসা উদ্যত হয়ে উঠেছে আমার ওপর, আমি নাচার। যাদের কাছে ওদের ব্যবহারটা বেলেল্লাপনা বলে মনে হয়েছিল, তাদের সঙ্গে আমার তফাত মূলে। ওদের আতিশয্য ছিল, ওরা অভব্য আচরণ করে নি। কামরার বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধেয় আচরণ দেখি নি। এবং এমন কোনো কথা শুনি নি, যা থেকে ধরে নেওয়া

যেতে পারতো, সমাজের অন্ধকার থেকে ওরা উঠে আসছে। আমার মনে হয় নি, বিধ্বংসী পোকায় ওদের খেতে আরম্ভ করেছে।

আমার মনে হয়েছিল কলেজ বা ইউনিভার্সিটির গন্ধ ওদের গা থেকে এখনো যায় নি। উদ্দামতাকে ওরা এখনও সংহত করতে শেখে নি। যে কারণে ওদের হৃদয় অমন বে-আবরু হয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর অনেক মহারথী নীতি-বাগীশের হৃদয়ের কোণেই ওরকম ইতিহাসের এক-আধটি ছেঁড়া পাতা লুকিয়ে আছে। হয়তো সেই ছেঁড়া পাতাগুলোতেই জীবনের কিছু সোনা-রুপোর কারুমিতি রয়েছে। যৌবনের কাছে বন্ধক রেখে, বার্ধক্যে এখন শুধু বিকিয়ে আসার দীর্ঘশ্বাস। যে-দীর্ঘশ্বাস এখন মাত্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। বয়স্করা চির-কালই নিজেদের সেই দিনগুলো ভুলে যান। আর হতাশ ছোকরারা চিরকালই মাৎসর্যে ঠোঁট বাঁকিয়ে থাকে। এর জন্যে কিছু করার নেই।

জানি, ওরা সবকিছু লুকিয়ে চেপে, গম্ভীর মুখে চালাকির সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে ইশারায় কথা বলে, মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতো, (সেটাই ভদ্রলোকের রীতি !) তা হলে কারুর চোখেও পড়তো না। নৈতিক বাতাসটাও বেশ পবিত্র থাকতো। মানতেই হবে, ওরা একটু কম সেয়ানা। আঁটঘাট বেঁধে বেশ জুতসই করে, দাবা বোড়ের নিঃশব্দ চাল ওরা চালাতে শেখে নি।

আসলে যাঁরা বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, তাঁরা দেখছিলেন, তাঁদের ঘরের ছেলেদেরই চেহারা। মনের গভীরে যেখানটা আবর্তিত হয়ে উঠছিল, সেখানকার তত্ত্বটা বোধহয় তাই। তিন শ্রীমানকে দেখলে, সব মধ্যবিত্তেরই বাড়ির ছেলেদের কথা মনে পড়ে যাবার কথা।

সর্বোপরি, তিন শ্রীমতীর চোখ মুখের অবস্থাটাও বিচার্য। ওদের সলজ্জ হাসির উচ্ছ্বাস, চোখের তারায় অনুচ্চারিত যে-ভাষা, সেটাও লক্ষ্য করবার ছিল। এক্ষেত্রেও, তিন শ্রীমতীই বোধহয় সিংদরজা। সে সিংদরজার পাল্লাও যে, কখনো চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যের বা ভ্রূকুটি চোখের কোণের অপ্রতিরোধ্য চোরা হাসিতে একটু মুক্ত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ কি।

কিন্তু পরমেশবাবু দক্ষিণেশ্বর না পেরোতেই খ্যাক খ্যাক করে উঠেছিলেন, 'ওহে ছোকরারা, বলি এত হাউচাউ দাপাদাপি করার কী আছে, অ্যাঁ ? এত হাউচাউ দাপাদাপি কিসের ?'

তিন শ্রীমানই একটু থতিয়ে গিয়েছিল। তিনজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল। শ্রীমতীদের অবস্থাও প্রায় সেরকমই। ওরা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর

হয়ে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসেছিল। যেন ওরা কিছুই জানে না।
এহ বাহ্য, এ তো জীবজগতের নিয়ম, সেখানে হয়তো পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীরা লড়ে,
আর মেয়েরা মুহূর্তে নির্দয়ীর নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। লক্ষ্য থাকে জয় পরাজয়ের
দিকে। এখানেও ব্যাপারটা পুরুষদের মধ্যেই ঘটছিল। লক্ষণীয় ছিল,
প্রৌঢ় দম্পতি সে সব কিছুই তাকিয়ে দেখছিলেন না। তাঁরা মালপত্র কিছু
ফেলে আসা হয়েছে কি না, খুচরো পয়সার হিসেব, ইত্যাদি নানান বিষয়ে
তখনো ব্যস্ত। তাঁদের লক্ষ্য রাখবার মতো ঘটনাও কিছু ঘটে নি।

এক শ্রীমান যেন অবাক্‌ হয়ে বলেছিল, 'আমাদের বলছেন ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদেরই বলছি।'

'কী বলছেন ? আপনার কোনো অসুবিধে করেছি নাকি ?'

পরমেশবাবু আরো এক ডিগ্রি উঠেছিলেন, 'আলবাত করেছ। এই গরমে
আর এত দাপাদাপি সহ্য হচ্ছে না।'

আর এক শ্রীমান বলেছিল, 'দাপাদাপি করব কেন ? আমরা তো কাজ
করছি স্যার।'

পরমেশবাবুর মেজাজ মোড় নিয়েছিল আরো অন্য দিকে। বলেছিলেন,
'যথেষ্ট কাজ হয়েছে। আবার স্যার বলা হচ্ছে। স্যার !'

শ্রীমান তিনজনেই চুপ হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি
করেছিল। এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই তিনজনের অট্টহাসি ফেটে পড়েছিল
কামরার মধ্যে। পরমেশবাবু ঘাড় তুলে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিলেন। হয়তো
ওদের হাসির পরেই ঘটনার শেষ রেশ টানা হয়ে যেত। কিন্তু বৃদ্ধ এত
সহজে ছাড়বার পাত্র নন। হাসি শুনে পরমেশবাবুর মেজাজটি প্রায় ফালি
বেগুনের মতো গরম তেলে পড়েছিল। খেঁকিয়ে উঠেছিলেন, 'মানে ? এ
হাসির মানে কী ?'

ওদের যে হাসতেও মানা, অতোটা আমি ভাবি নি। এক শ্রীমান জবাব
দিয়েছিল, 'আপনাকে "স্যার" বলায় চটে গেলেন, তাই।'

'তাই হাসি হচ্ছে ?'

'না, তা হলে কী বলব, তাই ভাবছি।'

পরমেশবাবু বড়বড়ে দাঁত দেখিয়ে, চোখ পাকিয়ে, তর্জনী তুলে বলেছিলেন,
'মশায়, মশায় বলতে হবে।'

এক শ্রীমান ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'ও !'

আর-এক শ্রীমান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠেছিল, 'জ্যাঠামশায়।'

সর্বনাশ! কথাটা বৃদ্ধের কানে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছিলেন, 'কী বললে? কী?'

ওরা তখন নিজেদের জায়গা ঠিক করে নিয়ে বসতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পরমেশবাবুকে বাধ্য হয়ে আর একজনকে উদ্দেশ্য করে বলতে হয়েছিল, 'দেখেছেন! শুনেছেন কথা?'

বলেই আমার দিকে ফিরেছিলেন, 'অ্যাঁ, শুনলে হে?'

আমাকে উনি প্রায় প্রথম থেকেই তুমি দিয়ে শুরু করেছিলেন।

শুনেও যে কী বলতে হবে, বুঝতে পারছিলাম না। কোর্টে সাক্ষী দিতে যেতে হত না নিশ্চয়। কোনো রকমে একবার উচ্চারণ করেছিলাম, 'ছেড়ে দিন ও সব।'

'ছেড়ে দেব?' যেন তেড়ে ধরবার জন্যেই নড়বড়ে দাঁতে একটা জিভের ঝটকা মেরেছিলেন। বলেছিলেন, 'বাঙালী জাতটার অবস্থা একবার ভাব কোথায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি।' ..

তার পরেই বাঙালী জাতির ভূতগ্রস্ত অবস্থা পিণ্ডিদান, বলতে গেলে, সেই ভাবেই পরমেশবাবু বলে চলে ছিলেন। ওঁর কথায় কান না থাকলেও শোনবার ভাবটা বজায় রাখতেই হচ্ছিল।

ওদিকে তখন প্রৌঢ় দম্পতির যেন একটু সংবিৎ ফিরেছিল। সংবিৎ ফিরেছিল কামরার মধ্যে একটা ঝগড়া-বিবাদ কিছু ঘটেছে। প্রৌঢ় পিতা ফুলো ফুলো গাল আর গোল গোল চোখ নিয়ে তাকিয়েছিলেন পরমেশবাবুর দিকে। আর দেখছিলেন মেয়েরা ঠিক আছে কিনা কিন্তু সেখানে বলার কিছু ছিল না। শান্ত তিনটি মেয়ে, মায়ের দিকেই মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসেছিল। কামরায় যে কী ঘটছিল, ওরা যেন জানেই না। ওদের মুখোমুখি উল্টোদিকে তিনটি ছেলে যে ওদেরই মুখ চেয়ে বসেছিল, সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন। অতএব বাবা-মা নিশ্চিন্ত।

ছেলে কটি যে বোকা নয়, প্রমাণ হয়েছিল। এক 'জ্যাঠামশায়' উচ্চারণেই হাওয়া অনেকক্ষণ গরম ছিল। তারপরে পরমেশবাবু আকারে ইঙ্গিতে ওদের তিনজনের উদ্দেশে অনেক চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। ওরা নির্বিকার। শুধু নির্বিকার হলেও একটা কথা ছিল। একবার রবীন্দ্র সংগীতের দু কলি গুনগুন করেছিল। তারপরেই আর-একজন কোনো বিদেশী সংগীতের সুর ধরেছিল। সেটা ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা কি প্যাটবুন, আমার জানা ছিল না।

পরমেশবাবু এক সময়ে, অভিযোগের অন্য দিকে, অর্থাৎ সেকেণ্ড ক্লাসের

ফ্যান-এর প্রসঙ্গে পৌঁছেছিলেন। তারপর সকরিগলি ঘাটে শ্রীমানেরা কিংবা তিন শ্রীমতীদের পরিবার কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, জানিনে। ওদের বালির ঝড় কেমন লেগেছিল, কিভাবে কেটেছিল দেখি নি। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত, যেখানেই হোক সবাই এক সঙ্গেই ছিল। নিশ্চিত হয়েছিলাম, কারণ শিলিগুড়িতে তাদের সবাইকে প্রায় এক সঙ্গেই দার্জিলিং-এর এই ছোট গাড়িতে উঠতে দেখেছিলাম।

পরমেশবাবুরও ঠিক লক্ষ্য পড়েছিল। বলেছিলেন, 'সেই বিচ্ছু কটি, না?'

না হেসে পারি নি।

তার পরেই তো হিমালয়ের বুকে, দ্বৈত-কণ্ঠের সংগীত আর মাউথ অর্গান-নাদ।

পরমেশবাবুর মতে নিশ্চয় বিচ্ছুর চীৎকার! বিচ্ছুরাও বোধহয় এমন চীৎকার করতে পারে না।

এই একটু আগেই পরমেশবাবু বলছিলেন, 'কই হে, পাহাড়ের অনেক ওপরে তো উঠলাম, এখনো গরম লাগছে কেন? শুনেছিলাম যে, উঠলেই শীত করতে আরম্ভ করে।'

এ বিষয়ে তাঁর মতো আমিও অনভিজ্ঞ। আবার বলেছিলেন, 'সব ভাল, কিন্তু বড় কয়লা আসছে। দু দণ্ড যে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখব, তার উপায় নেই।'

মোটের ওপর, পরমেশবাবুর কিছুতেই শান্তি ছিল না। তার ওপরে এই বজ্র কণ্ঠ ও মাউথ অর্গানে, চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।—

গোটা কামরাটার সবাই ওদের দিকে ফিরে তাকালো। ওদের অবিশ্যি কামরার ভিতর দিকে নজর নেই। প্রায় জানালার বাইরেই ওদের মুখ। কিন্তু সকলেই যে বিরক্ত, এমন কথা বলতে পারব না। কেউ কেউ বেশ উপভোগই করছে। দেখলাম, সেই তিন শ্রীমতীর মুখও জানালার বাইরে। এবং বাইরে ওদের চোখের তারায়, ঠোঁটের কোণে কী কারুমিতির খেলা, তার সাক্ষী একমাত্র হিমালয় পর্বত।

কিন্তু আশ্চর্য, হিমালয়ের ক্রমশ আবরণমুক্ত যে রূপ দেখে আমি এক মৌন আবেশে ডুবে যাচ্ছিলাম, সহসা শব্দের চকিত চমকে তবু বিরক্ত হতে পারলাম না। নিজের ভিতরটাকেই বা কতটুকু চিনি! কে জানতো, আমার মৌন স্তব্ধতার অন্তস্রোতে, প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ দর্শনের খুশি চঞ্চলতায়, এমনি এক উদ্দাম তাল মান লয়, সুর ও ছন্দের ঝংকার আবর্তিত হচ্ছিল। এর কোনো

ব্যাখ্যা আমি জানিনে। শুধু অনুভব করলাম, ওদের সুরের দোলা, বেগের ছন্দ, আমার প্রাণে ঢুকেছে চুঁইয়ে। আমার মৌন আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। আমার মনে হল, চারপাশের ছোট ছোট উপত্যকায়, গিরি সঙ্কটের অরণ্যানীতে ওদের গানের সুর আর তাল ছন্দিত হয়ে উঠলো। এই খেলাঘরে ছোট্ট গাড়িটাও যেন দুলতে লাগলো তালে তালে। ছুটতে লাগলো, উঠতে লাগলো ওদের সুরের বেগে। স্বয়ং হিমালয় যেন প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। রৌদ্র আর মেঘের আলো ছায়ার বিচিত্র খেলা তার দিগ্‌দিগন্তে।

লক্ষ্য করি নি, কখন থেকে পাহাড়ের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে পথে পথে। মাঝে মাঝে পথের ধারে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ছে। তাদের নাক দেখতে পাই নে, চোখ দেখতে পাই নে। কিন্তু একটি বিস্মিত হাসি তাদের হলুদ রক্তাভ মুখের ভাঁজে ভাঁজে ছড়ানো। কালো বেণী দোলানো, রবারের পুতুলের মতো টুকটুকে লাল গাল, নাক বোঁচা, কালো চোখ, রক্তিম ঠোঁট মেয়েদের মুখে হাসি, চোখে কৌতূহল। ওরা সবাই নিশ্চয় কাজে চলেছে। অনেকেই হয়তো চারপাশের উপত্যকায় ছড়ানো চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করে। পুরুষদের অনেকের কাঁধে কোদাল কুড়ুল। কেউ হয়তো রেলের, কেউ পি. ডব্লিউ. ডি-এর কর্মী।

দেখলাম তারা কেউ কেউ হাত তুলে, গানের তালে তালে দুলিয়ে দিচ্ছে। মেয়েরা দল বেঁধে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসছে। ছোটদের তো কথাই নেই। কেবল লাইনের ধারেই, পাহাড়ের খাঁজে বসে অবাক্ হয়ে তারা সমতলের মানুষদের দেখছে। জীবন্ত মানুষের বাচ্চা বলে তাদের ভুল হয়। যেন শহরের শো-কেসে সাজানো দেড় ফুট দু-ফুটের রং করা পুতুল। ফুলো ফুলো লাল গাল। কালো কালো গোল দুটি চোখ। পোকা খাওয়া দাঁতে, ঝলকে ঝলকে হাসি। হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে কেউ। কেউ নিঃশব্দ নিশ্চল গম্ভীর, ভাবলেশহীন মুখ! যেন এখনো চলমান যানের এই সংগীতের ও বাজনার খেই ধরতে পারে নি।

এদিকে শুধু রেল নয়। রেল লাইনের সঙ্গে সঙ্গে, কখনো নিচে, কখনো ওপরে যুগপৎ চলেছে রাস্তা। সেখানে মোটর গাড়ির যাত্রীরা হাতছানি দিচ্ছে রেলের যাত্রীদের। আমার মনে হল, হিমালয়ের অভ্যন্তরে এক চলমান উৎসব অনুষ্ঠান চলেছে। আমার ভিতরেও নিঃশব্দে সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে :

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত ··

কিন্তু হঠাৎ মনে হল, আমার দেহের কোনো একটা অংশে যেন তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে রয়েছে। অনুভূতিটা আমাকে এমন আড়ষ্ট করে দিল যে, আমি আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। এবং যা ভেবেছিলাম, তাই! পরমেশবাবুর বিরক্ত ক্রুদ্ধ সপ্রশ্ন চোখ আমার দিকেই। হাসতে সাহস তো পেলামই না বরং মুখের প্রসন্ন ভাবটুকুও গাম্ভীর্যে ঢেকে ফেললাম।

পরমেশবাবু বললেন, 'এ সবের মানে কি বলতে পারো?'

পারি, তাতে পরমেশবাবু ক্ষুণ্ণ হবেন। এবং একজন বৃদ্ধ লোককে শুধু মাত্র একটি কথা বলে ক্ষুণ্ণ করতে আমার মন চায় না। জানি, খুব সহজ এবং সদুত্তরই দেওয়া যায় ওঁকে। কথাটাও সত্যি বলা হবে। কিন্তু এই বৃদ্ধ পরমেশ-বাবুকে আজ নতুন করে কিছু বোঝানো যায় না। ওঁর বিশ্বাসে এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। অতএব কী লাভ ওঁকে দুঃখিত করে যদি ওঁর কথায় সায় দিলে, কথা একটু শুনলে খুশি হন, কেন করব না।

মুখে প্রায় বিরক্তি ফুটিয়েই, আমি শ্রীমানদের দিকে একবার ফিরে তাকালাম।

পরমেশবাবু জানালার ওপরে চাঁটি মেরে বললেন, 'কি অধিকার আছে তোমার অন্যান্য যাত্রীদের শান্তিভঙ্গ করবার? আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

এই 'তোমার' মানে আমি নয়। প্রতিপক্ষের উদ্দেশে আমাকে খাড়া করে, বলা মাত্র। ওদিকে মাউথ অর্গানের কর্ড, খোলা গলার উদাত্ত গান পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, 'সে তো বটেই।'

পরেমেশবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না না, সে তো বটের কথা নয়। এটা তো তোমার বাড়ির উঠোন নয়, ছাদ নয়, এমন কি খেলার পার্কও নয়। তবে? তবে এসবের অর্থ কী? তার মানে তুমি আইন শৃঙ্খলা কিছুই মানতে চাও না, অ্যাঁ! গায়ের জোরে তুমি সব চালিয়ে যাবে, না! কী করে তুমি জানছ, এখানে কারুর মাথা ধরে নি? কী করে জানছ, কারুর শরীর খারাপ হয় নি? হয়তো ওরা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু তুমি যে অতবড় ষণ্ডার মতো চেহারাটা নিয়ে এই ভ্যাকোর ভ্যাকোর বাজনা বাজিয়ে গাধার মতো চেঁচিয়ে চলেছ, তোমার তো একটু খেয়াল করা দরকার, না কী হে?'

আমি প্রায় অসহায়ের মতো ভ্রূ কুঁচকে গাড়ির চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। যেন সত্যি অনেক অসুস্থ লোক আছে। যদিচ, আমার সন্দেহ হল, দু-চারজনকে বাদ দিলে, কামরার সকলের হাতে পায়েই প্রায় একটা তালের

দোলা লেগে গেছে। তবু বললাম, 'সত্যিই তো।'

পরমেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'অথচ তুমি বলতে যাও, অমনি তোমাকে জ্যাঠামশাই বলবে। হয়তো শেয়াল ডেকেই উঠবে!'

সত্যি, কতখানি ভেবেছেন। হয়তো মোটামুটি ওঁর দিক থেকে ঠিকই ভেবেছেন। যদিও বাধা দিলে শ্রীমানেরা সত্যি শেয়াল ডেকে উঠবে কি না, আমিও জানি নে। তবু পরমেশবাবুর এ অসহায় ক্রোধে দুঃখিত হলেও, একটা হাসির বেগ আমার ভিতরে টলটল করে উঠলো। এমন সাহস হল না যে বলি, 'যাক গে, ছেড়ে দিন। রাস্তা-ঘাটের ব্যাপার।' পরিবর্তে মুখখানি আরো গম্ভীর করে তুললাম।

পরমেশবাবু হঠাৎ শ্রীমানদের দিকে ঘুরে বসলেন। আবার বেশ বুঝতে পারলাম, অঘটন একটা ঘটলো বলে! ওদিকে না তাকিয়ে আমি প্রায় শক্ত হয়ে বসে রইলাম। বোমা ফাটবার অপেক্ষায়।

এদিকে আমার পাশে কাকলী। ওর একটি হাত আমার কোলে। শিশুটিরও তাল লেগেছিল, এবং আমার কোলের ওপরে একেবারে নির্ভুল তালে হাত দিয়ে বাজাচ্ছিল।

কাকলীর পরেই ওর মা বসেছিল। ওর মায়ের পাশে, পুরোপুরি সাহেবী পোশাকে একটি ভদ্রলোকও বসেছিলেন। ধূসর রঙের মেলানো স্যুট, লাল টাই, সাদা শার্ট, স্মার্ট ভদ্রলোকের বয়স নিম্ন চল্লিশ বোধহয়। শিলিগুড়িতে দেখেছিলাম, কাকলীর হাত ধরেছিলেন ভদ্রলোক। কাকলীর মায়ের হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন। মালপত্র আর কুলির খবরদারিও করেছিলেন। বেশ-বাস দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সদ্য সেজে-গুজে বেরিয়েছেন। একবার বলতেও শুনেছিলাম, 'আমি প্রায় আধঘণ্টা আগে স্টেশনে এসেছি। তোমাদের গাড়ি আজ মোর দ্যান রাইট টাইম, কারণ, মাত্র কুড়ি মিনিট লেট করেছে।'

বলে ঠোঁট উল্টে হেসেছিলেন। ওঁর কথা থেকে বোঝা গিয়েছিল, সচরাচর এই এক্সপ্রেস ট্রেন আরও বেশী লেট করে।

এখনো জানি নে, ভদ্রলোকটি কে। কাকলীকে ডাকতে শুনি নি। এবং গোঁফ নেই। ইতিপূর্বেই জানা ছিল, কাকলীর 'বাবার' গোঁফ আছে। এ ভদ্রলোকের মুখ নিরঙ্কুশ কামানো, এবং সদ্য কামানো। অতএব, ধরেই নিয়েছি, ইনি কাকলীর বাবা নন। কাকা মামা হতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করার কোনো প্রশ্ন বা প্রসঙ্গই থাকতে পারে না। অথচ কৌতূহল যে চাপা ছিল মনে মনে তা নিশ্চিত। কাকলীর মায়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের বসার মধ্যে

একটি ঘনিষ্ঠতা ফুটে উঠেছিল। এখনো পরস্পরের স্পর্শের মধ্যেই, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে দু'জনে। প্রায় গায়ে গায়ে। এ নৈকট্যকে নিবিড় বলা যাবে কি না জানিনে, অনিবিড় বলা যাবে না।

কিন্তু কেন বা কৌতূহল। ওই দূরান্তের পাহাড়ের গায়ে দেশান্তরগামী মেঘের মতো, আমাদের এই গাড়ির যাত্রা শেষেই, পরস্পরের কাছ থেকে আবার দূরে চলে যাব। কেউ কাউকে মনে রাখব না। হয়তো কয়েকটি মুহূর্ত, এই কোল ঘেঁষা শিশুটিকে মনে পড়বে। আবার নতুনেরা এসে আবার মন দখল করবে।

নদীর তীরের মতো মন। সেখানে নিরন্তর স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গের খেলা। আসে ও যায়। পলিমাটির স্তরে স্তরে কিছু চাপা পড়ে থাকে। জোয়ারের স্রোতে ধুয়ে যায় কিছু।

কিন্তু অবাক্ হয়েছিলাম, পরমেশবাবুর নজর দেখে। তিনি ঠিক লক্ষ্য করেছিলেন ভদ্রলোককে। কাকলীর মাকে হাত ধরে তুলে দেবার সময় ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে, গলার স্বর নামিয়ে বলেছিলেন, 'ইটি আবার কোথা থেকে উদয় হল হে?'

বলেছিলাম, 'জানি নে।'

পরমেশবাবু চোখ ঘুরিয়ে হেসে, প্রায় রহস্যোদ্ধারের রহস্য করে বলেছিলেন, 'হুঁ, বুঝেছি। তার মানে, গিন্নিটি কলকাতায় থাকেন, কর্তাটি এদিকেই কোথাও, বুঝলে না? তাই তো বলি, নইলে একলা সোমত্ত মেয়েমানুষ একটা বাচ্চার হাত ধরে, পথে বেরিয়েছে কোন্ সাহসে।'

বলেই কিন্তু মুখ গম্ভীর করে বলেছিলে, 'তাহলেও বলব, এ পর্যন্ত কারুর সঙ্গে আসা উচিত ছিল, কী বল হে? মনিহারী ঘাটে কী অবস্থাটা হয়েছিল, দেখেছ তো?'

তা দেখেছিলাম। এবং এখন দেখছি, কামরায় এই গানের দিকেও কাকলীর মা এবং ভদ্রলোকটির তেমন নজর নেই। দু'জনেই নিম্নস্বরে কথা বলে চলেছে, মাঝে মাঝে নীরব হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকছে। কাকলীর সম্পর্কে দুজনেই বোধহয় নিশ্চিন্ত। সেটা আমার জিম্মার ভরসাতেই।

যাই হোক। এদিকে গা শক্ত করে, দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছি মুখ ফিরিয়ে। শ্রীমানদের গান, পরমেশবাবুর প্রতিক্রিয়া, এই দু'য়ের সংঘর্ষ-জনিত অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষা। কিন্তু পরমেশবাবুর কোনো সাড়া শব্দ নেই কেন?

রাগের চোটে একেবারে কথা বন্ধ হয়ে গেল নাকি? আস্তে আস্তে, সভয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। আশ্চর্য! পরমেশবাবু সেই একভাবেই প্রায়, ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু নির্বাক্। ঠোঁট দুটি যদিও আবদ্ধ, ভিতরে জিহ্বা যে দাঁতের ওপর আঘাত করে চলেছে তাতে নিঃসন্দেহ। কারণ গোটা মুখটাই প্রায় নড়ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, পরমেশবাবুর চোখে আমি একটা অনুসন্ধিৎসা দেখতে পেলাম।

জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, কিসের অনুসন্ধিৎসা? দুর্বিনীতদের প্রতি আক্রমণের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন কী? অর্থাৎ কীভাবে সহসা হুংকার দিয়ে উঠবেন?

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালেন পরমেশবাবু। বললেন, 'গানটা তো ভালোই মনে হচ্ছে, না কী বল হে?'

প্রায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। ঠিক শুনেছি তো? কথাগুলো ঠিক পরমেশবাবুর কণ্ঠ-নিঃসৃত তো? আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, গানটা খুব ভালো।'

পরমেশবাবু আমার কথা শুনলেন বলে মনে হল না। আপন মনেই বলে চললেন, 'কী বলছে?…চল্‌রে চল্‌রে চল্, ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল· হুঁ, মার্চিং সং-এর মতো, না? আমি ভাবলাম, ওই কটিকে দেখে, মানে ওই যে হে মেয়ে কটি, হাঁসের মতো জানালা দিয়ে মুখ বার করে রয়েছে, তাদের দেখে বুঝি কিছু গাইছে। আজকালকার হালচাল বোঝা দায়। ওরা তো গাইছে অন্য গান, তোরা অমন জানালা দিয়ে মুখ বার করে, চুল উড়িয়ে, আঁচল উড়িয়ে কী করছিস্, অ্যাঁ? আমি তো দেখছি এখন ছেলেগুলোর কোনো দোষ নেই, না কী বল হে? গানটা বেশ জমাটি তালের। আমি ভাবলাম কী, আজকাল সব ওই হয়েছে না, যা তা কথার সব গান, সে রকম কিছু গাইছে বুঝি।'

আমি আবার তাড়াতাড়ি বললাম, 'আজ্ঞে না, গানটা সত্যি মার্চিং সং। মানে নতুন দেশ দেখছে, আনন্দে—।'

পরমেশবাবু বললেন, 'সে তো খুব ভালো কথা। কী বলছে, "আমরা টুটাবো তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।" গানটি কার? ওই কী বলে, এখন যাঁর গান খুব গাওয়া হয়, ওই তোমার গিয়ে, আমাদের রবি ঠাকুরের?'

বললাম, 'আজ্ঞে না। এটা কাজী নজরুল ইস্‌লামের।'

পরমেশবাবু ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'অ! শুনিচি বটে, ওই সেই এখন যাঁর মাথাটি খারাপ হয়ে গেছে, না? শুনিচি, উনি হিঁদুর মেয়ে বিয়ে করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

মনে মনে একটু যে সন্ত্রস্ত না হলাম, এমন নয়। কী জানি, এ ক্ষেত্রেও পরমেশবাবু আবার বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের দুরবস্থা ও অধঃপতনের কথা টেনে আনবেন কি না। ঠোঁট দুটি ছুঁচলো করে, ঘাড় নেড়ে একটু ভাবলেন। বললেন, 'তা কবিদের কথা অবিশ্যি আলাদা। ছেলেমেয়েরা যদি মেমসাহেবই বিয়ে করতে পারে, তবে আর দেশের মুসলমানরা কী ক্ষতি করেছে, না কী বল হে। তবে বাপু যাই বলো, আমাদের হাড়ে এখনো নাড়া খায়। তা সে যাক গে, পাগল হল কেন? কবিতা লিখে লিখে?'

বললাম, 'না, শুনেছি এক ধরণের মানসিক অসুখে ওরকম হয়ে গেছেন।'

'অ। তা গানটি বেশ ভালোই বলতে হবে। বেশ একটা...।'

কথা শেষ না করে, পরমেশবাবু মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। দিগন্তজোড়া পাহাড়, দুরান্তের নীল আকাশের সঙ্গে মেশামিশি করছে। কখন ছাড়িয়ে গেছি চুনাভাটী, তিনধরিয়া, গয়াবাড়ি। প্রকৃতির চেহারা বদলাতে শুরু করেছে কখন থেকে। মাঝে মাঝে নাম না জানা গাছের গায়ে অর্কিডের জড়িয়ে ধরা লতা ও ফুল। কোথাও পাইন নিবিড়। কোথাও বিচিত্রবর্ণ পাথর শুধু।

সেই পাথরের গায়ে কী বিচিত্র ঘাসের স্তর, ছোট ছোট অজস্র ফুলের চিকচিকে হাসি। বর্ণাঢ্য এই সব ফুলের কী নাম কে জানে। না-ই বা জানলাম। দু' চোখ ভরে দেখছি, আর পুরনো বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কারণ. দেখছি পাথরে ফুল গজায়। দেখছি, লাল গোলাপের ঝাড় দুলছে, কাঁপছে বাতাসে পাথরের বুকে। পাথরের ফুল।

পরমেশবাবু বললেন, 'বেশ, না? মানুষ কোথায় না যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপর রেল উঠিয়ে ছেড়েছে, ভাবো একবার, অঁা?'

বলছেন, আর মনে হচ্ছে, (হায়, কী অবিশ্বাস্য।) পরমেশবাবুর তর্জনীটি তাঁর নিজের হাঁটুর ওপরেই গানের তালে পড়ছে। সূর্যচ্ছটায় দীপ্ত দূরের কৃষ্ণনীল চূড়ার দিকে তাকিয়ে ভাবি, একি হিমালয়েরই কারসাজি। নিরুৎসবের বিরক্ত প্রাণে উৎসবের চঞ্চলতা কে জাগালে। আমি যে দেখছি, পরমেশবাবুর প্রাণেও উৎসবের দোলা লেগে গেছে। এবং শেষটায় আমার নিঃশ্বাসই বন্ধ হয়ে এল প্রায়। উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম, পরমেশবাবুর গলায় কী একটা সুর যেন গুন্‌গুন্ করছে। কী সুর? চেনা, অথচ মনে করতে পারছি নে।

এক মুহূর্তের রুদ্ধশ্বাস সংকট। তারপরেই মনে পড়ে গেল; হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়...।

প্রাণ খুলে একবার হাসবার জন্যে ভিতরটা ভীষণ ছটফট করতে লাগলো। পারলাম না হাসতে। সারা কামরার মধ্যে, যে ছোটখাটো উৎসবের ফোয়ারা আমার পাশে বইছে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। শুকিয়ে যাবে। আমি কাকলীর হাত নিয়ে জোরে জোরে তাল দিতে লাগলাম। হাসির উদ্গত উচ্ছ্বাসকে চাপতে লাগলাম।

কিন্তু পরমুহূর্তেই পরমেশবাবু আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। চুপি চুপি গলায় বললেন, 'তবে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি বাপু, ওই যে মেয়ে কটি বুঝলে কি না, খুব সুবিধের নয় কিন্তু, যাই বলো। একটু মানে, বেহায়া টাইপের, তাই না?'

আমার আর তখন কোনো বিষয়ে ঘাড় দুলিয়ে 'হ্যাঁ' বলতে আপত্তি ছিল না। কারণ, আর উনি যাই বলুন, হিমালয়ের এই অঙ্গনে এসে, আর উনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। ওঁর ভিতরের প্রাণের প্রাণটির রূপ আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। আমি রাগী শিশুটিকে চিনতে পেরেছিলাম। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পরমেশবাবু বললেন, 'তা বাপু মেয়ে কটিরই বা দোষ দেব কি? বাপ-মা কি চোখে ঠুলি এঁটে আছে, অ্যাঁ? দেখতে পাচ্ছ না, মেয়েরা কী করছে? ছেলেমানুষ, বয়সকাল, ওদের তো ছেলে-ছোকরাদের দেখলে ওরকম একটু-আধটু হবেই, না কী বল হে?'

এবার একটু সন্তর্পণেই ঘাড় নাড়লাম। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমরা দুটিতে কী করছ, অ্যাঁ? দুটিতে পাশাপাশি, গায়ে গা দিয়ে দিব্যি নিজেদের তালেই আছো। কেন, এখনো কি ছেলেমানুষ আছো? বিয়ের আগে সেই আইবুড়ো ভাত খাবার গন্ধ যায় নি এখনো, নাকি, বিয়ে বাসরের আমেজ লেগে গেছে? ছেলেমেয়েদের সামনে ওরকম পাশাপাশি বসে গল্প করার দিন আছে আর? তোমাকে আমি বলছি, লোকটা নির্ঘাত স্ত্রৈণ।'

শেষ দিকে গলার স্বরটা এত বেশী চড়ে উঠলো, শঙ্কিত হয়ে আশেপাশে তাকালাম। অন্য কেউ শুনতে পাবার ভয় যত বেশী নয়, তার থেকে বেশী, কাকলীর মায়ের শুনতে পাওয়া। বলা যায় না, হয়তো ধরে নেবে, তাদের নিয়েই কথা হচ্ছে, আসলে যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে তারা বেশ বহাল তবিয়তেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এবং স্ত্রৈণের চরিত্র লক্ষণ সঠিক কী, তা স্পষ্ট না জানলেও, পরমেশবাবুর কথা শুনে, একবার প্রৌঢ় দম্পতির দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। দেখলাম, পুরোপুরি মিথ্যে বলেন নি। কর্তা-গিন্নী পাশাপাশি বেশ

নিবিড়ভাবে বসে, হিমালয়ের সৌন্দর্য অবলোকন করছেন। কথা বলছেন গিন্নি, কর্তা শুধু ঘাড় নেড়ে চলেছেন।

অভিজ্ঞদের মুখে শুনেছি, ওইটিই নাকি সুখের লক্ষণ। গিন্নি যা বললেন, তাইতেই ঘাড় নাড়া, আর সায় দেওয়া। প্রতি পদে পদে গিন্নিকে অনুসরণ কর। তাই কি অনেক বাড়ির দেওয়ালেই এখনো বিচিত্র এমব্রয়ডারির, বিচিত্রতর অক্ষরে সাজানো সেই নোটিশটা ঝুলতে দেখা যায়, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' তারপর কী? অতএব, সাধু সাবধান?

সেটা যাই হোক, এ ক্ষেত্রে কিন্তু প্রৌঢ় কর্তা-গিন্নিকে আমার ভালোই লাগলো। অনুমান করি, কর্তা হয়তো একটু আত্মভোলা প্রকৃতির। গিন্নিকে তাই সব দিকে মানিয়ে চলতে হয়। আপাতত সংসারের প্রত্যহের প্রতিটি কর্তব্যের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ার বাইরে, দুজনের এই মুক্তির নিবিড়তাটুকু ভালো লাগছে। মধ্যবিত্তের সংসারে, হয়তো এ মুক্তিটুকু অনেক মূল্য দিয়ে কিনতে হয়েছে। এখনো কি তরুণী মেয়েদের পাহারা দিয়ে রাখতে হবে? চোখে চোখে রাখতে হবে? এক জায়গায়, সেটা তো প্রতিদিনই রাখতে হয়। আর পাহারা দেওয়া, চোখে চোখে রাখাই কি সব? নিজেদের ভালো মন্দ বোঝার বয়স কি ওদের একটুও হয় নি?

বসে থাকুন, নিবিড় হয়ে বসে থাকুন কর্তা-গিন্নি, মুগ্ধ হয়ে দেখুন! আজ সকল দায়িত্ব থাক এই মহালয় হিমালয়ের হাতে।

ওদিকে গান চলেছে, কিন্তু তার ভাষা এবং সুর বদলে গিয়েছে কখন। মাউথ অর্গানের সুরে আর একক গলায় তখন গান চলেছে,

সুনীলসাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।

এদিকে পাগলাঝোরা পেরিয়ে মহানদী ছাড়িয়ে, ওপরে উঠেছি। পাগলা-ঝোরার পাগলামি নেই, গর্জনও নেই। আর মহানদী, নিশ্চয় মহানন্দা। দূরে যে কুঁজের মতো মহলদীরাম পাহাড়ের চূড়ো দেখা যায়, মহানদী কি তারই কোল ভাসিয়ে আসছে? মহানদীকে লেপচারা বলে, মহনদী। লেপচা ভাষায় যার অর্থ বাঁকা নদী। এবং ওপর থেকে তাই দেখছি। মহানন্দা নিচে নেমে, সহসা দক্ষিণে বাঁক নিয়ে খোলস ছাড়ানো চকচকে বিশাল অজগরের মতো ছুটে চলেছে। গাড়ি যখনই পশ্চিমে বাঁক নিয়ে ওপরে উঠছে, তখনই

দূর সমতলের ছবি ভেসে উঠছে। মাঝে মাঝে বালাসন নদীকেও দেখতে পাচ্ছি। বিস্তৃত স্বর্ণাভ বালু আসন থেকে বালাসন। আর একদিকে, বিসর্পিত বিস্তৃত রোদ চলকানো আয়নার মতো তিস্তা ঝলকে উঠছে।

কিন্তু পরমেশবাবু চুপ করেন নি। প্রৌঢ় কর্তাকে স্ত্রৈণ সিদ্ধান্তের পরেই, পরবর্তী বক্তব্য হল, 'আরে বাপু, এখন না হয় স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে। পরিবারকে নিয়ে আমরাও তো এককালে বেড়িয়েছি, না কী বল হে।'

কিমাশ্চর্যম্। আসলে এসব কিছু নয়, বৃদ্ধ বিপত্নীক পরমেশবাবুর নিজের দাম্পত্য জীবনের ছবি ওঁর স্মৃতির দীঘি বুঝি তোলপাড় করে তুলেছে? তাড়াতাড়ি বললাম, 'তা তো বটেই।'

পরমেশবাবু বলে চললেন, 'দার্জিলিং-এ আসি নি বটে। নিছক বেড়ানো আবার আমাদের ভালো লাগত না। হরিদ্বারে গেছি, পুরীতে গেছি, কাশী বৃন্দাবন মথুরা, সব দেখে এসেছি। বেড়ানোকে বেড়ানোও হয়েছে, ওদিকে আবার তীর্থদর্শনও হয়েছে। আমরাও অনেক বেড়িয়েছি।'

বাইরের নীল কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিলেন পরমেশবাবু। হঠাৎ যেন একটি নিঃশ্বাস পড়লো ওঁর। চুপ করে গেলেন। এও হিমালয়েরই কারুমিতি কি না জানি নে। আমি দেখলাম, পরমেশবাবুর শূন্য দৃষ্টি দূর পাহাড়ে নিবদ্ধ। কিন্তু সেই শূন্য, রাত্রি জাগা কোটরাগত চোখে, যেন অনেক ছবির খেলা। পুরনো দিনের, অনেক ভ্রমণের ছবি, অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা।

সহসা এই বিপত্নীক একলা যাত্রীর সম্পর্কে আমার কৌতূহল জেগে উঠলো। কেন, এই বয়সে একলা কেন পাহাড়ে চলেছেন? এখন তো তাঁর এমনি করে একলা পথ চলবার কথা নয়। যিনি একদা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে, কাশী বৃন্দাবন মথুরা হরিদ্বার বেড়িয়েছেন, আজ তো তাঁর সঙ্গে ছেলে, বৌমা, নাতি-নাতনীদের থাকবার কথা। বৃদ্ধ বয়সে একলা ভ্রমণে কেন?

কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই, পরমেশবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন 'হুঁ, টের পাচ্ছ? একটু আগের থেকেই যেন একটু একটু মালুম দিচ্ছিল। এইবার বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

অবাক্ হয়ে বললাম, 'কী বলুন তো?'

স্বভাবতই আমার নজর তিন শ্রীমান ও তিন শ্রীমতীদের দিকে যাবার উপক্রম করলো। কারণ, এক মুহূর্ত আগেই একটি চকিত পলকের জন্য যেন, কামরার ওপাশের, জানালার বাইরে, চুড়ি-পরা একটি হাতের সঙ্গে আর একটি

চওড়া ব্যাণ্ড-এর রিস্টওয়াচ, পরা যুবক হাতের, ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা খেলতে দেখছিলাম।

কিন্তু পরমেশবাবু সামনে রাখা হাত-ব্যাগটি খুলতে খুলতে বললেন, 'শীত! শীত লাগছে হে, ঠাণ্ডা শুরু হয়ে গেছে, টের পাচ্ছ না? তাই তো ভাবছি অনেকক্ষণ থেকে, ঠাণ্ডা লাগছে না কেন। আঃ, এইবার বোঝা যাচ্ছে। ভাবো এখন কলকাতার কথা।'

বলতে বলতেই ব্যাগ থেকে টেনে বার করলেন একটি চাদর। সত্যি, ঠাণ্ডা লাগতে আরম্ভ করেছে। গাড়ির হুইসেল শোনা গেল। পশ্চিমে বাঁক নিল। রাস্তার ধারে ধারে, বাড়ির জানালা দরজার পাহাড়ী গৃহস্থদের রক্তাভ হলুদ রং মুখ দেখা দিল। তারপরেই সামনে চোখে পড়লো, কার্শিয়ং, উচ্চতা ৪৮৬৪ ফুট সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে, লেখা রয়েছে স্টেশনের উঁচু গায়ে। গাড়ি স্টেশনের শেডের তলায় ঢুকলো।

একটু নেমে দেখবার জন্যে উঠতেই, কাকলী বলে উঠলো, 'তুমি তোলে দাত্তো?'

ফিরে হেসে বললাম, 'না, যাব না, আমি আসছি।'

কাকলী চোখ বড় করে বললো, 'তালাতালি এতো, গালি ছেলে দেবে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তাড়াতাড়িই আসব।'

স্বভাবতই কাকলীর মা-ও হেসে তাকালো। বললো, 'আপনাকে দেখছি একেবারে পেয়ে বসেছে। খুব বিরক্ত করছে তো?'

বললাম, 'বিরক্ত করবে কেন? ওতো বেশ শান্ত আর লক্ষ্মী মেয়ে।'

প্রশংসা শুনে এক ফোঁটা কাকলী যেভাবে আড়চোখে ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে মুখ গম্ভীর করলো, তাতে হাসি চেপে রাখা দায় হল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে শুনতে পেলাম, কাকলীর মা তার পুরুষ সঙ্গীকে (আপাতত পুরুষ সঙ্গী ছাড়া অন্য কোনো কথা মনে এল না) বলছে, 'সেই কলকাতা থেকেই খুকুর দেখছি ভদ্রলোকের দিকে ভীষণ ঝোঁক পড়েছে।'

পুরুষ সঙ্গীটির হাসির শব্দ শোনা গেল। কিছু বললেন কিনা শুনতে পেলাম না। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, কাকলীর মায়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের যত ভাব, ততো নয় কাকলীর সঙ্গে। শিলিগুড়ি থেকে সারা পথে মনে করতে পারিনে, কাকলীর সঙ্গে ভদ্রলোকটির একটিও কথা হয়েছে কি না।

দু'জনে প্রায় সর্বক্ষণই কথা বলেছে। কিন্তু সেই কথার মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখি নি। স্পর্শের নিবিড়তা দেখেছি, মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন লজ্জিত হয়ে, আবার একটু সরে বসতেও দেখেছি। হয়তো গম্ভীর গুরুতর বিষয়ের কোনো আলোচনা চলছিল। সহসা নিঃশ্বাস এবং বিষণ্ন চিন্তিত মুখে দু'জনকেই চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। বিশ্বসংসারের প্রতি কোণে, রন্ধ্রে, প্রতি মুহূর্তে কত জটিলতা জট পাকাচ্ছে। সব খবর কি আমরা পাই? সব কি আমরা জানতে পারি?

এদিকে গাড়ি থেকে নামবার জন্যে সকলের একটা হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়বার পর, পরমেশবাবু চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে তুমি কি চায়ের সন্ধানে চললে নাকি?'

একেবারে মিথ্যে অনুমান করেন নি। অবচেতনে বোধহয় পিপাসাটা অনুভব করছিলাম। ওঁর কথায় সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বললাম, 'আপনার চাই নকি?'

'তা, ঠাণ্ডার আমেজটি যেমন লেগেছে, পেলে মন্দ হত না।'

অতএব স্টেশনের বাইরে আর যাওয়া হল না। চায়ের সন্ধানেই সময় কেটে গেল। চা জুটলো, কিন্তু সহজে নয়। কার্সিয়ং-এর ক্যাটারিং-এর পক্ষে ভিড় সামলানোই দায় হল। ঠাণ্ডার আমেজ পেয়ে, সকলেই চা-তৃষ্ণার্ত। ক্যাটারিং-এর ডাইনিং হলে ঢুকে দেখি, বাঃ! তিন শ্রীমান এক টেবিলে। পাশের টেবিলেই তিন শ্রীমতী। সামনা-সামনি, মুখোমুখি। ভিড়ের মধ্যে বয়কে চায়ের অর্ডার দিয়ে, এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। বসবার জায়গা তো ছিল না। চা পাওয়ার আশা আছে কি না, তাও জানি নে।

এক শ্রীমানকে বলতে শুনলাম, 'অনুমতি করেন তো, আমরাই দিয়ে আসি।'

শ্রীমতীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হেসে উঠলো। একজন বললে, 'থাক, আর অতটা উপকার করতে হবে না।'

ওঃ! কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে! পেছিয়ে নেই কেউ। আর চোখে চোখে হেসে হেসে নয় কেবল? জিভের আড়ষ্ট নীরবতা ভেঙে, বাণী বিনিময়ে পৌঁছেছে। সেই শুভলগ্ন কখন এসেছিল, জানি নে। সম্ভবত গতকাল রাত্রেই। অবিশ্যি, গতকাল দুপুরেই, এক শ্রীমান ভুল করে, আর এক শ্রীমতীর স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে বাথরুমের দিকে ছুটেছিল যখন, তখনই বাণী বিনিময়ের সূচনা ঘটেছিল। ভুল হওয়াটা কিছু বিচিত্র ছিল না। সামনা-সামনি, মুখোমুখি, নিচে পায়ের কাছে ছয় জোড়া স্লিপার। ইচ্ছাকৃত ভুল না করেই

শ্রীমান যখন শ্রীমতীরটা পায়ে গলিয়ে পা বাড়িয়েছিল, শ্রীমতী প্রায় অমূল্য সম্পদ হারাবার মতো আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'ওটা আমার, আমার স্লিপার।'

শ্রীমান তো লজ্জিত, বিস্মিত এবং দুঃখিত। তাড়াতাড়ি নিজেরটা খুঁজে নিয়ে, শ্রীমতীরটা ছেড়ে, বন্ধুদের অস্ফুট ঠাট্টা ও কন্যাদের মিটিমিটি হাসি, এবং কামরার সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে বাথরুমে চলে গিয়েছিল। কেবল বলেছিল, 'সরি। মানে, বুঝতে পারি নি।'

পরমেশবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'পারবেও না। পারবার অবস্থা তো তোমাদের আর নেই বাবা। এখন স্যাণ্ডেল বদল করছ, এর পরে মন বদল, প্রাণ বদল, হাত বদল বাকী।'

আমি আর কথা বলতে সাহস করি নি। মনে মনে প্রাণ ভরে হেসেছিলাম।

এক শ্রীমান বললো, 'আমরা দিয়ে এলে ক্ষতি কি ?'

এক শ্রীমতী উচ্চারণ করলো, 'ক্ষতি ?'

বলেই তিনজনে আবার হেসে উঠলো। আর এক শ্রীমতী সম্ভবত সর্ব-কনিষ্ঠা, বললো, 'আপনি একটি গবেট।'

যাকে বলা হল, সে প্রায় গবেটের মতোই তাকালো মেয়েটির দিকে। বললো, 'কেন ?'

মেয়েটি অবলীলাক্রমে ভেংচে দিয়ে বললো, 'কেন ? তা হলে আর আমরা নেমে এসেছি কেন ?'

উভয় পক্ষেই একটা হাসির রোল পড়ে গেল। কিন্তু কোথায় কী দিয়ে আসতে হবে, সেটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না। ধরতে পারলাম তখন, যখন দেখলাম, বয় ছ' কাপ চা এনে মেয়েদের সামনে নামিয়ে দিল। তিন মেয়ে তিন কাপ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একজন (বোধহয় সকলের বড়) বললো ছেলেদের দিকে ফিরে, 'আমাদের চা-টা একটু পাহারা দিন, এগুলো আমরা পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

তিন শ্রীমানই এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই।'

একটি মেয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'দেখবেন, চুমুক দেবেন না যেন।'

শ্রীমানেরা সমস্বরে বলে উঠলো, 'না না।'

ওদের বলার ধরনে, মেয়েরা আবার হেসে উঠলো। হাসিটা আমার ভিতরেও ঘুলিয়ে উঠলো। তিনটি বেচারী। বেশ দেখতে পাচ্ছি, তিনটি তাজা বুদ্ধিদীপ্ত মগজ একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মেয়েরা অথচ সেই পরিমাণেই সহজ এবং স্বাভাবিক রয়েছে। বরং একটু বেশী বুদ্ধিরই পরিচয় দিচ্ছে।

হায় পুরুষের অহংকার। হায় শৌর্য বীর্য বুদ্ধির গর্ব। একটা সময়ে তার মতো বোকা এবং অসহায় আর কেউ নয়। যখন সে প্রেমে পড়ে, প্রেমে পড়ে মুগ্ধ হয়। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি ব্যবহারে তার ভারসাম্য যায় হারিয়ে। চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে তখন সে একেবারে অন্ধ।

আর উল্টোটাই কি সত্যি? প্রেম কি মেয়েদের চতুরা করে? এ ক্ষেত্রে তো তাই মনে হচ্ছে। তবে একটু বেশী সতর্কতাই বোধহয় ওদের 'অতি চালাকির গলায় দড়ি' পরিয়ে দেয়।

এদিকে নাটক জমেছে ভালো। চশমা চোখে ছেলেটি রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেছে। সে বলে উঠলো, 'আচ্ছা, আমাকে ও গবেট বললো কেন?'

বাকি দুই বন্ধু হেসে উঠলো। একজন বললো, 'কারণ, এটা অ্যাপলায়েড ফিজিকস্ নয়।'

আর একজন বললো, 'আর তুই যে রকম করছিলি, তাতে কিছু অন্যায় বলে নি। দেখছিস, বাবা-মাকে চা দেবার নাম করে ওরা নেমে আসার চান্স নিল, আর তুই সেটাই মাটি করতে চাইছিলি।'

শ্রীমান অ্যাপলায়েড ফিজিকস্-এর অধ্যায়নরত বোঝা গেল। কিন্তু চশমার ভিতরে দুটি দুঃখিত ক্ষুব্ধ চোখ দেখে বোঝা গেল, মেয়েটি ভেংচে 'গবেট' বলার থিওরী কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারছে না। দুঃখিত গম্ভীর গলায় বললো, 'আমি আর ওর সঙ্গে কথা বলব না।'

এক বন্ধু বলে উঠলো, 'সে যা বলার, কাল রাতেই তো বলে নিয়েছিস। তুই মনে করেছিলি, আমরাও ঘুমিয়ে পড়েছি, আর দিব্যি আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলি। সেকেণ্ড ইয়ারের সায়েন্সের ছাত্রী, তুই তো কলকাতায় ফিরে গিয়ে, ওকে ওদের বাড়িতে কোচ করতে যাবি বলেছিস।'

অ্যাপলায়েড ফিজিকস্ কাঁচকলা দেখিয়ে বললো, 'কোচ করবে না হাতি করবে।'

কথা শেষ হবার আগেই শ্রীমতীদের পুনঃপ্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন। শ্রীমতীরা চা নিয়ে নিজেদের জায়গায় বসে গেল। কিন্তু চশমা চোখে শ্রীমান একেবারে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলো। দুই বন্ধু হাসি সামলাতে পারলো না। অ্যাপলায়েড ফিজিকস্ তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল চেপে বন্ধুদের ইশারা করলো। বেচারা বেকায়দায় পড়ে গেছে। বন্ধুদের কাছে চোটপাট করছিল। মেয়েরা আসতেই, মুখের চেহারা বদলে গেছে।

শ্রীমতীদের একজন আর এক শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

এত হাসি কিসের ভাই?'

এক শ্রীমান ফাঁস করে দিল, 'আমাদের বরুণবাবু খুব দুঃখ পেয়েছেন।'

'কেন?'

'ওই যে উনি, আপনার ছোট বোন, ওকে গবেট বলেছে, তাই।'

বলা মাত্র বরুণ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'না না, মোটেই নয়।'

কিন্তু ততক্ষণে হাসির প্লাবন ভেঙে পড়েছে। চা চলকে পড়ে, টেবিল ক্লথ থেকে শাড়ি, কিছুই বাদ গেল না। ইতিমধ্যে শ্রীমানদের চা-ও এসে গেল। কিন্তু বরুণের বোধহয় সে হাসির পীড়ন আর সহ্য হচ্ছিল না। বিশেষ করে, যখন চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখলো, যে তাকে গবেট বলেছে, তার হাসিটাই সব থেকে উচ্চকিত, দেহলতা প্রায় লুটানো টেবিলের ওপর। বরুণ গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো।

বন্ধুরা বলে উঠলো, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

বরুণ বললো, 'গাড়িতে।'

আবার একটা হাসির রোল ফেটে পড়বার আগেই, বরুণের অভিযুক্ত মেয়েটিই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আরে শুনুন শুনুন, সত্যি রাগ করেছেন নাকি?'

বরুণের নত মুখ। গম্ভীর গলায় বললো, 'না।'

'তবে চলে যাচ্ছেন যে?'

'আমার ভালো লাগছে না।'

বলে বরুণ পা বাড়াতেই, মেয়েটি বলে উঠলো, 'আপনি সত্যি গবেট।'

বরুণ চকিতে একবার ফিরে তাকিয়ে, ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। আবার একটা হাসির রোল পড়লো। কিন্তু কিমাশ্চর্যম্। গবেট বলেও শ্রীমতী এবার হাসতে পারলো না। তার মুখ গম্ভীর।

সর্বনাশ। ব্যাপার তা হলে গুরুতরই। পথের দেখায়, মান অভিমানের পালাও যখন চলেছে, এ কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কে জানে। ইতিমধ্যে নেপালী বয় ট্রে-সুদ্ধ চায়ের পট নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপকো চা কাহাঁ দেগা?'

বললাম, 'গাড়িতে চল।'

ডাইনিং হলের নাটক আর দেখা হল না। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি ভিড়ের মধ্যে এই নাটকের যে আর কোনো সাক্ষী নেই, তাও জানি। হয়তো এ নাটকের যবনিকা মাঝপথেই কোথাও থেমে যাবে। কিংবা হিমালয় থেকে

নেমে কলকাতায় গিয়েও, এর অনেক অঙ্ক অভিনীত হবে। এর সমাপ্তিতে ট্রাজেডি কিংবা কমেডি আছে, সে-কথা জানে ওদের নিয়তি নাট্যকার। আমার মনটা কিন্তু, অসীম আকাশে ডিগবাজী খাওয়া পাখির মতো খুশিতে ভরে উঠলো।

জানি, নীতিধারকেরা এতে কলুষের গন্ধ পাবেন। আমার কাছে এটা কিন্তু দ্বন্দ্বহীন স্বাভাবিক ছন্দ বেগে বেজে উঠলো। মনে মনে বরং প্রার্থনা করি, অনেক অন্ধকারের কলুষতা থেকে, এমনি আলোয় আলোয়, সকল স্ব-ভাব যুক্ত হোক, মুক্ত হোক, পবিত্র হোক।

পরমেশবাবু হাত বাড়িয়ে ট্রে ধরলেন। নিজের হাতেই চা ঢেলে দুধ মিশিয়ে নিলেন।

বললাম, 'চিনি নিলেন না?'

'নাঃ, ওটা অনেকদিন ছাড়তে হয়েছে।'

বলে বৃদ্ধ আমার চা-ও ঢেলে চিনি মিশিয়ে দিলেন। বললেন, 'এখন চিনি খাবে তোমরা। নুন খাবে তোমরা। ওসব পাট চুকিয়ে দিয়েছি।'

কিন্তু বরুণকে ট্রেনের কামরায় দেখতে পেলাম না। এবং কাকলীর মায়ের সঙ্গীও দেখছি নেই। হঠাৎ কাকলীর দিকে নজর পড়তেই থমকে গেলাম। দেখলাম, কাকলী আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। চুমুক দেবার আগেই কাপ নামিয়ে বললাম, 'তুমি চা খাবে?'

কাকলী তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললো, 'আমি খাই না।'

কাকলীর মা বললো, 'একটু গরম জলের চেষ্টা দেখছি। ওকে একটু গ্ল্যাক্সো দেব।'

তবু আমার মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। সকলেই প্রায় কিছু না কিছু পান-ভোজন করছে। কাকলী চুপচাপ। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই কাকলী ঝোল টেনে উৎকণ্ঠার শব্দ করলো। বললো, 'তালাতালি খেও না, মুখ পুলে দাবে।'

'তাই বুঝি?'

কাকলী ঠোঁট টিপে, চোখ বুজে, ঘাড় নেড়ে বললো, 'হুঁ!'

কোনো রকমে চা শেষ করে, ক্যাটারিং-এর কাউণ্টারে গেলাম। চকোলেট পাওয়া যায় না। শুনলাম, স্টেশনের বাইরের দোকানে পাওয়া যাবে। তাই

গেলাম। শহরই বটে। রেল লাইন আর মোটর রাস্তার দু'পাশে দোকান। কিন্তু চকোলেট খুঁজতে খুঁজতে যখন সন্ধান পেলাম, তখন স্টেশন চোখের আড়ালে পড়ে গেছে। ওদিকে ঘণ্টা বেজে উঠলো, টিং টিং টিং। এবং পরমুহূর্তেই খুদে এঞ্জিনে পাহাড় কাঁপানো হুইসল। কী বিপদ! কাকলীকে চকোলেট খাওয়াতে গিয়ে শেষটায় কার্সিয়ংএ পড়ে থাকবো? আর ধন্যি দোকানদার। বৈয়াম থেকে চকোলেটের প্যাকেট বের করতে মাড়োয়াড়ির যুগ কেটে যায়।

কোনোরকমে পয়সা মিটিয়ে চকোলেট নিয়ে যখন ছুট দিয়েছি, এঞ্জিনের শব্দ তখন পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলেছে, স্টেশনে ঢোকবার আগেই গাড়ি চলমান। আর, কী মুসকিল! গাড়ির দরজা পড়েছে বাঁ দিকে। প্ল্যাটফরমের ওপরে উঠতেই পরমেশবাবুর চীৎকার শুনলাম, 'এই যে ওহে এই যে।'

রক্ষে এই, এঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে গতির মিল নেই। গর্জন যত, বর্ষণ তত নয়। গাড়ী বেশ আস্তেই চলেছে। উঠতে না উঠতেই পরমেশবাবু খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠলেন, 'তুমি তো আচ্ছা বেআক্কেলে। এখন গেছ শহর বেড়াতে? গাড়ি কি তোমার জন্যে সারাদিন এখানেই থাকবে নাকি?'

বলার কিছু ছিল না। একটু বিব্রত হেসে, বসে পড়লাম। দেখলাম, কাকলীর গায়ে উঠেছে সোয়েটার। গলায় বাঁধা তোয়ালে, হাতে গ্ল্যাকসোর গেলাস। বললো, 'তুমি হারিয়ে গেতলে?'

কাকলীর কাছে তো এটা হারিয়ে যাওয়াই। বললাম, 'হ্যাঁ।'

অমনি চোখ দুটি বড় হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'কী কলে এলে?'

হারিয়ে যাওয়াই তো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আর সেই হারিয়ে যাওয়ার জগৎটা যে কী ভীষণ। মা নেই, বাবা নেই, যত রাজ্যের রাক্ষসে খোক্কসে গিজগিজ করছে। সেখান থেকে কী করে ফিরে আসে লোক। কিন্তু আমার মাথায় কোনো নাটকীয় কাহিনীই এল না। বললাম, 'দৌড়ে পালিয়ে এলাম।'

কাকলী ওর ছোট ছোট ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসলো। বুঝলাম, দৌড়ে পালিয়ে আসতেই সে খুশি হয়েছে, কৌতূহল নিবৃত্ত হয়েছে। তবু কাকলী সাবধান না করে পারলো না, 'আর দেও না, আমি কাঁদবো।'

বিস্ময়ে আনন্দে, একটু বা ব্যথায় যেন চমকেই উঠলাম। হয়তো এমনি করে বাপ-মাকে বলাই ওর অভ্যাস। কিন্তু আমার মনটাকেও একেবারে

ভিজিয়ে দিল। ওর মাথায় একটা হাত তুলে দিলাম। ওর মা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। পাশে তার সঙ্গী ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, 'খুকু দেখছি হৃদয় সমর্পণ করে বসে আছে।'

খুকুর মায়ের নিচু গলা শোনা গেল, 'এখনো জগৎটা চিনতে শেখে নি তো।' বলে চকিতে একবার আমার দিকে তাকালো। হাসলো, কিন্তু ঈষৎ লজ্জা গোপন করতে পারলো না। ভদ্রলোকও হাসলেন, কিন্তু গম্ভীর হয়ে উঠলেন পরমুহূর্তেই। কাকলীর মা ভদ্রলোকের দিকেও একবার দেখে নিল। মনে হল যেন, এই দু'টিই ছোটোখাটো হাসির কথায়, অন্য কোনোখানে কিছু ঘটে গেল। কাকলীর মা তাড়াতাড়ি খালি গেলাসটা নিয়ে, গলা থেকে তোয়ালে খুলে কাকলীর মুখ-হাত মুছিয়ে দিল। আমি আস্তে আস্তে পকেট থেকে চকোলেট বের করলাম। করতেই কাকলীর চোখ পড়লো, এবং ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হেসে উঠতেই বোধহয় যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, মুখ গম্ভীর করে তাকালো।

ব্যাপরটা অনুধাবনযোগ্য। তাই আমিও ঠোঁটে ঠোঁট টিপে নিশ্চল অনড় হয়ে বসে রইলাম। হাতে বেগুনি রঙের প্যাকেটে, সোনালী অক্ষর চকচক করতে লাগলো।

কাকলীর চোখের তারাটি চকিতে একবার প্যাকেটের ওপর পড়লো। আবার ফিরে গেল। তারপরেই একবার আমার দিকে আড়চোখে দেখে, আবার প্যাকেটের দিকে নজর পড়লো, এবং দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরে গেল। আর মুখের ভিতর জিভের ঠেলায় গাল সুপুরির মতো ফুলে উঠলো।

এ খেলাটা একটু নিষ্ঠুর ঠেকলো আমার কাছে। হাতটা ওর কাছে বাড়িয়ে, মাথা নেড়ে তুলে নিতে ইশারা করলাম। কিন্তু কাকলীর মুখ আরো গম্ভীর হল। চকোলেটের দিকে নয়, ঠায় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় ডাকলো, 'মা।'

আশ্চর্য! একটু হাসি বা বিকার নেই কাকলীর মুখে। ওর মা ফিরে বললো, 'কী রে?'

চকোলেটের দিকে ছোট্ট তর্জনীটি তুলে দেখিয়ে, প্রায় যেন কাঠগড়ায় আসামীকে দেখিয়ে বললো, 'আমাকে দিততে।'

ওর মা একবার আমার দিকে তাকালো। হেসে বললো, 'কাকু হারিয়ে গেলে তুমি কাঁদবে বলছ, দিচ্ছেন যখন, নাও। কিন্তু অত বড় চকোলেটটা একেবারে মুখে পুরো না যেন।'

আমাকে বললো, 'ওটা আনতে গিয়েই বোধহয় গাড়ি ফেল করেছিলেন? দেখুন তো!'

কিন্তু কাকলীর মুখ তখন হাসিতে ভরে উঠেছে। মায়ের অনুমতি পাওয়া মাত্র, দু হাত দিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল চকোলেটের প্যাকেট। আর আমার কোলে একেবারে নিবিড় হয়ে এল।

পার্বত্যনগর কার্সিয়ং কখন পার হয়ে এসেছি। নতুন স্টেশন এল, নাম 'টুং'। কী তার মানে, কে জানে। যেন একটি শব্দের প্রতিধ্বনির মতো, একটি বাজনার ঝংকারের মতো নাম। রুক্ষ চুল, রক্তাভ কিংবা তামাটে মুখ নরনারী আর শিশুরা রয়েছে আশেপাশে। কাছে কয়েকটি বাড়ি, দোকানঘর। হয়তো এই সব মানুষেরা সকলেই কাজের সন্ধানে স্টেশনের আশেপাশে এসেছে। তাদের ছোট ছোট চোখে অপরিচয়ের নির্বাক বিস্ময়। কেউ কেউ বা হাসছে। এখানে এই হিমালয়ের বুকে যেন কালো মানুষ, বিভিন্ন মুখের ছাঁদ মানায় না। গরম জবর-জং পোশাক তা যতো ময়লা আর ছেঁড়াই হোক তা ছাড়া যেন এখানকার মানুষদের চেনা যায় না। ওদের চোখে মুখেও যেন পাহাড়ের স্তব্ধ গাম্ভীর্য। হাসলে রোদের মতো হাসির ঝিলিক হেনে ওঠে।

এখন ক্রমাগত প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ে চলেছে। অরণ্য যেন বিরল হয়ে এসেছে কিছু। কিন্তু পর্বত তার সুগভীর উচ্চতায় ক্রমেই যেন বাড়ছে, ব্যস্ত হচ্ছে। মাঝে মাঝে, ফালি জমিতে বাঁধাকপি আর টমাটোর চাষ দেখতে পাচ্ছি। সমতলবাসীর কাছে বৈশাখ মাসের অমূল্য সবজি পালং-এর শিষ উঠেছে ডগডগিয়ে।

'টুং' ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই কার্সিয়ং আবার ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কিছুই দেখি নি, দেখবো আশা আছে। দার্জিলিং-এ থাকাকালীন কার্সিয়ং দেখতে আসব। পশ্চিমে, দূরে বালাসনের উপত্যকার ওপরে নাগরি আর মিরিক পাহাড় কৃষ্ণনীল। ওদিকেই কোথায় যেন নেপালের সীমান্ত, বন্য হস্তী যুথের রাজ্য মোরুং-এর গভীর অরণ্য। চা বাগান সর্বত্র। দেখতে পাচ্ছি, উপত্যকার বিস্তীর্ণ-বাগানে, পিঠে লম্বা ঝাঁপি, রংবেরঙের শাড়ি পরা, মাথায় রুমাল বাঁধা মেয়েরা চা-পাতি তুলছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আকাশের বুক ঘেঁষে চলেছি। হাত বাড়ালেই আকাশ স্পর্শ করতে পারব। কে যেন বলে উঠলো, 'ওই যে এলাচি বাগান।' জানি নে কোন্‌গুলো এলাচি

গাছ। ভাবতে ভালো লাগছে।

কিন্তু শীত যেন গুরগুরিয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। এবং গাড়ি যেন সহসা মেঘের রাজ্যে প্রবেশ করলো। গাড়ির গতিও কিছু মন্থর হল। গাছপালা পাহাড় পর্বত, সমস্ত কিছু ঢেকে গেল চোখের সামনে। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। মুহূর্তে কামরার ভিতরে লোকেরাও অস্পষ্ট হয়ে গেল। আলো জলে উঠলো। কিন্তু ঘন কুয়াশার মতো মেঘ কামরার মধ্যে এসে ঢুকলো। এক হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। মুখ এবং হাত ভিজে ভিজে উঠলো।

কাকলী আমার একটি হাত চেপে ধরলো। বললো, 'কী হয়েতে কাকু ?'

বললাম, 'কিছু নয়, ওগুলো মেঘ।'

আমার মতোই ওরও বিস্ময়। বললো, 'মেঘ ? বিত্তি হবে ?'

নিজের অনভিজ্ঞতানুযায়ী জবাব দিতে হল, 'এ মেঘে বৃষ্টি হয় না।'

'এতা কি তবে আকাথ ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, আমরা তো আকাশ দিয়ে চলেছি।'

মজা ও বিস্ময়ে কাকলী খ্যাঁক করে একটু হাসলো।

মেঘের মধ্যে দিয়েই গাড়ি এগিয়ে চললো। তারপর যেন এক স্বপ্নের দেশের বাড়িঘরের মতো অস্পষ্ট অবয়ব সোনাদা স্টেশনে গাড়ি ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে সারা গায়ে মেঘ মাখবার জন্যেই যেন নেমে গেল। চা পানের ধুম পড়ে গেল। সাদা পেঁজা-পেঁজা তুলোর মতো ঘন মেঘ এখানে যেন আরো গাঢ় হয়ে, চাপাচাপি ঠেলাঠেলি করে এল। যেন পৃথিবী পার হয়ে এলাম। মর-জগতের ওপারে কোনো এক অবাস্তব স্বপ্নের দেশে যেন এসে পড়েছি। সবই অবাস্তব বলে বোধ হতে লাগলো।

মনে পড়লো, বইয়ে পড়েছিলাম, লেপচা ভাষায় সোনাদা মানে ভালুকের গুহা। একদা নাকি এই সোনাদায় ভালুকের খুব উৎপাত ছিল। কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়, এই কুয়াশার ভিতর দিয়ে লোমশ সেই জানোয়ার হাত দুলিয়ে দুলিয়ে চলেছে।

আবার গাড়ি ছাড়লো। আস্তে আস্তে কুয়াশা পাতলা হয়ে এল। এবং যতই অগ্রসর হলাম, উঁচুতে উঠতে লাগলাম ততই, যেন নতুন করে অরণ্য গভীরতর হয়ে উঠলো। একটু আগের মেঘ আর নেই। পাইন, শাল, দেবদারু এবং আরো নাম-না-জানা আকাশ ছোঁয়া বনস্পতিরা এখন রৌদ্রে স্নান করছে, আর এ রোদ এখন কলকাতায় হয়তো আগুন ছিটোচ্ছে কিন্তু এখানে অগ্রহায়ণের হৈমন্তী সোনালী চিকচিক করছে।

পরমেশবাবু বললেন, 'কাণ্ডটা একবার ভাবো। কোথায় একশো দশ ডিগ্রি গরম, আর কোথায় চাদর জড়িয়েও সামলানো যাচ্ছে না। পৃথিবীটা এখন একটা ম্যাজিক দেখছি, না কী বল হে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এখানে আর গাড়িতে পাখার দরকার নেই।'

বলেই কিন্তু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। মুখটা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে ফিরিয়ে ভাবলাম, পরমেশবাবু নিশ্চয় ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন।

খানিকক্ষণ কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে খুব আস্তে আস্তে চোখ ফেরালাম। পরমেশবাবু কিন্তু বাইরের দিকেই চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন। একটু অবাকই হলাম। এবং হঠাৎ তাঁর সম্পর্কে নতুন করে কৌতূহলিত না হয়ে পারলাম না। বললাম, 'তা আপনি একলা এই বয়সে পাহাড়ে বেড়াতে এলেন, সঙ্গে কেউ—।'

কথা শেষ করতে দিলেন না। বলে উঠলেন, 'বেড়াতে? তোমাকে বললে কে, যে আমি এই এত রাস্তা ঠেঙিয়ে দার্জিলিং-এর শোভা দেখবার শখে বেড়াতে এসেছি? আমার কি খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই ভেবেছ?'

তাও তো বটে। শুধু বেড়াবার জন্যেই সবাই দার্জিলিং-এ আসে না, একথাটা আমার ভাবা উচিত ছিল। তাও এই বয়সে, এই সকরিগলি এবং মনিহারী, দুই ঘাট পেরিয়ে, দুঃস্বপ্নের পথে বিশেষ করে পরমেশবাবুর পক্ষে খেয়ে-দেয়ে, আরো অনেক কাজ করবার থাকতে পারে। কিন্তু দার্জিলিং-এ আসা নয় নিশ্চয়ই।

নিজেই আবার বললেন, 'আমি যাচ্ছি রস দেখতে হে।'

'রস?'

'হ্যাঁ, প্রেমের রস, বুঝলে?'

প্রেমের রস দেখতে যাচ্ছেন, তাও আবার দার্জিলিং-এ? সে আবার কী! একটু থতিয়ে গেলাম। কোনো রকমে মাত্র উচ্চারণ করলাম 'অ'।

আবার একবার শিথিল মূল কয়েকটি দাঁতে ঝড় বইলো। বললেন. 'হ্যাঁ, একবার দেখে আসি প্রেমের রস কেমন টগবগিয়ে ফুটছে? প্রেম টগবগায় না পেট করকরায়, একবার দেখতে হবে না? না কী বল হে?'

বুঝতে কিছুই পারছিনে। এ প্রায় সোনাদার ঘন কুয়াশার মতো। তবু বলতে হল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

কিন্তু আমার কথায় এখন প্রায় কর্ণপাতই করলেন না পরমেশবাবু। চোখের ইশারায় কামরার অন্যদিকে শ্রীমান শ্রীমতীদের দিকে দেখিয়ে বললেন,

'প্রেম মানে তো তোমার ওই ব্যাপার, অ্যাঁ? জানি সবই, হাসা হল, একটু হাত ধরা হল, ব্যাস্ নাও এখন কী করবে, ওঁনাদের তো প্রেম হয়ে গেছে? তা আবার যেমন তেমন হওয়া নয়, এমন হয়েছে যে, ভগবান এলেও ছাড়াবার উপায় নেই। কিন্তু তারপরে? বাছা, কত ধানে কত চাল, তার হিসেব তো প্রেম দিয়ে হবে না, তারপরে? বল না হে।'

আমি বলব? সর্বনাশ! তাও এই পরমেশবাবুর ভুরু খোঁচা চোখের দিকে তাকিয়ে। আমি ঠোঁট কুঁচকে শুকনো হাসি হাসলাম। আর পরমেশবাবুর দু'তিনটি দাঁত ঠোঁটের ওপর চেপে বসেছে। মৃদু মৃদু ঘাড় দোলাচ্ছেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিনে, কার প্রেমের রস দেখতে চলেছেন দার্জিলিং-এ।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ আছেন বুঝি ওখানে?'

পরমেশবাবু এক কথায় উড়িয়ে দিলেন, 'আত্মীয় না আমার চৌদ্দপুরুষ! যাব দেখব, আবার কালকের গাড়িতেই কলকাতা রওনা দেব। কেবল যে চিঠিতে লেখে, 'আমি বেশ ভাল আছি,' সেই ভালটা একবার দেখব খালি। আরে একটা গো মুখ্যু; মাইনে তো পাস একশো সাত টাকা। বাড়ি ভাড়া দিয়ে এই বিদেশে, পাহাড়ের ওপরে কেমন ভালটা আছিস, একবার দেখতে হবে না? আমার সঙ্গে চালাকি। বুঝি না কিছু, অ্যাঁ? আর—আজকাল আবার এক ফ্যাশান হয়েছে, দুজনে সই করলেই বিয়ে। আবার সই করলেই বিয়ে নট, বোঝ একবার কী বিয়ে! বিয়ের মাথায় মারো ঝাড়ু।'

পরমেশবাবু রীতিমতো উত্তেজিত। বেড়াবার কথা জিজ্ঞেস করে, এমন জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি, এখন চাপা দিতে পারলে বাঁচি। যদিও কৌতূহল একটা কাঁটার মতো উঁচিয়ে আছে মনের মধ্যে।

তা থাক, পরমেশবাবু শান্ত হোন।

মুখে একটু বিব্রত হাসি টেনে চুপ করে রইলাম। পরমেশবাবু ছাড়লেন না। বললেন, 'তুমি মানো, ওই রেজিস্ট্রী বিয়ে না কী মুণ্ডু বিয়ে বলে?'

বললাম, 'গভর্নমেন্ট তো তাই মানে।'

'আরে রাখ তোমার গভর্নমেণ্ট। তাঁরা তো আইন জারী করে খালাস, ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা তো আর দেখতে আসছে না। তুমি কেন মানো, সেটা বল।'

কী বিপদ্! আমারটা জেনেই বা ওঁর কী লাভ হবে? শেষ পর্যন্ত বলে ফেললাম, 'খরচ-খরচা অনেক বাঁচে, এই আর কী।'

পরমেশবাবু বোধহয় এটা আশা করেন নি। একটু থতিয়ে গিয়ে ভ্রূ-কুঁচকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপরে বলে উঠলেন, 'বাঃ, বা বা! একেই বলে সেয়ানা'। তোমারও বোধহয় ওই রকমই কিছু ঘটেছে?'

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আজ্ঞে না না, তা নয়।'

পরমেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'বুঝেছি।'

নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগলো। বললাম, 'আপনার কেউ কি—?'

কথার মাঝপথেই, সহজভাবে বলে উঠলেন, 'হুম্। আমার মেয়ে।'

পরমেশবাবুর মেয়ে? সে মেয়ের সাহস আছে বলতে হবে। বললাম, 'ও, তাকে দেখবার জন্যেই—।'

'নাঃ।'

পরমেশবাবু বাধা দিয়ে আগেই বলে উঠলেন, 'তাকে দেখবার মাথা-ব্যথা আমার নেই, তার 'ভাল থাকার' চেহারাটা দেখেই নেমে যাব। ওসব বাপ ভাই, কেউ কিছু নয়, বুঝেছি। প্রেমিকের হাত ধরে, ছুটি সই দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে পড়তে পারলেই হল। তবে আমারও বাপের প্রাণ বলতে ঢু। ওখানে আর কিস্যু নেই। খবর আমি সব পেয়েছি, বাছাধনদের এখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। যাব, দেখব আর মুখের ওপর হেসে চলে আসব, বুঝেছ? প্রতিশোধ যাকে বলে।'

পরমেশবাবুর বিক্ষুব্ধ চোখের দিকে আর তাকাতে পারলাম না। হয়তো মেয়ের ব্যবহারে খুবই দুঃখিত ও বিরক্ত হয়েছেন। তা বলে, এই বয়সে, এই দুস্তর পথ পেরিয়ে, শুধু মাত্র মুখের ওপর হাসবার প্রতিশোধ নিতে চলেছেন। এটা বড় বেশী নিষ্ঠুর মনে হল।

গাড়ি ইতিমধ্যে সিঞ্চলের পাদদেশ দিয়ে, ঘুমবাজার পেরিয়ে ঘুম স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। অল্প কুয়াশা ছড়ানো চারিদিকে। সোনাদার মতো ভারী গাঢ় নয়। সবই দেখা যায়, অথচ সবই যেন ঝাপ্‌সা আব্‌ছায়ায় মাথানো। এ কুয়াশার রূপ আলাদা। গাড়ির শব্দ থেমে গেছে। ঘুম স্টেশনকে আমার নির্জনতম স্টেশন বলে মনে হল। নীরবতম বটে। দার্জিলিং-এর পথে সর্বোচ্চ স্টেশন। দার্জিলিং এখান থেকে নীচে নেমে গেছে। সব মিলিয়ে, ঘুম যেন কী এক ধ্যানমগ্ন গাম্ভীর্যে মৌন। আর হাল্‌কা অনড় কুয়াশার আব্‌ছায়া

যেন এই গাম্ভীর্যের মধ্যে কী এক অলৌকিকতায় ঘিরে রেখেছে। কী একটা পাখি ডাকছে, আমি তার নাম জানিনে।

মনটা যেন বিস্ময়ে ও নিঃশব্দ আনন্দে ভরে উঠলো। সবাই তো সমতল থেকে আসছি। তবে একলা কেন এত বিস্ময় মানি। এই বিশাল গম্ভীর অপরূপ রূপ দেখে কী? মনের মধ্যে, কোথায় একটা অচেনা রহস্যময় দরজায় আমার ঘা পড়ে কেন? কেবলি মনে হয়, দেখতে পেলাম না। কী যেন দেখতে পাচ্ছি নে। এই সকল কিছুর মধ্যে, কোথায় যেন সেই কিছু মিশে আছে। আমি তাকে চিনতে পারছিনে। তাই আনন্দের নিবিড়তার মধ্যে, একটি ব্যাকুলতাও অনুভব করি। একটি মধুর বেদনা অনুভব করি।

এই প্রায় আট হাজার ফুট উঁচুতে, আব্ছায়ায় দেখতে পাচ্ছি বিশাল পপ্লার শ্রেণী, শান্ত মৌন কিন্তু জীবন্ত। বিরাট বার্চের মাথা ওপরের কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। পাইনের নিবিড়তা ঘিরে রেখেছে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই একক মহানুভবতায় মহীয়ান হয়ে উঠতে পারে না। মানুষ এবং প্রকৃতি, কিছুই নয়। ন' জনের মহানুভবতার যোগফল. দশমকে মহীয়ান করে তোলে। একজনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। হিমালয়ের এই বিচিত্র বাহ্য প্রকৃতির অপরূপ রূপ মিলে-মিশে তাকে মহীয়ান করেছে।

গাড়ি আবার এগিয়ে চললো। কামরার মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছানোর, যাত্রা শেষের গুঞ্জন উঠেছে। দেখতে দেখতে গাড়ি বাতাসিয়ার শেষ চক্রে (লুপ) প্রায় বৃত্তাকার হয়ে গেল। দেখলাম গাড়ির সামনে পিছনে দুটি এঞ্জিন কাজ করছে। আবার রোদ হেসে উঠেছে।

সহসা কে যেন চীৎকার করে উঠলো, 'কাঞ্চনজংঘা! কাঞ্চনজংঘা!'

চকিত হয়ে দৃষ্টি ওপরে তুললাম। চোখের ওপর ভেসে উঠলো শ্বেতমর্মরের মতো দুটি তিনটি চূড়া। দূর উত্তরের আকাশে, রৌদ্র চকিত নীলাম্বরের বুকে, প্রায় যেন সাদা মেঘের মতো। কিন্তু একমুহূর্ত চোখ রাখলেই টের পাওয়া যায়, মেঘ নয়, আর কিছু। শুধু মৌন শ্বেতশির তুষারের বুকে হাল্কা নীল ও সবুজ ও হলুদের ছোঁয়া লেগেছে ভাঁজে ভাঁজে। কিংবা ঠিক যেন সে রং ব্যক্ত করতে পারিনে। ভাষার থেকে, শিল্পীর তুলিতেই হয়তো তার রঙের ব্যাখ্যা হয়।

কাঞ্চনজংঘা! বাংলার সমতলের ছেলের চিরবিস্ময়ের, চির আনন্দের, চির বাসনার। কিন্তু কী দেখলাম, তা প্রত্যক্ষ করার আগেই পথ গেল বেঁকে। যেন চোখের পলকে সে হারিয়ে গেল, অথচ মনের মধ্যে একটা

স্পষ্ট ছবি ভেসে রইলো। এখন সম্মুখে নীলাভ্রী মহাকক্ষের ভিড়।

হঠাৎ চোখে পড়লো, কাকলীর মায়ের চোখে যেন জল। আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছছে। তার সঙ্গী একটু বিব্রত, নতমুখে নখ খুঁটছেন। কাকলী কিন্তু অবাক্ আনন্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পরমেশবাবু বলে উঠলেন, 'ওহে, আমার যেন মনে হল, কাঞ্চনজংঘার মাথাটা নড়ছিল।'

বলে নিজেই হাসলেন। দেখলাম, কপালে নয়, কোলের ওপর হাত দুটি জড়ো করা।

সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে বিস্ময় বেদনা আনন্দবিধুর একটি অনুভূতি ভরে উঠলো।

দার্জিলিং শহর ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ভ্রমণবিলাসীদের ভাষায় 'পর্বতপুরের রানী।' কুইন অব দি হিল স্টেশন্‌স।

ছোট গাড়ি, ছোট স্টেশন, সামনে রাস্তা। সবখানে জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। প্ল্যাটফরমে নেমে কুলিকে মাল নামাতে বললাম। ঠিকানা, ম্যাল রোডের নিচে বার্চ হিল রোড। বাড়ির নাম পপ্‌লার ভিউ। চোখে দেখি নি, নামটাই শুনেছি। মনের মধ্যে একটা কল্পনার ছবি আঁকা হয়ে গেছে, সূচিবিদ্ধ শির পপ্‌লারের বেষ্টনীতে একটি কাঠের কুটির। কিন্তু বাস্তবে গিয়ে কি দেখব জানিনে।

কোঁচার কাপড়ে টান পড়তে, নিচু হয়ে দেখলাম, কাকলী। ওর মা আর সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে হাসছে। ওর মা বললো, 'চললাম। কাকলীকে বিদায় দিন, নইলে যে ও যেতে পারছে না।'

তাড়াতাড়ি কাকলীকে কোলে তুলে, ওর টসটসে ফর্সা গালে একটু ঠোঁট ছুঁয়ে দিলাম। কাকলী কিন্তু হাসলো না। খুব কাছ থেকে আমার চোখের দিকে তাকালো। মুখ গম্ভীর। ওর নেলপলিশ লাগানো ছোট্ট তর্জনী দিয়ে একবার আমার গাল স্পর্শ করলো। তারপর প্রায় আমারই অনুকরণে, আমার রাতজাগা ধুলোমাখা গালে আলগোছে একটি চুমো দিয়ে দিল। সে চুম্বন চুঁইয়ে আমার মরমে প্রবেশ করলো। কিন্তু কাকলীর লজ্জা দেখে আমার প্রায় থ মেরে যাবার দাখিল। বললো, 'আমাদেল বালি আত্‌বে?'

কিছু না ভেবেই জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই আসব।'

ওর মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'সত্যি আসবেন কিন্তু, ওর হয়ে আমিও বলে রাখছি। কী যেন রাস্তার নামটা ?'

বলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। ভদ্রলোক বললেন, 'রাস্তা তো নয় সত্যি, একটি স্বর্গের সিঁড়ি বিশেষ। কিন্তু পাহাড়ের দেশে ওটাই রাস্তা। নাম আমারও মনে নেই। ম্যাল থেকে সোজা পোস্ট আপিসের কাছে এলেই ডান দিকে পড়বে। 'রূপকুমার হাউস' বলবেন, তা হলেই হবে। আমার নাম বিবেকরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।'

সম্মতি জানিয়ে আমার নামটাও ওঁকে বলতে হল, নিয়ম সূচক পরিচয়ের নমস্কার বিনিময়ে। কাকলী বলে উঠলো, 'আল্ মাল্ নাম সুমিতা।'

কাকলীর মা হেসে উঠে, ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললো, 'সুমিতা ভট্টাচার্য। কিন্তু খুকু এবার নেমে এস। আমরা যাই, ওঁকেও যেতে দাও।'

কাকলীকে ওর মায়ের কোলে দিয়ে, মালপত্রের সন্ধানে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, বিছানা বাক্সো আমার পায়ের কাছে। নাক চক্ষুহীন একটি মানুষ আমার সামনে। পাহাড়ী কুলি, পথের নির্দেশের প্রতিক্ষায়, একটু নিশ্চিন্ত ওদিকে ব্যস্ত হয়ে হাত তুলে কাকলীকে বিদায় দিতে গেলাম। দেখলাম নেই, চলে গেছে। পরিবর্তে কানের কাছে শুনতে পেলাম পরমেশবাবুর গলা, 'চললাম হে। আমাকে যেতে হবে বাজার পেরিয়ে কার্ট রোড ধরে। গাড়ির ব্যবস্থা নাকি নেই। অগত্যা পায়ে হেঁটে।'

বললাম, 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা—?'

কথা শেষ হবার আগেই বললেন, 'না, এখানে আর দেখা হবে না। কালকের গাড়িতেই আবার ফেরত। তোমরা শৈলবিহার কর।'

এগিয়ে চলে গেলেন। কুলিকে ঠিকানা বললাম। তার মুখের ভাঁজ দেখে মনে হল, তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলো। তারপর চওড়া ফিতের মতো দড়ির সঙ্গে বিছানা স্যুটকেশ পিঠে ঝোলালো। তারপর স্টেশনের সামনেই, রাস্তার ধারে ঘাস ছাওয়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললো।

মনে হল, চোখ দুটি যেন চির সবুজে ডুবে গেল। চোখের সব থেকে বড় ক্ষুধা বোধহয় সবুজ বর্ণ।

চলার পথ থেকে বুঝতে পারলাম, কুলি পথ সংক্ষেপ করছে। হিন্দীতে যখন জিজ্ঞেস করলাম, সে ঠিক পথে যাচ্ছে কিনা, তখন আমি তার হলদে দাঁত দেখতে পেলাম। আর পিঠের বোঝা যে দড়িতে ঝোলানো, সেটা কপালের ওপরেই মাথার কাছে আটকানো। কপালের চামড়ায় টান পড়তেই সম্ভবত

তিল পরিমাণ কালো দুটি ছিদ্র দেখতে পেলাম। সন্দেহ নেই, ও দুটি চোখ। এবং মুখ ভরতি ওর হাসি। বললো, 'ঠিক। চোর বাটো সে যাত।'

চোর বাটো আবার কি? জিজ্ঞেস করতে, সে আমার অর্বাচীনতায় আর একবার পর্বতমোহন হাসি হাসলো। তারপর অদ্ভুত দ্রুত উচ্চারণ করলো, 'শটকাট্।'

'শর্টকাট্?'

'এঃ। হেঁঃ হেঁঃ।'

বোঝাতে পেরে খুশি হল। এ বাটো যে আমাদের বাঙলা শব্দের 'ঘাটে বাটেরই', বাটো তাতে সন্দেহ নেই।

এক সময় ফাঁকা রাস্তা ছেড়ে সে পিচের রাস্তা ধরলো। এবং সহসা যেন কোনো এক শহরের সীমানায় নিয়ে এল। আবার দেখলাম, বালি ছড়ানো পিচের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বাঁ দিকে হাল ফ্যাশানের শো-কেসে সাজানো বড় বড় দোকান। কোডাক আর গেভার্টের পণ্য বিজ্ঞপ্তির গোরা মেয়ের ফোটো-পোশাক আর বিদেশী খাদ্য সম্ভারের ছবি। কানে এল, হে ভগবান! পর্বতপুরের রানীর বুকে, প্রথমেই কানে এল, বিদেশী অর্কেষ্ট্রার সঙ্গতে মেয়ে গলার হিন্দী গান, জাস্তি না দে, তো থোড়া থোড়া।...আর শুধু তাই নয়। দেখলাম, উলেন টুপি কালো প্যাণ্টের নিচে শেক্সপীয়ারিয়ান জুতোর সোলে তাল বাজছে। এই দ্বিপ্রহরেই, রং মাখা মুখের ভিড়, রং-বেরঙের তন্তুজনগ্নবাহার শাড়ির ওপরে, বিচিত্রতর ক্লোক ওভার কোট কারচোপ বাঁধা গলায় মাথায়। পুরুষদের প্রায় সকলেরই প্যাণ্ট কোট টাই।

কুলিটা আমার অবস্থা দেখে বলে উঠলো, 'ম্যাল ম্যাল।'

ম্যাল! এ তা হলে সেই! ইংরেজদের 'ছায়া নিবিড় বেড়াবার পথ।' দার্জিলিং-এর ম্যাল। আমার পক্ষে ইংরেজী শব্দটার অন্য অর্থটিই বেশী অর্থপূর্ণ হয়ে উঠলো যেন। এই mall মুগুরের মতোই প্রায় আঘাতে উদ্যত। কানের চারপাশে ইংরেজী বুকনি, মাঝে-মধ্যে কিছু হিন্দী বুলি। তারপরেই শুনলাম একটা চড়া শিস্, পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। দেখলাম, ভারত ললনার, রং- করা সোনালী কেশ, জিন স্ল্যাক এঁটে ঘোড়দৌড় চলছে। কিন্তু যেভাবে ভয়ে কাঠ হয়ে ঝুঁকে পড়ে বসেছে, ভয় হল, হিরোইনটি আছাড় খেয়ে হাত-পা না ভাঙেন। কারণ এ ক্ষেত্রে হিরোইন বীরাঙ্গনা তো নন, নায়িকা। চারপাশে পোশাকে-আশাকে একেবারে টপ র‍্যাঙ্ক পরিবেশ সন্দেহ নেই! আভিজাত্য কতখানি আছে, টের পাওয়া গেল না। যদি চকচকে গরম কোটের

কাঁধ একটু ঝুঁকিয়ে, হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে, দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে এড়ো এড়ো উচ্চারণে ইংরেজী বলাকে আভিজাত্য বলতে হয়, তাহলে তা ছড়িয়ে আছে এই পথের কেন্দ্রবিন্দুতে। আর মহিলাদের বেঞ্চি জুড়ে বসে থাকা, চোখে দূরবীন, কিংবা যেন কাউকেই দেখছিনে, প্রায় শূন্য চোখে তাকিয়ে অতি মন্থর পথ চলাকে (বকেরা ওভাবেই মাছ ধরে) অ্যারিস্টোক্রেসীর অন্যতম অঙ্গ বলে, তারও বেজায় ছড়াছড়ি।

কিন্তু আশ্চর্য লাগছে মাঝে মাঝে কোনো কোনো বেঞ্চিতে, এদেশের গম্ভীর প্রায় ভাবলেশহীন মুখ মানুষগুলোকে দেখে। তাদের কারুর ছেঁড়া কোট, ছেঁড়া প্যাণ্ট। বিচিত্র দর্শন তালি-মারা আলখাল্লা কারুর কারুর লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। শীতের শাণিত নখে আঁচড়ানো, তামাটে রেখাবহুল মুখ। ভাঁজে ভাঁজে পাহাড়ের ধূলিকণায় মলিন। কারুর খালি মাথা, কারুর মাথায় জীর্ণ টুপি। পায়ের জুতোয় পাহাড়ী বর্ষা আর অনেক পাথর ঘষার দাগ।

ওরা কী করছে? ওদের মুখে না আছে হাসি, না দেখি বিস্ময়। যেন মহাকালের মতো চির উন্মুক্ত চোখ, গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে আছে। এই পাহাড়ের মতোই নির্বাক গম্ভীর। ওরা কি চিরকাল ধরেই এমনিভাবে ম্যাল-এর এই বিচিত্র লীলা দেখে আসছে?

কিন্তু কোথায় আমার প্‌পলার ভিউ বাড়ি, কোথায় বা বার্চ হিল রোড, কিছুই তো জানি নে। শুনে তো এসেছি, সেখানে নিবিড় নির্জনতা। কুলী দেখলাম, ডানদিকের পথ দিয়ে পশ্চিমগামী। ম্যাল-এর প্রাঙ্গণ ছাড়তেই পথ আবার নিরিবিলি হয়ে এল। পথের ধারে, উত্তর পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেছে কুটিরের পর কুটির। যেন এলোমেলো ছড়ানো খেলা ঘর। যেন ছেলেবেলার ঝুলোনের সজ্জায় দেখা পাহাড় আর বাড়ি। মাঝে মাঝে সর্পিল সরু পথ। সেখান থেকে ছেলেমেয়েদের খেলার চীৎকার ভেসে আসছে।

কুলি হঠাৎ বাঁধা সড়ক ছেড়ে, কাঁচা সড়কে নামলো। একটু নেমে একটা বাড়ি। বাড়িটার পাশ ঘেঁষে পথ, আরো প্রায় পঞ্চাশ ফুট নেমে পপ্‌লার ভিউ। গেট নেই, পথ চলে গেছে বাড়ির উঠোনে, কাঠের বারান্দার ধার দিয়ে।

দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি মধ্যবয়স্কা, নিরাভরণা এ দেশীয় মেয়ে-মানুষ। তামাটে মুখের উপর সবুজ শ্যাওলার মতো ছাপকা ছাপকা দাগ। তার পাশে একটি বছর বারোর মেয়ে, ফ্রকের ওপরেই খয়েরী ডোরাকাটা শাড়ি পরেছে। টুকটুকে লাল, বোঁচা নাক, এবং আশ্চর্য, চোখ দুটি নকল-

চেহারা নয়। আয়ত্ত নয় বটে কিন্তু কালো, তাগর চোখ দুটিতে একটি পার্বত্য কৌতূহল।

পপ্‌লার ভিউ-এর যিনি মালিক, তিনি কলকাতাবাসী বাঙালী, সে হিসেবে আমি তাঁরই অতিথি। মধ্যবয়স্কা মেয়েলোকটি যে পপ্‌লার ভিউ-এর কেয়ারটেকার, তাঁর কথা অনুযায়ী সেটাও বুঝতে পারছি। বলে দিয়েছিলেন, আমি গিয়ে নামটা বললেই নাকি কেয়ারটেকার বুঝতে পারবে, এবং আমাকে গ্রহণ করবে। হয়তো আমি এসে পৌঁছবার আগেই তাঁর নির্দেশ এসে পৌঁছেছে কলকাতা থেকে।

মধ্যবয়স্কা একহাত তুলে ঝুঁকে পড়ে সেলাম জানালো। আমি আমার নামটা বললাম। সে আর একবার সেলাম জানিয়ে হিন্দীতে জানালো, কলকাতা থেকে সাহেব তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর বন্ধু এই তারিখে আসছেন। 'আপ আইয়ে সাব।'

বলে সে কুলিকে কী বললে। কুলি মালপত্র সহ বারান্দায় উঠে তাদের অনুসরণ করে, ভিতরে ঢুকে গেল। তাদের পায়ের শব্দে বুঝতে পারলাম, কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে তারা হেঁটে চলেছে। সামনের কাঁচের বড় পাল্লা দরজাটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। তার আগেই চোখে পড়লো, দরজা দিয়ে ঢুকেই ঘরের একপাশে একটি আয়না, ছাতা আর টুপি রাখার একটা দাঁড় করানো র‍্যাক। ব্যবস্থা পুরোপুরি সাহেবী। কিন্তু এদিকে আমার তো কোঁচার পত্তন ঝল্‌মল্‌ করছে। আপাতত মোটা পাঞ্জাবির ওপরে হাত কাটা কোট (জহর কোট যাকে বলে) চাপাতে হয়েছে। কেয়ারটেকার মেয়েলোকটিও দেখছি সাব্‌ সাব্‌ করছে। বেগতিক। কলকাতার পপ্‌লার ভিউ-এর মালিক বন্ধুর কথানুযায়ী জানি, এরাই আমাকে রান্নাবান্না করে খাওয়াবে। খরচটা দিয়ে দিলেই হল। ব্যবস্থা নাকি সব আছে। কিন্তু খাওয়াটাও সাহেবী হবে না তো? শুনেছি, পাহাড়ের ওপরে এখানে খাদ্য সবই পাওয়া যায়। মায় মৌরলা মাছ পর্যন্ত। বাঙালীর ছেলে, কে কী মনে করবে জানিনে, একটু সাপটে খাওয়া অভ্যেস। সম্ভবত কড়াইয়ের ডাল, পোস্ত চচ্চড়ি আর ইলিশ মাছের অম্বল আশা করা যায় না। নিছক ডাল মাছভাজা আর একটু তরকারী পাব তো?

কিন্তু সামনে অর্ধবৃত্তাকার লন আর বাগানটা আমাকে হাতছানি দিল। বারান্দায় না উঠে পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ঘাস ছাঁটা হয় না। সে যদৃচ্ছা বেড়েছে। বিলিতি ফুলগাছগুলোর তেমন যত্ন নেই।

তবু তারা ফুটেছে অজস্র। আমি এদের নাম জানিনে, বর্ণবাহারেই মুগ্ধ। এত রং। একটি ছোট্ট ফুলের বুকে এত বিচিত্র রকমারি রং কেমন করে ফোটে! কী আছে মাটির রসে, কী আছে সূর্য কিরণে, গাছের প্রাণে প্রাণে ডুব দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

অর্ধবৃত্তাকার লনের পরেই, পাহাড়ের ঢালু খাদ নেমে গেছে। খাদের ওপারে আর একটি পাহাড়, ভোটিয়া বস্তি। ঘিঞ্জি এলোমেলো কুটির। মেয়ে-পুরুষেরা ওঠা নামা করছে। তারপরেই চোখ চলে গেল আরো নিচে, উত্তরে পুবে একটি সমতল ভূমি। তাতে একটি রক্তিম বৃত্ত। মনে পড়ে গেল বইয়ে দেখা ছবির কথা, ওটা লেবং। রক্তিম যে বৃত্তটি দেখতে পাচ্ছি, সেটা নিশ্চয় ঘোড়দৌড়ের সীমানা। লেবং। লেপচা ভাষায় 'আলি' শব্দের অর্থ জিহ্ব, 'আবং' মানে মুখ থেকে। আলিবং, মুখ থেকে জিহ্বা, ইংরেজীতে লেবং দাঁড়িয়েছে। আমি বুঝতে পারিনে, কিন্তু পাহাড়ী মানুষের চোখে, লেবং-এর সমতল মাঠ সম্ভবত মুখের বাইরে জিভের মতোই দেখায়।

আর যতদূর চাই, পাহাড়। কৃষ্ণনীল পাহাড়ের পর পাহাড় অন্তহীন। কিন্তু উত্তরে পাহাড়ের ওপরে ধূসর আকাশ। তার গায়ে এখন কোথাও কাঞ্চনজংঘার চিহ্ন নেই। উত্তরের ওই ধূসর আকাশের কোথাও সে আছে। সেই কাঞ্চন ধবল স্তব্ধ মৌন গম্ভীর যে, সে ওখানে কোথায়, কী তাকে আড়াল করেছে কিছুই তো দেখতে পাইনে।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়লো, তাই চকিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। পপ্‌লার ভিউ-এর পপ্‌লার গাছ কোথায়। অবাক্‌ হয়ে আবিষ্কার করলাম, প্‌পলারের কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। লনের শেষ প্রান্তে, বৃত্তের দুপাশে দুটি নাতিদীর্ঘ প্‌পলার গাছ। পূর্বের অশেষ পাহাড়, অসীম আকাশ আর প্রথম সূর্যকে অভিবাদনের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন দুই দ্বারী।

প্‌পলার কি ঝাউয়ের বংশধর? কে জানে। ছেলেবেলায় এ গাছগুলোকে কে যেন চিনিয়ে দিয়েছিল বিদ্যা গাছ বলে। সরস্বতী পুজোয় কোথা থেকে প্‌পলারের পাতার আমদানী হত। বইয়ের ভিতর সারা বছর তার পাতা রেখে দিতাম। শুকিয়ে শুকিয়ে তার চেহারা হত অদ্ভুত, ফসিলের মতো দাগ পড়তো বইয়ের পাতায়। ছেলেবেলা থেকেই এ গাছের ওপর তাই বড় ভক্তি। যদিও, আমার সামনে এ প্‌পলারের পাতা এবং ঝাড় একটু ভিন্ন রকমের।

কিন্তু সত্যি, নিবিড় নির্জন আর নিঃসীম। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। আশেপাশে বড় বড় বার্চ গাছে অরণ্য হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, একটা দোয়েল

যেন ডাকছে কোথাও থেকে। কিংবা দোয়েল ভাবছি, অন্য কোনো পাখি হয়তো। প্রজাপতিরা তাদের বর্ণাঢ্য-পাখা রোদে চকচকিয়ে উড়ছে।

পিছন ফিরে দেখলাম, বাড়ির সমুখ দিকও অর্ধচন্দ্রাকার। দোতলা কুটির, লাল রং-করা টিনের চাল। ওপরে নিচে, সামনের দুটি ঘরকেই কাঁচঘর বলা যায়। নিজের ঘরটিতে মানুষের নড়াচড়া যেন দেখতে পাচ্ছি। কে আছে ওখানে?

নিচের ঘরে নজর করতে গিয়ে, আবার ওপরে চোখ পড়লো, এবং থমকে গিয়ে প্রায় সিটিয়ে গেলাম। ওপরের ঘরের কাঁচের খোলা জানালায়, ঘরের একটু ভিতরে ওটা কি মানুষ? কালো বিশাল মুখ, সামনে খানিকটা টাক, বাকীটা প্রায় ঘাড় অবধি উস্কখুস্ক চুল। বয়স কত হবে কে জানে, মুখটা কেবল মনে হচ্ছে পাঁচ সের ওজনের ভাতের হাঁড়ির মতো বিরাট। দুটি চোখও নিশ্চয়ই আছে, কারণ অনুভব করছি দৃষ্টিশলাকা আমার ওপরেই নিবদ্ধ। বাড়ির মালিক অবশ্য বলে দিয়েছিলেন, 'গিয়ে আপনি হয়তো আর একজন অতিথির দেখা পেতে পারেন, যদি তিনি খেয়ালের চোটে অন্য কোথাও না চলে গিয়ে থাকেন। আশা করি, তাতে আপনার অসুবিধা হবে না।'

এই কি সেই অতিথি? দৃষ্টিটা তাড়াতাড়ি ফেরালাম। কিন্তু সে আমার দৃষ্টি; আর এক জোড়া চোখের দৃষ্টি যে বিঁধেই রইলো মনে হচ্ছে। কোন দিকে যাই? একেবারে পুব দিকে ফিরে দাঁড়ালাম। হঠাৎ যেন মনে হল, প্রায় একটা ভূতুড়ে পরিবেশে এসে পড়েছি। ওই লোকটার সঙ্গে থাকতে হবে নাকি? কী বিশ্রী!

পিছনে সামান্য শব্দেই, চমকে ফিরে তাকালাম। ফ্রকের ওপরে শাড়ি পরা (সেই রকমই মনে হচ্ছে যেন) নাক বোঁচা টুকটুকে গাল মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে কুলিটা। ওর প্রাপ্য মেটানো হয় নি।

কত দিতে হবে জিজ্ঞেস করলাম। পরিবর্তে দু-পাটি হলুদ রঙের দাঁত, মুখের কিছু ভাঁজ এবং দুটি আঙুল। দাঁত আর ভাঁজ হল হাসি। আঙুল দুটি পারিশ্রমিকের অঙ্কের ইশারা। আমি কিছু বলবার আগেই, মেয়েটি সরু গলায় তরতর করে কী বলে উঠলো। কুলি তৎক্ষণাৎ আট আনা কমিয়ে বললো, 'দেড় টাকা।'

আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। (আমার মন কিন্তু দোতলার কাঁচ-ঘরের জানালায়।) মেয়েটি যেন তাতে লজ্জা পেল, একটু রক্তিম হল। আর লোকটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে উচ্চারণ করলো, 'এক।'।

কিন্তু দাঁত আর ভাঁজ এক রকমই রইলো, ঘাড়টা না-এর ভঙ্গীতে দুলে

দুলে উঠলো। দ্বিরুক্তি না করে লোকটাকে দেড় টাকা দিয়েই বিদায় করলাম। এবং খুব সন্তর্পণে না দেখার ভান করে, দোতালার জানালার দিকে তাকালাম। নেই। আঃ! ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি নেই।

মেয়েটি বলে উঠলো. 'চিয়া? চিয়া?'

চিয়া? কি বস্তু সেটা বুঝতে পারলাম না। ভ্রূ কুঁচকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে রইলাম।

পাহাড়ী বালিকার রক্তিম ঠোঁট দুটি চকিতে একবার হাসিতে বিস্ফারিত হল। পরমুহূর্তেই সম্ভ্রমে ও গাম্ভীর্যে কুঁচকে উঠলো। আর একটু জোর দিয়ে একবার উচ্চারণ করলো, 'চ্যাঃ চ্যাঃ।'

চ্যাঃ? চিয়া ও চ্যাঃ, কি বস্তু হতে পারে? চা কী? জিজ্ঞেস করলাম, 'চা?'

প্রায় দম দেওয়া পুতুলের মতোই ওর মাথা সম্মতিতে দুলে উঠলো। আমারও প্রাণটা দুলে উঠলো। বেলা দেড়টা বাজে। আমাকে এখন নিশ্চয় কেউ গরম ভাত পরিবেশন করবে না। অতএব, চায়ের তুল্য বস্তু আর কি আছে এখন? হিন্দিতেই জিজ্ঞেস করতে হল, 'মিলবে?'

ঘাড় কাত করে জানালো, হ্যাঁ। তারপর বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'অন্দর আইয়ে।'

ওর পিছু পিছু গেলাম। মাথা তুলে দেখলাম, দক্ষিণে পঞ্চাশ ফুট ওপরের বাড়িটা সেখানে এখন লোকজনের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বারান্দার কাছে এসে চোখে পড়লো, পপ্‌লার ভিউ-এর পশ্চিম দিকের ঢোকবার মুখে, রাস্তাটা প্রায় সমতলের মতো চলে গেছে খানিকটা। গিয়ে শেষ হয়েছে, বড় বড় গাছের বেষ্টনীর আড়ালে একটি বাড়িতে। সেটিও সাদা রঙের দোতলা কাঠের বাড়ি। মনে হয়, গভীর ছায়ায় বাড়িটা ডুব দিয়ে রয়েছে।

বারান্দা দিয়ে উঠে, ছোট ঘরটির পরেই, ডাইনে একটি বড় ঘর। খোলা দরজা দিয়ে, নিচের কাঁচঘরটা দেখতে পেলাম। মেয়েটি আমাকে বড় ঘরের ওপর দিয়ে সেখানেই নিয়ে গেল। খুশিতে আমার দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দেখলাম, সেই ঘরেই একপাশের খাটে আমার বেডিং খুলে বিছানা পাতা হয়ে গেছে। বেডিং-এর ভেতর থেকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম রেখেছে একপাশের একটি ছোট টেবিলে। তোয়ালে রেখেছে আলনায়।

মস্ত বড় একটা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে একপাশে। আয়নাটি বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার। কাঠের মেঝেয় কার্পেট পাতা। পুব দিকে কাঁচের ভিতর দিয়ে

দেখলাম, দুই আরো পল্লার। বহু দূরান্তে, ওই নীল রেখাটি কি কালিম্পং?

মেয়েটি আমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। চোখ পড়তেই বয়স্কা তরুণীর মতো ও রক্তিম হয়ে উঠলো। আমি বললাম, 'বহুত আচ্ছা।'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি আর একপাশে সরে গিয়ে একটি দরজা খুলে দিল। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম অ্যাটাচড্ বাথরুম। চমৎকার! আর কী চাই! উত্তরে দক্ষিণে আর পুবে সবটুকুই কাঁচে ঘেরা। পর্দা টাঙানো আছে। সরিয়ে দিলেই সমগ্র হিমালয় ভেসে উঠবে চোখের সামনে। আবার বলে উঠলাম, 'বহুত আচ্ছা।'

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে, কালো চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'আপকো গরম জল চাহি?'

মনটা এত তরতরিয়ে উঠলো খুশিতে যে, জবাব দেবার আগে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'নাম কী?'

ও সলজ্জ মুখ নিচু করে বললো, 'পার্বতী।'

সুন্দর! সব মিলিয়ে প্রায় অপরূপ। কিন্তু ওর লজ্জা ও হাসির মধ্যে এমন একটি গাম্ভীর্যের ভাব কেন? ওটাকে তো যুবতী ধরম বলেই মনে হয়। ওর বয়স কি তবে, আমার আন্দাজ অনুযায়ী বারো তেরই নয়? না কি পর্বতের পার্বতীদের এমনি ধারা। এখন থাক সে বিচার। বললাম, 'পার্বতী, গরম জল তা হলে একটু দাও।'

ঘাড় কাত করেই এমন হুড়দাড় করে ছুটলো, মনে হল, আমার আন্দাজই ঠিক। পার্বতী বালিকাই। ব্যবহারটা অপরিচয় এবং সম্ভ্রমের ভারে একটু ভারী হয়ে গেছে।

পার্বতী যেতে না যেতেই সেই মধ্যবয়স্কা ঢুকলো। হিন্দীতেই বললো, 'আপনার গরম জল আসছে। কিন্তু আপনাকে কী খেতে দেব, সাব। আমার কাছে পাঁউরুটি আছে। তা দিয়ে দেব?'

'দাও।'

'আর রাত্রে কী খাবেন?'

'তা তো জানি নে। যা হয় হবে।'

ও হেসে ফেললো। দেখলাম, কয়েকটি দাঁত নেই। জানালো, এখনই সব সওদা করে আনিয়ে না রাখলে, রাতে রান্না করে খেতে দিতে অসুবিধা হবে।

তাড়াতাড়ি কিছু টাকা বের করে দিয়ে বললাম, 'মাংস রুটি-টুটি করো, আর দিনের বেলা মাছ-ভাত। সাহেবী খানা একদম নট।'

ও শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে হাসলো। অর্থাৎ বুঝেছে। টাকাগুলো নিয়ে গুনে গুনে দেখলো। বললো, 'সব হয়তো বুঝতে পারব না, যা দরকার হয় বলে দেবেন। এখানে কেউ এলে, তাদের দয়াতেই আমি বেঁচে থাকি সাব।'

বললাম, 'আমি সাব নই।'

ও ফোগলা দাঁতে, বুড়ী মায়ের মতো হাসলো। বললো, 'বাবু। আপনি বাবু।'

'তোমার নাম কী?'

'মায়লী।'

'মায়লী?'

'জীউ বাবু, মায়লী। আমি আমার বাবার মেজ মেয়ে। আমাকে তারা মায়লী বলেই ডাকতো।'

দেখলাম, মায়লীর একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়লো। আর আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, বাবা মায়লী বলে ডাকতো।

তারপর, আর একজন, আর একজন তো নিশ্চয় আছে যে, যৌবনে মায়লীকে মরালীর মতো দেখেছে। সে কী নামে ডাকে? যেটা আসল নাম?

মায়লী নিজেই বলে উঠলো, 'আমার তো কিছু করার কথা নয় বাবু। পার্বতীর বাবা মারা গেল তিন বছর আগে। ফৌজের কাজ খতম করে, পপ্‌লার ভিউ-এর কাজ নিয়ে কেয়ারটেকার হয়েছিল সে। সে-ই সব করে দিত। এখন সে নেই, তাই আমাকেই করতে হয়। ঘরদোর নেই, এখানেই চাকরদের ঘরে মেয়ে দুটোকে নিয়ে থাকি, ছেলে আর ছেলের বউও থাকে এখানেই। তবে—।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'নসীব বাবু, ওরা আমাকে চায় না। বড় মেয়ে প্রেমবতী, সামনের গাছ-ঘেরা বাড়িটা আছে, 'দেওদার কুঞ্জ', সেখানে এখন কাজ করছে। ওটাও বাঙালী বাবুর বাড়ি। লেড়কা, আর বহু—এসেছে অনেক দিন, থাকবেও অনেক দিন।'

তারপরে হঠাৎ যেন মনে পড়লো মায়লীর, নতুন বাবুর সঙ্গে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। হঠাৎ থেমে বললো, 'গোস্তাকি মাফ করবেন। আপনি বিশ্রাম করুন, চা নিয়ে আসছি।'

কিন্তু তার আগেই আমি জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'মায়লী, ওপরে কে আছেন?'

মায়লী যেন সন্ত্রস্ত চোখে একবার পিছন ফিরে দেখলো। তারপরে চুপিচুপি গলায় বললো, 'একঠো বাবু। বাবু কো বিবি ভী হ্যায়। বাবু সারাদিন তস্‌বীর বানায় আর বিলাইতী দারু খায়। কারুর সঙ্গে কথা বলে না।'

কথা বলে না, দারু খায় আর তস্‌বীর বানায়? কিন্তু বিবির সঙ্গে তো ভদ্রলোক কথা বলেন নিশ্চয়? আর তস্‌বীর মানে কী? সারাদিন ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করেন, না রং তুলি নিয়ে থাকেন? জিজ্ঞেস করতে মায়লী যা বলল, তার অর্থ আঁকেন। আর্টিস্ট। আমি যে চেহারাটি দেখেছিলাম, সেটি তবে আর্টিস্টের? সর্বনাশ! উনি আর্টিস্ট? অবিশ্যি বলবার কিছু নেই। গুণের সঙ্গে কি চেহারায় মিল থাকে? তবু, কলকাতায় কোনো পরিচিতি আর্টিস্টের চেহারার সঙ্গে মেলাতে পারলাম না। আর দার্জিলিং-এর, ম্যাল-এর নিচে, বার্চহিল রোডের নিরালায় এসে যখন সারাদিন দারু খান ও তস্‌বীর বানান তখন সম্ভবত কমার্শিয়াল শিল্পী নন। লক্ষণগুলো তো সব দেখছি, চলতি মতে ক্রিয়েটিভ জিনীয়সের।

জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কী? কতদিন এসেছেন?

মায়লী বললো, 'নাম তো বাবু আজতক জানি না। এসেছেন কুড়ি একুশ দিন। থাকবেন কতদিন তাও বলতে পারি না। বাবুকে একটু ডর লাগে।'

'কেন?'

'হরবকত গোডিডর ঘোরে আছেন!'

'গোডিড!'

'ওই দারু আর কী। বাবুর আঁখ তো আগুনের মতো লাল। ডর লাগে, এই মারে তো এই মারে!'

আমি বললাম, 'বিবিজী তো আছেন। তিনি কি বলেন?'

'বিবিজী তো খালি খান আর দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। বাবু বেড়াতে যান। কভী কভী দিন একলাও যান। আর···আর···।'

মায়লীর সঙ্কোচ দেখে, একটু দ্বিধাই হল। প্রতিবেশীর খবর বোধহয় একটু বেশীই নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যার নিচের তলায় আস্তানা নিয়েছি, ওর সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্তিও হতে চায় না। বললাম, 'আর কী?'

মায়লী বললো, 'গোস্তাকি মাফ হয় বাবুজী, দু'জনে থেকে থেকে খুব ঝগড়া করে।'

'কেন?'

'ঈশ্বর জানেন বাবু, কিনো ঝগড়া করে। হায় বাবা, কি ঝগড়া মালুম

হয় কি, ঘরে দরজা বন্ধ করে মারপিট হয়।'

কী বিপদ! শুনেই যে প পলার ভিউ-এর নিবিড় মিশ্রণীমের আনন্দ শুকিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ বাথরুমের ভেতর থেকে দরজায় টক্‌টক্‌ শব্দ হল। অবাক হয়ে মায়লীর দিকে তাকালাম।

মায়লী বললো, 'পার্বতী বাইরের দরজা দিয়ে আপনার জন্যে বাথরুমে গরম পানি নিয়ে এসেছে। আপনি যান। আমি চা নিয়ে আসছি।'

সে বেরিয়ে গেল। আমি বাথরুমের দরজা খুলে দেখি গরম জলের গামলা থেকে ধোঁয়া উঠছে। পার্বতী চুপ করে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বাথরুমের বাইরের দরজাটা টেনে দিয়ে গেল। কিন্তু মনটা গেছে অস্বস্তিতে ভরে। কর্তাগিন্নীর সংবাদ সুসংবাদ বলে মনে হল না। তবে শিল্পী, চিত্রকর, এইটুকু হল সান্ত্বনা, এবং সব থেকে বড় কৌতূহল।

তবু যেন স্বস্তি পেলাম। গরম জলে পরিষ্কার হয়ে, জামা-কাপড় বদলে, চা রুটি খেয়ে যখন পুব-উত্তর কোণে কাঁচের জানালা ঘেঁষে বসলাম' মনটা যেন নিবিড় এক মধুর আলস্যে ভরে উঠলো। মনে হল, আমি যেন হিমালয়ের অসীম কোণে ডুব দিয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছি, লেবং-এর জিহ্বা-সদৃশ মাঠ, ব্যারাকের মতো বড় ঘরের চালা, ঘোড়দৌড়ের বৃত্ত আর আশেপাশের চা বাগান। সব গভীর কুয়াশায় ডুবে গেছে। নীল কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে। দূর থেকে দেখছি যেন চারিদিকে পাহাড়। মাঝখানে এক বিশাল নীল হ্রদ। অথচ পাহাড়ের শীর্ষে সোনালী রোদের খেলা। দূরের একটি পাহাড়ের গা গত বছরে কয়েক শো ফুট চৌহদ্দি নিয়ে ধ্বসে গেছে। সেখানে অভ্র কুচি মেশানো পাথরের গা শানের মতো চক্‌চক্‌ করছে। লনের ঘাস চিক্‌চিক্‌ করছে রোদে। রং বেরঙের ফুলগুলো দুলছে। প্রজাপতিরা উড়ছে। ঝিঁঝিরা ডাকছে। তবু কী অসীম নীরবতা। এ নৈঃশব্দ্যকে যেন স্পর্শ করা যায়। যাকে কাজ বলি, ব্যস্ততা বলি, প্রাত্যহিকতা বলি, সে-সব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। জীবনের সকল তুচ্ছতা যেন বিলীন হয়ে গেছে। যেন নতুন জন্ম নিয়ে, নিবিড় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছি। এই মুহূর্তের এই নতুন জন্মকে নিয়ে কী করতে হবে, কিছুই জানি নে। ভাষা নেই, ব্যাখ্যার ক্ষমতা গেছে হারিয়ে। বুকের স্পন্দনে কেবল বাজছে, কী অপূর্ব। কী অপরূপ। কি করব, আমার

তো দেবতা-বোধ নেই, কিন্তু হিমালয়কে যেন আমি দেখছি, মহান মৌন গম্ভীর শ্রেষ্ঠ একজন। মহৎ বিশাল রহস্যময় কিন্তু প্রসন্ন। যেন কী এক আশ্চর্য অস্তিত্বকে অনুভব করি। যেন কী এক মহাপ্রাণকে দেখতে পাই। আর ইচ্ছে করে, আমি জিজ্ঞেস করি, 'আমাকে তুমি কি নির্দেশ দাও। আমাকে তুমি কী করতে বলো।'...

কোথায় কোন্ গভীরে যেন ডুবে গেলাম। কিন্তু চৈতন্য হারালো না। দেখতে পেলাম, নিচের গভীর লেবং-এর ওপর থেকে কুয়াশা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। যেন কেউ ধীরে তার কুয়াশার আলখাল্লাটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। লেবং ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। কিন্তু উত্তরের ধূসর আকাশের দরজা তেমনি বন্ধ। কাঞ্চনজংঘার কপাট খোলা নেই।

হিমালয়ের এ সকল কিছু কি আমাদের জীবনেরই প্রতীক ?

সহসা পায়ের শব্দ পেলাম। ফিরে তাকিয়ে চমকেই উঠলাম। একজন যুবতী মহিলা। উঠে দাঁড়ানো উচিত কি না ঠিক করবার আগেই কানে এল, 'নমস্তে।'

সুগোল রক্তাভ টিপ্ ঢাকা দিয়ে, দুটি কাঞ্চনাভামায়ী করতল জড়ো হয়ে কপালে উঠলো। অবাক্ হয়ে ভাবলাম, একি পার্বতীই যুবতী হয়ে এল নাকি ? লাল ব্লাউজ, নীল রং শাড়ি, নাকে একটি ছোট্ট পাথর বসানো নাকছাবি। ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে সর্পিণী বেণী দোলানো সামনের দিকে। পায়ে একজোড়া জীর্ণ রঙীন স্লীপার। পার্বতীর মতোই একরাশ বেলোয়ারী চুড়ি ফরসা নিটোল হাতে।

আমার অপরিচয়ের বিস্মিত দৃষ্টি দেখেই বোধহয় মেয়েটির রক্তিম মুখ আরো রক্তিম হল। তারপরেই পিছনে দেখি পার্বতী। সে কি একটা বলে উঠলো। মেয়েটি তাড়াতাড়ি আমার টেবিলের ওপর থেকে চায়ের কাপ-ডিশ তুলে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু পার্বতী গেল না। দরজার আড়াল থেকে ওর কাপড়ের অংশটা আমি দেখতে পাচ্ছি। তারপর একটু একটু করে মুখের একটি পাশ ও একটি চোখ জেগে উঠলো দরজার পাশে। শুনলাম, 'মেরো দিদি প্রেমবতী'। মুখটি আবার অদৃশ্য হল। মেরো দিদি মানে আমার দিদি, প্রেমবতী নামটিও মায়লীর মুখে শোনা ছিল। দরজার দিকে তাকিয়েই তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তোমার দিদি তো দেওদার কুঞ্জে কাজ করে। এল

কী করে?'

আবার একটু একটু করে মুখখানি জাগলো। সামনের বড় ঘরটা প্রায় অন্ধকার বলে বোধহয়, পার্বতীর আধখানি মুখ ছবির মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু পুরোটা নয় কেন বুঝতে পারছিনে। বললো, 'এখন ওকে ছ'ঘণ্টা ছুটি দিয়েছে, তাই বাড়ী এসেছে।'

'ও'।

আবার শুনতে পেলাম, 'কাপ-ডিশ মো লে আরে যাতী রাহা, দিদি বোলি, ও লে আয়গী।'

কথার মধ্যে একটু কৈফিয়তের সুর। যদিও পার্বতী আমার থেকে ভাল হিন্দী বলে। আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

ও আবার বললো, 'গোস্তাকি নেবেন না।'

আমি বললাম, 'না না, তাতে কী হয়েছে।'

পার্বতী আবার অদৃশ্য হল। ভাবলাম বোধহয় চলেই গেল। ভেবে মুখ ফেরাতে যাব, আবার ওর মুখ অর্ধেক ভেসে উঠলো। বললো, 'মা বাজারে গেছে।'

বলতে হল 'আচ্ছা।'

তারপরেই আবার, 'আপনার এখন কিছু চাই?'

যেন চাইলেই পার্বতী খুশি হয়। কিন্তু কি চাওয়া যায়? অবিশ্যি একটি তৃষ্ণা আমার সময় অসময় মানে না। বললাম, 'চাই।'

তৎক্ষণাত পার্বতী পুরোপুরি বেরিয়ে, দরজায় একেবারে অ্যাটেনশন্। বললো, 'কী।'

বুঝতে পারি, ওর মায়ের শিক্ষা এসব। অতিথিকে আপ্যায়ন এবং খুশি করার থেকেও, পার্বতীর ছেলেমানুষ মনে, উৎসাহের আধিক্যও বেশী। পরিশ্রমটা ওর কাছে এখনো আনন্দের। আমি বলে উঠলাম, 'চিয়া চিয়া।'

ও একমুহূর্ত আমার দিকে বড় বড় চোখে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। পরমুহূর্তেই হেসে উঠে, দাঁত দিয়ে ডুরে শাড়িটার আঁচল কামড়ে ধরে, ধুপধাপ করে দৌড়ে চলে গেল। খুব খুশি!

ও চলে যাবার পরেই, নিখুঁত বাঙালী মেয়ের চীৎকার শুনতে পেলাম, 'ধাক্কা দিস না লক্ষ্মীটি, পড়ে যাব।' তারপরেই কয়েকটি মেয়ে গলার প্রবল হাসি ও কলরব যেন আমার দক্ষিণ দিকের জানালাতেই একেবারে ফেটে পড়লো। দক্ষিণ দিকে তো পাহাড়ের পাঁচিল। ফুট পঞ্চাশ ওপরে একটি

বাড়ি, তার ওপরেই ম্যাল রোড। শব্দটি কি ম্যাল রোড থেকেই এল? না কি এ বাড়িতেই কেউ এসে ঢুকলো?

উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানলায় উঁকি মেরে উঁচুতে তাকালাম। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। তিনটি রংবেরঙের শাড়ি প্রায় উড়তে উড়তে নেমে আসছে ওপর থেকে। তাদের লক্ষ্য পপ্‌লার ভিউ কিনা জানিনে, কিন্তু চলটা অনিবার্যভাবে এদিকেই। যদিও পাহাড়ের গায়ে পপ্‌লার ভিউ-এর পাঁচিল খাড়া করা আছে এবং অবিশ্বাস্য এই কারণে, চিনতে অসুবিধা হল না, সেই তিন শ্রীমতী। এরা এখানে এল কী করে?

আমার ভাবনা শেষ হবার আগেই, তিনজন একেবারে পাঁচিলের ওপরে। ছোটটি, যার নাম ইভা, সে বলে উঠলো, 'দিদি ঝাঁপ খাব?'

বলে কী! অমন নিটোল হাত-পাগুলো যে ভেঙে চুরমার হবে! ভয়ে আগে আমিই বলে উঠলাম, 'দোহাই, ও কাজটি নয়, তার চেয়ে একটু ঘুরে নেমে আসা ভাল।'

ওরা তিনজনেই থমকে গেল। অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে তার পরে তিনজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। প্রথমে একটি গলায় কুক্‌ করে একটি শব্দ হল। দ্বিতীয় গলায় খিকখিক। তারপর তিন গলাতে খিলখিল!

হাসি একটু সামলে বড়টিই সম্ভবত বললো, 'আপনি তো আমাদের সঙ্গে—?'

আমি বলে উঠলাম, 'এক গাড়িতেই এসেছি।'

ওরা আবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে একটু যেন লজ্জিত হয়ে উঠলো। কিন্তু নিঃশব্দ হাসিতে মুখে আঁচল চেপে ফুলতে লাগলো।

মেজ জিজ্ঞাসা করলো 'আপনি, বুঝি এ বাড়িতে এসে উঠেছেন? বেশ সুন্দর বাড়িটা!'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনারা এখানে এলেন কী করে? ম্যাল রোড থেকে সোজা ঝাঁপ দিয়ে নাকি?'

ওরা তিনজনেই প্রায় সমবেত গলায় শালিকের মতো কিচির মিচির করে উঠলো, 'না না, আমরা তো ওই বাড়িটার, ওই যে ওপরে দেখতে পাচ্ছেন, ওই বাড়িটায় এসে উঠেছি।'

মানে আমার মাথার উপরেই? আসবার সময় যে বাড়িটার পাশ ঘেঁষেই এলাম? আশ্চর্য, টের পাই নি তো!

ইভা বললো, 'বাড়িটার নাম রূপকুমারী।'

হেসে বললাম, 'ঠিক বাড়িতেই এসে উঠেছেন।'

ওরা তিনজনেই হেসে উঠলো। বড় বললো, 'গোছগাছ করেই, চা খেয়ে এ বাড়িটা দেখবার লোভ হল। আমাদের জানালা দিয়ে এ বাড়িটা ঠিক ছবির মতো দেখাচ্ছে।'

বললাম, 'তা বেশ করেছেন। কিন্তু দোহাই, ঝাঁপ খাবেন না।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো, ইভার নজর দোতলায়। সে নজরে শংকা, এবং যেন সম্মোহনে স্থির। বড় বোনের আঁচলটা নিয়ে শুধু টানছিল। তার-পর তিনজনেরই দৃষ্টি ওপর দিকে গেল। দোতলায় আমার দৃষ্টি যাচ্ছে না বটে। অনুমান করতে পারছি, শিল্পী মহোদয় ওখানে। জানালায় এসে দাঁড়িয়েছেন নিশ্চয়। তারও স্থির নিবদ্ধ চোখ নিশ্চয় তিন বোনের উপর পড়েছে।

বড়বোন একবার আড় চোখে আমার দিকে তাকালো। আবার ওপরের দিকে। পরমুহূর্তেই আমার দিকে ফিরে বললো, 'কোন্‌খান্‌ দিয়ে নামবো বলুন তো?'

বললাম, 'পশ্চিম দিকে এগিয়ে যান, গেলেই রাস্তা পাবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বড় বোন বলে উঠলো, 'ওঠ্‌, চল, ওদিকটায় গিয়ে রাস্তাটা দেখি।'

তিনজনেই দেখলাম ভয়ে ভয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে গুটি গুটি হাঁটা ধরলো। আমার চোখের আড়াল হবার পর মনে হল, ওদের একটু সাহায্য করা দরকার। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। ফিরতেই দেখি, পার্বতী চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, 'টেবিলে রাখ, আমি আসছি।'

পার্বতী বললো, 'ঠাণ্ডা হো জায়েগী।'

বললাম, 'এখুনি আসছি।'

বলে পা বাড়াতে গেলাম। পার্বতী বলে উঠলো, 'উনলোগ কওন হ্যায়?'

একটু যেন বিস্ময় আর অখুশি পার্বতীর পার্বত্য মুখে। কালো চোখের তারায় তীব্র অনুসন্ধিৎসা। ভেবে দেখলাম, অন্যায় কিছু নয়। এখন পার্বতীই আমার কর্ত্রী, আমার ভালো-মন্দের দায়িত্ব তার হাতেই। ছেলে-মানুষ? তাতে কী। ও যদি বড় হত তবে তো নীরব থাকতো। বাড়িতে আমার ছোট বোন যা করতো, ও ঠিক তাই করছে। তাতে বোঝা গেল,

মনের পথ সমতলে আর পাহাড়ে একই রঙ্গে চলে। পার্বতী যে এখন আমারও কোয়ারটেকার। কারণ, ভেবে দেখ, মা-ও বাড়িতে নেই, বাজারে। দিদি তো এ বাড়ির কেউ নয়, সে দেওদার ভবনের লোক। আমার যদি একটা বিপদ-আপদই ঘটে!

বললাম, 'ওরা আমার কেউ নয়। বেড়াতে এসেছে। চল দুজনেই যাই।'

এ আমন্ত্রণে একটু যেন খুশি হল। ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়ে কাপ টেবিলের ওপর রেখে, ডিশ ঢাকা দিল। ওদিকে অ্যানটি রুমে পৌছবার আগেই, মেয়ে গলার একটি তীব্র আর্তনাদ শুনলাম। ছুটে বাইরে বেরিয়ে দেখি, তিন জনেই এদিকে ছুটে আসছে। মেজটি চেঁচাচ্ছে আর জোরে হাত ঝাড়া দিচ্ছে।

উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

কাছে এসে হাত তুলে দেখালো, বললো, 'এই দেখুন, হাতে জেঁাক ধরেছে। কী হবে আমার?'

তাই তো! আমারও যেন গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠলো। হাত দিতে পারলাম না। ইভা এবং বড় বোনেরও আমার মতো অবস্থা; ওরা নিজেদের হাত-পা অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পার্বতী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে টান মেরে জেঁাকটা খুলে নিল। ছোট্ট ঘাসের ডগার মতো সরু সবুজ জেঁাক। নিয়ে আবার দূরের ঘাসেই ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠলো পিছন থেকে। সবাই ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, প্রেমবতী। পার্বতীও হেসে উঠে, দিদির ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবং দু'জনেই হাসতে লাগলো।

মেজটি একবার ভালো করে জেঁাক ধরা জায়গাটা দেখে নিল। রক্ত বেরোয় নি, ঈষৎ নুনছাল উঠে যাবার মতো হয়েছে একটি বিন্দুতে। আর একটু সময় পেলেই মোক্ষণ শুরু হত। তারপর ওরা তিন বনেও হাসতে আরম্ভ করলো। আমার মনে হল, কান দুটোতে তালা লেগে গেল প্রায়।

হঠাৎ ওরা তিন বোনের হাসি থামালো। পাহাড়ী বোনেদের হাসি আগেই থেমেছিল। তিন বোন নিজেদের দিকে তাকিয়ে, একটু লজ্জিত হয়ে উঠলো। বড় বললো, 'আপনি খুব যা-তা ভাবছেন নিশ্চয়।'

'কেন?'

'এই চেনা নেই, পরিচয় নেই, অমনি চলে এলাম, আর হা হা করে হাসছি!'

মনে মনে ভাবলাম, সত্যি কি তাই? আগেই কুয়াশায় ডোবা লেবং-এর

দিকে তাকিয়ে পর্বতের ঝিল্লিস্বরের সঙ্গে যেন আমিও নিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই এই প্রাণ-চঞ্চল হাসির উচ্ছ্বাস। দেওদার ভবন আর গভর্নরের বাড়ির উঁচু 'নচুর মাঝখানে নানান বনস্পতির ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্রচ্ছটা, প্রজাপতিদের ওড়া-ওড়ি ছুটোছুটি, ফুল ঝিকিমিকি, প্রাণবেগের ছন্দে বেজে ওঠা, বার্চহিলের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত এই হাসি, আমার নিবিড় তন্ময়তায় কেনো নিরানন্দ এনেছে কি? মনে তো হয় না। বরং সেই নিবিড়তার মধ্যে যেন একটা ধ্বনি আবর্তিত হচ্ছিল। ওদের হাসির বেগে সেটাই বেজে উঠলো। বললাম, 'তাতে বরং সৌভাগ্যই মানছি। পাখা-ওয়ালা প্রজাপতিগুলো হাসতে পারে না, আপনারা পারেন এইটুকুই যা তফাত।

ওরা তিনজনেই লজ্জা পেল, খুশি হল, একটু দ্বিধাও বোধহয় হল। সব-চেয়ে ছোট ইভা তাই ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠলো, 'ইস্!'

বললাম, 'সত্যি।'

তিনজনেই হাসলো আবার। ওদিকে দুই পার্বত্য ভগ্নী কুঞ্চিত ভ্রূ, অথচ একটু অনুসন্ধিৎসু হাসি নিয়ে এই দৃশ্য ও আলাপন লক্ষ্য করছে।

মেজ বলে উঠলো, 'দেখব একটু এ বাড়িটায় ঢুকে?'

বললাম, 'স্বাচ্ছন্দে।'

কিন্তু ওরা তিনজনেই থমকে গিয়ে একবার ওপরের দিকে তাকালো। যদিও সেখান থেকে কিছুই দেখা যায় না। দেখলাম, ওদের চোখে একটু আগের শঙ্কা জিজ্ঞাসা আবার ফিরে এসেছে। বললাম, 'কিন্তু দোতলা যদি দেখতে চান, সেটা আপনাদের দায়িত্ব।'

বড় তাড়াতাড়ি ওর সেই গতকালের কলকাতায় পরা বাসি কাজল মাখা চোখ দুটিই বড় বড় করে বললো, 'সেই কথাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। ওরা কারা? ভদ্রলোকের মুখটা কি মস্ত বড়!'

মেজ বললো, 'আর চোখ দুটো লাল টকটকে।'

ইভা বললো, 'আর ওই মেয়েটি— মানে, ভদ্রমহিলা ওঁর বউ বুঝি?'

তিনজনের গলাই বেশ উচ্চগ্রামে বাঁধা। আমি একটু বাইরের ঘরটার দিকে পিছন ফিরে দেখে দিলাম। কারণ, দোতলার সিঁড়িটা ওই ঘরেরই কোণের দিকে। গলা একটু নামিয়ে বললাম, 'ভদ্রলোক একজন আর্টিস্ট, এখনও আলাপ হয় নি, শুনেছি মাত্র। আপনাদের মতো দূর থেকে একবার দেখেছি, ওঁরা কর্তা গিন্নিতে আছেন।'

ইভা বলে উঠলো, 'ওরকম দেখতে কেন ভদ্রলোককে।'

এ কথার জবাব আমার জানা ছিল না। বড় বলে উঠলো, 'তুই থাম ইভা। আচ্ছা, আর্টিস্ট মানে, কিসের?'

'চিত্রশিল্পী। মানে ছবি আঁকেন, পেন্টিং যাকে বলে।'

মেজ বললো, 'বাড়ির ভেতর ঢুকলে ওঁরা কিছু বলবেন না তো?'

বললাম, 'অন্তত নিচের তলায় ঢুকলে তো না বলাই উচিত। কারণ, এটা নাকি আপাতত আমারই অধিকারে।'

ইভা বললো, 'আমি ঢুকছি। চুরি তো করি নি।'

সে-ই আগে পা বাড়ালো। পিছে পিছে দুই বোন। ওদিকে, পার্বতী আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে। প্রেমবতী নতমুখী। পার্বতীর চোখ দেখে বোঝা গেল, তিনটি মেয়ের এ রকম অবাধ প্রবেশ ওর ভালো লাগছে না। আমার চোখের দিকে দেখে, আমার মনোভাব বুঝতে চাইছে।

বললাম, 'পার্বতী, এস। ওরা তোমাদের এ বাড়িটা দেখতে এসেছে।'

পার্বতী দিদির দিকে একবার তাকালো। প্রেমবতী ঠোঁট টিপে হাসলো বোনের দিকে তাকিয়ে। একবার আড়চোখে দেখলো আমাকে। তারপরে পার্বতীর কাঁধে একটু ধাক্কা দিয়ে, সম্ভবত বললো, 'যা না।'

জবাবে পার্বতী যেন কী বললো। প্রেমবতী হেসে ফেললো, আর কিছু একটা বললো। পার্বতীর মুখ কিন্তু গম্ভীর। আমি প্রেমবতীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

প্রেমবতী বললো, 'পার্বতী বলছে এরা আপনার কেউ নয় তো, জানলো কি করে আপনি এখানে আছেন?'

মরেছে! এ যে রীতিমতো জবাবদিহি! তাও কেয়ারটেকারের মেয়ের কাছে? একটু বিরক্ত হয়ে উঠলাম। বাড়াবাড় ঠেকলো। তাকালাম। কঠিন কথাই কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পার্বতীর প্রায় শিশুর মতো গম্ভীর করুণ মুখ দেখে কিছু বলতে পারলাম না। আমারও প্রেমবতীর মতো হাসি পেতে লাগলো। বললাম, 'ওরা এসেছে ওই রূপকুমারী হাউসে। গাড়িতে ওদের সঙ্গে আলাপ। ওরা আসলে এমনি এসেছিল তোমাদের এ বাড়িটা দেখতে। আমার সঙ্গে দেখা হবে, এটা জানতো না। দেখা যখন হল, তখন ওরা তো আমার মেহমান।'

প্রেমবতী আবার খোঁচা মারলো পার্বতীর গালে। চোখ পাকিয়ে চাপা গলায় ধমকে কিছু বললো।

কথাগুলো বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে যেন। পার্বতী বাড়ির ভিতর দিকে পা বাড়ালো। প্রেমবতী তাড়াতাড়ি আমাকে বললো, 'ওর কসুর নেবেন না। ও একটু ওই রকম, আর ছেলেমানুষ তো।'

তা বুঝতেই পেরেছিলাম। বললাম, 'আমার ওকে খুব ভাল লাগছে, ও খুব ভাল মেয়ে।' প্রেমবতী হেসে চোখ নামালো। আমি তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলাম। ভিতরে তিন বোনের গলাও পেলাম।

শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কোথায় তা বুঝতে পারছি নে।

বাইরের ঘরের পর খাবার ঘর, সেটাও কাঁচের জানালায় ঘেরা। পাশে আর একটি ছোট ঘর, আর এক অংশে যাবার পথ নির্দেশ করছে। সেখান থেকেই আবিষ্কৃত হল, তিন বোনেই রান্না ঘরে গিয়ে জুটেছে। পার্বতীকে নানান কথা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আমাকে দেখে বেরিয়ে এল। এ-ঘর ও-ঘর করে, আমার ঘরটায় ঢুকে, তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'আঃ, কি সুন্দর ঘর! সব কাঁচ দিয়ে ঘেরা। আমাদেরটা এরকম নয়।'

ঘরে চেয়ার সোফার অভাব ছিল না। ওদের বসতে বললাম। বলবার আগেই প্রায় অসঙ্কোচে যে যেখানে পারলো, বসে পড়লো। এর পরে স্বভাবতই জিজ্ঞেস করতে হল, 'একটু চা হোক?'

ইভা এক পায়ে খাড়া। ঘাড় কাত করে বলে উঠলো, 'হুম্।'

মজ ঠোঁট কুঁচকে বললো, 'হুম। ওদিকে বাবা-মা ভেবে ভেবে মরুক।'

বড় বললো, 'হ্যাঁ, দেরি হয়ে যাবে। আজ থাক, আমরা তো রোজ আসতে পারব।'

সর্বনাশ! দরজার কাছে দাঁড়ানো পার্বতীর দিকে চকিতে একবার দেখে নিলাম। সমতলের নগর-কন্যাদের যে তার একটুও ভালো লাগছে না তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু ওর চোখে আবার কৌতূহল।

বললাম, 'নিশ্চয় আসবেন।'

ইভা বললো, 'আচ্ছা আপনার নাম কী?'

নাম বললাম, এবং জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই, বড় নিজের থেকেই বললো, 'আমার নাম মল্লিকা।'

মেজ বললো, 'আমার নাম মালতী।'

ছোট বলার জন্যে মুখ খোলবার আগেই আমি বলে উঠলাম, 'মল্লিকা মালতীর সঙ্গে ইভা তো ঠিক মিলছে না?'

তিনজনেই একটু অবাক হয়ে তাকালো। মল্লিকা বললো, 'ইভা আমাদের

মাসতুতো বোন। কিন্তু আপনি ওর নামটা জানালেন কী করে?'

ইভার দু-চোখ যেন বিস্ময়ে ফেটে পড়ছে। আমি একটু রহস্যময় নীরবতায় ঠোঁট টিপে হাসলাম।

ইভা বলে উঠলো, 'বলুন না তাড়াতাড়ি।'

বললাম, 'অত ব্যস্ত কেন, বলছি। যতদূর মনে পড়ছে—।'

বলে ভ্রূ জোড়া কুঁচকে, মুখ বিকৃতি করে, একটু স্মৃতি হাতড়াবার ভান করলাম। ওদের তিনজনের বোধ হয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ইভার তো বটেই। বললাম, 'যদ্দুর মনে পড়ছে, বরুণকে যে গবেট বলেছিল তার নামই ইভা।'

তিনজনের গলাতেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ ফুটে উঠলো যেন। আরক্ত ইভা তো একেবারে থ। তিনজনে তিনজনের দিকে একবার তাকালো। তাতে বিস্ময় এবং সন্দেহ দুই-ই ছিল।

মল্লিকা প্রায় চুপিচুপি গলায় বললো, 'কী করে জানলেন?'

বললাম, 'আড়ি পেতে নয়। বোধহয় কার্সিয়ং-এর ক্যাটারিং-এ ভিড়ের মধ্যে চা খেতে খেতে—'

ইভা বলে উঠলো, 'এ মা! ছি!'

বলে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকলো। মল্লিকা আর মালতী খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আমি বললাম, 'আহা। তাতে কি হয়েছে! কিন্তু মিটমাট হয়েছে তো?'

ইভা মুখ ঢেকেই রইলো। মল্লিকা আরক্ত হয়ে বললো, 'চান্স পায়নি।'

তৎক্ষণাৎ ইভা মুখ খুললো, 'ছাখো বড়দি, ইয়ার্কি করো না বলছি। তাহলে আমি সব ফাঁস করে দেব।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'উঁহু, ফাঁস করবার কিছু দরকার নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওরা উঠেছে কোথায় সে কথা কিছু বলেছে? অনেক দূরে নাকি?'

এবার তিনজনেই বোবা। সহসা লজ্জা ও সঙ্কোচে, তিনজনের অবস্থাই সমান। কেউ আর আমার দিকে সহজে তাকাতে পারছে না।

আমি গম্ভীর ভাবেই বললাম, 'মানে আর কিছু নয়, ওরা কাছে-পিঠে থাকলে একটু গান, মাউথ অর্গানের বাজনা-টাজনা শোনা যেত। এই আর কী।'

তিনজনের আরো গুটিয়ে যাওয়াটা আমার কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে

উঠলো। ভিতরে একটা হাসির প্লাবন পাক খেতে লাগলো। এবং শেষ পর্যন্ত হাসির বেগ চেপে রাখা গেল না। ওরা তিনজনেও হঠাৎ হাসির পাগলাঝোরার প্লাবনে ফেটে পড়লো। মনে হল গোটা পপ্‌লার ভিউ বাড়িটাই হাসিতে কাঁপছে। এমন কি পার্বতীর অবুঝ বিস্মিত মুখেও, ছোঁয়াচে ব্যাধির মতো হাসি ছড়িয়ে পড়লো। নীল পাহাড়ের শীর্ষে শীর্ষে রক্তিম রোদও যেন হাসছে।

দুটো দিন কোথাও বেরুলাম না। প্রত্যহের অনেক কোলাহল, অনেক ব্যস্ততা, জটিলতা, তিক্ততার বাইরে এসে বার্চহিল রোডের এই নির্জনতা, হিমালয়ের এই আরণ্যক স্তব্ধতায় ডুবে গেলাম। এই দুদিনের মধ্যে কাঞ্চনজংঘার সঙ্গে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাত্র দুবার দেখা হয়েছে। যেন শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে দিনে একবার। কয়েক মুহূর্তের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছে। দর্শনার্থীদের একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে। অনেক প্রার্থনার ব্যাকুলতায়, একটু উন্মোচন। এবং আশ্চর্য, আকাশ জোড়া সেই দরজা, সূর্যোদয়ের সময়েই একটু খুলেছে। তারপরে, সারাদিনের মধ্যে ঘষা কাঁচের মতো ধূসর আকাশটা গম্ভীর ভাবলেশ-হীন অটুট থেকেছে। বিশ্বাস করা যায় না, উত্তরের ওই ধূসরতার কোথাও সেই আশ্চর্য দরজা রয়েছে।

সেই আশ্চর্য দরজা, যার অন্তরালে রয়েছে তিব্বতীয়দের সকল পার্থিব সংসারের খাজাঞ্চিখানা। ওদের ভাষায় কাং-ছেন-দ্‌-জাং-গা, যার থেকে আমরা উচ্চারণ করছি, কাঞ্চনজংঘা। কাং-ছেন-দ্‌-জাং-গা-এর বাংলা মানে দাঁড়ায় 'বরফ্‌-বড়-খাজাঞ্চিখানা-পাঁচ।' কাঞ্চনজংঘার পাঁচটি শিখরের তারা এই নাম দিয়েছে। যে উচ্চতম শিখরটি আছে, সূর্যাস্তের রক্তিম ছটায় সে সোনার বর্ণ ধারণ করে। তাই সে সোনার খাজাঞ্চিখানা। দক্ষিণের চূড়া সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত ধূসর, সূর্য ঝলক লাগলেই রুপোলী হয়ে ওঠে, সে রুপোর খাজাঞ্চিখানা। বাকী তিনটি চূড়াকে বলা হয়েছে রত্ন, শস্য আর অস্ত্রের খাজাঞ্চিখানা। বিশাল হিমালয়ের চূড়ায় তারা তাদের সকল পার্থিব জীবনের প্রতীক দর্শন করেছে। কাঞ্চনজংঘার কাছে তারা আবহমান কাল ধরে প্রার্থনা করে এসেছে জীবনধারণের সকল সার, ধর্ম, খাদ্য, ঐশ্বর্য। কাঞ্চনজংঘা তাদের কাছে সকল রাজার রাজা। বাস্তব জগতে মানুষের সকল শাসন মেনে নিয়েও কাঞ্চনজংঘা রাজ্যের বশংবদ প্রজা তারা। তাই পূর্বদিকে শিখরের নাম দিয়েছে

পানদিম। যার অর্থ রাজমন্ত্রী। কাঞ্চনজংঘার পাশে পান দিম রাজমন্ত্রীর মতোই দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষ বোধহয় এ জন্যেই বিচিত্র, এ জন্যেই, মহৎ, সে অরণ্যে, পর্বতে, সমুদ্রে নদীতে বিশ্বপ্রকৃতির সকল কিছুর মধ্যে জীবনের অর্থকে খুঁজেছে। তার সকল পার্থিব জগতের মধ্যে তৃষ্ণার্ত হৃদয় অপার্থিবকে সন্ধান করেছে।

দুদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যে কাঞ্চনজংঘাকে দেখেছি। কিন্তু সেই পাঁচ খাজাঞ্চিখানায় একক মহারাজ যেন বড় কৃপণ। চোখ মেলে দেখবার আগেই দূর আকাশে, নিঃশব্দে তার ধূসর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এমন কথা মনে করতে পারিনি, ধূসর দরজার আড়ালে সে মজা করে হাসছে। বরং মনে হয়েছে তার সময় নেই। নির্বিকার মহাকালের মতো, সে যেন কি এক মহান কর্মে ব্যস্ত। এই পৃথিবীর মতোই, সময় নেই, সময় নেই।

এই দুদিন কোথাও না বেরুনোয় আমার সকল স্নায়ু তৃপ্ত শান্ত। গভীর অবগাহনের একটি প্রশান্তি যেন আমাকে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু খুশিতে চঞ্চল দেখছি পার্বতীকে। সে আমাকে বারে বারে জিজ্ঞেস করছে বটে, 'আপনি কোথাও বেড়াতে যাবেন না?'

হয়তো একটু সন্দেহ হয়েছে, আমি বেড়াবার পথঘাট জায়গা চিনিনে বলে বেরুতে পারছি নে। তাই বলেছে, 'মলে সবাই বিদেশীরা বেড়াতে যায়। আপনি কি মল চেনেন না?'

বলেছি, 'চিনি। সেখানে যেতে ইচ্ছে করে না।'

পার্বতী ওর সরল পার্বত্য চোখে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে। হয়তে ভাবে, আমি দারু খাচ্ছিনে, ছবি আঁকছিনে, সঙ্গে বউ নেই, তবু শুধু ঘরে আর বাগানে বসে বসে কখনো বই পড়ে আমার সময় কাটছে কি করে। অবিশ্যি আর একটা গুরুতর প্রশ্ন ওর চোখের ওপারে লুকিয়েছিল। আমি দেখতে পাই নি। গতকাল সন্ধ্যায় সেকথাটাও আমাকে জিজ্ঞেস করলো পার্বতী, 'ওরা আসবে বুঝি? তাই কোথাও যান না?'

ওরা? কাদের কথা বলছে পার্বতী। ওর দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়েছি। ও একটু লজ্জা পেয়েছে, একটু বোধহয় ভয়ও হয়েছে মনে মনে। তবু দক্ষিণের ওপরে আঙুল দেখিয়ে বলেছে, 'ওই রূপকুমারীর দিদিলোগ্।

কয়েক মুহূর্ত একেবারেই থমকেই গিয়েছি। বুঝতে অসুবিধে হয় নি, ও মল্লিকা, মালতী, ইভাদের কথা বলছে। মনে মনে হেসেছি। ওদের তিন বোনের কথা দুদিনের মধ্যে যে একবারও মনে পড়েনি তা নয়। ওরা আসবে,

এ কথা একবারও ভাবি নি। যদিও আশাটা মোটেই বিচিত্র নয়। যে কোন মুহূর্তেই, বার্চহিল রোডের নির্জন নিঃশব্দ ঝিঁঝি ডাকা পাতা ঝরা রাস্তা, মুখর প্রজাপতিগুলোর কলরবে চকিত হয়ে উঠতে পারে।

আমি অন্যদিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেছি, 'রূপকুমারীর দিদিদের তোমার ভালো লাগে না, না?'

পার্বতী ওর পাহাড়ী সুরে বলেছে, 'কিনো?' বহুত আচ্ছা লাগে!'

কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য কি না, বোঝাবার জন্য ওর চোখের দিকে তাকিয়েছি। ও ওর ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখিয়ে, রক্তাভ ঠোঁট বিস্ফারিত করে হেসেছে। আবার বলেছে, 'কিনো?'

ওর মুখে 'কিনো' শুনে আবার কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেছি মুখের দিকে। এ হাসি, এ চাউনি কি সত্যি কোনো অভিজ্ঞ চতুরা নারীর? একবারও তো তা মনে হয় নি। পার্বতী তো এখনো শিশু, বালিকাই বলতে হবে। ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ও কৈশোরের কলরবহীন স্তব্ধ স্বপ্নের পথে হাঁটছে। তরুণী লাবণ্যের চকিতে জাগরণের জোয়ার, উচ্ছ্বাস কোথাও নেই। চোখে গভীরতা আছে, তাতে এখনো কোনো ঘূর্ণির পাক নেই। আমার সামনে ওর গাম্ভীর্যটা তো আসলে সম্পর্কের শালীনতাকে বাঁচাবার জন্যে! তাই ওটা কপট। আমি ওর হাসি চীৎকারও কম শুনলাম না এ দুদিনে। তবু ওর কথা শুনে চমক লাগে, সংশয়ের ঘোর লাগে।

অথচ সামনে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার নিঃসংশয় হয়েছি। চাতুরী ওর মনের দিগন্তে কোথাও নেই। ও অভিজ্ঞ নারীও নয়। হয়তো ওর জীবনের অভিজ্ঞতা কিছু অসহজ, জটিল। মায়ের স্নেহটুকু মাত্র সম্বল। আর সমস্ত পৃথিবীটাই নিষ্ঠুর, কঠিন। বিনা শ্রমে, মুখের গরাসের একটি কোণও ভরে না। আসলে সবটাই প্রবৃত্তির খেলা। যে-প্রবৃত্তির মধ্যে মা বোন এবং চিরন্তন মেয়েটি বাস করে। দুদিন ধরে, কাছে ও দূর থেকে ও আমাকেই দেখছে এবং আমার কোনো সমস্যা আছে কি না, তারই সন্ধান করে মরছে। যদি আমি বলতাম, 'হ্যাঁ মল্লিকাদের জন্যেই অপেক্ষা করে বসে আছি—' তবে সম্ভবত, রূপকুমারী হাউসে ছুটে যেত তাদের ডাকতে। ও তো জানে না, হিমালয়ের বুকে ডুব দিয়ে আমি জীবনায়নের পথ ধরে চলেছি।

বলেছি, 'এমনি বললাম। আমি রূপকুমারীর দিদিদের জন্যে বসে নেই। এটাই আমার ভাললাগে।'

এর পরে আর ওর মনে কোনো সমস্যা দেখা দিল না। বরং কখন আমি

চিন্না চিন্না বলে উঠবো, সে জন্যে যেন ওর হিয়া থরো থরো। এক এক সময় ইচ্ছে করে, ওকে কাছে ডেকে ছোট্ট কাকলীর মতোই আদর করি কিন্তু ও এমন একটা ভাব করে থাকে যেন, অনেক বড় হয়ে গেছে।

মায়লী এসে কয়েকবার ফোগলা দাঁতে সবুজ শ্যাওলা মুখে অজস্র রেখা ফুটিয়ে বলেছে, 'পার্বতী খালি আপনার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনাকে নিশ্চয় বিরক্ত করছে ?'

আমি বলি, 'না, বিরক্ত কেন ? ও খুব ভাল মেয়ে।'

সে কথা আবার মায়লীকে বলার উপায় নেই। তা হলেই টপটপে শিশির পড়া পাতার মতো তার চোখ দুটি ভিজে ওঠে। বলে, 'মগর বাবু, খারাপ মায়ের পেটে ওরা জন্মেছে। আমি ওদের একটু সুখ দিতে পারি না।'

বলতে আরম্ভ করলে মায়লীর সুদীর্ঘ দুঃখের কাহিনী সহজে শেষ হতে চায় না। ছেলে আর ছেলের বউয়ের উপর অভিযোগই বেশী। গতকাল রাত্রে ছেলে আর বউয়ের মাতাল গানও শুনেছি। সকালবেলা পার্বতী বলেছে, দাদা আর বৌদি খুব রক্সী খেয়েছিল। দুজনে গান করছে, ঝগড়া করছে, কেঁদেছে ইত্যাদি।

মায়লীর শেষ কথা হল, 'পার্বতী বেশী জ্বালাতন করলে ধমকে দেবেন বাবু। ছেলেমানুষ আপনার কাছে একটু আশকারা পেয়েছে, তাই বিরক্ত করতে সাহস পায়।'

বলেছি, 'ঠিক আছে, ওটা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মনে মনে ভেবেছি, সব কিছুরই সম্ভবত একটা ছন্দ আছে। আমার এই নির্জন নিবিড়তার মধ্যে যদি মাঝে মাঝে পার্বতীর আবির্ভাব না ঘটত তবে হয়তো তার ছন্দ নষ্ট হত। এই নির্জনতায় যে এক হাহাকারের অস্তিত্ব আছে, সে হাঁ করে ছুটে আসতো।

ওপর তলার শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে প্রথম রাত্রি প্রভাতেই। প্রথম দিন স্বামী-স্ত্রী কারুর সঙ্গেই আলাপের সৌভাগ্য হয় নি। তাঁরা নিচেই নামেন নি। সেটাও মায়লীর একটা অভিযোগ। ওদের দুবেলার প্রধান খাবারও নাকি ওপরে পৌছে দিয়ে আসতে হয়। নিচের খাবার ঘরে কখনো এসে বসেন না। পার্বতী কিছুতেই ওপরে যাবে না। ওর নাকি সাহেবকে দেখে ভীষণ ভয় লাগে।

রাত্রিবেলা মাথার ওপরে কাঠের ছাদে গুরুভার কিছু পতনের শব্দে চমকে ছিলাম। একবার নয়, কয়েকবার। কিছুটা অনুমান করেছিলাম। শিল্পী মহাশয় হয়তো মত্ত হয়েছিলেন। সকালবেলা চা খেয়ে বাগানে বেরিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কালিম্পং-এর আকাশ থেকে সূর্য উঠেছে। এবং এক মুহূর্তের জন্য কাঞ্চনজংঘার দর্শন পেয়ে, উত্তর দিকেই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম। আবার যদি দরজা খুলে যায়।

উত্তরের দরজা খোলে নি, দোতলার শিল্পী দম্পতির দর্শন পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম, কর্তা-গিন্নী দুজনেই নেমেছেন। দর্শনেই চমকে না উঠে পারি নি। আগের দিন দূর থেকে শিল্পীকে দেখেছিলাম। মুখ দেখেছিলাম। পরদিন সকালবেলা, কালো অলেস্টার গাঁয়ে দেওয়া এবং অসম্ভব চওড়া লোমশ ভ্রূ, ঈষৎ রক্তিম কোটরাগত ছোট ছোট চোখ! মনে হয়েছিল সে চোখে একটা দম্ভ আর বিরক্তি যেন মাথামাখি করে রয়েছে। মুখখানি সত্যি বিরাট নিরেট। আর তাঁর পাশেই শিল্পী-গিন্নি। কী আশ্চর্য অমিল। একহারা ফরসা ঈষৎ লম্বা মুখ, একটি যুবতী। দৈর্ঘ্যে শিল্পীকে ছাড়িয়ে গেছে। দেখেছিলাম, সকালবেলাই ঠোঁটে গাঢ় রঙের প্রলেপ, চোখে কাজল। চুলের গোছা প্রায় রুক্ষ, কপাল থেকে সরানো। একহারা ফরসা দীর্ঘ-দেহিনী যুবতী মহিলার সর্বাঙ্গে এমন একটা চোখ খোঁচানো ঔদ্ধত্য আর তীক্ষ্ণতা ছিল, মনে হয়েছিল স্থূল ভারী গদার পাশে সুদীর্ঘ ঝকঝকে সরু তরবারি। বয়স অনুমান করা মুশকিল ছিল। আন্দাজ করছি পঁচিশ-ছাব্বিশ। চোখের চারপাশে ঈষৎ কালিমার ছায়াই বোধহয় তার চোখের চাউনিকে একটু তিব্র উজ্জ্বল করে তুলেছিল। অহঙ্কারের বালাই ছিল না। মণিবন্ধে শুধু ঘড়ি। নীল শাড়ির ওপরে, একটি সাদা উলের স্কার্ফ কাঁধে ফেলা ছিল মাত্র। শীতে যে কাবু নন মোটেই, বোঝা গিয়েছিল ওঁর হাতকাটা, পেট খেলা জামা দেখে।

শিল্পী বোধহয় আমাকে দেখতে পান নি। গিন্নির সঙ্গে তাই প্রথমে চোখাচোখি হয়েছিল। তিনি স্বামীর গা ঘেঁসে ছিলেন। চোখাচোখি হতেই কেন জানি নে, মনে হয়েছিল, ওঁর চোখ যেন একটা সন্ধিৎসার ঝলক হেনেছিল। আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে ঠোঁট দুটি বেঁকে উঠেছিল। ঘাড় কাত হয়ে গিয়েছিল। তারপরে একবার বলেছিলেন, 'আঃ, কী সুন্দর রোদ উঠেছে।'

তাতে শিল্পীর মুখের একটি রেখাও কাঁপে নি। তাঁর নিরেট মুখখানি নিয়ে সূর্যের দিকেই রুক্ষ গভীর চোখে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু রোদের কথা

বলেই মহিলা আর একবার তাকিয়েছিলেন আমার দিকে, এবং প্রায় অবিশ্বাস্য ভাবে, নিচের ঠোঁটটা উল্টে, কাঁধে একটু ঝাঁকানি দিয়েছিলেন। আমার চেয়ে থাকার অভদ্রতাতে রেগে উঠেছেন, ভেবেছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে সহসা একটি সরু তাজা রক্তাভ ক্ষত দেখেছিলাম ওঁর গালে। আরও আশ্চর্য, মহিলার চোখের কোণে মণি, দেখছিলেন আমাকে, কিন্তু বলেছিলেন সামনেই। ঠোঁট দুটি কুঁচকে উঠেছিল। ভ্রূ-জোড়া চোখ পাকানোর মতো ওপরে উঠেছিল।

পপ্‌লার গাছের কাছে পৌঁছুবার আগেই শিল্পীর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। একই বাড়ির বাসিন্দা, স্বাভাবিক ভদ্রতা বোধেই হাত দুটি আমার কপালে উঠেছিল। মুখ থেকে বেরিয়েছিল, 'নমস্কার।'

ভদ্রলোক যেন ঘুম থেকে উঠেছিলেন, কাঁচা ঘুম ভাঙার মতো একটা হক-চকানো বিরক্তিতে বলে উঠেছিলেন, 'অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ, নমস্কার! আপনি কাল এসেছেন নিচের ঘরে, তাই না?'

গলার স্বর ততোধিক গম্ভীর আর মোটা মনে হয় নি। এবং যা ভয় পেয়েছিলাম, হয়তো কথাই বলবেন না, ঠিক তা নয়। বলেছিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনলাম আপনি একজন—।'

ভদ্রলোক তার আগেই বলে উঠেছিলেন, 'অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আঁকি।'

আবার মুখফুটে কৌতূহলটা প্রকাশ করেছিলাম, 'আপনার নামটি—?'

তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন, 'গণেন, গণেন সেন।'

গণেন সেন নামটা তো পরিচিত। এঁর কিছু কিছু ছবি আমার দেখা ছিল, এবং চিত্রকলা প্রেমিক হিসাবে গণেন সেন সম্পর্কে একটা কৌতূহল বরাবরই ছিল। বিস্ময়ে এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সামনে সেই গণেন সেন, যাঁর আঁকা দেখে অনেক কল্পনা করেছি, যার রঙের আবর্তে অনেকবার ডুবেছি। আমি উচ্চারণ করেছিলাম, 'ও, আপনি। আমার নাম—'

আমার নামটা তাড়াতাড়ি বলেছিলাম। উনি তার জবাবে বলেছিলেন, 'ও, তাই নাকি? ঠিক আছে।'

এমন অদ্ভুত ঢঙের কথা আর কখনো শুনি নি! ওঁকে যতটা নিরেট, গদার মতো ভারী আর ভাবলেশহীন মনে করেছিলাম, কথায় তা একেবারেই নন। কথা খুব তাড়াতাড়ি বলছিলেন। ঘন ঘন ভ্রূ কুঁচকে উঠছিল। কাছাকাছি হতে দেখেছিলাম, মুখের সমস্ত রেখাগুলো যেন প্রতি মুহূর্তে

কাঁপছিল। উনি পূব দিকে মুখ ফিরিয়ে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য। তখন আর কালো বেঁটে চওড়া ভল্লুক-সদৃশ লোকটিকে আমি আগের চোখে দেখতে পারছিলাম না। আমার মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের একটা ঘোর লেগেছিল।

আর যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, একটা ভয়ংকর দর্শন মাতাল লোক আমার মাথার ওপরে রয়েছে। এবং নিজেকে সৌভাগ্যবানই মনে করেছিলাম।

তবু ওঁর স্ত্রীর (নিশ্চয় স্ত্রী?) ভাব-ভঙ্গি অদ্ভুত লেগেছিল। উনি যখন কথা বলছিলেন তখন মহিলাটি অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রূপে টেপা হাসি হাসি মুখে চোখ বাঁকিয়ে ওঁকে দেখছিলেন। গণেন সেন তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। আমি যে দেখছিলাম তাতেও মহিলাটির বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভেবেছিলাম, গণেনবাবু ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। দেন নি বরং ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল ওঁর পাশে যে কেউ আছে, তাই যেন খেয়াল নেই।

আমার সঙ্গে কথা শেষের পর মহিলা বলেছিলেন, 'একটু নিচের দিকে গেলে কেমন হয়? গণেন সেন কোনো জবাব দেন নি। যেন শুনতেই পান নি। আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। ওরকম একটা পরিবেশ থেকে যেন পালাতে পারলেই বাঁচতাম। এবং পায়ে পায়ে, সরতেই আরম্ভ করেছিলাম। দেখেছিলাম, গণেনবাবুর নিশ্চুপ নির্বিকারত্বে, মহিলাটির কাঁধ দুটি বেঁকে উঠেছিল। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিব্রত ভাবটা কাটাবার জন্যেই যেন হেসেছিলেন। ভীষণ অস্বস্তিতে আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। মহিলাটিকে মোটেই স্বাভাবিক মনে হয় নি। বরং সন্দেহ হয়েছিল। মাথায় ছিট আছে কি না। আর ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছিনে। মহিলার প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গির মধ্যে একটা অশ্লীলতা ফুটে উঠেছিল। মুখটা ফিরিয়ে রেখে যদিও গোপন করতে চাইছিলেন তবু গালের কাটা দাগটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

ফিরে যেতে গিয়ে আমার কানে এসেছিল, 'এই এই।'

মহিলার গলা। ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম, উনি গণেন সেনকে পিঠে ধাক্কা দিয়ে ডাকছেন। গণেন বাবুর গলা শুনতে পেয়েছিলাম, 'কী?'

'ডাকলে জবাব দাও না কেন বলতো? নিচে যাবে একটু?'

'তুমি যাও।'

'আমার একলা ভয় করে।'

মহিলাটি যেন ঠিক কচি খুকির মতো ঠোঁট ফুলিয়ে আদুরে গলায় কথা

বলছিলেন। গণেনবাবু কোনো জবাব দেন নি। আবার মহিলার গলা শোনা গিয়েছিল, 'কী ভীষণ জোঁক বাবা এখানকার ঘাসে। বিচ্ছিরি জায়গা। এস না সঙ্গে।'

বলে গণেনবাবুর হাত ধরে টেনেছিলেন। গণেনবাবু ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় খেঁজে উঠেছিলেন, 'আঃ ছেড়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা গণেনবাবুর চওড়া শরীরটা প্রায় দু হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আতঙ্কে যেন চীৎকার করেই উঠেছিলেন, 'ওরে বাবা! এত জোরে ধাক্কা দিয়েছ, পড়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে।'

বলেই ছেড়ে দিয়ে হেসে উঠেছিলেন। চোখ তুলে দেখেছিলেন আমি দেখছি কিনা। আমি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিলাম। যদিও মহিলা টের পেয়েছিলেন, আমি সমস্ত ঘটনাই দেখছি। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি নি। মহিলার কাণ্ড দেখে একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলাম। গণেনবাবু তেমনি ভোটিয়া বস্তির দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়েছিলেন। এবং মহিলাটি আমাকে দেখিয়ে দেখিয়েই, পিছন থেকে গণেনবাবুকে জিভ ভেংচে-ছিলেন। আর হেসে উঠেছিলেন খিল খিল করে।

আর কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। বাইরের ঘরেই, কোণের আয়নার সামনে পার্বতী দাঁড়িয়ে ছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, সে অন্য কোথাও ছিল। সেইমাত্র বাইরের ঘরের আলো-আঁধারি কোণে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর খয়েরী ডুরে শাড়ির আঁচলটা মুখে চেপে হাসছিল, 'ওদের দেখলেন?'

'হ্যাঁ।'

তারপর চোখ বড় বড় করে বলেছিল, 'আপনাকে কী বললো ওই লোকটা? গালাগাল দিচ্ছিল?' বলেছিলাম, 'না, গালাগাল দেবেন কেন? এমনি কথা হচ্ছিল, উনি একজন খুব বড় মানুষ।'

কথাটা আপদেই বিশ্বাস করে নি পার্বতী। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'বড় আদমি হুই? তো দারু কিনো পিতা? মারপিট কিনো করতা?'

সত্যি, কথার কোনো জবাব দিতে পারি নি। দারু খাওয়াটা যদি বা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যেত, মারপিটটা বোঝানো যেত না। আমার নিজের বিস্ময়ও কম ছিল না। দু' জনকেই যেন কেমন অস্বাভাবিক রহস্যময় মনে হয়েছিল। গণেন সেন দম্পতি মারামারি করেন, ভাবতেও অবাক লাগে।

অথচ মহিলার গালের সরু লম্বা ক্ষতটি তো তাজাই। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল।

ভিতরে ভিতরে একটা দিশাহারা বিস্ময়ে, পার্বতীকে ঠিক জবাব দিতে পারি নি। বলেছিলাম, 'ওসব কেন করেন, আমি জানি না। কিন্তু উনি একজন বড় মানুষ, এটা জানি।'

পার্বতী অসহায় বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি আমার কাঁচঘরে গিয়েছিলাম ওঁদের দেখব বলে। তখন আর ওঁরা সেখানে ছিলেন না। হয়তো মহিলার টানাটানিতে নিচেই নেমে গিয়েছিলেন।

দুদিনের মধ্যে আর গণেনবাবুকে দেখতে পাই নি। মহিলাকে দেখেছিলাম। এবং সে দৃশ্য ভোলবার নয়। পরদিন দুপুরের খাওয়ার পাট মিটে যাবার পরেও, খাবার ঘরেই বসেছিলাম। কাঁচের জানালা দিয়ে উত্তরদিকে পাহাড়ের শীর্ষে শীর্ষে রোদের খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ দুপদাপ শব্দে এবং মেয়ের গলার তীক্ষ্ণ চীৎকারে চমকে পিছন ফিরেছিলাম। দেখেছিলাম, লেস্ বসানো সিল্কের শায়া আর একটি সংক্ষিপ্ত অন্তর্বাস মাত্র মহিলার শরীরে। কাঁধে একটি লাল তোয়ালে।

রুক্ষ চুল খোলা। বাংলা ভাষাতেই তিনি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছিলেন, 'পার্বতী, এই ছুকরি, কতক্ষণ ধরে যে গরম জল চাইছি, কী হল?'

বলতে বলতে উনি খাবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে আমাকে দেখে বোধহয় একটু থমকে ছিলেন। সে এক মুহূর্ত। তারপরেই অসঙ্কোচে ঢুকে, রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। তার আগেই পার্বতী এসে পড়েছিল। ভীরু গলায় বলেছিল, 'আভী লে জাতী মেমসাব।'

মহিলা শরীরের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে, খেঁকিয়ে উঠেছিলেন, 'আভী লে জাতী! মারব এক থাপ্পড়, একেবারে বদন বিগড়ে দেব। কখন থেকে জলের জন্যে হাঁ করে বসে আছি, ওর আর পাত্তা নেই।'

ইতিমধ্যে মায়ল্লাও এসে পড়েছিল। বলেছিল, 'কসুর মত্ লিজিয়ে মেমসাব আভী জাতী।'

মহিলা সমস্ত অঙ্গ দুলিয়ে, কাঠের মেঝেয় দুপদাপ শব্দ করে চলে গিয়েছিলেন। আমি পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম।

পার্বতী করুণ মুখ নিয়ে ফিরে গিয়েছিল রান্নাঘরে। মায়লী কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বারে বারে ঘাড় নেড়েছিল। বলেছিল, 'আপ দেখা বাবুজী? কেয়া বাতায়েগা!'...

আমার মনে হয়েছিল, মহিলার চালচলন ব্যবহারের মধ্যে একটা যেন হিস্টিরিয়ার লক্ষণ রয়েছে।

এই দুদিনের মধ্যে, আর একটি ঘটনা আমাকে কৌতূহলিত করেছে। দেওদার ভবন আর প্রেমবতীকে নিয়ে কোথাও একটা গোলমাল ঘটেছে। মায়লীর মুখে শুনেছি, দেওদার ভবনে যে দম্পতি আছেন, তাঁরা এসেছেন প্রায় দেড়মাস। দেওদার ভবনের মালিকও তাঁরা-ই। এই দম্পতির মাঝখানে আর একজন আছেন। তিনি নাকি দার্জিলিং-এরই আপাতত বাসিন্দা, বড় এক সরকারি চাকুরে। চাকরি উপলক্ষেই দার্জিলিং-এ বাস। নাম শ্রীমন্ত রায়। ভবনের মালিক, কলকাতার কোনো এক সম্পন্ন লাহিড়ী পরিবার। তাঁদেরই এক ছেলে শুভেন্দু আর তাঁর স্ত্রী ললিতা (নামটা পার্বতীর মুখে শুনেছি) রয়েছেন এখানে। শুভেন্দুর নাকি ছেলেবেলার বন্ধু শ্রীমন্ত। এখন দেওদার ভবনই নাকি তাঁর বাসা হয়ে উঠেছে। উনি অবিবাহিত।

এই সব নামধাম পরিচয়, সবই প্রায় মায়লী আর পার্বতীর কাছে পেয়েছি। কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে নয়। নিতান্তই কথায় কথায়। এ কথাও শুনেছি, গিন্নি ললিতার প্রেমবতীকে একদম পছন্দ নয়। তাঁর সমর্থক শ্রীমন্ত। শুভেন্দু প্রেমবতীকে তাড়াবার কোন কারণ খুঁজে পান না।

এঁদের তিনজনকেই চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যে দুদিনের কথা বলছি, তার প্রথম দিন দুপুরেই আমার কাঁচঘরের জানালা দিয়ে লেবং-এর দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। জানতাম, আমার পিছনে নিঃশব্দে পার্বতী এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার মতো একান্ত এই একলা নির্জনতা প্রেমিক লোকটির প্রতি ওর অসীম কৌতূহল। জানি, একটু পরেই ও জিজ্ঞেস করবে, 'এক নজরে তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছেন?'

আমি বলব, 'পাহাড়।'

ও বলবে, 'কোন্ পাহাড়টা?'

তারপরেই শুরু হবে ওর আশ্চর্য আশ্চর্য সব কাহিনী। তার মধ্যে অধিকাংশই অলৌকিক মানুষ ও ঘটনার গল্প। বিশেষ করে, লালচে দাড়িওয়ালা এক ভোটিয়া গুণিনের কথা। সে নাকি অদৃশ্য হবার মন্ত্র জানে। মেয়েদের, বিশেষ করে পার্বতীদের বয়সের মেয়েদের মন্ত্র দিয়ে ছোট একটা পাখি তৈরি করে খাঁচায় ভরে নিয়ে যেতে পারে। কেউ টেরও পাবে না। কারণ, আমার

পাখি আমি খাঁচায় ধরে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি কিছু বলতে পারো না।

আমি যদি অবাক্ হয়ে বলি, 'তাই নাকি?' তাহলে পার্বতীর কালো ঈষৎ গোল চোখ দুটি উত্তেজনায় চকচকিয়ে ওঠে। বলে, 'ইয়ো পপ্‌লার ভিউমে ভী উ কভী কভী আতা। আমি তখন ওর চোখের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। এবং শুধু এ সবই নয়। ছেলেদেরও মন্ত্র দিয়ে ঠিক পোষা কুকুর বানিয়ে ফেলতে পারে। তুড়ি দিয়ে শিস্ দিয়ে ডাকলেই ল্যাজ তুলে ওর পিছন পিছন চলে যাবে।

কী ভয়ংকর লোক। এর পরে জিজ্ঞেস করতেই হয়, 'আমাকেও নিয়ে যেতে পারে?'

'বেসখ্।' একেবারে চোস্ত হিন্দী উচ্চারণে বলে পার্বতী। এবং নিয়ে গিয়ে ওর বাড়িতে রেখে দেবে। খেতে দেবে না কিছুই। না খেয়ে শুকিয়ে মরে যেতে হবে।

এ কি অবিচার! কুকুর বানাবে, খেতেও দেবে না? বাঃ। তা হলে আর গুণিন হয়েছে কেন? তাও তো বটে।

যাই হোক, লেবং-এর দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। পপ্‌লার ভিউ-র উত্তর গা দিয়ে তিন চার ফুট নিচে একটি কাঁচা রাস্তা আছে। প্রায়ই ও-পথ দিয়ে স্থানীয় লোকদের নিঃশব্দে চলাফেরা লক্ষ্য করি। হঠাৎ দেখি একজন মহিলা আর একজন পুরুষ চলেছেন সেই পথে, পুরুষটি পুরোপুরি সাহেব। মজবুত শক্ত শরীর। চলার মধ্যে এমন একটা ভাব যেন এ বিশ্বকে দেখিয়ে চলার একটা স্পর্ধা তাঁর আছে। জীব-জগতের সবটাই অনেকখানি তুচ্ছ। চওড়া ঘাড়ের ধাক্কায় তিনি সব ধসিয়ে দিতে পারেন। বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি। মহিলাটিকেও পুরোপুরি মেমসাব বলতে বাধা ছিল না। কপালে কোপলে ঠোঁটে ভুরুতে রং তো ছিলই, চুলের একটি গুচ্ছ কপালের ওপর এসে পড়েছিল। শুনেছি, ওটা নাকি ইচ্ছাকৃত প্রসাধনের পর্যায়ে পড়ে। চোখ দেখতে পাই নি। কারণ সেখানে আয়ত হরিণ চোখের ছাঁচে ঢালাই করা এক জোড়া কালো কাঁচ পরা ছিল। গগল্‌স্ যার নাম। চোখ ঢাকা থাকাতে তাঁর সৌন্দর্যের সবটুকু দেখতে পাই নি। স্বাস্থ্যটি ভালোই। বয়স তিরিশের উর্ধ্বে নয় সম্ভবত। মায়লীর মতে তিনি বন্ধ্যা। সন্তান হয়নি একটিও।

পার্বতী আমার পিছন থেকে ফিসফিস গলায় বলে উঠেছিল, 'দেওদার ভবন কি বহুজী।'

—অর্থাৎ ললিতা। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আর উনি কে? শুভেন্দুবাবু?'

পার্বতী তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'না, না, উ শীমন্তবাবু হুই।'

শীমন্তকে শ্রীমন্ত ধরে নিতে হবে। ওঁরা দুজনেই একবার পপ্‌লার ভিউ-এর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ঘরের দিকে নয়, দোতলার দিকে। দুজনেই কিছু বলাবলি করেছিলেন এবং হাসাহাসি করেছিলেন। শ্রীমন্ত এমন কিছু বলেছিলেন যাতে ললিতাকে লাল হয়ে উঠে বলতে হয়েছিল, 'যাঃ।' তারপর হাতের ছোট ব্যাগটা খুলে চেপে হেসে উঠেছিলেন।

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে একটি আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম, যেটা পার্বতীর চোখেও পড়ে নি। পপ্‌লার ভিউ-এর লনের প্রান্তে, দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড দেবদারু গাছের আড়ালে নীল রঙের একটি শাড়ি পরে দাঁড়িয়েছিল প্রেমবতী। দেখছিলাম ও তীক্ষ্ণ চোখে যেন ললিতা আর শ্রীমন্তকেই লক্ষ্য করছে। আমি পার্বতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ও দিদিকে দেখতে পায় নি। শ্রীমন্ত আর ললিতাকেই দেখছিল। বিস্মিত কৌতূহলে আমিও আবার দেখেছিলাম ওঁদের। ওঁরা পশ্চিম থেকে এসে, পুবের ঢালুতে বেঁকে ক্রমেই নেমে যাচ্ছিলেন। আস্তে আস্তে ওঁদের মাথা ডুবে গিয়েছিল।

দেখেছিলাম, প্রেমবতী দেবদারু গাছ ধরে, গলা তুলে উঁকি মেরে দেখেছিল। অনেকক্ষণ দেখেছিল। তারপরে এদিক ওদিক দেখে দক্ষিণে, পাহাড়-কাটা দেওয়ালের কোল ঘেঁষে চলে গিয়েছিল। অদ্ভুত লেগেছিল ব্যাপারটা।

পার্বতীর দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, ঠোঁটে ঠোঁট শক্ত করে টেপা। বোঁচা নাকের পাটাও ফুলে উঠেছিল চোখ দুটি যেন দপদপ করছিল। বলেছিলাম, 'কী হল পার্বতী ?'

পার্বতী আমার দিকে ফিরে বলেছিল, 'শীমন্তবাবু খারাপ আদমী।'

'কেন ?'

জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ যেন লজ্জায় একটু আরক্ত হয়ে উঠেছিল পার্বতী। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে বলেছিল, 'আমি জানি। সবকোই জানতা।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম 'কী জানে সবাই ?'

পার্বতী পুরনো রবারের স্লীপার দিয়ে কার্পেটের ওপর ঘসছিল। হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারে নি। চোখ তুলে চকিতে চকিতে আমাকে দেখছিল, আর সঙ্কোচে ও লজ্জায় মাথা আরো নুয়ে পড়ছিল। কোনোরকমে খাপছাড়াভাবে একবার উচ্চারণ করেছিল, 'ওরা—ওরা, দুজনে…'

তারপরেই মাথা নেড়ে বলে উঠেছিল, 'মো নেই বাতানে সাকতী।'

সহসা আমারও খেয়াল হয়েছিল, পার্বতীর মুখ থেকে ওভাবে কিছু শোনা

আমার উচিত হচ্ছে না। বলেছিলাম, 'থাক, তোমাকে কিছু বলতে হবে না।'

যদিও আমি কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলাম। এবং ভেবেছিলাম, প্রেমবতীর ভাবভঙ্গি যেন অনেকটা গুপ্তচরের মতো। কার গুপ্তচর সে? শুভেন্দুর নাকি? না কি, শুধুমাত্র একটি মেয়েলী কৌতূহল ও উত্তেজনায় অমন লুকিয়ে দুজনকে দেখছিল?

কিন্তু কী লাভ ওসব ভেবে? হয়তো ললিতা এবং চিরকুমার শ্রীমন্ত সমাজের চলতি নিয়মের বাইরে পা বাড়িয়েছে। শ্রীমন্তর চিরকুমারত্ব হয়তো ললিতার ছোঁয়ায় কাঁপছে থরথরিয়ে, ফাটল ধরেছে। ওরা কেউ ছোট নন। ওঁরা খারাপ কিংবা ভালো, সে চিন্তাই বা আমি করি কেন?

এই অসীম বিশাল, বাস্তব ও অলৌকিকে মাখামাখি কী রহস্য যেন স্তব্ধ অথচ মুখর বিরাট হিমালয়ের বুকে কত ললিতা, কত শ্রীমন্তরা মানবলীলার বিচিত্র খেলা খেলে গেছে। হিমালয় মহাকালের মতো সব দর্শন করেছে। কিন্তু তার চিরলীলায় কোথাও বিস্ময় ও মাধুর্যের অভাব হয় নি। অজস্র লীলার ভাণ্ডার এই বিচিত্র লীলাময়কেই তাকিয়ে দেখি। ডুব দিয়ে থাকি তার পরম শান্তি ও গাম্ভীর্যের কোলে। কিন্তু পার্বতীকে ঠিক বুঝতে পারি নি আসলে। ও যে অত্যন্ত নিবিষ্ট চোখে আমার মুখের প্রতিটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল, তা জানতাম না। জানতাম না, ললিতা-শ্রীমন্ত প্রসঙ্গ ওর বুকের মধ্যে তখনো টগবগিয়ে ফুটছিল। ও বলেছিল, 'আপ সমঝ গেয়া?'

আমি চাপা দেবার জন্যেই বলেছিলাম, 'না।'

পার্বতী মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বস্তিসূচক শব্দ করেছিল। অর্থাৎ কেন আমি বুঝতে পারছিলাম না। এবং শেষ পর্যন্ত এ অবুঝকে বোঝাতে, লজ্জা সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে বলে ওঠেছিল, 'ইসকে মানে. বহুজী আপনা স্বামীকে ছিপাকে⋯।'

আমি তাড়াতাড়ি গম্ভীর গলায় বলে উঠেছিলাম, 'বুঝেছি, বুঝেছি।'

আমার গাম্ভীর্য ও চেয়ে দেখে নি। খুশি হয়ে বলেছিল, 'সমঝ গেয়া আপ?'

'হুম!'

'তো ইয়ে খারাপ্ হুই কি না?'

ঘাড় কাত করে ও আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে তেমনি সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিলাম, 'হুম।'

তখন ওর সংবিৎ ফিরেছিল, লক্ষ্য করেছিল আমার গাম্ভীর্য। নিচু গলায় বলেছিল, 'আপকা গোসা হুয়া?'

'হ্যাঁ।'

'কিয়ো ?'

'তোমার মুখে এসব কথা আমার শুনতে ইচ্ছা করে না।'

পার্বতী চুপ করেছিল। জানতাম, এই সামান্য লোকালয়, এখানে যে কোনো ঘটনাই সকলের কানে ওঠে। বিশেষ করে পার্বতীদের জীবনধারণের রীতিটা এমন যে, পরের খবরটা ওদেরই যেন বেশী রাখতে হয়। মায়লীর নিশ্চয় এমন বোধ নেই, ছোট মেয়ের সামনে কি কথা বলা যায় বা যায় না। পার্বতীর কোন দোষ নেই। হয়তো আমি যা ভাবছি, তার চেয়েও গুরুতর গূঢ় জীবনের নানান সংবাদ তার জানা আছে। তবু না বলে পারি নি, 'তোমার ওসব বিষয় ভাবা উচিত নয়, ওসব কথার মধ্যে তোমার মতো মেয়ের থাকা উচিত নয়।'

ও বলেছিল, 'জী।'

স্বভাবতই কুণ্ঠা ও অপরাধ বোধ ফুটে উঠেছিল ওর মুখে অথচ জানি, পার্বতী অত্যন্ত সরল, মন এখনো সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ। ও চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল। আমিও কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারি নি। তারপরে ও নিজেই বলেছিল, 'এখন আপনাকে একটু চিয়া দেব ?'

গলার স্বরটা রুদ্ধ মনে হয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য মেয়ে, সহজে চোখের জলে ভাসতে রাজী নয়। ও তখন আমার গাম্ভীর্য ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। আমি খুশি হয়ে উঠেছিলাম। হেসে বলেছিলাম, 'বাঃ, তুম তা বহুত আচ্ছা লেড়কী হ্যায়। জরুর লে আও।'

ভেবেছিলাম ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠবে। কিন্তু চকিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে পার্বতী ছুটে চলে গিয়েছিল। আমার মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠেছিল সহসা। বসে থাকতে পারি নি। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দিকে গিয়েছিলাম। রান্নাঘর অবধি পৌঁছতে হয় নি। খাবার ঘরের এক কোণেই দেখেছিলাম, পার্বতী ওর থেকে অনেক বড় শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। আমাকে দেখা মাত্র, ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় ও উত্তেজনায় ঠকঠকিয়ে উঠেছিল একেবারে। ওর বেড়াবিনুনি বাঁধা মাথাটা সুদ্ধ আঁচলে ঢেকে ফেলেছিল প্রায়। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে ডেকেছিলাম, 'পার্বতী, তোমাকে আমি গালি বকি নি।'

'জানদি।'

'তবে কাঁদছ কেন ?'

'তিমির গোসা ভয়ো।'

'না, রাগ হয় নি।'

ভেজা রক্তাভ চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আর শুভ্র তুষার-শীর্ষে রৌদ্র ঝিলিকের মতো একটু হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। এবং পরমুহূর্তেই যেন আবার ভীষণ লজ্জায় মুখ নীচু করে বলেছিল, 'আমি চিয়া নিয়ে আসছি।'

ঘরে ফিরে এসেছিলাম। মনটা আনন্দ ও বেদনার যুগপৎ একটা অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল।

কিন্তু প্রসঙ্গটা ছিল প্রেমবতীর। সেই দিনই প্রায় আমি, একটু পায়চারি করতে করতে, পশ্চিমের সরু রাস্তা ধরে দেওদার ভবনের কাছে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, দেওদার ভবনের বারান্দার আরাম কেদারায় একজন পুরুষ বসে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে প্রেমবতী। পুরুষের চেহারা, পোষাক এবং বয়স দেখে অনুমান করতে অসুবিধে হয় নি, উনি শুভেন্দু। আর প্রেমবতীর সলজ্জ হাসি মুখ, কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলার ভঙ্গি দেখে, ঠিক গৃহকর্তা আর পরিচারিকার কথা মনে হয় নি। আমি যেন লজ্জিত হয়ে উঠেছিলাম। দু'জনের কারুরই চোখ পড়ে নি আমার দিকে। দু'জনেই কথা বলতে ব্যস্ত। ঘটনাটা লুকিয়ে ঘটছিল না। বাড়ির বাইরে বারান্দায় বসেই কথা হচ্ছিল।

তবু আমি তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে, চলে এসেছিলাম। মনটা আবার আবর্তিত হয়ে উঠেছিল। কেন যেন সহজ হতে পারছিলাম না। যা আমার ভাববার নয়, যাতে আমার কিছুই করণীয় নেই, তা-ই যেন আমার মনের চারপাশে ভিড় করে আসছিল। পরিবেশকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা কঠিন, আমরা অনেক সময় তার অসহায় শিকার হয়ে পড়ি। আমার বার বার মনে হয়েছিল, কোথায় যেন একটা বেসুর বাজছে। ললিতা বেড়াতে গেছেন শ্রীমন্তর সঙ্গে। প্রেমবতী তা লুকিয়ে দেখলো। তারপরে, শুভেন্দু বাড়িতে বসেছিল, গল্প করেছিলেন প্রেমবতীর সঙ্গে। এটাও জানা ছিল, প্রেমবতীর প্রতি ললিতা এবং শ্রীমন্ত খুশি নন। কী ঘটেছিল, কে জানে।

সেই দিনই রাত্রে, বাতি জ্বালাবার পর, আমার সুবিধে অসুবিধের কথা জিজ্ঞেস করতে এসে মায়লী দেওদার ভবনের কথা তুলেছিল। আর বার বার বলেছিল, 'আমার বড় ভয় লাগছে বাবুজী, প্রেমবতীর জন্য আমার বড় ভয় লাগছে। যাঁরা এসেছেন তাঁরা দুদিন বাদে যাবেন। কিন্তু আমার মেয়েটার যদি কোনো

ক্ষতি হয় আমি মরে যাব।'

এত ভয় কিসের মায়লীর, বুঝতে পারি নি। প্রেমবতীর কী ক্ষতি হতে পারে, অনুমান করতে পারি নি। কিন্তু মায়লী মা। সে যা বুঝতে পারে, আমার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। তবে একথা বরাবরই মনে হয়েছিল, সভ্যতার শীর্ষ থেকে আগত যে তিনটি প্রাণীর লীলা চলেছে দেওদার ভবনে সেই লীলায় প্রেমবতীর না জড়িয়ে পড়াই উচিত। কারণ, সভ্যতা আর হিমালয় শীর্ষের জীবনে অমিল আর তফাত অনেকখানি।

আজ দেখছি, উত্তর দিগন্ত নিটুট, নির্বিকার। তার ধূসরতায় কোথাও একটু চিড় খায়নি, একটু ফাট ধরে নি। সকল পার্থিব খাজাঞ্চিখানার দরজা বন্ধ ও নিরেট। লেবং-এর মাঠে দেখছি মানুষের বিন্দু বিন্দু মূর্তি কাজে ব্যস্ত। পার্বতী বললো, 'ঘোড়দৌড় হবে, তাই সাফ করছে।'

এক এক সময় মানুষকে মনে হয় অপরাজেয়। সে যেখানে গেছে, সেখানেই তার প্রয়োজনের সব আয়োজনকে উপস্থিত করেছে। হিমালয়ের বুকে সে তার প্রমোদ খেলার ব্যবস্থাটুকুও বাদ রাখে নি।

সকালবেলাই আমাকে জামা-কাপড় পরতে দেখে, পার্বতী একটু অবাক্ হল। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

বললাম, 'আজ একটু বেড়িয়ে আসি।'

যাক, ও যেন একটু স্বস্তি পেল। আমি লোকটা তা হলে নিতান্তই ঘরকুনো। অস্বাভাবিক একটা কিছু নই। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন ?'

'ম্যাল-এ, তোমাদের শহরে।'

ও ভ্রূ কুঁচকে অবাক্ হয়ে বললো, 'এটা বুঝি আমাদের শহর ?'

'তবে কাদের ?

আমার অজ্ঞতায় ও বিস্মিত হল। ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'আপনাদের তো।'

খুব সহজ সরল কথা। কিন্তু মনে হল ওর এই সারল্যের মধ্যে কোথায় একটা অচেনা ব্যাথার ছায়া লুকিয়ে রয়েছে। শহরটা শুধুই বাইরের ভ্রমণ-বিলাসীদের জন্য। ওদের নয়।

বললাম, 'না, আমাদের সকলেরই।'

পার্বতী হেসে বললো, 'মো জানদি না।'

ও জানে না। কিন্তু পরমুহূর্তে বললে, 'বেশী দেরী করবেন ?'

দেখলাম, ওর চোখে উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা। বললাম, 'না না। তাড়াতাড়ি আসব। তুমি যাবে?'

'না। আমি মায়ের সঙ্গে রান্না করব।'

কিন্তু যেতে বলায় এত খুশি হল যে ওর সারা চোখমুখ ঝলকাতে লাগলো। বললাম, 'তোমার বৌদি তো মায়ের সঙ্গে কাজ করতে পারে।'

'ওরা তো কোন্ বিহানে দু'জনে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত্রে বেহুঁশ হয়ে।'

তাও তো বটে! সেই বেহুঁশ হওয়ার খোয়ারি কাটানো তো রোজই টের পাই।

প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বেরুতে যাব, সিঁড়ির ওপর থেকেই গণেনবাবুর ব্যস্ত ডাক শুনতে পেলাম, শুনুন শুনুন, আপনার নাম তো ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'মানে, আপনি কি সেই ইয়ে লেখক ?'

সঙ্কোচের সঙ্গে স্বীকার করতে হল। গণেনবাবুর সেই একই চেহারা। ভ্রূকুটি চোখে একবার আমার আপাদ মস্তক দেখে বললেন, 'বলেন নি তো, অ্যাঁ ? আপনি—অ্যাঁ ? হুঁ, বুঝেছি। বেশ ভালো। আমি আপনার দু'একটা লেখা পড়েছি।'

গণেন সেন আমার লেখা পড়েছেন, এতে পরম সৌভাগ্য মানি। পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন সেই মহিলা। তিনি প্রায় হেসে ঘাড় হেলিয়ে তাকালেন আমার দিকে। গণেন সেন আবার বললেন 'পরে আমার সন্দেহ হল, আপনার নামটা তো আমার জানা। আচ্ছা, ঠিক আছে, বেশ।'

দ্রুত উচ্চারণে কথাগুলো বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। আমি সাহস পেয়ে বললাম, 'আপনি কি এখন আঁকতেই ব্যস্ত ?'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলাম, ওঁর কুঞ্চিত ভ্রূ দুটি সহজ হয়ে উঠলো। রক্তিম চোখ দুটি যেন বড় হয়ে ভেসে উঠলো। সে চোখ রুক্ষ কঠিন নয়, বিরক্তি নেই তাতে। যেন একটা স্বপ্নের ঘোর নেমে এল। প্রায় আত্মমগ্ন স্বরে বললেন, 'ব্যস্ত ? আমি আর কী জানি ? শুধু আঁকতেই জানি, বসে থাকতে পারি না। জীবনটা তো নষ্ট হয়ে গেল, আর তো কিছুই জানলাম না, দেখলাম না।'

গলায় একটা অদ্ভুত শব্দ করে বোধহয় হাসলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। আমি যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এমন কথা এর আগে কখনো শুনেছি কিনা জানি না। না এঁকে পারেন না, আর সেটাই ওঁর—যন্ত্রণা!

আর একবার শুনতে পেলাম, 'এটা কোনো জীবন নয়।'

আমিও তাড়াতাড়ি ওঁর সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে একটু ছবি দেখতে চাই।'

'দেখবেন ? তা, হ্যাঁ, আসবেন, দেখবেন।'

তিনি লনের দিকে চলে গেলেন। মহিলাটি হেসে একবার তাকালেন। ঠোঁট টেপা হাসি। আমি হাত তুলে ওঁকে নমস্কার না জানিয়ে পারলাম না। তাতে উনি চমকে উঠলেন, একটু অবাক হলেন। তারপরে হাত দুটি কপালে তুলে কোনো রকমে প্রতিনমস্কারের ভঙ্গি করে, যেন লতিয়ে গেলেন। কেন ? এটাও অস্বাভাবিক মনে হল আমার কাছে। আমি তো আসলে ওর সঙ্গে আলাপ করতেই চাইছিলাম। যাতে শিল্পীর সম্পর্কে কিছু শুনতে পাই। কিন্তু দেখলাম, গালের ক্ষতরেখার ওপরে দুটি আঙুল রেখে, উনিও তাড়াতাড়ি লনের দিকে চলে গেলেন।

আমি পথ বেয়ে শহরের দিকে উঠতে লাগলাম। আর ভাবলাম, সবটাই এই দূর উত্তরের জীবনের পরম ঐশ্বর্যের মতোই নিশ্চুপ নির্বিকার। কখন তার দরজা সহসা খুলে যাবে, কেউ জানে না।

রূপকুমারী হাউসের কাছে একটু না দাঁড়িয়ে পারলাম না। কোথায়, সে মুখর প্রজাপতিগুলো কোথায় ? তাদের কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি নে তো। বাড়িটার দরজা-জানালা বন্ধ, স্তব্ধ। পিছন দিকে একটু ধোঁয়ার আভাস দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতেই, একটি কাঞ্চী, জিজ্ঞাসু চোখে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলাম, এ বাড়ির লোকেরা কোথায় ?'

বললে, 'সবকোই বাহার ঘুমনে গেয়া।'

স্বাভাবিক। প্রজাপতিরা নিশ্চুপ হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকবে, এটা হতে পারে না। ম্যাল-এ এসে দেখলাম, সেই একই দৃশ্য। বিদেশী পোশাকের ঝলক, রঙের ঝিলিক, শহুরে সভ্যতার একটি চলমান একজিবিশন। তার মাঝে মাঝে পাহাড়ী নরনারীরা তেমনি চুপচাপ বিচিত্রবেশে বসে।

একদা আঠারো শো উনত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরেজরা দার্জিলিং-এ এসেছিল। সিকিমরাজের অধীনে, এই জায়গায় একটি স্বাস্থ্যনিবাস করতে চেয়েছিল তারা। খাজনা হয়েছিল, বার্ষিক ছয় হাজার টাকা। স্বাস্থ্যনিবাস তৈরী হয়েছিল। খাজনাও কিছুকাল দেওয়া হয়েছিল। তারপর সিকিমরাজ বিরক্ত হয়ে যখন দু'জন ইংরেজকে তাদের অন্যায়ের জন্য বন্দী করেছিলেন, তখন খাজনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তখন ইংরেজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না। তার শক্তির

হুঙ্কার সর্বত্র।

ম্যাল থেকে সরে এসে, যেদিকে ভোটিয়া লেপ্‌চাদের টাট্টুদের আস্তাবল তার পাশ দিয়ে, জলা পাহাড়ের নির্জনে এগিয়ে গেলাম। এক সময়ে মনে হল, আমার চারপাশে সব ঢেকে দিল মেঘে। একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে মনে হল, এ বিশ্ব-সংসারে আর কেউ নেই। শুধু আমি, একলা। এবং সেই জন্যেই যেন আমার জীবনের প্রিয় অপ্রিয় সব মুখ আর ঘটনাগুলো হঠাৎ ভেসে উঠতে লাগলো। আমার অবচেতন থেকে যেন কেউ কথা বলে উঠলো, 'এই জীবনটা যখন আমি পেয়েছি, তখন তার সঠিক পথের চাবি-কাঠি আমাকে দাও, আমাকে দাও।'

কে বলছে, কাকে বলছে, যেন বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ কানে বেজে উঠলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ। যেন কয়েকটা ঘোড়া মন্থর পায়ে এক সঙ্গে আসছে। সামনে বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছি নে। তাই সরে দাঁড়ালাম। একটু পরেই আমার সামনে অশ্ব আর তার সওয়ার ভেসে উঠলো। চিনতে অসুবিধে হল না, তিন শ্রীমান। ওরা আমাকে দেখেই, ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে নেমে পড়লো। দেখেই নেমে পড়ার মতো পরিচয় বা সম্পর্ক ওদের সঙ্গে আমার গড়ে ওঠে নি।

একজন বলে উঠলো, 'কোথায় চলেছেন?'

বললাম, 'একটু বেড়াচ্ছি।'

বললো, 'আমাদের তো আজ বিকেলে আপনার ওখানে প্রোগ্রাম।'

'আমার ওখানে?'

'হ্যাঁ, আপনার ওখানে, মানে পপ্‌লার ভিউ-তে।'

বুঝতে অসুবিধে হল না, শ্রীমতীদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। বললাম, 'তাই নাকি? বেশ তো, আসুন না।'

কথা শেষ হতে না হতেই দেখি আরও তিনটি ঘোড়া কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে আসছে। কিমাশ্চর্যম্‌। তিন শ্রীমতী, মল্লিকা মালতী ইভা। অবিশ্যি ওদের সঙ্গে একটি ভোটিয়া মেয়েও রয়েছে। দুটো ঘোড়ার লাগাম তার দু-হাতে ধরা। সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে কলরবে জলা পাহাড়ের পথ মুখর হয়ে উঠলো। এবার তিনটি নয়, ছয়টি মুখর প্রজাপতি। ওরাও তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো।

মল্লিকা বললো, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

জবাব দিলাম একই। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা তখনো কাটে নি। বললাম,

'কিন্তু ব্যাপার কী? ভাগ্যিস পরমেশবাবু দার্জিলিং-এ নেই। তা হলে তো একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেত।'

'পরমেশবাবু কে?'

'কেন, সেই ট্রেনের বুড়ো ভদ্রলোক।'

ওরা দু'জনেই যেন আঁতকে উঠলো। আমি বললাম, 'কিন্তু অভিভাবকেরা কোথায়?'

মল্লিকা বললো, 'মা বাবা বাজারে গেছে।'

'আর এদিকে বীর বীরাঙ্গনারা—'

দু'জনেই একটু লজ্জিত হল, মাথা নিচু করলো। তারপর একসঙ্গে সবাই জোরে হেসে উঠলো। মল্লিকা বললো, 'আপনার সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম হীরেন, বি. ই. কলেজের ছাত্র। এর নাম, এর নাম—।'

ছেলেটি নিজেই বলে উঠলো—বিজয়। সর্বনাশ! ব্যাপার তো অনেক দূর গড়িয়েছে! বিজয়ের নামটা জানা সত্ত্বেও মল্লিকা উচ্চারণ করতে চাইলো না। আমি গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হুম।'

মল্লিকা বলে উঠলো, 'কিন্তু এ কিছুই করে না। খালি খায় আর ঘুমোয়, লেখাপড়া অনেকদিন ডকে তুলে দিয়েছে। এখন শুধু মাউথ অর্গান, গীটার আর পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে বেড়ায়।'

বিজয় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো, 'বাজে কথা বলো না। আমি লোককে বাজনা শেখাই, সেটা বলো।'

মল্লিকা বললো, 'তার মানেই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াও।'

আর এই মোষ তাড়ানো বাজনদারটিই যে মল্লিকার পাপড়িতে পাখার ঝাপটা মেরেছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

বিজয় বললো, 'তা এখন যা খুশি বলতে পারো!'

মল্লিকা তৃতীয় জনকে দেখিয়ে কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই, আমি বলে উঠলাম, 'বরুণ, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স। এটা কোন্ বছর?'

বরুণ বললো, 'সিক্সথ।'

আমি চকিতে একবার ইভার দিকে তাকালাম। ইভা আমার দিকেই তাকিয়েছিল. তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিল। বুঝতে পারছি, ওর হাসি পেয়ে গেছে। আমি বললাম, 'বাঃ! তা বেশ, সব ঠিক হয়েছে। কিন্তু ইভা আর কোনো রকম গালাগালি দিচ্ছে না তো?'

সবাই হেসে উঠলো। ইভা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আমি বুঝি লোককে

খালি গালাগালি দিই ? যে যেরকম ব্যবহার করে আমি তাকে তাই বলি।'

আমি সমর্থন করলাম, 'নিশ্চয়ই। সেটা মোটেই গালাগাল নয়। তবে সবাই তো বোঝে না।'

ইভা বললো, 'আহা।'

বাকীরা হাসলো। মালতী বললো, 'তবু ওদের রোজ একটা বিষয়ে ঝগড়া হবেই।'

'সেটা কী ?'

ইভা বলে, 'বরুণের পিওর ফিজিক্স পড়া উচিত ছিল।'

বরুণ তাড়াতাড়ি যোগ করলো, 'আর তা নইলে নাকি আমি একটা শিক্ষিত মিস্তিরি ছাড়া আর কিছু হব না। এমন পাগলের মতো কথা শুনেছেন কখনো ?'

সহসা ঘাড় দোলাতে সাহস পেলাম না। একবার ইভার দিকে তাকালাম। ইভার ভ্রূ তখন লতিয়ে কুঁকড়ে উঠেছে। বললো, 'আমি পাগল, না। আর মাথা ঠাণ্ডা করে আপনি অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স পড়তে গেছেন। আমার এক খুড়তুতো দাদার তাই হয়েছে। পাশ করে তিন বছর কারখানায় কাজ করার পর একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে, কিন্তু এঞ্জিনীয়রের ওপরে কোনদিন মাথা তুলতে পারবে না, তা জানেন ?'

কী মুশকিল। রাগারাগি তর্কাতর্কির বিষয়টাও তো বড় জটিল দেখছি।

বরুণ বলে উঠলো, 'তোমার দাদার মাথায় কিছু নেই, তাই ওরকম করেছেন।'

ইভা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, আমার দাদার মাথায় কিছু নেই, আর আপনার ওই নিরেট মাথায় আছে।'

বরুণ সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর। বললো, 'নিরেট মানে ?'

ইভা বললো 'নিরেট মানে নিরেট।'

থমথমিয়ে উঠলো বরুণের মুখ। ঘাড় গোঁজ করে প্রায় গোঙা স্বরে বললো, 'বেশ, আমি নিরেট।'

বলেই বীর বিক্রমে ঘোড়ায় উঠে চলতে আরম্ভ করলো। হীরেন আর বিজয় ডেকে বললো, 'এই বরুণ, কোথায় যাচ্ছিস ?'

চলতে চলতে মুখ ফিরিয়েই জবাব দিল, 'হোটেল।'

সবাই থমকে গেল। আমার অবস্থাটাও প্রায় অপরাধী হয়ে উঠেছে। বিজয় বললো 'নাঃ, বরুণটাকে নিয়ে কিছুতেই পারা যাবে না।'

মল্লিকা বললো 'বজ্জ গোঁয়ার।'

হীরেন বললো, 'দুজনেই সমান।'

ইভা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'আপনারা সব মাথা ঠাণ্ডা ভালো মানুষ।'

ইতিমধ্যে কুয়াশা কেটে উঠেছিল। আমার ভিতর আসলে প্রবল হাসির বেগ কলকলিয়ে উঠেছিল। পাছে ছেলেমানুষ ইভা বেচারীকে কষ্ট দিই, তাই অনেক কষ্টে হাসি চাপতে হল। বললাম, 'তা হলে এখন সবাই ধাওয়া করুন, ওকে পাকড়াও করে ঠাণ্ডা করুন।'

সবাই উঠলো ঘোড়ায়। মল্লিকা বললো, 'বিকালে আপনার ওখানে এরা যাবে।'

'আর আপনারা?'

'আমরা একটু পরে যাব। কিন্তু এই ইভা, ঘোড়ায় ওঠ।'

ইভা কখনো ঘোড়ায় চাপে নি। বললো, 'তোমরা চল, আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি।'

ওরা সবাই এগিয়ে গেল। ভোটিয়া মেয়েটি আর ইভা দাঁড়িয়ে রইলো। দেখলাম, ইভার চোখ দুটি প্রায় ছলছল করছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বলে উঠলো, 'দেখলেন তো কী রকম ব্যবহার, এখন আর আমার সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলবে না।'

শেষ কথাটি উচ্চারণ করতে গিয়ে ইভার গলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। খুশিতে আর বিস্ময়ে আমার গলাও বন্ধ। শুধু পথের দেখায় কয়েকদিনের মাত্র পরিচয়ে কেমন করে মানুষের সম্পর্ক এত নিবিড় হয়ে ওঠে সে কথা জানে মানুষের অন্তর্যামী। ইভা, কতই বা ওর বয়স, আঠারো উনিশের বেশী নয়। কিন্তু ওর এই সুন্দর মনটা দেখে চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার চার-পাশের নৈতিক ভ্রূকুটিগুলো মনের চারপাশে দেখতে পেলাম। যাদের ভ্রূকুটির শাসন আজ এদের মনকে বিরক্ত করে বিপথে চালাতে পারে। সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে না তাই, সেই ভ্রূকুটির কোনো মর্যাদা নেই আমার কাছে। বললাম, 'কথা না বলে ও কোথায় যায়, বিকেলে দেখব আমার ওখানে। আপাতত তুমি চোখ দুটি মোছ।'

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছলো ইভা। আরো গভীরতর লজ্জায় ও একেবারে মাথা নীচু করে ফেললো। বললাম, 'কী হল?'

ইভা আঁচল খুঁটতেই লাগলো। আস্তে আস্তে বললো, 'আপনি কী ভাবলেন?'

বললাম, 'যা সত্যি তাই। দেখলাম এখনো মিথ্যেরা এসে তোমাদের মাঝখানে ভিড় করে নি।'

সেই মুহূর্তেই ইভা প্রায় উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো, 'দেখুন দেখুন।'

ওর চোখের নির্দেশে ফিরে দেখলাম, খাজাঞ্চিখানার ছুই শীর্ষ আকাশের উত্তরে ঝলকাচ্ছে। হয়তো সোনা ও রুপোর খাজাঞ্চিখানা ছুটি। আকাশের সকল বাধা বিদীর্ণ করে একেবার বেরিয়ে পড়েছে।'

ইভা বললো, 'আমি যাচ্ছি ওদের কাছে, অ্যাঁ?'

বললাম, 'এস।'

প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্বর্ণশিখরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আবার ফিরে এলাম ম্যাল-এ। সেই একই রকম জনতার ভিড়। অথচ দশটা বেজে গেছে। অবিশ্যি এখানে ভ্রমণকারীরা কে-ই বা ঘড়ি ধরে বসে আছেন। ভিড় ছাড়িয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকে যাবার ইচ্ছে হল। শুনেছি, সেখানে দুর্জয় শিবের বাস কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নেপালীদের আক্রমণের আগে, ওখানে আসলে একটি বৌদ্ধদের মঠ ছিল। সিকিমের প্রসিদ্ধ দার্জিলিং মঠের শাখা, ওটাকে দোর্জে বলা হত। নেপালীরা আক্রমণ করে সে মঠ বিনষ্ট করেছিল। দোর্জের অর্থ বজ্র। কে জানে, বৌদ্ধদের বজ্রকেই দোর্জেলিঙে পরিণত হতে হয়েছে কিনা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন নজীর নতুন নয়।

ম্যাল-এর থেকে পা বাড়াতে যাব। সামনে অবিশ্বাস্য দৃশ্য। মাথায় লাল টুকটুকে টুপি, গায়ে পুরো হাতা লাল সোয়েটার, কাকলী। কাকলী নয় কাকুলী। কিন্তু আশ্চর্য ওর ভঙ্গি। চোখাচোখি হতেই চট করে চোখ নামিয়ে মুখের মধ্যে পুরো তর্জনীটা পুরে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি ততোধিক প্রস্তরবৎ। যদিও কাকলীর চোখের পাতা ঘন ঘন কাঁপছে, পলকে পলকে আমাকে দেখছে এবং মাথা নামিয়ে রাখা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে ওর। রাগ না অভিমান কিংবা লজ্জা বুঝতে পারছিনে। ওকে বুঝতে পারা কঠিন। ওর মা, ওঁরাই বা কোথায়? সুমিতা আর বিবেকবাবু।

খুব আস্তে ডাকলাম, 'কাকলী।'

মাথা তুলে একবার দেখলো। তারপরেই তর্জনী ঘন ঘন মুখের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগলো। কিন্তু জবাব নেই।

আবার ডাকলাম, 'কাকলী।'

আবার দেখলো কিন্তু অবস্থা অপরিবর্তিত। ওর কাছ ঘেঁষে গেলাম। ওর সমান সমান হবার জন্যে কোঁচা গুটিয়ে উবু হয়ে বসে পড়তে হল আমাকে। বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছ না?'

টুক করে একবার ঘাড় নড়ে উঠলো। অর্থাৎ চিনতে খুবই পারছে। বললাম, 'তবে এসো আমার কাছে।'

বলে হাত বাড়ালাম। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে প্রসারিত হাতের মাঝখান দিয়ে বুক ঘেঁষে এল। দু'হাতে প্রায় জড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'তবে কথা বলছিলে না যে? রাগ করেছ?'

ঘাড় নেড়ে জানালো, 'হ্যাঁ।' বললাম, 'কেন?'

'তুমি আতো নি কেন?'

আমার নিবিড় নির্জনতার স্বাদ তো ওকে বোঝাতে পারব না। তাই প্রায় মিথ্যে করেই বলতে হল, 'আমি যে ব্যস্ত ছিলাম।'

'কাজ কত্থিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী কাজ?'

'মানে পাহাড়গুলোর তো সব আলাদা নাম আছে, চিনে নিচ্ছিলাম।'

ব্যাপারটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও মোটামুটি কাজ বলেই বিশ্বাস করলো। তারপর একটি আঙুল দিয়ে আমার চিবুক, গালে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে ফিক করে একটু হাসলো। আমি ওকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সবে জিজ্ঞেস করতে যাব, মা কোথায়? সেই মুহূর্তে ডাক শুনতে পেলাম, 'এই যে এদিকে আছি আমরা।'

তাকিয়ে দেখলাম, সুমিতা আর বিবেক দুজনেই বসে আছেন উত্তর দিকে, মাথায় ছাউনির তলায় বেঞ্চে। কাকলীকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ডাক দিয়েছিল সুমিতা। সেই বললো, 'আমরা বসে বসে দুজনের মানভঞ্জনের পালা দেখছিলাম। ও তো আপনাকে দেখেই ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়ালো।'

বিবেকবাবু বললেন, 'বসুন। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে নিশ্চয় মেয়েকে বোঝাতে?'

সকলেই হেসে উঠলাম। সুমিতা বললো, 'আমরাও ভাবছিলাম, আপনি ভুলে গেলেন নাকি।'

বললাম, 'না, ভুলি নি। সুন্দর একটা বাড়ি পেয়েছি। সারাদিন চুপ

করে কদিন বসেইছিলাম।'

সুমিতা বললো, 'আর ইতিমধ্যে আমরা একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি।'

'কী বলুন তো?'

সুমিতা আর বিবেক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বিবেকবাবু বললেন, 'আপনি মশাই সাহিত্যিক?'

বললাম, 'এই আবিষ্কার। আমি ভাবলাম, না জানি কী।'

সুমিতা বললো, 'ভাবলাম, আপনি যখন সাহিত্যিক, তখন নিশ্চয় আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষদের সব ভুলেই গেছেন।'

বললাম, 'কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন, আমি ক্ষুদ্র তো বটেই, এই ক্ষুদ্রতমটিকেও ভুলি নি।'

বলে বুকের ওপর কাকলীকে একটু চাপ দিলাম। ওঁরা হেসে উঠলেন। সুমিতা বলে উঠলো, 'তবে ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করুন। চলুন বাড়িটা চিনে আসবেন, আর একটু চা খেয়ে আসবেন।'

'এত বেলায়? এগারোটা যে বাজে।'

'কেন, এখানেও কি সম্পাদক প্রকাশকেরা আপনাকে তাড়া করছে নাকি?'

লজ্জাই পেলাম। বললাম, 'না না, সে কি কথা। আপনাদের রান্না খাওয়ার সময় এখন।'

সুমিতা বললো, 'ওসব পাট আমরা হোটেলের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছি। খাবার রেখে যায়, যখন খুশি হিটারে গরম করে নিয়ে খাই; তা বলে চায়ের সাজ সরঞ্জামটা নিজের হাতেই রেখেছি।'

সম্মতি দিতেই হল। নইলে যদি সত্যিই আমার ক্ষুদ্রত্ব অপ্রমাণ থেকে যায়। কাকলীকে আমার কোলে নিয়েই চললাম। ও আমার গালের কাছে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললো, 'খুব মজা লাগতে।'

কিন্তু কাকলীদের সিঁড়ির রাস্তা ভেঙে, বাড়ির দরজার কাজে এসে, সুমিতা আর বিবেকের সঙ্গে আমিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওঁদের সঙ্গে আমিও দেখলাম, প্যান্ট-কোট পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। বয়স চল্লিশের নিম্নেই। গম্ভীর মুখ, স্থির দৃষ্টি। আমি দেখলাম, ভদ্রলোকের ঠোঁটের ওপরে গোঁফ।

কাকলী বলে উঠলো, 'বাবীন বাবীন!'...

কাকলীর বাবা, সুমিতার স্বামী। কিন্তু কাকলীর ডাকের কোনো জবাব দিলেন না ওর বাবা। সুমিতা যে বিস্ময়ে এবং অস্বস্তিতে বাক্‌রুদ্ধ, তাও বুঝতে

পারলাম। বিবেকের মুখে একটু বিব্রত হাসির ভাব। সুমিতা বললো, 'তুমি? কখন এলে?'

একটু স্খলিত শোনালো সুমিতার গলা। কাকলীর বাবা বললেন, 'ভোরের প্লেনে এসেছি। এই মিনিট পাঁচেক হল, দরজায় দাঁড়িয়েছি।'

দেখলাম, ঝি একটি দরজা খুলে ভিতরে দাঁড়িয়ে। সেখানে একটি এয়ার-পোর্টের টিকিট-মারা সুটকেস্।

সুমিতা দরজার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললো, 'কোনো খবর দাও নি তো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অসুবিধে হল তাতে?'

সুমিতা বললো, 'না, অসুবিধে আবার কী।'

বলে, পিছনে ফিরে বললো, 'বিবেক, তুমি ওঁকে একটু বাইরের ঘরে বসাও। আমি ওঁর সঙ্গে একটু ভিতরে গিয়ে কথা বলি। চল ভিতরে যাই।'

স্বামীকে উদ্দেশ করে বলে, দু'জনে ভিতরে চলে গেল। আমারই বুকটা তখন টিপটিপ করতে আরম্ভ করেছে। বেসুর শুনছি। ভীষণ বেসুর। ঠিক যেন তালে মিলছে না।

বিবেকবাবু তাড়াতাড়ি আমার পিঠে আলগোছে হাত রেখে বললেন, 'চলুন, ঘরে চলুন।'

কাকলীকে কোলে নিয়ে আমাকে ঘরে উঠতেই হল। বোঝা গেল, বসবার ঘর। বাক্সের মতো ছোট। পপ্‌লার ভিউ-এর বিস্তার এখানে নেই। শহর তো! ভিতরের ঘরে তখন কী ঘটছে, কে জানে। কিন্তু কষ্ট হল কাকলীর দিকে। তাকিয়ে ওর বাবার চোখে-মুখে এমন একটা ঘৃণা ও উত্তেজনা ছিল যে, মেয়ের আদুরে ডাকের জবাবটুকুও দেন নি। বললাম, 'বিবেকবাবু, অনুমতি করেন তো এখন যাই। কাল-পরশু আর এক সময় আসব। এখন উনি এসেছেন, সকলেই ব্যস্ত।'

বিবেকবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না না, ব্যস্ততা কিসের। এই কাঞ্চী।'

উনি ডেকে উঠলেন। কাঞ্চী একটি ছোট দরজা দিয়ে এসে ঢুকলো। বিবেক বললেন, 'চার কাপ চায়ের জল বসাও তাড়াতাড়ি।'

ঘাড় নেড়ে কাঞ্চী বিদায় নিল। কাকলী আমার কোল থেকে নেমে, আমার দিকে একবার ফিরে তাকালো। বললাম, 'বস এখানে।'

ও সোফায়, আমার পাশে বসে বসে, পা দোলাতে লাগলো। বললো,

'তুমি এখন তলে যাবে ?'

বললাম, 'চা খেয়ে যাব।'

'আবাল আতবে ?'

'আসব বৈ কি !'

মিথ্যে বললাম না তো। আর কি আমি এখানে আসব ? আসতে ইচ্ছে করবে ? খুট করে ভিতর ঘরের দরজা খুলে গেল। সুমিতা বেরিয়ে এল। মুখে যে তার কাষ্ঠহাসি, বুঝতেই পারছি। কারণ, মুখটি প্রায় রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। তবু হেসে বললো, 'উনি খুব টায়ার্ড, তাই এলেন না, পরে দেখা হবে। বসুন, চা আসছে।'

বললাম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি বিদায় নিতেই চেয়েছিলাম। বিবেকবাবু ছাড়লেন না।'

সুমিতা বললো, 'বেশ করেছে।' বলে একটি মোড়ায় বসলো।

কিন্তু কথা ফুরিয়ে যেতে লাগলো যেন। আমার বারে বারেই মনে হতে লাগলো ঝড় আসন্ন। আমার বিদায়ের পরেই হয়তো তাণ্ডব হবে। কাকলী মায়ের কাছে গিয়ে বললো, 'মা, বাবীন খুব লাগ কলেছে, না ?'

সুমিতা বললো, 'না, বাবীনের ভীষণ মাথা ধরেছে। তুমি এখন কাকুকে টা-টা করে বাবীনের কাছে যাও, তোমাকে ডাকছেন।'

কাকলী আমার দিকে ফিরে হাত তুলে প্রায় নিঃশব্দে উচ্চারণ করলো, 'টা টা।' এবং খুব মন্থরে ভিতরের ঘরে চলে গেল।

চা এল, পান এল। দু একটা মামুলী কথার পরেই আমি উঠলাম, আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বিবেকবাবু বললেন, 'চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

সুমিতা তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ, তাই এস। কিন্তু খুব দেরি করো না যেন।'

আমি আপত্তি করতে পারলাম না। কারণ, মনে হল, বিবেকবাবুর একটু সাময়িক অনুপস্থিতি বোধহয় সুমিতার দরকার। বিবেকবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে, ম্যাল পেরিয়ে প্রায় বার্চ হিল রোডে পা দেওয়া পর্যন্ত দার্জিলিং-এর আবহাওয়া আর বাজার নিয়ে দু-একটি কথা হল। বার্চ হিল রোডে পা দেবার পর আমি বললাম, 'থাক, আর কত দূর আসবেন।'

বিবেকবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'না, আর বেশী দূর যাব না। কিন্তু আপনিও একটু দাঁড়ান ভাই দয়া করে। এমন একটা মুহূর্তে আপনি গিয়ে-

ছিলেন, আপনাকে দু-একটি কথা বলব।'

আমার লজ্জা করতে লাগলো। আমি ওঁর দিকে ফিরে তাকালাম। বিবেকবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটু বিসদৃশতা হয়তো আপনি লক্ষ্য করেছেন।'

বলে উঠলাম, 'না না, বিসদৃশ আবার কী।'

বিবেকবাবু হাসলেন। বললেন, 'যাই মনে করেন, একটু বলা দরকার বোধহয়। ভয় পাচ্ছি, একটা কোনো গোলমাল না ঘটে। আমার আজ বিকেল চারটের গাড়িতে চলে যাবার কথা ছিল। শিলিগুড়ি আমার কর্মস্থল। সুমিতা আগে খবর দিয়েছিল, বাড়ির ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। ও একলা মেয়ে নিয়ে থাকবে ভেবেই শহরের ঘিঞ্জিতে বাসা ঠিক করেছিলাম। সম্পর্কটাও বলি, সুমিতা আমার কলেজের বন্ধু। ও এখন একজন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ছোটখাটো গেজেটেড অফিসার। একদা আমাদের সম্পর্কটা ছিল প্রেমের। দৌড়টা বিয়ে অবধি পৌঁছুতো। কিন্তু তার আগেই এই সুবীরের, অর্থাৎ সুমিতার স্বামীর আবির্ভাব। সুবীরকে দেখা মাত্র সুমিতার মনে হয়েছিল, আমাকে বিয়ে করার চিন্তাটা ওর ভুল হয়েছিল। সুবীর স্পোর্টস্‌ম্যান, মেকানিজমের বিদ্যেটা পাকা করে এসেছিল তখন বিলেত থেকে, একটা কারখানার ম্যানেজার ও এখন। ওদের পরস্পরের দেখা হওয়া মাত্র স্থির হয়ে গেছল, ওরা দুজনে প্রায় ইটার্নল হাজব্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ। কয়েক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। সম্ভবত পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চলেছে কিংবা হয়েছে। ওদের বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি হয়েছিল, গোলমালটা লেগেছিল ঠিক তত তাড়াতাড়ি। বোধহয় এক বছরের মধ্যেই। তবু কাকলীর উদয় হয়েছিল। সংসারটা বাইরে থেকে ভাঙে নি, ভিতরটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। অবিশ্যি, এগুলো আমার মজা করে বলার গল্প নয়। কিন্তু সুবীর এই বিশ্বাস নিয়েই এসেছে, সুমিতার সঙ্গে আমার যোগসাজসেই দার্জিলিং-এ আসা হয়েছে। যোগাযোগ আমার সঙ্গে ঠিকই হয়েছে, কিন্তু একসঙ্গে বাস করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। যদিও প্রকারান্তরে প্রায় তাই ঘটে গেছে। আর এ কথাও বলি, হয়তো আমি আর সুমিতা এখনো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলে, কোথাও একটা যন্ত্রণা বেজে ওঠে। কিন্তু আমরা পরস্পরের কাছে এটুকু বলাবলি করেছি, কোনো তৈরি কার্যকারণের ভিতর দিয়ে আমরা সংসার সাজিয়ে বসব না, আমার পক্ষে তো আর সম্ভবই নয়। আপনাকে···আপনাকে খালি বলছি, এসব আপনার গল্পে স্থান যেন না পায়, আমার সঙ্গে সুমিতার

কোনো অবৈধ সম্পর্ক নেই। তবু, ওদের দুজনের ডাইভোর্সটা আজ অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়েছে। সেটা আপোসেই সুমিতার কাম্য। সুবীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা সে দেবে না।···জানি নে, যেখানে অবশিষ্ট আছে আর শুধু ঘৃণা, সেখানে কেন ডাইভোর্সটা পরস্পরকে দেবে না। অবিশ্যি জানি, এর না দেবার মধ্যেও সুবীরের প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা কিছুটা তৃপ্ত হচ্ছে। কিন্তু যাক এসব কথা। আমি বোধহয় আজ চারটের গাড়িতেই চলে যাব। আপনার সঙ্গে আর দেখা নাও হতে পারে। আপনাকে যে এত কথা বলে ফেললাম, ভেতরের একটা অস্থির উত্তেজনাতেই। পরে হয়তো লজ্জা পাব, আপনি মনে মনে যেন ক্ষমা করেন।'

বলে, নামতে গিয়ে আবার হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কিন্তু যে জন্যে বললাম, তা আর একটু বাকী থেকে যাচ্ছে। একটা কথা আমিও সুমিতাকে বলতে পারি নি। আসলে ..আসলে কী জানেন, মানুষের একনিষ্ঠতা বলে কিছু আছে কি না কে জানে, আমি আর একটি মেয়েকে ভালোবেসেছি। অতি সাধারণ, প্রায় গ্রাম্য গৃহস্থের একটি মেয়েকে। এ ভালোবাসাটা আমার পাপ নয়, কিন্তু সুমিতাকে না বলতে পারাটা পাপ। কী করবো বলুন, আমি পারি নি, পারি নি। আচ্ছা চলি। ক্ষমা করবেন...আর...অসুবিধে না হলে সুমিতার সঙ্গে একটু দেখা করবেন। ওর এক মাস থাকবার কথা। যাচ্ছি—'

বিবেকবাবু চলে গেলেন। কয়েকটা মুহূর্ত বার্চহিল রোডের গাছের ছায়ায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এতক্ষণ ধরে যা শুনেছি, তাই আবার স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। আর ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, আমার মাথার ওপর দিয়ে, ম্যাল রোড ধরে বিবেক তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যাচ্ছেন। আমার গায়ে শুকনো পাতা উড়ে পড়লো। প্রজাপতিরা উড়ছে। ফার্ন ফাছগুলো অল্প বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। উত্তরের দরজা বন্ধ। সুমিতার মুখখানি আমার মনে পড়লো।

পা বাড়াতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, বিস্তৃত অঞ্চল ঘিরে, অতিকায় বিশাল শ্বেত সরীসৃপের মতো কুয়াশা নিচের থেকে উঠে আসছে। পপ্‌লার ভিউটা দেখতে পাচ্ছি না।

কয়েকটা দিন ঘুরে ঘুরে কাটালাম। ছয় শ্রীমান শ্রীমতীরা মাঝে বর্গীর মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইভা আর বরুণের ঝগড়াটা কিছুতেই থামছে

চায় না। কিন্তু ওরা দুজনেই দেখেছি সব থেকে প্রাণবন্ত, সরল আর সহজ। টানটাও ওদের বেশী। পার্বতী এখন আর ওদের আপদ মনে করে না। বরং খুশি হয়ে আতিথেয়তা করে।

সুমিতার ওখানে যাই নি। ম্যাল-এ ওঁদের দেখতেও পাই নি। বিবেকবাবু চলে গেছেন কি না, তাও বলতে পারি না। কিন্তু নতুন আর আশ্চর্য এবং সাধারণ অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। যাদের আমার মনে হয়েছে, এই প্রাঙ্গণে না দেখলে চিনতে পারতাম না।

একদিন সকালবেলা ম্যাল-এর কাছেই, আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া একটি ভদ্রলোককে দেখলাম। কেবল চোখ নাক আর ঠোঁট বেরিয়ে আছে। বাদবাকী সবই ঢাকা। মনে হল, ভদ্রলোক আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। আমি পাশ কাটাতে গেলাম। ভদ্রলোকের গলা ঘড়ঘড়িয়ে বেজে উঠলো, 'ওহে, তুমি যে কী বলে, একেবারে চিনতেই পারছ না, অঁ্যা?'

কে? পরমেশবাবু? এ যে আকাশ-ভাঙা বিস্ময়! যাঁর ধনুকভাঙা পণ ছিল দ্বিতীয় দিনই ফিরবেন, তিনি যে দ্বাদশ দিনেও দার্জিলিং-এ আছেন, কী করে ভাবব? তাছাড়া, সেটাও তো আমার অপরাধ, ওঁর এত পাকা বুদ্ধি সত্ত্বেও চিনতে পারি নি। দেখলাম ওঁর নড়বড়ে দাঁত ঠেলাঠেলি করছে।

বললাম, 'আপনি?'

'কেন, চেনা যাচ্ছে না?'

'আজ্ঞে না, তা নয়। তবে আপনি যে দার্জিলিং-এ আছেন, তাই তো কল্পনা করতে পারি নি। পরদিনই তো আপনার ফিরে যাবার কথা ছিল যেন?'

মুখটা বেজায় গম্ভীর করে পরমেশবাবু বললেন, 'তা ছিল। তবে যাওয়া হয় নি।'

আমি একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'আপনার মেয়ে-জামাই সব ভালো তো?'

মুখটা বিকৃত করে বললেন, 'ভালো? তাই তো দেখছি, মুসুর ডালের জল আর ভাত গিলে তো দুটিতে আছেন, তার ওপর একটি এসেছে। মানে ছেলে হয়েছে একটি। সুখ তো ষোল আনা। কয়েকদিন থেকে একটু মজাটা দেখে যাচ্ছি।'

সাংঘাতিক লোক, সন্দেহ নেই। মেয়ে-জামাইয়ের দুরবস্থায় মজা ভোগ করার জন্যে, এখনো আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে এই পাহাড়ের দেশে রয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আছেন কোথায়? মানে এখন উঠেছেন কোথায়?'

পরমেশবাবু একটু কেশে মুখখানি তেমনি মুখবিকৃত করেই বললেন, 'আছি অবিশ্যি মেয়ের ওখানেই...।'

কথাটা শেষ না করে যেন থেমে গেলেন। কিন্তু কথাটা যেন কেমন ঠেকল। শুনে আমারও যেন মজা-লাগা চমক লাগে। যাদের দুরবস্থার মজা দেখবার ইচ্ছে, তাদের ঘরেই অবস্থান, একটু যেন কেমন কেমন শোনায় না!

পরমেশবাবুও তা বুঝতে পারলেন বোধহয়, তাই কোনো রকমে শীতার্ত হাতখানি বের করে, ঘুরিয়ে বললেন, 'আছি মানে, ওই রকম। আমার আবার হোটেলের খাওয়া-দাওয়া পছন্দ হয় না, সয় না, তাই। আর এসেছি যখন, বাজারটা রোজ করি, আনাজ-টানাজ বেশ ভালোই, কিনতে-টিনতে বেশ ভালোই লাগে। ভালো লাগে বলেই কিনি, অন্য কোনও গরজ নেই। এসব সবুজ নধর শীতের তরকারি, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।'

তারপরে হঠাৎ গলার স্বর বদলে বললেন, 'যাবে আমার মে য়ের বাড়ি? চল না যাই, আঁদাড়ে-বাঁদাড়ে ঘুরে কী করছ, অ্যাঁ? চল যাই?'

না গিয়ে আর পারলাম না। একটু কৌতুহলও ছিল। তাঁর কথায় যেন কেমন একটু রহস্যের ছোঁয়া। অনিচ্ছাতেও একদিনের জায়গায় বারো দিন আছেন, নিতান্ত চোখে সুন্দর লাগে বলেই একটু আনাজ-পত্র বাজার করেন, এসব শুনলে একটু কৌতুহল হয়। তাই গেলাম। বাজারের পাশ দিয়ে, কার্ট রোডের ওপর খানিকটা নিচের দিকে গিয়ে, পরমেশবাবুর মেয়ের ছোট্ট কুটির। মেয়ে-জামাইকে দেখে মনে হল, ধরণীর এক কোণে দুটি সাধারণ কিন্তু অসাধারণ সুখী মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে। বাঙলাদেশের মণিমুক্তোগুলো অ-সাজেতেই সাজানো যেন। মেয়েটি দেখতে এমন কিছু নয়। শ্যামলা রঙ, ডাগর দুটি চোখ, ঘরকন্না করা শ্রমপুষ্ট শরীর, মুখে একটি পরিচ্ছন্ন দীপ্তি ও হাসি। জামাইটি ঋজু, বলিষ্ঠ, তার মধ্যেই মনে হয়, চোখ দুটিতে একটু ভাবুকের ছায়া। অথচ আত্মমর্যাদার একটা গাম্ভীর্যের ছাপও আছে। পরমেশ-বাবুর কাছে পরিচয় পেয়ে মেয়ে-জামাই দু'জনেই ছুটোছুটি করে অভ্যর্থনা করলো। একটি পায়া ভাঙা চেয়ার দিল তাড়াতাড়ি বসতে। তারপরেই দেখলাম, মেয়ের গম্ভীর মুখ, ভ্রূকুটি দৃষ্টি বাবার ওপরে। পরমেশবাবু যেন দেখেও না দেখে, আমার সঙ্গেই কথা বলতে ব্যস্ত হলেন।

মেয়ে বলে উঠলো, 'বাবা, কেন তুমি অতগুলো মুরগী কিনেছ? তুমি তো ছোঁও না।'

পরমেশবাবু বলে উঠলেন, 'ছি, এ বয়সে আর ওসব কি পারা যায়। তোরা খাবি বলেই এনেছি। দেখি সবাই কিনে কিনে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়।'

'তাই তুমিও নিয়ে আসবে?'

'তা কী হয়েছে। অমন করছিস কেন খুকি। কনক খেতে ভালোবাসে। তা জামাইয়ের জন্যে আনব না, কী বল হে? আজ যদি কলকাতা হত?'

মনে হল, শেষের কথা কটি বলতে পরমেশবাবুর গলা খাদে নেমে গেল। আর তার খুকির চোখ দুটি কেমন ঝাপশা হয়ে উঠল। জামাইকে দেখে বোঝা গেল, সে লজ্জাও পেয়েছে, ব্যথাও বোধ করছে। বাবা মেয়ের মাঝখানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকতে সে যেন অস্বস্তি বোধ করল। আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে সে সরে গেল।

আমার বুকের ভেতরটা একেবারে ভরে ছাপিয়ে উঠেছিল। আর ভাবছিলাম, এই কি সেই পরমেশবাবু? যাঁকে আমি ট্রেনে দেখেছিলাম? তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করেই সাক্ষী মেনেছেন। আমি খুব জোর দিয়ে তাঁকে সমর্থন করে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

টলটলে চোখ নিয়েই কন্যা আমার দিকে চেয়ে হেসে উঠলো। বললো, 'না, দেখুন না, বাবা রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি বাজার করছেন, কে এত খায় বলুন তো! নষ্ট করা আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না।'

পরমেশবাবু বললেন, 'তোর মায়ের মতো কথা বলছিস্। কিন্তু কতকাল বাজার-টাজার করতে পাই নি, সেটা ছাখ্।'

কন্যা হেসে ধমক দিল, 'তাই বুঝি এখন শোধ তুলছ?'

তার কথা শেষ হয় না। ঘরের মধ্যে শিশুর কান্না বেজে উঠলো। পরমেশবাবু বললেন, 'ছাখ! ভাল্লুকটা বোধহয় উঠলো, আমার কাছে নিয়ে আয়।'

খুকি গিয়ে শিশুকে নিয়ে এল। সত্যি, ভল্লুক। তবে কালো কুচকুচে চোখ, শ্বেত ভল্লুক। পরমেশবাবু দু হাত বাড়িয়ে দৌহিত্রকে বুকে তুলে নিলেন। আমার মনে হল, তাঁর দুটি চোখ স্নেহ স্নিগ্ধতায় ভিজে উঠেছে।

আমার মনে হল, আমারও উঠবে। তাতে লজ্জিত হব না, মনে মনে বলব, একদিন যে পরমেশবাবু বলেছিলেন, 'ভাত কুরকুরোয় না প্রেম কুরকুরোয়' তাই দেখতে চলেছেন, তার জবাব, মানুষের এইটুকু অহঙ্কার, সে পেট সর্বস্ব ক্ষুধা-কাতর জীব নয়, প্রেমের ক্ষুধা তাকে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে। এখানে এই দরিদ্র দম্পতি, আর স্নেহকাতর পিতার মধ্যে তাই দেখলাম।...

বেলা প্রায় তিনটে। ঘরে বসে দেখছি, লেবং-এ আজ মানুষেরা পোকার মতো গিজগিজ করছে। ঘোড়ার দৌড় হচ্ছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, মাঠে ঘোড়ারা চক্রবৎ দৌড়ুচ্ছে। ওপরে গণেন সেনের ঘরে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। বিচিত্র ঘর। শায়া শাড়ি ব্লাউজ পায়জামা পাঞ্জাবি, মদের বোতল, ছবি, ইজেল, রঙের টিউব, আর কতগুলো আঁকা ক্যানভাস সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য। এবং আরো জেনেছি, গণেন সেনের স্ত্রী নন মহিলাটি। একদা মডেল হিসাবেই এসেছিলেন। সাত বছর আগে আঁস্তাকুড় থেকে রমলা, অর্থাৎ মহিলাটিকে এনেছিলেন। এবং ক্যানভাসে রমলার প্রচুর ন্যুড চিত্র। নানান ভঙ্গিতে। এখন দুজনের সম্পর্কটা বিচিত্র। কেউ কাউকে ছাড়তে পারেন না, সহ্যও করতে পারেন না। ভয়ংকর বিকার তাঁদের চেতনাকে গ্রাস করে রেখেছে। শুধু এমন বিপরীত, ঘৃণা ও আকর্ষণের জীবন আমি দেখিনি। গতকাল রাত্রে দু'জনের, ভয়াবহ হাতাহাতি গেছে নিঃসন্দেহে। আবার আজই আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে, দু'জনে লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে চলে গেছেন।

দেওদার ভবনের শুভেন্দু ললিতা শ্রীমন্তরাও ঘোড়দৌড়ে গেছেন। বার্চ-হিলের এ পাড়াটায় আমি বোধহয় আজ একলা বিদেশী। কারণ, মল্লিকারাও দল বেঁধে ঘোড়দৌড় দেখতে গেছে। কলকাতায় নাকি কোনোদিন দেখে নি।

বসেছিলাম, হঠাৎ পার্বতী ছুটে এল। রুদ্ধ উত্তেজিত গলায় বললে, 'বাবুজী, তাড়াতাড়ি আসুন। মা দিদিকে মেরে ফেলছে।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে, দাঁড়িয়ে উঠে ওকে অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখলাম, রান্নাঘরের পাশে ওদের শোবার ঘরে, প্রেমবতী মেঝেয় পড়ে আছে। মায়লী তাকে একটা চ্যালা কাঠ দিয়ে ভীষণ পিটছে। প্রেমবতী কোনো বাধা দিচ্ছে না।

ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি মায়লীর হাত চেপে ধরলাম। ধমকে বললাম, 'করছ কী মায়লী, মেরে ফেলবে?'

মায়লী চীৎকার করে বললো, 'হ্যাঁ, মেরে ফেলব, ওকে মেরে ফেলব।'

বলেই হঠাৎ বুক চাপড়ে, ডুকরে কেঁদে উঠলো, 'সর্বনাশ করেছে ও বাবুজী, সর্বনাশ করেছে। আমি তো এ ভয়ই পেয়েছিলাম বাবুজী, ও বাচ্চা হোনেবালী। সমাজে আমি কেমন করে মুখ দেখাব?'

আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কে, কার কথা বলছ তুমি? কে ওর বাচ্চার বাবা?'

মায়লী কান্না রুদ্ধ গলায় বললো, 'শুভেন্দু বাবু, শুভেন্দু বাবু।'

শুভেন্দু! কি আশ্চর্য। বারো বছরের বিবাহিত জীবনে যে ছিল নিঃসন্তান, আজ সে এই পার্বত্য মেয়ের সন্তানের পিতা? শুভেন্দু কি জানে! সে কীভাবে এ সংবাদ গ্রহণ করবে? কিংবা করেছে।

দেখলাম, প্রেমবতী তেমনি মুখ গুঁজে পড়ে আছে। পিঠের জামা ছিঁড়ে, ধবধবে সাদা পিঠে রক্ত দেখা যাচ্ছে। বললাম, 'কিন্তু ওকে এখন আর মেরে কি হবে মায়লী। ওকে না মেরে, বরং দেখ এখন কী করা যায়। কোনো একটা গতি করা যায় কি না, তার উপায় ভাব।'

মায়লী বললো, 'ব্যবস্থা কিছু করার নেই বাবুজী, আমাকে এখুনি পঞ্চায়েতের কাছে যেতে হবে। আমাকে তাদের কাছে সব কথা বলতে হবে। নইলে তারা যখন জানতে পারবে আমাকে রক্ষে রাখবে না।'

বললাম, 'বেশ তো, তুমি যাও। প্রেমবতীকে আমি দেখছি।'

মায়লী আর দেরী করলো না। ও চলে যাবার একটু পরে, পার্বতীর সাহায্যে প্রেমবতীকে উঠিয়ে বসালাম। এক সঙ্গে আমরা চা খেলাম। তারপরে ওর মুখে সব ঘটনা শুনলাম।

কাহিনী সামান্য। শ্রীমন্ত আর ললিতার ওপর নজর রাখবার জন্যেই প্রথমে শুভেন্দু ওকে বলেছিল। প্রেমবতী বিশ্বস্তভাবেই তা পালন করেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে প্রেমবতীর সঙ্গে শুভেন্দুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। প্রেমবতী প্রথমে শুভেন্দুর প্রস্তাবে আপত্তি করলেও, স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত একজন মানুষের প্রতি সহৃদয় হয়ে উঠেছিল সে। তারই পরিণতি এই মাতৃত্ব! তার মনে হয়েছিল, এই প্রবঞ্চিত নিরপরাধী লোকটির মন যাতে শান্তি পায়, সেরকম কোনো কিছুতে তার বাধা দেওয়া উচিত নয়।

কিন্তু বেচারী মেয়েটি, পর্বতদুহিতা তার সারল্য দিয়ে বুঝতে পারে নি, একটি প্রবঞ্চিত লোককে করুণা করতে গিয়ে, সে নিজেই করুণার পাত্রী হয়ে উঠেছে। অপমান ও বিপদের খড়্গ নেমে এসেছে তার ওপর।

মায়লী পঞ্চায়েতের লোকজন নিয়ে ফেরবার আগেই, দেওদার ভবনের তিনজনেই ফিরে এলেন। পঞ্চায়েতও এল। দেওদার ভবনের বাইরের ঘরেই প্রায় পঞ্চাশজন লোকের জটলা। যাবার ইচ্ছে ছিল না। মায়লী আর পার্বতী ছাড়ে নি। পঞ্চায়েতের সঙ্গে গুরখা লীগের কয়েকজন সদস্যও ছিল।

শ্রীমন্ত আর ললিতা চীৎকার করে তাদের গালাগালি দিতে লাগলো। তাদের দুজনের বক্তব্য হল, প্রেমবতী আর তার মা এবং এই পঞ্চায়েত উঁদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে কিছু টাকা মারবার মতলবে আছে।

শুভেন্দুকে ওরা কোনো কথাই বলতে দিচ্ছিল না। সে যতবারই কিছু বলতে যাচ্ছিল, ততবারই ললিতা আর শ্রীমন্ত তাকে বাধা দিয়েছিল। দু তিনবার ললিতা শুভেন্দুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কথা বলবার জন্যে। প্রত্যেক বারই, ললিতার রোষ বেড়ে উঠছিল। পঞ্চায়েতের সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে শ্রীমন্ত একলাই একশ' ছিল। কেন জানি না, লোকটার ভাবভঙ্গি আমার একটুও ভালো লাগছিল না। কেমন যেন ধূর্ত আর শঠ মনে হচ্ছিল।

কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না কিছুতেই। তবু শেষ পর্যন্ত শুভেন্দু মুখ খুললো, এবং স্বীকার করলো, প্রেমবতীর সঙ্গে তার সম্পর্ক। এই স্বীকারোক্তির মধ্যে যেন, যুগপৎ একটা গৌরব এবং ব্যথা প্রকাশ পাচ্ছিল। তার রক্তও যে পিতৃত্ব ধারণ করে, সেই তার গৌরব। কিন্তু তার সন্তানের জননী যে-পাত্রী, যে দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই পিতৃত্ব ঘোষিত হয়েছে, সেটাই তার ব্যথা।

তখন স্বভাবতই পঞ্চায়েত চেপে ধরলো, তা হলে শুভেন্দুকে বিয়ে করতে হবে। প্রেমবতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে হবে।

এ সময়ে ললিতা যেন একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠলো। শুভেন্দুকে সে অন্ধ মূর্খ বলে তীব্র বিদ্রূপে ফেটে পড়ে বললো, 'এটা বুঝতে পারছ না, মেয়েটাকে তোমার ঘাড়ে চাপাবার জন্য এরা একটা ষড়যন্ত্র করেছে। তুমি নিজে জান না, এ তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমাকে দেখেও কি তুমি বুঝতে পারছ না, এ তোমার কাজ নয়?'

কিন্তু শুভেন্দুর তাতে বিন্দুমাত্র ভাববিকার দেখা গেল না। সে পরিষ্কার বললো, 'কোন্‌টা কার কাজ, তা সে-ই বলতে পারে, কাজটা যে করেছে। অন্ততঃ এক্ষেত্রে আমি তা অস্বীকার করব না।'

পঞ্চায়েতকে সে জানালো, বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পঞ্চায়েত এ বিষয়ে যেন বিবেচনা করে। তবে প্রেমবতীর যে-সন্তান হবে, তাকে বরাবর মানুষ করার দায়িত্ব তার। তা ছাড়া, প্রেমবতীকে সে দু'হাজার টাকা দেবে। ভবিষ্যতে আর কী হবে, জানে না।

দেখা গেল, পঞ্চায়েত এটা মেনে নিল। আমার একবার মনে হল, প্রেমবতীকে বিয়ে না করাটা শুভেন্দুর অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু সময়ের পথ চেয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, শুভেন্দুর চোখে আমি একটি বিচিত্র

আলোর ঝলক দেখেছি। সেটা বোধহয় তার অবরুদ্ধ হতাশ পিতৃত্বের সহসা চকিত ঝলক! প্রেমবতীকে কি সে চিরদিন ছেড়ে থাকতে পারবে?

দার্জিলিং থেকে ফিরে যাবার দুদিন আগে সুমিতার সঙ্গে ম্যাল-এ দেখা হল। কাকলী ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। দেখলাম, দার্জিলিং সুমিতার মুখের রক্তই শুষেছে কেবল। জিজ্ঞেস করলাম, 'বিবেকবাবু আর সুবীরবাবু কোথায়?'

সুমিতা অবাক হয়ে বললো, 'বিবেক তো সেদিনই বিকেল চারটেয় চলে গেছে। সুবীরের তো তার পরের দিনই ফ্লাই করার কথা।'

এ আবার কেমন কথা! খট্ করে যেন কানে লাগলো। সুমিতার দিকে তাকালাম। সে তখন দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেছে অন্যদিকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ফ্লাই করার কথা মানে? করেছেন কি না, সে খবর আপনি রাখেন না?'

শীত লেগেই যেন সুমিতার ঠোঁট শুকিয়ে উঠলো। হাসিটিও তেমনি শুকনো। বললো, 'কী করে রাখব বলুন। আমাকে একবার বলেছিলেন, পরের দিনই তিনি প্লেনে কলকাতা চলে যাবেন।'

আমি বললাম, 'উনি যখন বাড়ি থেকে বেরোন, তখন নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

সুমিতা আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে, পরমুহূর্তেই লজ্জিত হয়ে উঠলো।

বললো, 'ওঃ, আপনি বোধহয় জানতেন না, উনি যেদিন এলেন, সেদিন আপনারা চলে যাবার আধঘণ্টা পরেই স্যুটকেশ নিয়ে হোটেলে চলে গেছলেন।'

আচমকা একটা থাপ্পড় খাবার মতো থমকে গেলাম। সুবীরবাবু যে সেইদিনই হোটেলে চলে গেছলেন, সে খবর জানা ছিল না। কোনোরকমে একবার উচ্চারণ করলাম, 'ওহ, তাই নাকি?'

সুমিতা চুপ করে, দূরের অস্পষ্ট কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলো। কাকলীকে বুকে নিয়ে আমিও চুপ করে রইলাম। সন্দেহ হল, কাকলীও যেন এই বিষণ্ণ অস্বস্তিদায়ক অবস্থাটা একরকমভাবে অনুভব করে, চুপ করে আছে। আমার জামার বোতাম খুঁটতে খুঁটতে, শিশুটিও অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

কিন্তু কাকলী বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলো না। হঠাৎ বলে উঠলো,

'বাবীনতা ভলে গ্যাছে, তুমি দানো না ?'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করলাম। ঘাড় নেড়ে জানালাম, জানি না। আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। কাকলী আবার বললো, 'বাবীন আমাকে হোতেলে নিয়ে দেতে তেয়েথিল।'

বললাম, 'গেলে না কেন।'

কাকলী গম্ভীরভাবেই জবাব দিল, 'মা দায় নি।'

'মা না-ই বা গেল। তুমি তো বাবীনের কাছে যেতে পারতে।'

কাকলী একটি বড় মেয়ের মতো দূরের দিকে চেয়ে বললো, 'দু দনের কাথে থাকতে ইত্‌তে কলে।'

এবার শুধু বুকে মোচড় নয়। মনে হল, আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসছে। দেখলাম, সুমিতার মুখ নত। তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মনে হল, কাকলীর কথায়, আমার থেকে তার অবস্থা ভালো না। একটু পরেই তার গলা শোনা গেল, 'খুকু, কাকুর কোল থেকে নেমে, তুমি একটু সরে গিয়ে খেলা কর তো।'

কাকলী একবার আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপরে মায়ের দিকে ফিরে গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞেস করলো, 'তোম্‌লা কথা বলবে ?'

সুমিতা বললো, 'হ্যাঁ তোমার নতুন কাকুর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

কাকলী আমার মুখের দিকে তাকালো। নিজের থেকেই কোল ছেড়ে নামতে নামতে বললো, 'কিনতু আমি এখন খেলা কল্‌বো না। ওখানে দেয়ে দাঁলাবো।'

বলে সে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল। দেখলাম, কাছেই, একটি বেঞ্চিতে বসে থাকা বুড়ো নেপালীর পাশে গিয়ে সে দাঁড়ালো। নেপালী বুড়ো ফোগলা দাঁতে হাসলো। কাকলীও হাসলো। তরপরে, দুজনেই ঘাড় নেড়ে নেড়ে কী ভাষায়, কী কথা যে বলতে লাগলো, তা ওরাই জানে।

সুমিতা আমার দিকে ফিরে তাকালো। ইতিমধ্যেই তার মুখ যেন আরো শুকিয়ে উঠেছে। বললো, 'আপনি হয়তো জানেন না, সুবীর কেন এসেছিল।'

মুখ খুলতে আমার সঙ্কোচ হল। সরাসরি কিছু না বলে, বললাম, 'হয়তো আপনাদের দুজনের বিষয়ে কিছু একটা স্থির করতে।'

'আপনাকে বিবেক কিছু বলেনি ?'

'বলছিলেন।'

'সে হয়তো আপনাকে ডাইভোর্সের বিষয়ে বলেছিল।'

এত সোজাসুজি কথায়, সঙ্কোচে চুপ করে থাকা চলে না। 'হ্যাঁ, শুনেছি আপনি ডাইভোর্স চান।'

সুমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে, কিছুটা কষ্ট মেশানো দ্বিধার সঙ্গে বললো, 'চাই কি না, ঠিক জানি না। কখনো মনে হয়, চাই। কখনে মনে হয়, ডাইভোর্স নিয়েই বা আমার কী হবে। কেন জানি না, আপনার কাছে কোনো সঙ্কোচ হচ্ছে না কথা বলতে। আমার কোনো দ্বিতীয় জীবন নেই।'

শেষের কথায় যেন একটি দৃঢ় স্বীকারোক্তির সুর ফুটে উঠলো সুমিতার গলায়। তার কথার মধ্যে যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হল না। হয়তো বিবেকের কথা মনে করেই, সে অমাকে একথা বললো। কিন্তু সেটুকু বিশ্বাস আমার ছিল, সুমিতার জীবনে কোনো দ্বিতীয় পুরুষের স্থান নেই। ও নিজেই আবার বললো, 'মেয়েদের এ অবস্থাটা কতখানি হেল্‌প্‌লেস, হয় তো বুঝতে পারেন। তবু ডাইভোর্সের কথা এই কারণে ভাবি, যা হোক একটা স্থির হয়ে যাক। ত্রিশঙ্কুর মতো, ঝুলে থাকা যায় না। সুবীর তাও দেবে না। অথচ, আমি তো জানি, সুবীরেরও কোনো দ্বিতীয় জীবন নেই। এক এক সময় বুঝতে পারি না, তা হলে কী নিয়ে ব্যবধান থাকছে।'

বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আমার ধারণা, এটা নিতান্তই ব্যক্তিত্বের সংঘাত।'

আমার কথাটা অস্পষ্ট বোধ হওয়ায় সুমিতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমি আবার বললাম, 'আপনাদের বিবাদটা তো বাইরের বিবাদ নয়, ভিতরের বিবাদ। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যে অধিকার, সেই অধিকারের বিবাদ। জানি না, সে বিবাদ মেটানো সম্ভব কি না। এ আপনাদের নিতান্ত দুজনের ব্যাপার। মন না মানলে, এর বোধহয় শেষ হয় না।'

সুমিতা বলে উঠলো, 'কিন্তু আপনি যদি সুবীরের ব্যবহার দেখতেন। সে আমাকে আজকাল অবিশ্বাস পর্যন্ত করতে শুরু করেছে।'

'সেটাও বোধহয়, এ ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।'

'এখানে এসে, খুকুর সামনেই কী রকম করে কথা বলছিল, তা যদি শুনতেন। সুবীর জোর করে খুকুকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চায়।'

বলতে বলতে, সুমিতার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। চোখের কোণ চিকচিক করে উঠলো। এ সময়ে আমার যে কী বলা উচিত, জানি না। হিমালয়ের

এই পথ চলতে, আমাদের পরিচয় বা কতটুকু। বলবার অধিকার বা কতখানি। অথচ সুমিতার জন্য মনটা ব্যথা করে উঠলো।

সুমিতা নিজেই আবার নিচু স্বরে বললো, 'সুবীরের জীবনে তো তবু কাজ আছে। কাজ আছে বলে, তার অনেক লোক আছে। তার কত নাম, কত প্রশংসা। কিন্তু আমার কী আছে। খুকুকে যদি নিয়ে নেয়, তাহলে আমার আর কী থাকে। ও খুকুর মন বয়স পর্যন্ত ভুলে গেছে। খুকুকেই সোজাসুজি বলেছে, 'তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে থাকতে চাও, না আমার কাছে?' ভাবুন তো বেচারীর অবস্থা। সে এই একটু আগে আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, ও দুজনের কাছেই থাকতে চায়।'

আমি বললাম, 'ওর পক্ষে সেটাই তো স্বাভাবিক আর সুন্দর। ওর মনের মধ্যে যে এখনো পক্ষপাতের সৃষ্টি হয় নি, সেটা একটা আশীর্বাদ।'

সুমিতা আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। বললো, 'ঠিক বলেছেন। আমিও তাই মনে করি।'

বললাম, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করুন।'

'সুবীরবাবু নিশ্চয় তাঁর মেয়েকে ভালোবাসেন?'

সুমিতার দৃষ্টি একটু নত হল। বললো, শুধু বাসেন বললে ভুল হয়। সুবীরকে আমি যদি ঠিক চিনে থাকি, ও যা-ই করে থাক্, খুকুকে ছেড়ে মনে মনে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।'

'আপনি যেমন ভাবছেন, আপনার মেয়েকে কেড়ে নিতে চান উনি, উনিও সেই রকম ভাবছেন, আপনি ওঁর মেয়েকে কেড়ে নিয়েছেন।'

দুঃখের মধ্যে সুমিতা একটু হাসলো। বললো, 'ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়িয়েছে।'

আমি বললাম, 'তা হলে, সুবীরবাবুর দিক থেকেও কিছু কিঞ্চিৎ যুক্তি আছে।'

সুমিতা চুপ করে রইলো। আমি তাড়াতাড়ি আবার বললাম, 'দেখবেন, এর থেকে যেন ধরে নেবেন না, পুরুষকেই কেবল সমর্থন করছি।'

সুমিতা বললো, 'না, তা ভাবছি না।'

বলে সে কাকলীর দিকে তাকালো। আমিও তাকালাম। দেখে মনে হল, বুড়ো দরিদ্র নেপালীটার সঙ্গে সে গভীর সমস্যামূলক আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাকলী গম্ভীরভাবে, গালে আঙুল রেখে, ঘাড় নাড়ছে। আর

খুড়ো কী যেন বলছে।

কাকলীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, আমার ভিতরে যেন অনেক কথা কল্‌কল্‌ করে উঠলো। মনে হল, এ বেচারীর কী দোষ। যত অন্যায় অধিকারের বোঝা তো, এই শিশুটির ঘাড়েই চেপে বসেছে। আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সুমিতা মুখ ফিরিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই।'

'দেখুন, আপনার আর সুবীরবাবুর মাঝখানে যে সংঘাত, সেটা নিশ্চয় একটা ভিতরের ব্যাপার। বিবেকবাবু যে আমাকে বলেছিলেন, আপনাদের দুজনের মধ্যে এখন ঘৃণাই শুধু অবশিষ্ট আছে—।'

সুমিতা বলে উঠলো, 'শুধু ঘৃণা?'

'আমি সেইরকমই শুনেছি।'

সুমিতা নত মুখে নিচু স্বরে বললো, 'অবিশ্যি বিবেক আমার কথা থেকেই সেরকম আন্দাজ করেছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি ঠিক ততটা চিন্তা করি নি। সম্ভবত ঘৃণার চেয়ে জেদটাই আপনাদের দুজনের মাঝখানে বেশী রয়েছে। ইংরেজীতে হয়তো একে "এগো" বলে। তারপরেও তো, আর একটা জায়গা আছে। আপনাদের দুজনের মন-ই সেটা সব থেকে ভালো বোঝে। বিশেষত আপনাদের কারুরই যখন দ্বিতীয় জীবন বলে কিছু নেই।'......

কথা শেষ করতে পারলাম না। দেখলাম, সুমিতার মাথাটা একেবারে নত হয়ে পড়েছে। তার চিবুক প্রায় বুকের কাছে ঠেকেছে। ফর্সা ঘাড়ে রোদ লেগে, স্বর্ণগ্রীবা সদৃশ দেখাচ্ছে। হয়তো সে কাঁদছে। তবু কথা যখন উঠেছে, আমার থামতে ইচ্ছা করলো না। বললাম, 'যদি মনে করেন, তার-পরেও কিছু থেকে যায়, সেটুকু কি খুকুর মুখ চেয়ে ছাড়া যায় না? ও যে বাবা মায়ের মাঝখানে জুড়ে থাকতে চায়, ওর এ সাধ কেন অপূর্ণ থাকবে।'

সুমিতা রুদ্ধ গলাতেই বলে উঠলো, 'আপনি জানেন না, সুবীর কী রকম নিষ্ঠুর। ও ভাঙবে তো মচকাবে না।'

'আপনি মচকান।'

আমার কথা শুনে সুমিতা ভেজা চোখ তুলেই যেন চমকে তাকালো। আমি হেসে, অনুরোধের সুরে বললাম, 'খুব কঠিন জানি, কিন্তু আপনি তো জানেন, এ মচকানোর অর্থ কী। এ মচকানো, সত্যি কি মচকানো?'

সুমিতা যেন অনেকটা ব্যাকুল সুরে বলে উঠলো, 'কেমন করে, কেমন

করে বলুন।'

আমি তেমনি হেসেই বললাম, 'আমি যোগিনী হয়ে যাব সেই দেশে, যেথায় নিঠুর হরি। সব দিয়ে দেখুন না, আসল ভাঙন মচকানোটা কার। কার হার, কার জিত।'

সুমিতা আমার দিকে যেন চেয়ে থাকতে পারলো না। অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে রইলো। জানি, সে কাঁদছে। একটু পরে সে বললো, 'খুকুকে ডেকে নিন।'

আমি কাকলীকে ডাকলাম। শুনেই সে ছুটে এল। বোঝা গেল, সে আমাদের কাছে আসবার জন্যে মনে মনে ব্যস্ত হয়েছিল। সুমিতা তাকে কোলের কাছে টেনে নিল। বুকের কাছে চেপে ধরলো। বললো, 'চল, এবার আমরা উঠি।'

বলেও সে কাকলীকে বুকে চেপে বসে রইলো খানিকক্ষণ। আমি চুপ করে দেখলাম। তারপরে যখন সুমিতা মুখ তুললো, দেখলাম, তার ভেজা মুখে হাসি। হাসিটি স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন, যেন কৃতজ্ঞতায় ভরা। মুখে তার রক্তাভা। বললো, 'কে যে কেমন করে কখন বন্ধু হয়ে ওঠে, বোঝা যায় না।'

আমি বললাম, 'ঠিক সময়ে বোঝা যায়।'

দুজনেই চোখে চোখে তাকিয়ে হেসে উঠলাম। বন্ধুর হাসি। সুমিতা বললো, 'আপনার কথা সারা জীবন মনে থাকবে।'

আমি বললাম, 'সারা জীবন না হোক, কলকাতায় গিয়ে যেন ভুলে যাবেন না।'

আবার হেসে উঠলাম দুজনেই। তারপরে বললাম, 'আপনার তো ফেরার দিন হয়ে এল।'

সুমিতা বললো, 'হ্যাঁ, পরশু যাব। আপনি?'

বললাম, 'তার পরের দিন।'

সুমিতা বললো, 'অন্য কিছু যেন মনে করবেন না, অসুবিধে না হলে চলুন না, এক সঙ্গেই যাই, নইলে আমাদের মা মেয়েকে একেবারেই মুখ বুজে যেতে হবে।'

কেন জানি না, বুকের মধ্যে একটা খুশির হাসির বেগেই যেন টনটনানিতে ব্যথা করে উঠলো। আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। কাকলীকে হাত বাড়িয়ে নিয়ে বুকের ওপর ধরে বললাম, 'নিশ্চয়, তাতে কী হয়েছে। আমারও তো পথে একটু কথা বলবার লোকের দরকার।'

দেখলাম, আজ সারাটা দিন ধরে খাজাঞ্চিখানা উত্তরের আকাশে ঝলকাচ্ছে। পুব থেকে পশ্চিমে ধবলগিরি অর্ধচক্রাকারে দার্জিলিং-এর প্রাঙ্গণকে ঘিরে রয়েছে। আজ আর কারুর তেমন কৌতূহল নেই, উচ্ছ্বাস নেই। আজ তার কোথাও ঢাকাঢাকি নেই। সকল দুয়ার হাট করে খোলা।

ফিরে আসবার সময় অনেক কষ্টে পার্বতীকে ঢালু পাহাড়ের কোল থেকে আবিষ্কার করেছিলাম। সে সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় দিতে চান নি।

বার্চ গাছের আড়ালে আড়ালে, চড়াই উৎরাইয়ের ধাপে ধাপে, নিজেকে লুকিয়ে, সে স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। ওর মা মায়লী, স্টেশন অবধি আমাকে বিদায় দিতে এসে বারে বারে বলেছিল, 'মেয়েটা কিছুতেই আপনার সামনে আসতে চাইল না। তাজ্জব লেড়কী আমার। বাবুর কি চিরদিন এখানে বসে থাকা চলে।'

বলে, মায়লী ফোগলা মুখে, করুণ হেসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ও কোথায়?'

মায়লী স্টেশনের সামনেই, রাস্তার ধারে যে উঁচু চড়াইয়ের সবুজ চূড়াটা রয়েছে, তার ঢালুতে আঙুল তুলে দেখালো। দেখলাম, পার্বতী সেখানে দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই, পিছন ফিরে সে ছুটে চলে গেল। হাসতে গিয়ে কোথায় একটু লাগলো। জীবন মন, সবই কত বিচিত্র।

একটু পরেই, সুমিতা আর কাকলী এসে পড়ল। গাড়ি প্রস্তুত, এবার কেবল উৎরাইয়ের পালা, অবতরণ।

অনেকদিনের ঠিকানা, তাতে কোনো ধাঁধা নেই। পথ একটু ঘোরালো। দিশা খুঁজে নিতে হবে। ঢাকা দিল্লী কলকাতা, যে-ঘাট থেকেই আসি, সোজা বাটের রসিদ কেউ দেয়নি আমার হাতে। যদিও সে আমার ঘরের কোলে 'আরশীনগরের' মতো আখচারের আনাযানায় পড়ে, তবু সে 'পড়শীকে' পেতে, ঘুর-পথে হাতড়ে ফেরা ঘোচে না। কলের গাড়ি থেকে নামলাম নিপাট, বাবুকে টিকিট দিয়ে হাজির হলাম ঠিক টিকানায়, সেটি হবার জো নেই।

পথের ধুলো মাখতে হবে গায়ে। পারলে বলতাম,

ক্ষ্যাপা, না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়?
আপন ঘর না বুঝে,
বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।

কিন্তু ধান কাটা সারা হয়েছে। জলে ধরেছে টান। পাঁক কাদা শুকিয়ে পথ ঘাট খট্ খট্ করছে। সোনা যদি কখনো নীল হয়, তবে সে আকাশে গিয়ে। এখন যেমনটি, যেন নীল ঝলকে চোখ ধেঁধে যায়। পৌষ-সংক্রান্তির এই বেলা যতো ছোট আকাশ ততো বড় দেখায়। ঘরে কেউ থাকতে চায় না। বাংলা দেশে মেলার মরসুম পড়েছে তাই। এ মেলা যেন গ্রামীণ বাংলার বন ভোজনের কাল। বাংলার যে-জেলাতেই যাওয়া যাক্, ঘরে কেউ 'আপন খুঁজতে' নেই। বিশেষ, এখন এই আমন ফসল ঘরে ওঠার কালে। ধান গোলায় উঠেছে, গঞ্জে গেছে। সে হিসেবে, বোটানিকেল গার্ডেনের শহুরে বন-ভোজনের সঙ্গে এসব মেলার তফাৎ আছে। মেলা মানেই শুধু বেড়ানো নয়। উৎসবের আঙিনায় দেখা-সাক্ষাতের পালা আছে। আছে কেনাবেচার লেনদেন। সেই সঙ্গে

তীর্থ-ধর্মের পাট চুকিয়ে নেওয়া। বন-ভোজনটাও এখানে ধর্মের নাম ধরেই জমে। এর নাম মেলা।

অগ্রহায়ণ থেকে শুরু। বৈশাখ পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠ ধরো ধরো। এ ক'মাস ধরে অরণ্য আর আবাদ থেকে, উত্তরের পাহাড়ি কোলে, পশ্চিমের ধুলিধুসর প্রান্তর থেকে পুবের নদীবহুল শ্যামলী সমতলে, যেদিকে যাওয়া যাক, যেদিকে চাওয়া যাক; মেলা আছে কোথাও না কোথাও। উপলক্ষের অভাব নেই।

যে- তত্ত্বজ্ঞ ঘরে বসে রূপ দর্শনের কথা বলছে, সে কিন্তু একতারা নিয়ে মাঠে নেমেছে। ঘরে থাকা যে তার দায় হল, সে-ই সকলের দায়। আমারও। ঘরে কেউ 'আপন খুঁজতে' থাকল না। সবাই বাটে এসেছে। আমিও। আমার ঘোরালো পথের ঠিকানা ঘরের কোলে কেন্দুবিল্ব। ডাক নাম কেঁদুলি। কিন্তু যদি ডাক দিয়ে শুধোয়, 'কন্দুর?'

তা হলে এক কথায় সবাই জবাব দেবে, 'জয়দেব'।

কেন্দুবিল্ব নয়, কেঁদুলিও নয়। শেষ পর্যন্ত সব মিলিয়ে একটি নামেই কার্য-কারণের সন্ধান মিলবে। 'জয়দেবে' মানেই জয়দেবের পাটে। আর জয়দেবের পাট ও কেঁদুলি, সঙ্গে জয়দেব-স্মারক মেলা, সব 'জয়দেবে।'

সহজ ভেবে এসেছিলেম
পড়েছি অসহজের হাওরে
ক্ষ্যাপা, পড়লি একি ফাঁপরে।

পথ খুঁজতেই বেলা গেল। কোন্ পথ ধরা যায়, সেইটি ভাবনা। নইলে, এক ডাকে চেনা যাবে, এমন অনেক জায়গার নাম করা যায়। আসানসোল থেকে ব্যাসে চেপে দুবরাজপুর হয়ে যাওয়া যায়। বোলপুরের বাসের সহিসও হাঁক দিয়ে জানায়, 'জয়দেব। জয়দেব।' বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর হয়ে, সংরক্ষিত বনের পথ ধরে যাওয়া যায়। আর শেষোক্ত পথটাই নাকি দক্ষিণের শহর থেকে আসা মানুষের পক্ষে সহজ।

সেই ভালো, কিন্তু 'সহজেরে চিনলে নে মন!' সারা গায়ে ধুলো মেখে দুর্গাপুরে এসে যখন মোটরবাস দাঁড়াল; তখন তার ভিতর বাহির একাকার। তিল ঠাঁই আর নাইরে। রাত্রিবাসের দায়ে সঙ্গে লটবহরও আছে। নিজের ঠাঁই নেই, তার ওপরে মাল সামাল দেওয়া।

এতেই বিচলিত? চোখে না হয় না-ই দেখা গেল বসবার আসনগুলি। না হয়, মেয়ে পুরুষের মাঝখানে, গাড়ির মেঝেতেই বসতে হল। তার পরেও তো সেই দস্যি মেয়েটা বাকী ছিল, কোলে যার ছাগশিশু। হাতে কাঁটাল

পাতা। কাঁধে ঝুলি।. সংকোচ করে লজ্জা পেয়ে লাভ নেই। লেডীজ সীটের ফিকিরে সে কোনদিন মান বাঁচিয়ে ফেরেনি। সে গায়ের সঙ্গে লেপটে বসায় যদি কারুর তরঙ্গ লাগে, সে আপন তরী সামলাক। সীমন্তিনী চলেছে আর এক তীর্থের বন-ভোজনে। সেখানে মন গুণে ধন পাওয়া যাবে। সেখানে প্রেমিক তার মরণের ভয়টুকুও প্রেমিকার পায়ে দিয়ে পাগল হয়েছে। ঝড়ের রাতে দুর্জয় নদী তার প্রেমের সাহসে থির হয়েছিল সেখানে। মনের মানুষকে চিরদিন ধরে যেখানে মানুষ খুঁজেছে। সে যাবে 'চিন্তামনিতে'।

বোঝা গেল, শুধু জয়দেবে নয়, এ যাত্রা চিন্তামণিতেও। বিল্বমঙ্গলের সেই অধরা প্রেম চিন্তামণিরূপে যে বিরাজে সারা অধর বৃন্দাবনে।

কিন্তু সেখানে ছাগ বলি কেন? বাংলা দেশের এ বড় ঘোরপ্যাচের কথা। নবদ্বীপে কিংবা শান্তিপুরে, কেন শাক্তদের দব্‌দবা? চণ্ডীদাসের বাসুলী কেন শক্তিরূপিনী?

তা যেন হল। এ মেয়ে কেন যায় বলি নিয়ে?

সে কথা আছে তার সিন্দুরের ডগ্‌ডগানিতে, চোখের ছটায়, হাসির ঝিলিকে। এ মেয়ে যায় অধর ধরার মানত দিতে। ধান উঠেছে, ছাগ কিনেছে, পাওয়ার উৎসবের এই তো সময়।

কিন্তু বনের পথ, বনেরই পথ। গাড়ি যে শুধু পায়ে চলার মত আস্তে চলে, তা নয়। মানুষ সব দলা পাকিয়ে টালমাটাল। গাড়ি নয়, যেন মন্থর গতি মাতাল হস্তি। পথ যেন খ্যাপার মত লাল এলোমেলো। গাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।

দু'পাশের শালবনের দিকে তাকিয়ে, বুঝতে যদি ভুল হয় যে, দুর্গাপুরের এ পথের সীমানায় শালবন রাঙা কেন, তবে নিজেকে দেখলেই হবে। এ পথে যার বাস, এ পথে যার যাওয়া-আসা তাকে সে দাগ না দিয়ে ছাড়ে না। এ পথের ফাগ খেলা পৌষ-সংক্রান্তি থেকেই শুরু হয়। লাল ধুলো মুখের মধ্যে ঢুকেও কিচকিচ করে জানান দেয়। আর বাইরে অনবরত যে বিকট চীৎকার শোনা যায়, সে হল গাড়োয়ানের বলদ সামলানোর দায়। গ্রামবাসী বলদের যন্ত্রের শব্দ শুনলেই মাথা খারাপ। একেবারে কানার মত খানায় নেমে ভোঁ দৌড়। গাড়ির মধ্যে মানুষ তাতে পড়ল কি মরল, বিচার করবে না।

আগে নামে চিন্তামণির যাত্রীরা। তারপরে জয়দেবের যাত্রীরা অজয়ের ধারে। কিন্তু অজয় নদ কোথায় বহে, কে জানে। সামনে দেখা গেল দুস্তর মরুভূমি। রোদ ঝলক দিচ্ছে বালিতে। বালি উঠেছে আকাশে। বালি

উড়ছে মাহুষের পায়ে পায়ে। মোষ বলদের খুরের ঘায়ে।

লাইন দিয়ে চলেছে গরুমোষের গাড়ি। কাতার দিয়ে চলেছে মাহুষ। এক তরফা নয়। যাওয়া আসা দুই-ই চলেছে। দু' একটি জীপগাড়িও যে না দেখা যায়, তা নয়। গায়ে তাদের লিখন আছে দুর্গাপুরের ইস্পাত কলের ছাপ। অজয়ের এ বালির চরে কলের গাড়ির শব্দ কোনো আন দুনিয়ার চমক দেয় না। দূরের ওই কেঁদুলি গাঁয়ের মেলা থেকে কলের গানের যে রকম জান্তব শব্দ ভেসে আসছে, তাতে বোঝা যায়, কলের আওয়াজে বাংলার কোনো গ্রাম, কোনো নদীর চর-ই আর তেমন চমকায় না।

বালির পথ কিছু কম নয়। ঘাম দেখা দিয়েছে। বালির পথ ঠেলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। মাহুষ তবু নিজের কলে চলে। কিষাণের শক্ত হাতের ঠেলা না পেলে গরুর গাড়ির চাকা বালি কামড়ে থামতে চায়।

কিন্তু তরী বুঝি পাড়ে এসে ডুবল। ঘুর পথের শেষ ধাক্কা, এবার চড়া পেরিয়ে নদী। এমন কিছু ছোটখাটো কাঁদর নয় যে লাফ দিয়ে ডিঙোব বৈতরিণী। অজয়ের বুকে জল আছে। জলের চেয়ে জলের টান আছে বেশী। এপার ওপারও একটুখানি।

অগত্যা পায়ের জুতো হাতে, আর হাতের মাল মাথায়। এ দরিয়া পার হতে হবে। তবে আপন-বুঝ তরীতে চলবে না। পরের পায়ের দাঁড় ধরে পাড়ি দিতে হবে। প্রায় গুরুর পা ধরে চলার মত। নইলে অচেনা খানা-খপ্পর আছে।

কিষাণের ক্রুদ্ধ গর্জন যদি শোনা যায়, 'হেইরে শালার ভীমরতি হয়েছে,' তবে ফিরে তাকাবার দরকার নেই। কারণ তারপরেই ছপ্‌টির ঠাস্‌ ঠাস্‌ শব্দেই জানা যাবে, নদীতে গাড়ি পার হচ্ছে। মালপত্র নিয়ে যদি মাহুষেরই ভীমরতি হতে পারে, জোয়াল কাঁধে গরুর আর দোষ কী? তবে কাঁধটা শুধু মোষ বলদের নয়। কিষাণের নিজের কাঁধও চাকায় ঠেকেছে। তাতে পেশী ফাটে কি রগ ছেঁড়ে, দরিয়া পার হতে হবে।

কিন্তু কাপড় যতখানি দরকার, তুলতে লজ্জা করলে চলবে না। কারণ লজ্জাটুকু অজয়ের ঘাট পারানির মাশুল নয়। তা হলে মেয়েরা মাথার ঘোমটায় শালীনতা রেখে অমন করে হাসতে হাসতে পার হয়ে যেত না। তাতে শহুরে চোখ যদি লজ্জা পেয়ে থাকে, তবে শহরের গায়েই কাঁটা দিয়েছে। এখানে যার কূলে ভেড়ার সে কূলে ভিড়েছে।

শুকনো ডাঙায় পা দিয়ে মনে হল, সহজের বাজন শুনি, অসহজের টঙ্কারে। এখন বেশ ভালই লাগছে। ঘুরপথের সীমানা পেরিয়ে, সেই ঘরের কোলেই এসেছি। কিন্তু আমার 'পড়শীর' দেখা এখানে নেই। সদরে তার দেখা পাব, আশা নেই তেমন।

পার হয়ে এলাম বর্ধমান। এপার হল বীরভূম। অজয়ের উঁচু পাড়ে উঠে প্রথমেই গরুর গাড়ির ভীড়। তারপরেই মেলার শুরু। সেই একই মেলা। কলের গানের কান ফাটা চীৎকার। আয়না সাজানো, ছবি টাঙানো, সারি সারি পান-বিড়ির দোকান। থরে থরে খাবার সাজানো। খাজা গজা পানতুয়া, সন্দেশ রসগোল্লা ছানার মুড়কি, সিঙাড়া নিমকি বোঁদে। বেগুনি ফুলুরি আলুবড়ার সঙ্গে মুড়ি। চা কোথায় নেই? বাংলা দেশের অসূর্যম্পশ্য বনে বাঘটাও বুঝি বেলা তিনটেয় চায়ের জন্য হাই তুলতে আরম্ভ করে।

মেলার সদর জুড়ে সেই, হাত কাটা লোকের পা দিয়ে খেলার সার্কাস। এক মানুষের তিন মাথা, জলপরীর ম্যাজিক আর বৈদ্যুতিক নারী, যার গায়ে আঙুল ছোঁয়ালেই আগুন।

মানুষ চলছে আজব কলে।

কিন্তু 'কেন্দুবিল্বসম্ভবরোহিনীরমণ' তাল দিয়ে ফিরছে আমার মনের ঝঙ্কারে। যাঁর স্মারক মেলায় 'অধর মনের মানুষের' সন্ধানীদের খোঁজে এসেছি, সেই 'পদ্মাবতী রমণ' 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী'র স্মরণচিহ্ন আছে কোথায়। এই ঘুড়ো বটের ছায়াভরা দীন গ্রামখানির কোথায় সেই,

> জয়দেবে মাধবর স্তুতিক বর্ণাব
> পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।
> কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিগদতি
> রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।

কোন্ মন নিয়ে শুনতে পারি সেই বসন্ত-গুর্জরী-মালব রাগের গান, তার সঙ্গে রূপক তাল, যতিতাল, অষ্টতালী, একতালী। যে রাগ ও তালের বোলে, মোহিনী নাচের ছন্দে, নুপুরের ধ্বনি শুনে গ্রাম কেঁদুলির রাত্রি আতুর হয়েছে। অজয়ের খরস্রোত স্তব্ধ হয়েছে কেন্দুবিল্বের পায়ে।

অজয়ের তীর ছেড়ে, একটু এগেই রাধাবিনোদের মন্দির। দ্বাদশ শতাব্দীর কবির বাসগৃহের ভিটেয় বুঝি সপ্তদশ শতাব্দীতে এ মন্দির উঠেছিল। পোড়া ইঁটের ফলকে ফলকে ছবি আঁকা। কিন্তু রাধাবিনোদের লীলা নেই! মন্দিরের গায়ে লীলা করেন দশভুজা মহিষমর্দিনী। তাঁর পায়ের তলায় লড়াই

করে বানরে আর রাক্ষসে। লঙ্কার পাপ আর পঞ্চবটীর পুণ্য কাহিনী।

এই মাটিতেই সেই কবির ঘরকন্না? এই মাটিতেই কবি লেখেন গান, প্রেম-মুগ্ধ সলজ্জ চোখে দেখেন পত্নী?

কিন্তু কলের গানে কান পাততে পারি না। শাশুড়ি ননদ বউয়ের আঁচলে আঁচল বাঁধা ভিড়ের ঠেলায় দাঁড়াতে পারি না। ঘোমটার তলায় পাঁপরভাজা গুঁজে দেওয়া আদেখলে বরটারই যেন গোটা মেলায় দখলিস্বত্ব আছে। আঁটখোঁপায় ঢিল পড়া আদিবাসী মেয়েটা, অমন ব্যাকুল চোখে কোন্ 'অচিন পাখিকে' খুঁজছে, কে জানে। নাকি ওর 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি' শুধু যাওয়া আসা করছে, তাই দেখছে।

অজয়ের তীর ধরে বেদনাশা বটের তলা। সেই পথে গেলাম। এক নদীতে যুগপৎ জোয়ার ভাঁটা। মানুষ আসে, মানুষ যায়। এ দুয়ের উজান ঠেলে যাওয়া যায় না, থেমে থাকতে হয়। দু পাশেই পসরা। তুলসী মালা, রুদ্রাক্ষ আর সিন্দুর। বাঁশের বাঁশি, কাঠের পুতুল, মনোহারীর ঝলক।

তারপরেই ঝুরিনামা বটের বিস্তার। ছায়াময় এক নতুন দেশ যেন। সেখানে সংসারের যাবৎ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোয় টুকরোয় হলদে লাল আসমানি রং-এর পুরো আলখাল্লার ভিড়। চুলের চূড়োয় কষা বাঁধন নাচের উল্লাসে স্খলিত, বাতাসে চূর্ণ চূর্ণ। ডারা-ডুপকি-খুঞ্জরি, কাঠ-করতালি-প্রেমজুরি-খুঞ্জনি, ওই যা বল, সব আপন তালে আপনি মগ্ন। একতারা-দোতারা-বাঁয়া, লাগ-ঝুভা-ঝুঙ্ গুপীযন্ত্র, সব পায়ের ঘুঙুরে দিচ্ছে সাড়া। গলার স্বরে আত্মহারা।

এখানে দোকান নেই, পসার নেই, ছেঁড়া কাঁথার আলখাল্লা পরে সব অধর ধরার খ্যাপামিতে নাচ গান জুড়েছে। কাঠ দিয়ে জ্বেলেছে আগুন। গন্ধেই অনুমান, গঞ্জিকা চলেছে প্রতিটি আসরে আসরে। গুচ্ছ গুচ্ছ আসর, ছড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। হুশ। হুশ। পাখিদের তাড়া না দিলে মাথা মুখ নষ্ট করে ওপর থেকে। নীচে বাউল সমাবেশ। গাছের ডালে ডালে পাখির সমাবেশ।

বাউলের শুধু আলখাল্লা নয়। গেরুয়া বসনও আছে অঙ্গে। মাথায় আছে পাগড়ি। হাতে অনেকের লোহার বালা। কাঁধের ঝুলি নামাবার অবসর হয়নি। জয় গুরু! জয় গুরু! বলে, অভিনন্দন প্রত্যাভিনন্দনের পরেই একতারাতে ঠুং ঠুং। বাঁয়াতে ঝুগ্ ঝুগ্। হেসে হেসে ভ্রূ নাচিয়ে উদাত্ত গলায় ডাকে,

ওরে ক্ষ্যাপা।

মন আছে তোর মনের ভিতরে
তারে একবার ছাখ না নেড়ে চেড়ে।

আসরে সহসা স্তব্ধতা। গায়কের দিকে সকলের অবাক মুগ্ধ দৃষ্টি। গায়ক আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়ার ভঙ্গি করে দেখাল। সবাই বললে, আহা! আহা!

বাউল কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গাইল,

দেখবি সেথায়, জলের মধ্যে আগুন জ্বলে,
নিরালায় সে আছে বসে নীরে আর ক্ষীরে।
মন আছে তোর মনের ভিতরে।

পরমুহূর্তেই হরিধ্বনি কাঁপাল বটতলা।

জলের মধ্যে আগুন জ্বলার তত্ত্বকথা সুদূর রহস্য। শুধু সুরে আর বাজনায় আপনা থেকে দোলা লেগে যায় নিজেরই শিরদাঁড়ায়। ও যাদের কথা তাদের কথা। বুঝাত গেলে, জলের তল নেই। আর-এক আসরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই যুগেও, ছেঁড়া আলখাল্লার অহংকার কোথাও একটু মুখ ভার করে মাথা নামিয়ে বসেনি। এ কিসের সম্মোহন? আত্মসম্মোহন? ঘাটে ভাসা, বাটে ঘোরা এই নিত্যভিক্ষার ঝোলাওয়ালারা, আপন তত্ত্বগানে কেমন করে নিমগ্ন। এই সব খোয়ানো সাহস এরা পেল কোথায়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদের শেষ করতে পারেনি? বাংলার এই দুটি দশকের নিরন্তর মন্বন্তরের থাবা এদের একেবারে গ্রাস করতে পারেনি? আশ্চর্য! কেন?

সিউড়ির বুড়ো বাউল উদার হয়ে তাকায় অজয়ের স্রোতে। যেন নদীর স্রোত দেখে না, পার হয়ে যাওয়া সময়ের স্রোত দেখে। উত্তর বাতাসে তার দাড়ি কাঁপে। বলে, 'অ' বাবু, এ আর কি দেখতেছেন। সব গেঁইছে, এখন এ চাট্টি বাউলে ঠেইকেঁছে। এও যায় যায়। যাবে গা, বাউল থাকবেক না।'

তারপর একতারার আঙুল বুঝি আপনি আঙুলে ঝংকার দেয়, সুর করে বলে,

'এক দেহান্তে হলি কানা
(তাতে) মানুষ জনম আটকাবে না।
মানুষ যদ্দিন থাকবে রে মন
তারে সাধতে হবে মন মনা।

সে বলে সাধতে হবে। কেন? না, 'অ' বাবু, এ-শরীলের ভাণ্ড হলেন বেহ্মাণ্ড। মানুষের নিজের মধ্যে সব। জয়দেবে বাউল আসবেক না; নিজেকে

খোঁজার জ্বালা সে খোবে কুথা ?'

তারপর আপাদমস্তক দেখে বলে, 'বেদ-নাশা বটের তলায় যান, সিখানে কলে মুখ নাগিয়ে গান গাঁচ্ছে। বসবার জায়গা হয়েছে, আরাম পাবেন বইসে।'

পাশের 'ইস্তিরি লোকটিকে' দেখিয়ে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, ইনি ?

বাউল মোহন হেসে বলে,

চণ্ডীদাসের রজকিনী
যুগল প্রেম তারি শুনি
পদ্মাবতী চিন্তামণি
বিষম রসে পাতলি ঘুনি
নয়ন কোণে ঝলক দিয়ে
বাঁধগা এ'র তিরিবেণী ॥

সহজ পরিচয় বুঝি বাউলানী।

ঘোষপাড়ার ছায়া দেখছি সবখানে। নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া, সেখানে খোলা আকাশের তলায় আদিগন্ত লিচু বাগানের ছায়ায় ছায়ায় বাউল-বাউলানীর ভিড়। সেখানে এমনি আসর দেখছি দোল-পূর্ণিমার রাত্রে। এমনি গান শুনেছি সেখানেও, যেখানে তত্ত্ব ছাড়া গান নেই। তত্ত্ব ছাড়া শিল্পসৃষ্টির কোনো প্রেরণা নেই। তত্ত্ব আছে বলেই কথা আছে। কথা ছন্দে বাঁধার তলে তলে গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ। তবু কেন্দুবিল্বই আদি। ঘোষপাড়ার বাউল মেলার বয়স বোধহয় এখানকার রাধাবিনোদের মন্দিরের বয়সী।

আর-এক আসরে তিনজন একযোগে গান ধরেছে। খুঞ্জনি, বাঁয়া-একতারা আর ডুপকিতে তাল দিয়ে গাইছে নেচে নেচে,

বাঁয়ে ইড়া ডাঁয়ে পিঙ্গলা,
সুষুম্না মাঝে
রজ আর তমর মাঝে
গুণ বিরাজে।

একদিকে কমল, অন্যদিকে কুলিশ, মাঝে সুরতবিলাস। তাই কি বাউল আসে জয়দেবে ? সহজ সাধনের প্রকৃতি বলে কল্পনা করা হয়েছে নাকি জয়দেবের পদ্মাবতীকে ? যে-কল্পনায়, অপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ আধাররূপিণী শ্রীরাধিকা ? সহজ সাধনের দেহ ব্রহ্মাণ্ডের অরূপ রসে ডোবার ছন্দ বুঝি বেজেছিল পদ্মাবতীর নূপুরে। বাউল তাই ন্যাড়া শিমূলের রক্ত মাতনের মত রঙে রঙে মাতে এসে বুঝি জয়দেবের পাটে।

হালের ভাষায় বলা যায়, পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেবের পাটে এ যেন বাউল কংগ্রেস। জয়দেব-স্মরণোৎসবকে কেন্দ্র করে কোনো এক অতীতে বুঝি এ-বাউল সম্মেলন শুরু হয়েছিল। দল থাকলেই মিলন চাই। পরস্পরের দেখা-শোনা, আলাপ আলোচনার সামাজিক পন্থা চাই।

বাউল আছে যে যেখানে, সবাইকে আসতে হবে। আর এই যদি সব হয়, তা হবে বুঝতে হবে, নদীতে আর বান নেই। উৎসে তার টান ধরেছে অনেকদিন।

বাউল কবেকার? চৈতন্যচরিত্রামৃতে নাকি অনেকবার বাউলের নামোচ্চারিত হয়েছে।

'আমি ত বাউল আন্ কহিতে আন কহি।'

কিংবা

নীবিবন্ধ পড়ে খসি বিনা মূলে হয় দাসী
বাউল হঞা কৃষ্ণ পাশে ধায়।

চণ্ডীদাসেও বাউল শব্দ আছে।

যদি জিজ্ঞেস করি, বাউল কে? তবে শুনি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' 'সেই মানুষে ফিরি খুঁজে', তাই আমি বাউল। সে মানুষ কে? সে মনের মানুষ, সহজ মানুষ, সে রসিক, সে অচিন পাখি, সে অধরা। সেই 'সোনার মানুষ ভাসছে রসে। সেই আলোকের মানুষ আলোকে রয়।' সংসারের 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে।'

কেমন করে পাওয়া যায় তাকে? 'সহজ সাধনে।' 'সহজ ভজনে।' মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে। যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী। নারী আর পুরুষের প্রেমে। তাই রূপ নেই, সে অরূপ। তার ভাষা নেই, সে অনির্বাচনীয়। সে শুধু অনুভবের স্পন্দন। এই সহজ সাধন 'রেচক পূরক স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন।' কিন্তু 'সে নদী অত্যন্ত গভীর আছে কামরূপী কুম্ভীর।' 'কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি রয় মূলাধারে, প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে।'

বাউল বেদবিরোধী, সহজিয়া মতে, 'মাটির দেহ মাটিতে মিশায়।' গানের মধ্যে রাধা কৃষ্ণ গৌর নিতাই শুধু তত্ত্বকথার প্রতীক। তার দেবতা নেই, কোনো মূর্তি নেই। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন জলে নেমে সূর্যতর্পণ করে, সে গান গেয়ে বলে 'ভাই তোমার তর্পণের জল যদি অতদূর সূর্যের কাছে পৌঁছায়, তবে চাষের ওই কঠিন মাঠে অমনি করে জল পাঠিয়ে দাও না।'

দেখে আসি বেদ-নাশা বটের তলা। এদিকে সন্ধ্যা ঘনায়। অজয়ের বুকে

গ্রামে ছায়া। আকাশে জাগে চাঁদ। উত্তরের বাতাসে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। বাতাসও বড় সহজ নয়। পশ্চিমের কোণাচে চাবুক আছে তাতে।

এদিকটায় মেলা বলতে মেলা নেই। হ্যাজাক ডে-লাইট নেই, দোকান-পসার নেই, কলের গান নেই। আছে শুধু ঝুরি নামা, দাড়িওয়ালা বুড়ো বাউলের মত বট আর বট। বাউলেরা কেউ কেউ বা হ্যারিকেন জ্বালিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশেরই বাতি নেই। তাই এখানে আলো আঁধারের লীলা। স্পষ্ট, কিন্তু সবই অস্পষ্ট। তবে শুধু বাঁয়া ডুপ্‌কি একতারা প্রেমজুড়ি আর মেয়েদের সেমিজের মত আলখাল্লা কোমরবন্ধনী ও মাথায় পাগড়ি নেই। খোল করতাল আর গেরুয়া বসনও আছে বাউলদের মাঝে মাঝে। ছাই মাখা কপ্‌নি আঁটা ত্রিশূল আর চিমটাধারীও আসর নিয়েছে।

কিন্তু বেদ-নাশা বটতলায় বড় আলো ঝলমল। মস্তবড় ক্যাম্প হয়েছে। সেখানে সাজানো টাটে মনোহর ক্ষ্যাপার সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো প্রকাণ্ড ছবি। এ আশ্রম মনোহর ক্ষ্যাপারই। স্থায়ী আশ্রম পুরুলিয়ার। ব্যাটারিসেট্‌ মাইক বসিয়ে আসর করা হয়েছে। সামনে বেড়া ঘিরে গদী করে আসন হয়েছে মনোহর ক্ষ্যাপার। সেখানে তিনি বর্তমান। মাথায় আছে চূড়ো বাঁধা চুল, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবীতে ঝলক দিচ্ছে সোনার বোতাম। তার ওপরে সার্জের গলাবন্ধ কোট। বাঁ হাতের মণিবন্ধের ঘড়িতে নজর করছেন মাঝে মাঝে, তাতে আংটির পাথরে দিচ্ছে চমক।

আর একটি মহিলাকে দেখলাম. গেরুয়া সিল্ক তাঁর পরনে। মধ্যবয়স্কা, তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁট, চোখে কাজল, কিন্তু চশমা, হাল ফ্যাসানের ব্লাউজের গলায় সোনার হার। ভক্তরা মা মা বললেন। এখানেই দেখলাম শহুরে ভদ্রলোক-দের ভিড়। শিষ্য এসেছেন টেপ রেকর্ডার নিয়ে। আসর জমেছে ভাল। সমবেত হয়েছে বাউলেরা। বসে পড়লাম। নবীন এক বাউল তখন একতারা আর বাঁয়া নিয়ে নেচে নেচে গাইছে,

আমি দোষ কারুরে দিব না,
আমি রয়েছি যেই সেই কাঁনা।
কুম্ভভাবের ফেরে পড়ে
কুইচ্ছের নেহা ক'রে
সেই একের মধ্যে সার অসার গুরু বস্তু চিনলাম না।
ওরে মন, ফিরে যা তাড়াতাড়ি
হবার আগে ভরাডরি (ভরাডুবি)

গড়েছি বাঁদর অধর ধরতে পারলাম না।

বাউল নয়, যেন বনের হরিণ। খুশিতে নাচছে তাল দিয়ে। চোখে হাসি, মুখে হাসি, কোমরের বাঁকা গতি। বাউল লাফ দিয়ে দিয়ে নাচে।

একে একে অনেকে গাইল। তারপরে সেই খুঞ্জুনি বাজল, সেই দোতারার তারে লাগল টংকার। মিষ্টি মেয়ের গলায় সপ্তমে উঠল সুর,

যদি এসে থাক হরি
নিয়ে নামের তরী
আমারে নিয়ো পার ক'রে।
কে সে কোথা যায় বেয়ে
ও তরীখানা দাও ধরিয়ে।
যদি না নেয় তরীতে
ওগো, আমি যাব দাঁড় ধরি।

পরিচয় হল। নাম রাধারাণী। পাশে বসে যে দোতারা বাজায় সে বাউল গোপাল ক্ষ্যাপা। এসেছে বীরভূমের খোরামাঠ বাউল আখড়া থেকে। কালো গোপালের উন্নত নাসা, ঢুলু ঢুলু দুটি ভাবময় চোখ। মাথায় চূড়ো, গালে দাড়ি, হাতে বালা। পাশে তার রাধারাণী, স্ত্রী নয়, সাধন-সঙ্গিনী প্রকৃতি। ছোট্ট সিন্দুরের টিপটি বুঝি সংস্কারের ছোট করে আঁকা সুন্দর রস-কলি। অতল কালো দুটি চোখ, এক মাথা আঁচড়ানো চুল। সামান্য বেশভূষায়, বছর বাইশ তেইশের এ বাউলানীর চোখ মুখে নিয়ত এক ভাবের হাসি। গোপালের চোখে চোখ পড়লে লজ্জার মাধুর্য ফোটে। আর তাদের সঙ্গী দীনবন্ধু, সেও দোতারা বাজাল গান গেয়ে। দুনিয়ার আজব কলে নাকি ঘুরছে সে। দিনাজপুরের আদিবাস ছেড়ে এসেছে সে। এখন থাকে হুগলীর লক্ষ্মণপুরে। জয়দেবে তাকে আসতেই হবে। নইলে সকলের দেখা পাওয়া যায় না। বিশেষ করে গোপাল-রাধারাণীর সে বড় প্রিয়।

বললাম, 'আপনাদের আশ্রম কোথায় এখানে?'

গোপাল বললে, 'বড় বটের তলায় আসবেন, ওই আমাদের আশ্রম।' বলেই হাসি। রাধারাণীর খুঞ্জুনির রিনিঠিনি বোলের মতই তার নিজের হাসি। বললে, 'আসবেন আমাদের আশ্রমে।'

'কখন?'

'দিনে রাতে, যখন খুশি। মন বললেই আসবেন।'

ওরা চলে গেল। কিন্তু এই আলোকোজ্জ্বল আসরে আর আমায় থাকতে

ইচ্ছে করল না। বেরিয়ে পড়লাম। গোটা কেঁদুলি গ্রামটাই বুঝি টহল দিয়ে ফেললাম। মেলা যে কত বড়, বুঝলাম এবারে। এখন শীতকাল। ধান উঠে গেছে। ঘরদরজা সারাবার সময়। তাই বুঝি, দরজা জানালাও সাজিয়ে নিয়ে বসেছে ছুতোর মিস্ত্রিরি। কুড়ুল কাস্তে কোদাল মায় ঢেঁকি। কাঠের বাটি, কাঠের গেলাস, কাঠের কুনকে, বাদ যায়নি। কাঁসা পেতলের তো কথাই নেই, জামা জুতো অপর্যাপ্ত।

রাত এগারোটা নাগাদ আবার এলাম বটের বাগানে। বড় বট কোথায় জানিনে। কিন্তু দীনবন্ধুর গলার গান শুনে জায়গা চিনতে ভুল হল না। পাতা ঝরা বটের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঝিলমিলি। গোপাল ডেকে বলল, 'আসেন গো, আসেন।'

রাধারাণী জায়গা করে দিয়ে বলল, 'বসেন।'

বললাম, 'গান শুনব।'

জবাব হল, 'নিচ্চয়। বসেন শোনবেন।'

গঞ্জিকা তৈরী হচ্ছে গোপালের হাতে। রাধারাণী ডাকল, 'দীনবন্ধু।'

দোতারার তারে একটি ছোট টংকার দিয়ে বলল দীনবন্ধু, 'আজ্ঞা কর।'

'খাবার জল চাই একটু।'

'এনে দেই।'

গোপাল বলল, 'দীনবন্ধু বুঝি আজ্ঞাধীন?'

দীনবন্ধু বলল, 'না। চির অধীন।'

রাধারাণী হাসল খুঞ্জনির মৃদু শব্দে। তারপরে মুখ গম্ভীর হল। গোপালকে বলল, 'ওসব আর থাক, সারাদিনে তো অনেক হয়েছে।'

অর্থাৎ গঞ্জিকা। গোপাল ততক্ষণে টান দিয়েছে। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সুর আসে না যে।'

তুলে নিল দোতারা। দীনবন্ধু এসে পড়ল জল নিয়ে। সে নিল ডুপ্‌কি। রাধারাণী খুঞ্জনী। 'দেখলাম, আরো মেয়ে পুরুষ রয়েছে শুয়ে বসে।

রাধারাণী বলল, দীনবন্ধু, গাও।'

ডুপ্‌কি রেখে সে গান ধরতে গেল। গোপাল ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে বলল, 'মন খুলে গাও দীনবন্ধু।'

দীনবন্ধু বলল; 'সেই আজ্ঞা কর গোঁসাই।' গান ধরল সে,

আমার এক কলসে নয়টি ছিদ্র,
কেমনে রাখি জল গো সখি,

কেমনে রাখি জল।

ছিদ্রের এমনি গুণাগুণ

সব সময়ে, সব ছিদ্রে,

জল পড়ে না তেমন।

গালা কিংবা মোম জমায়ে

বন্ধ করতে যাই

বহির্মুখের স্রোতের ধারায়

খুলিয়া পলায়

ছিদ্রের ভিতর মুখে প্রলেপ দেওয়ার

কী করি কৌশল।

তারপরে গাইল রাধারাণী,

ও মন এবার কোন উপায় দেখিনা

অটল মানুষে ডাকতে (আমার) সরে না রসনা।

অবশ্যই দীনবন্ধুর সঙ্গে সব গান উত্তর প্রত্যুত্তর হিসেবে হল না। যেন মনে হল তাই। কিন্তু রাধারাণীর শ্রেষ্ঠ গান আমার মনে হল,

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে,

চুল ভেজাব না।

এ গান শহরে শুনেছি, সভায় সমিতিতে। কিন্তু কেন্দুলির বটের তলে এই জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারে, জ্যোৎস্নালোকিত অজয়ের নিশি-পাওয়া বালুর চর ও স্রোতের ধারায়, এমন উপযুক্ত পাত্রীর মুখের মত করে শুনিনি। এ যেন রাধারাণীরই গান।

রাত্রি বুঝি দুটো বাজে। ওদের একটু বিশ্রাম দরকার। কিন্তু এই পরিবেশ ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে করছিল না। উঠতে গিয়ে পা ঠেকে গেল রাধারাণীর পায়ে। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বললাম, 'আহা!'

গোপাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ গোঁসাই, দেহিপদপল্লবমুদারম।'

রাধারাণী হাসল খিলখিল করে। দীনবন্ধু বলল, 'জয়গুরু!'

গান সারারাত ধরেই চলবে। অজয়ের বালুচরে গিয়ে দাঁড়ালাম। একেবারে নির্জন নয়। দেখলাম, এত রাত্রেও গরুর গাড়ি এপার ওপার হচ্ছে। মালপত্র আনা নেওয়া চলছে বোধহয়। ইতস্তত নরনারী দেখতে পেলাম এদিকে ওদিকে ছায়ার মত। দূর থেকে নানান গলায় ভেসে আসছে-গান।

সময়ের পিছনে ফিরে গিয়ে, উতলা হব না। ফিরে যাব না মন ভার করে।

একদিন ছিল এরা অনেকখানি নিয়ে, আগামী দিনে আর থাকবে না হয়তো এ বাউলেরা। ওদের গুহ্যতত্ত্ব থাকবে মানুষের স্বভাব বিকাশে। সেই বুড়ো বাউলের কথা আমার মনে পড়ল, 'অ' বাবু, শরীরের ভাণ্ড হলেন ব্রহ্মাণ্ড মানুষের নিজের মধ্যে সব। জয়দেব বাউল আসবেক না, নিজেকে খোঁজার জালা সে থোবে কুথা?'

মানুষ নিজেকে খুঁজবে। মানুষে মানুষে ভালবাসাবাসি করবে, মানুষের মধ্যেই সে সর্বমনিবের অপরূপ রূপ দর্শন হবে, একথা চিরদিন ধরে বলতে হবে আমাদেরই, বাউল যেদিন থাকবে না সেইদিনও।